নষ্ট মেয়ে

নষ্ট মেয়ে

বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিমিটেড
১৪বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট কলকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ · শ্রাবণ ১৩৭২
২০তম মুদ্রণ : কার্তিক ১৪০৮, সংখ্যা ২২০০
২১তম মুদ্রণ : শ্রাবণ ১৪১০, সংখ্যা ২২০০
২২তম মুদ্রণ : শ্রাবণ ১৪১২, সংখ্যা ১১০০
২৩তম মুদ্রণ : নভেম্বর ২০০৬, সংখ্যা ১১০০
২৪তম মুদ্রণ : মার্চ ২০০৮, সংখ্যা ২২০০

প্রকাশক ঃ
ময়ূখ বসু
বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিমিটেড
১৪বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ ঃ প্রণবেশ মাইতি .

মুদ্রাকর ঃ
তনুশ্রী প্রিণ্টার্স
২১বি, রাধানাথ বোস লেন
কলকাতা-৭০০০০৬

ওঁম জবাকুসুম সংকাশন
কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্
ধন্তারিং সর্বপাপঘ্ন
প্রণোতোস্মী দিবাকরম।
ওঁম ঘৃণী সূর্য্যায় নমঃ, ও ঘৃণী সূর্য্যায় নমঃ,
ওঁম ঘৃণী সূর্য্যায় নমঃ।

আকাশ মেঘলা। সকালবেলায় উঠে সূর্যকে না দেখলে মন খারাপ হয়ে যায় সুনন্দার। সেই ছোটোবেলা থেকে ঘুম ভেঙে উঠে সূর্য প্রণাম করে দিন শুরু করার অভ্যেস ধরিয়ে দিয়েছিল ঠামা। সেই থেকে অভ্যেসটা আঁকড়ে রেখেছে ও। সকালে উঠে আকাশের দিকে তাকিয়েই বুঝেছে বৃষ্টিও হবে আজ। কালো জলভরা মেঘেরা একের পর এক মিছিল করে যাচ্ছে আকাশপথে। তবে, ঠিক এই সময় সূর্যঠাকুর আকাশের ঠিক কোনখানটায়, থাকেন জানে ও। বারান্দায় দাঁড়িয়ে সেই স্থান লক্ষ্য করে চোখ বন্ধ করে প্রণাম সেরে চোখ খুলতেই দেখে মেঘের পর্দাটাকে দুফাঁক করে এক পলকের জন্য মুখ দেখালেন সূর্য। মনটা ওমনি খুশি হয়ে ওঠে ওর। বাথরুম ঘুরে তাড়াতাড়ি নীচে কিচেনে নেমে আসে। সকালবেলাটা আর পাঁচটা বাড়ির বউদের মতোই ব্যস্ত থাকে আলিপুরের মুখার্জি ম্যানশনের একমাত্র পুত্রবধূ সুনন্দা মুখার্জি। ওকে এবাড়িতে কেউ বলেনি—'তুমি কিচেনে যাও।' কিচেন সামলাবার জন্য বাবুর্চি আছে, বাবুর্চির সাহায্যকারী আছে। এই দায়িত্বটা ও স্বেচ্ছায় নিয়েছে আর নিয়ে দেখেছে এবাড়ির লোকেদের ওর প্রতি ভরসার মাত্রাটা যেন আরও বেড়েছে। ও বিছানা ছেড়ে ওঠার আগেই তথাগত বেরিয়ে যায় জগিং করতে। ওদিকে শ্বশুর সিদ্ধার্থ মুখার্জি, আর শাশুড়ি ইন্দ্রাণীও বেরিয়ে যান। তথাগত অনেক চেষ্টা করেও বউকে ঘুম থেকে তুলে ভোরবেলায় দৌড় করাতে পারেনি। এখন বুঝে ফেলেছে রায়চৌধুরি বাড়ির মেয়েটি একটু অন্য জাতের মানুষ। আধুনিকা আবার কিছু কিছু ব্যাপারে একেবারেই অনাধুনিকা। ভোরে ওঠা ওর সম্ভবই নয়। প্রায় সাড়ে ছটায় উঠে কি যে সব সূর্য প্রণাম করবে তারপর বাড়ির পূর্বদিকে মন্দিরে প্রণাম করবে, পুরুতঠাকুরের সঙ্গে কথা বলে কিছু সময় নষ্ট করে কিচেনে গিয়ে ঢুকবে। তথাগতর প্রথম প্রথম বউকে

বঝতে একটু অসুবিধে হত। পরে বুঝেছিল দার্জিলিং লরেটো, প্রেসিডেন্সি কলেজ, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া করা বউ একটা পা পুরনো জগতে আর একটা পা বর্তমান জগতে রেখে চলতে চায় ও চলে। ওর খারাপ লাগে না এখন আর বরং বাবুর্চি, হাউসকিপারে অভ্যস্থ জীবনে এক অন্য স্বাদ এনে দিয়েছে ওর বউ। একধরনের বন্ধন। নকল সাহেবি আনা থেকে কিছুটা মুক্ত গেরস্ত গেরস্ত ভাব শুধু ওর নয়, মা ইন্দ্রাণী আর বাবা সিদ্ধার্থরও বেশ পছন্দ হচ্ছে। সুনন্দা এবাড়িতে বউ হয়ে আসার পর থেকেই মম্—ড্যাডের সঙ্গে তথাগতর ইন্টিমেসি অনেক বেড়েছে। আগে যেন অনেকটা ফরমাল রিলেশন ছিল। কেউই কারও খুব কাছে আসতে পারত না। কেউ কারও মনের খবর রাখত না। জানার চেষ্টাও করত না। যে যার নিজের জগৎ নিয়ে ব্যস্ত থাকত ওরা। সুনন্দা এসে ধীরে ধীরে ওদের সকলের জন্য একটাই জগৎ তৈরি করে ফেলেছে। অতি সুন্দরী বউ-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা আর ভালবাসা—দুটোর রশিতেই বাঁধা হয়ে আছে মুখার্জী অ্যান্ড মুখার্জি ইন্টারন্যাশনালের তৃতীয় কর্তা তথাগত মুখার্জি।

পুরুত মশাইর পুজোর সময়টা বাড়ির ছোটো মন্দিরে উপস্থিতি সেরে কিচেনে এসে ব্রেকফাস্টের ফরমাশ, ডোনার স্কুলের টিফিন, জগিং-ওয়াকিং থেকে ফিরে আসার পর মম-ড্যাড আর তথাগতর জন্য আলাদা আলাদা জুস, দুপুরের লাঞ্চের মেনু—সব কাজেই কিছুটা ইনস্ট্রাকশন আর কিছুটা নিজে হাত লাগিয়ে করার প্রাত্যহিক কাজগুলো শেষ করে অবশেষে ওপরে নিজের বেডরুমে আসার সময় হয় নন্দুর ওরফে সুনন্দার। রুনা ওর টেবিলে ডাক রেখে গেছে। চিঠিপত্র দেখতে গিয়ে খুশির হাসি ফুটে ওঠে মুখে। ডিব্রুগড় থেকে ঠামার একটা চিঠি এসেছে। ঠামাবুড়ি এই মোবাইল—ইন্টারনেটের যুগেও আঁকাবাঁকা হাতে চিঠি লেখে ওকে। নিজের চারছেলে আর নাতিরা যদি ঠামার বুকে পঞ্জরাস্থি হয় একমাত্র নাতনি নন্দু তাহলে পঞ্জরাস্থির ভেতরে অবস্থিত হৃৎপিণ্ডের ধকধক।

আমার আদরের নন্দরানি,

প্রথমেই আমার আদর নিও। বাড়ির সবাইকে আমার আশীর্বাদ দিও। আশাকরি সকলে কুশলে আছ। সামনে দুর্গাপূজা আসছে। ইচ্ছা করে সবাই একসাথে এখানে আসুক কিন্তু কেউ আমার কথা ভাবে না। আমি মরলে সবাই একসাথে আসবে হয়তো। শুধু আমি সেটা দেখে যেতে পারব না। নন্দরানি তোমার ছোটোবেলার বন্ধু অপুকে মনে আছে? সেই যে নবীন ব্যানার্জি আর লক্ষ্মীর ছোটোমেয়ে? বিশ বছর পর সেই অপু ওর ননদের ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে জন্মভূমি দেখতে এসেছিল। এসে হোটেলে উঠেছিল। আমি গাড়ি পাঠিয়ে বাড়িতে এনে তুলেছিলাম। প্রায় পনেরো দিন ছিল। আমাদের চা-বাগানে গেল, সারা পাড়ায় সকলের সঙ্গে দেখা করল। নিজেদের বাড়ির চারপাশে ঘুরল। হিমসাগর আমের গাছটার নীচে বসে অনেক কাঁদল। বারবার বলল—'ডিব্রুগড় থেকে চলে গিয়ে মা খুব ভুল করেছিল ঠামা। আমরা খুব কষ্টে ছিলাম কোলকাতায়।' তোমার কথা বলতে বলতে অভিমান করত—'নন্দু আমাকে ভুলে গেছে ঠামা।' অপু তোমার ফোন

নম্বর-ঠিকানা সব নিয়ে গেছে। যাবে তোমার বাড়িতে। একটু সাবধানে মেলামেশা করো। ছোটোবেলায় তোমাকে ভালোওবাসতো আবার খুব হিংসেও করত। তোমার সেসব মনে আছে কিনা জানি না। মহা মতলবি মেয়ে অপু, তাই সাবধান করে দিলাম। সবাই কুশলে মঙ্গলে থেকো। ইত্যাদি---। চিঠিটা হাতেই নন্দু জানালার সামনে এসে দাঁড়ায়। অপু। — মনটা পিছন ফিরে স্মৃতির রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করেছে। রায়চৌধুরি ভিলার একপাশে একরকম চারটে বাড়ি। মেহেন্দি গাছের ঝাড় দিয়ে পাঁচিল করা হয়েছে। তারই একটাতে থাকত অপুরা। নন্দুর থেকে ছমাসের বড়ো অপু। ওর বাল্যের সখী। কী দুষ্টুই না ছিল অপুটা। নন্দু কী ওকে ভুলতে পারে?। ঠামা বলেছিল দাদু নাকি ওই চারটে বাড়ি বানিয়ে রেখেছিলেন এই কথা ভেবে যে, যদি কখনও বাবা আর জেঠুদের মধ্যে বনিবনা না হয় তাহলে যেন ওরা ওই বাড়িগুলোতে থাকতে পারেন। তাহলে ওনারা আলাদাও থাকতে পারবেন আবার একই বাড়ির কম্পাউন্ডের ভেতর দাদুর চোখের সামনেও থাকবেন। কি আশ্চর্য মনঃস্তত্ত্ব আর দূরদৃষ্টি! কিন্তু দাদুর ভয়কে অহেতুক প্রমাণ করে বাবা—জেঠুরা চিরকাল এক সঙ্গে দাদু-ঠামার আন্ডারে বড়ো বাড়িতেই কাটিয়ে দিয়েছেন। ঠামা বলত—'তোরা তখনও জন্মাসই নি! আরে, তোর বাবাই তখনও জন্মায়নি রে। তোর দাদু অত বড়ো মানুষ হলে কি হবে, মাথাটায় একটু গোলমাল আছে, বুঝলি? তা নাহলে কেউ ছেলেরা যদি কখনও আলাদা হয়ে যায়, একথা ভেবে আগে থাকতেই চারখানা বাড়ি বানিয়ে রাখে? আমি বেঁচে থাকতে ওদের কখনও আলাদা হতে দেব আমি? তোর দাদুর সব আশঙ্কাকে মিথ্যে করে দিয়ে আমার চার ছেলে— চার বউ সারাজীবন সুখে দুঃখে একসঙ্গে কাটিয়ে দিচ্ছে। শেষ পর্যন্ত তোর দাদু ওই বাড়িগুলোতে অন্য লোককে থাকতে দিল। মানে ভাড়া দিল। বেশির ভাগই সায়েব দের ভাড়া দিত। ওরা তো কারও সাতে-পাঁচে থাকত না, বাড়ি সুন্দর করে রাখত আর দু-তিন বছর পর বদলি হয়ে অন্য জায়গায় চলে যেত। তোরা সে সব দিন দেখিস নি। জানিস, তখন বাঙালি, অসমীয়াদের থেকে রাস্তাঘাটে গোড়া সাহেব-মেম বেশি দেখা যেত, চা বাগানের মালিক তো একচেটিয়া ওরাই ছিল। ওদের মধ্যে আমার শ্বশুর ছিলেন একমাত্র বাঙালি যার তিনখানা বড়ো চা-বাগান ছিল। তারপর তোর দাদু আবার দুটো বাগান কিনেছিলেন পরে।'— ঠামা গল্প বলত আর সুনন্দা হাঁ করে বসে শুনত। ঠামার বলা যে কোনো গল্পই ওর শুনতে খুব ভালো লাগত। এ বাড়িতে এই জেনারেশনে সুনন্দাই একমাত্র মেয়ে। জেঠুদের সকলের ছেলে, কারও মেয়ে নেই। একটি মাত্র মেয়ে তারপর সকলের ছোটো বলে বাড়ির সকলের আদরের ঘটা একটু বেশিই ছিল ওর প্রতি। ঠামার কথা তো বলাই বাহুল্য। নিজের বাবার জন্মেরও আগের ঘটনা যেন ইতিহাস বলে মনে হত ওর কাছে। আর ঠামার বলার ধরনটাই এমন ছিল যে মুগ্ধ হয়ে শুনত সুনন্দা।

একদিন এমনি গল্প করবার সময় ঠামা অপুদের আসামে আসার গল্প করছিল। অপুর

বাবা নবীনচন্দ্র ব্যানার্জি একজন ইলেকট্রিশিয়ান ছিলেন। ভালোকাজ জানতেন। কোনও ডিগ্রি ডিপ্লোমা কিছুই ছিল না ওনার। কি করে যে শিখেছিলেন সে কথা ঠামাও জানে না। নবীন ব্যানার্জি ভাগ্য অন্বেষণে সুদূর কোলকাতা থেকে আসামের ডিব্রুগড়ে এসে ঠেকলেন। ঠামার শ্বশুর অর্থাৎ সুনন্দার দাদুর বাবার সঙ্গে কি ভাবে যে যুবক নবীনের পরিচয় হয়েছিল তাও ঠামা জানে না। তবে নবীন ব্যানার্জিকে একেবারে ঘরের ছেলে বানাতে বেশি দেরি হয়নি কেশবনারায়ণ রায়চৌধুরির। নবীনকে ডিব্রুগড় শহরের মার্কেট অঞ্চলে একটি ঘর ভাড়া করে দিলেন ইলেকট্রিকেল জিনিষপত্র রিপেয়ারিং করার জন্য। নবীন নিজের পরিশ্রম আর কেশবনারায়ণের সহায়তায় ধীরে ধীরে মোটামুটি একটা ব্যাবসা দাঁড় করিয়ে ফেলেছিলেন। দোকান ঘরেই থাকতেন, নিজের হাতে রান্না করে খেতেন। কপর্দক শূন্য নবীন যখন কয়েক বছরের মধ্যে বেশ জমিয়ে ফেললেন ব্যাবসা তখন কেশবনারায়ণই নাকি ওনাকে বলেছিলেন— নবীন এবার বিয়ে করে সংসারী হও। পরিবার প্রতিপালন করবার মতো রোজগার তো করছ। আর কতকাল নিজে রান্না করে খাবে? -কেশবনারায়ণকে নবীন প্রায় ভগবান জ্ঞানে পুজো করতেন মনে মনে। অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের ব্রাহ্মণ সন্তান নবীন, কেশবনারায়ণের মতো খ্যাতনামা ধনী ব্যক্তির সংস্পর্শ, স্নেহ, মমতা এবং সহায়তা পেয়ে বুঝেছিলেন স্বয়ং ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই ঘটনাগুলো ঘটছে। কেশবনারায়ণের প্রত্যেকটি নির্দেশকেই উনি বেদবাক্য মেনে নিয়ে গুরুত্ব দিতেন। বজবজের কাছে নিজের গ্রামে গিয়ে বিয়ে করে নিয়ে এলেন নবীন। বাসা ভাড়া নিয়ে সংসার পাতলেন ওরা। ঠামা বলত—'নবীনের বউ লক্ষ্মী কখন যে আমারও কাছাকাছি এসে গেল ওর স্বভাবগুণে, সে আমিও বুঝতে পারিনি জানিস? নতুন বউ হয়ে এসেছিল যখন, তখন এবাড়িতে, এলে আড়ষ্ট হয়ে থাকত। এ বাড়ির ঐশ্বর্য, বৈভব, আদবকায়দা সবই তো অন্যরকম ছিল। সাহেবিআনা ছিল কিছুটা। প্রথম প্রথম লক্ষ্মী এসে খুব ভয়ে ভয়ে থাকত। গ্রামের মেয়ে, গরিব মানুষ, ওরা তো এসব দেখেনি কখনও। রায়চৌধুরি বাড়িতে তো নবীন-লক্ষ্মীদের মতো অতি সামান্য মানুষের আসা-যাওয়া ছিল না কখনও। কিন্তু আমার শ্বশুরের, নবীন ব্যানার্জির ওপর অগাধ বিশ্বাস আর স্নেহ ওদের দুজনকে এ বাড়িতে যখন তখন আসা যাওয়া করার ছাড়পত্র দিয়েছিল। তোর বাবা যখন আমার পেটে, তখন লক্ষ্মীরও বাচ্চা হবে। তোর বাবা আর লক্ষ্মীর বড়োমেয়ে যুথীকা একসমান, ৬ মাসের ছোটোবড়ো ওরা। আদিত্যর পরে আমার তো আর ছেলেপুলে হয় নি, কিন্তু লক্ষ্মীর একের পর এক বাচ্চা হতে লাগল। ওরা যে দশ ভাই বোন সে তো তুই জানিস। আর চার ছেলের পর আমার আর মেয়ে হলই না।

এসব শুনে সুনন্দারও হাসি পেত। যুথীপিসি ওর বাবার সমান আর যুথীপিসির সবচেয়ে ছোটো বোন অপু ওর সমান। আগেকার দিনের লোকগুলোর সন্তান উৎপাদন ক্ষমতা কি সাংঘাতিক প্রবল ছিল! পুরনো দিনের স্মৃতি ঘাঁটতে ঘাঁটতে আলিপুরের বাড়ির

জানালায় দাঁড়িয়ে আপন মনেই হাসল নন্দু। ওর দাদু তো কেশবনারায়ণের মৃত্যুর পর নবীন ব্যানার্জিদের ওই চারখানা বাড়ির একখানা বাড়িতে নিয়ে এসে বসালেন। অপুর জন্ম এই অভিজাত রায়-চৌধুরি বাড়িরই কম্পাউন্ডের ভেতরে হয়েছিল। আর এর ছমাস পর নন্দু জন্মেছিল। ঠিক নন্দুর বাবা আদিত্য নারায়ণ আর অপুর বড়দি যুথীকার মতো।

শেষ বয়সের সবচেয়ে ছোটো মেয়ে অপু তাই আদরে, প্রশ্রয়ে প্রায় জংলি হয়ে বড়ো হচ্ছিল। অপুরা সাতবোন, তিনভাই ছিল। যুথীকা, মল্লিকা, মাধবীর পর প্রথম ছেলে বাদল কাকু, তারপর আবার টগর পিসি, বেলি পিসির পর, সজলকাকু, এরপর কেয়া পিসি, কাজলকাকু, এবং সবচেয়ে শেষে অপরাজিতা ওরফে অপু। নবীন ব্যানার্জি আর ওর স্ত্রীকে জ্ঞান হয়ে নন্দু যখন থেকে দেখেছে তখন তো ওনাদের বুড়ো মানুষই বলা যায়। ও ওদের দাদু—দিদা বলেই ডাকত। একমাত্র লক্ষ্মী দিদা আর অপু ছাড়া অন্য কোনো ছেলে মেয়েরাই বিনা প্রয়োজনে কখনও রায়চৌধুরিদের মূল বাড়িতে আসত না। কেন আসত না তা নন্দু সেই ছোটো বেলায় বুঝতে পারত না। এখন ওর মনে হয় যে এ বাড়ির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ওদের বাড়ির যে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক একটা বিশাল গ্যাপ রয়েছে সেটা ওরা জানত বলেই বোধহয় কখনও এবাড়িতে আসত না। বোধহয় বুঝত যে এমন একটা বাড়ির একপাশে একটি সুন্দর আলাদা বাড়িতে যে ওরা থাকতে পারছে, সেটা শুধুমাত্র ওই বড়োবাড়ির লোকেদের অনুগ্রহ ছাড়া কিছু নয়। লক্ষ্মীদিদার কিন্তু দিনের অধিকাংশ সময় এ বাড়িতেই কাটত। সুনন্দা ছোটোবেলায় দেখেছে লক্ষ্মীদিদা এ বাড়িতে কুটনো কুটে দিচ্ছেন, কখনও ঠামার চুল বেঁধে দিচ্ছেন, কখনও ঠামার খাটের ওপর দুজনে বসে পান সেজে খাচ্ছেন আর গল্প করছেন। আর অপু তো শোবার সময়টুকু ছাড়া এ বাড়িতেই পড়ে থাকত। সুনন্দার খাসিয়া আয়া একসঙ্গে অপু আর সুনন্দাকে প্রায় দিনই খাইয়ে দিত। আর একটা কারণও হতে পারে। এ বাড়িতে তো একমাত্র নন্দু ছাড়া বাকি সবাই ছেলে। আর এবাড়ির ছেলেরা ৪-৫ বছর বয়স থেকেই দার্জিলিং-এর সেন্ট পলস স্কুলে পড়তে চলে যেত। শুধু শীতের সময় তিনমাসের লম্বা ছুটিতেই ওরা বাড়ি আসত। দার্জিলিং-এর স্কুলের পাট চুকলে ওরা যেত শিলংয়ের সেন্ট এডমন্ডস কলেজে পড়তে। ওদিকে নবীন ব্যানার্জির ছেলেমেয়েদের পড়াশুনো শুরু হত সরকারি প্রাইমারি স্কুল থেকে আর শেষ হয়ে যেত সরকারি হাইস্কুলের ক্লাস সিক্স থেকে সেভেনের মধ্যেই। একমাত্র যুথীকাপিসিই নাকি ও বাড়িতে ম্যাট্রিক পাস করেছিলেন। এখন সুনন্দার মনে হয় ওরা একধরনের হীনম্মন্যতায় ভুগত বলেই এবাড়ি থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করত। রায়চৌধুরি বাড়ির কারোরই অহংকারী বলে বদনাম ছিল না কখনও। অহংকারী হলে এবাড়ির গেট্ পেরিয়ে ঢোকার অনুমতি নবীন ব্যানার্জির পরিবার কোনোদিনই পেত না। তবু ওরা কখনও আসত না কোনো উপলক্ষ্য ছাড়া।

অপু ছিল এক দুরন্ত মেয়ে। যার মেয়ে হয়ে না জন্মে বরং ছেলে হয়ে জন্মালে ভালো হত। নন্দু নিজেও দুষ্টু ছিল, তবে ওই বয়সে যেরকম সবাই হয় ততটুকুই। অপুর থেকে

ছমাসের ছোটো হবার সুবাদে নন্দুকে অনায়াসেই নিজের আজ্ঞাবাহী শিষ্য বা চামচা করে নিতে পেরেছিল অপু। ঠামার প্রবল আপত্তির কারণে দাদু নন্দুকে কোনো বোর্ডিং স্কুলে পাঠাতে পারেন নি; সে জন্য নন্দু ডিব্রুগড় শহরেরই একটা কনভেন্টে পড়তে যেত। অপুরও কোনো একটা প্রাইমারি স্কুলে নাম লেখানো ছিল যদিও, তবে সে স্কুলে যেতো কি যেত না তা নিয়ে ওদের বাড়ীর কারও বিশেষ মাথাব্যথা ছিল না। অপু রোজই নন্দুর স্কুল থেকে ফেরার অপেক্ষায় গেটের দারোয়ানের ঘরে বসে থাকত, আর নেপালী বাহাদুরের সঙ্গে কী যে বকবক করত সে ওই জানে । নন্দুকে নিয়ে গাড়ি গেটের সামনে দাঁড়ানো মাত্র অপু তড়াক্ করে লাফ মেরে গেটের পাশে ছোটো ফোকরটা দিয়ে বেরিয়ে এসে নন্দুর পাশে উঠে বসত। বাহাদুরের গেট খোলা আর তারপর ড্রাইভওয়েটুকু পার হয়ে গাড়িবারান্দা পর্যন্ত আসা—এইটুকু সময় গাড়ি চড়ার আনন্দটুকু থেকে নিজেকে অপু কখনও বঞ্চিত করত না।

নন্দুর খাসিয়া আয়ার নাম ছিল অ্যালিস। সেই যুগে সারা ভারতবর্ষে খাসিয়া মহিলাদের মতো আয়ার কাজ কেউ করতে পারত না। এদের আয়া বলা উচিত নয় বরং, গভর্নেস বলাটাই সম্মানজনক। তা'বড় রইস আর সাহেবরা ছাড়া এদের রাখার সাধ্য কারও ছিল না। সে যুগের উঁচুদরের সরকারি অফিসারের মাস মাইনের চারগুণ বেশি মাইনে হত এদের। অ্যালিস অপুকে একেবারে সহ্য করতে পারত না। নন্দুর জন্য অ্যালিসের বেঁধে রাখা রুটিন অপু প্রায়ই তছনছ করে দিত। নন্দু অ্যালিসকে অ্যালি আম্মা বলে ডাকত। অপু আড়ালে মুখ ভেংচে বলত—'খালি হাম্বা'। মনে পড়তেই সুনন্দা ফিক্ করে হেসে ফেলল। ছুটির দুপুরে অ্যালিস নন্দুর হোমওয়ার্ক হয়ে গেলে ওকে ঘুমিয়ে পড়তে বলত। নন্দু ঘুমিয়ে না পড়া অব্দি একটা চেয়ারে বসে কখনও বই পড়ত, কখনও উলের মোজা, সোয়েটার এসব বুনতো। ঘুমিয়ে পড়লে অ্যালিসও উঠে পাশের রুমে নিজের বিছানায় শুতে যেত। অপু যাতে এসে নন্দুকে তুলে না দেয় সেজন্য দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে যেত ভেতর দিক থেকে। অপুর একটা বাঁশের আঁকশি ছিল যেটা ও নানা অপকর্মে ব্যবহার করত। রায়চৌধুরি বাড়ির পেছনের বিশাল ফলের বাগানের আদ্দেক ফলেরাই অপুর আঁকশির খোঁচায় কচি-কাঁচা অবস্থায়ই লোপাট হয়ে যেত। শুধু রায়চৌধুরি বাড়ি নয় ; আশে পাশের প্রত্যেকটি বাড়িরই ফল-ফুল বাড়ির লোকেরা বিশেষ ভোগ করতে পারত না। তো, দুপুরে অপু নিঃশব্দে দোতালায় উঠে জানালার ভিতর দিয়ে সেই বিখ্যাত আঁকশি ঢুকিয়ে অবলীলায় খোঁচা মেরে নন্দুকে জাগিয়ে দিত। নন্দুও নিঃশব্দে দরজা খুলে বেরিয়ে আসত— কত মধুর-বিধুর সব স্মৃতি!

বাঙালি বাড়ির খাসমহল যতই সাহেবি বা পশ্চিম ঘেঁষা হক না কেন অন্দরমহলে বিশেষ করে রান্নাঘরে বাঙালিয়ানা থেকেই যায়। যতই না কেন ক্যালোরি সচেতনা থাকুক, এক্সারসাইজ, সুইমিং, জগিং ইত্যাদি চলুক, অঙ্কুরিত স্প্রাউট খেয়ে মেদজমা হওয়ার রাস্তা

বন্ধ করা যাক তবুও বাঙালির আসল পরিচয় তাদের রসনার জোরেই টিঁকে আছে। বাবুর্চি সামসুদ্দিনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সকালবেলার কিচেনে নন্দুকে ব্যস্ত থাকতে হয়। রোজ সকালে শ্বশুরের কুলেখাড়া পাতার সেদ্ধ জল, প্রত্যেকের এক এক গ্লাস করে নীট মুসাম্বির জুস, শাশুড়ি আর ওর জন্য মাপা গরমজলে তুলসীপাতা, মধু, লেবুর রস—এসব করতে বেশ সময় লেগে যায়। ওদের ডিব্রুগড়ের বাড়িতে একটা গেরস্ত গেরস্ত ভাব ছিল। ঠাকুর রান্নাঘরে লকড়ির উনুনে রান্না করত ঠিকই কিন্তু জেঠিমারা আর নন্দুর মা ও কোনো না কোনো তরকারি রাঁধত। ঠামা সকাল বেলা রান্নাঘরের বারান্দায় বটি পেতে বসে তরকারি কুটতো। ঠামার নিরেমিষ রান্নাঘরে মা-জেঠিমারা পালা করে নিরেমিষ রান্না করত স্নান সেরে এসে। তখনও গ্যাসের উনুন প্রচলিত হয়নি। অসমের দিকে কাঠ সস্তায় বিক্রি হত। কয়লার উনুনের চল খুব একটা ছিল না তাদের ছোটোবেলায়। আলিপুরের এই মুখার্জি ম্যানশনের সঙ্গে ডিব্রুগড়ের রায়চৌধুরি ভিলার অনেক তফাত। ছোলার ডাল আর নারকেল কোরা দিয়ে কচুশাক এবাড়ির বাবুর্চি রান্না করতে পারে না। গোল চাকা-চাকা করে কাটা নাগাকচু ভাজা এদেশের শীতের বেগুন ভাজার থেকেও নরম আর সুস্বাদু; মুখে দিলে মাখনের মতো গলে যায়। নন্দুর শ্বশুর সিদ্ধার্থ মুখার্জি ডিব্রুগড়ে গিয়ে নাগাকচু ভাজা খেয়ে এমন মুগ্ধ যে নন্দু যখনই ডিব্রুগড়ে যায় তখনই নাগাকচুর গোড়া আনার ফরমাশ থাকে ওনার। নন্দুকে রীতিমতো মার পাশে বসে শিখতে হয়েছে গোল চাকাগুলোকে চুলের মতো সরু সরু আঁজিআঁজি করে কী করে কাটতে হয়। এবাড়িতে ও শাশুড়ি ইন্দ্রাণীকে কখনও রান্না করতে দেখেনি। অবশ্য ওনার সঙ্গে সুনন্দার মা-জেঠীমাদের তুলনা করলেও ভুল করাই হবে। ইন্দ্রাণী অতিমাত্রায় আধুনিক মনস্ক মহিলা। বছরে কয়েকবার বিদেশে পাড়ি জমান। কখনও বেড়াতে যান নিজের ছড়িয়ে থাকা আত্মীয়দের কাছে, কখনও যে সব সামাজিক সংস্থাগুলোর সঙ্গে উনি বিশেষ ভাবে জড়িত সেসবের ডেলিগেট হয়ে। ইন্দ্রাণী এক আলাদা জাতের মানুষ যাকে সকলের সঙ্গে তুলনা করা যায় না। ইন্দ্রাণীর রূপ, অসম্ভব মার্জিত ব্যবহার আর প্রায় অসাধারণ ব্যক্তিত্ব নন্দুকে যেন সম্মোহন করে রাখে। শ্বশুরমশাই সিদ্ধার্থ আর স্বামী তথাগত মুখার্জি অ্যান্ড মুখার্জি ইন্টারন্যাশনালের দুই কর্তাও যেন ইন্দ্রাণীর কাছে ম্লান। নন্দুর মনে হয় একদিকে যেমন ভোরের নরম আলোর মতো মায়াময় আলো ওনাকে ঘিরে রাখে অন্যদিকে তেমনি যেন এক মহাশক্তির বলয়ে তার বাস। রান্না করার প্রয়োজন তার নেই তাই উনি হয়তো রান্না করেন না কিন্তু মানুষের প্রয়োজনে তাদের পাশে তৎক্ষণাৎ পৌঁছে যেতে তার জুড়ি মেলা মুশকিল। মনে প্রাণে শ্রদ্ধা করে নন্দু একেবারে কাছে থেকেও যেন অনেক দূরে থাকা এই মহিলাকে । যার স্নেহ-মমতা, ভালোবাসা নিজের জীবনে অনুভব করে ও কিন্তু ওই মহাশক্তির বলয় ভেদ করে ওই তেজস্বী মহিলার একেবারে কাছে পৌঁছতে পারে না।

তুলসীপাতার রস, মধু আর গরমজলের সঙ্গে পাতিলেবুর রস মেশাতে মেশাতে নন্দুর

মনে পড়ে একদিন ওরা দুজনে বসে গল্প করার সময় শাশুড়িকে জিজ্ঞেস করেছিল—' আচ্ছা মম তুমি রাজনীতিতে কেন জয়েন করলে না? তোমাকে দেখলে আমার শুধু একজনের কথাই মনে পড়ে— তিনি ইন্দিরা গান্ধি। তুমি কিন্তু পলিটিক্সে গেলে অনেক কিছু করতে পারতে। আরো অনেক বেশি কাজের স্কোপ থাকত তোমার। তোমাকে দেখতেও তো তাঁর মতন প্রায়!' ইন্দ্রাণী খুব হেসেছিলেন পুত্রবধূর কথায়। হাসি থামলে বলেছিলেন—' সুনন্দা, তাহলে যে ভালোবাসাটা তোমার আছে আমার প্রতি সেটা আর থাকত না। তোমার সামনে এখন এক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মম্ বসে থাকত না। রাজনীতিতে নামলে ইচ্ছে না থাকলেও নোংরা ঘাঁটতে হবে,—সে বড়ো সাংঘাতিক। রাজনীতি আমার পথ নয়—আমি কোনো নোংরা জিনিষ পছন্দ করি না। আর ইন্দিরা গান্ধির সঙ্গে আমার তুলনা? এটা করলে কিন্তু তাঁকে ছোটো করা হবে। এখনও পর্যন্ত বল তো মার্গারেট থ্যাচার আর ইন্দিরাগান্ধির মতো মহিলা রাজনীতিবিদ কজন দেখেছ?'

এবাড়িতে ভোর হয় সূর্য ওঠার আগে। শ্বশুর-শাশুড়ি আর ছেলে তিনজনেই ভোরে পথে বেরিয়ে পড়ে। তথাগত জগিং করে রোজ অনেকটা। সিদ্ধার্থ আর ইন্দ্রাণী স্প্রিন্টিং করেন। আগে নাকি ওনারাও দৌড়তেন এখন বয়সের কথা মাথায় রেখে দৌড়নো বন্ধ। ওরা যখন ট্র্যাকস্যুট পরে রোজ বেরিয়ে যায় নন্দু তখন পাশ ফিরে ভোরের ঘুমের আমেজে নিজেকে জড়িয়ে রাখে। ওর ওপর কোনো ব্যাপারেই কোনো বিধিনিষেধ নেই। বিয়ের পর তথাগত নিজে ওকে সাঁতার কাটতে শিখিয়েছিল নিজেদের সুইমিং পুলে। প্রথম দিন সুইমিং কস্টিউম পরতেই নন্দুর রায়চৌধুরি ভিলার আজন্ম সংস্কারে জোর ধাক্কা লেগেছিল—'পাগল? এসব পরে, ড্যাড আর মমের সামনে যাব আমি? কাজ নেই আমার সাঁতার শিখে।' — বলেছিল ও লজ্জায় কুঁকড়ে গিয়ে।

তথাগত আশ্চর্য চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল—'তুমি কোন যুগে বাস করছ নন্দু? মম্ তো কখনও লজ্জা পায় না? যে কাজ করতে গেলে যে পোশাক পরতে হয় সেটা কাজের প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত! কাউকে দেখাবার জন্য তো নয়? তাছাড়া তুমি তো কস্টিউম পরে শুধু সাঁতারই কাটবে, জল থেকে উঠে বাথরোব পরে নেবে! এতেও এত লজ্জা?'

প্রথম প্রথম শ্বশুর-শাশুড়ির যে সবদিনে সাঁতার কাটার মন হত সেসব দিনগুলো এবং বিশেষ করে ওই সময়টা বাদ দিয়ে ও নামত জলে তথাগতর সঙ্গে। আর সেটা বেশির ভাগই রাত্রে। পরে অবশ্য আস্তে আস্তে কুণ্ঠা কেটে গিয়েছিল। এখন তো সপ্তাহে একদিন ইন্দ্রাণীর সঙ্গে ওঁকে সাঁতার কাটতেই হয়। এটাও ইন্দ্রাণীর রুটিনে দাঁড়িয়েছে, এর আর নড়নচড়ন নেই। ঠামা, মা আর জেঠিমারা যদি কোনোদিন দেখে ওকে আর শাশুড়িকে টু-পিস সুইমিং কস্টিউম পরে সাঁতার কাটতে তাহলে চোখ কপালে উঠবে তাদের। দুটো বাড়িতে কত প্রভেদ! কালচারেল ডিফারেন্স, তবুও ভাবের আদান প্রদানে কোন খামতি নেই। রায়চৌধুরি ভিলার মতো এই মুখার্জি ম্যানশনেও একজন ঠামা থাকলে

হয়ত বা অতি আধুনিকতার রাশটা একটু টেনে ধরা থাকত। ঠাকুরঘর বলে বাড়ির ভেতরে কিছু থাকত যা এবাড়ির ভেতরে নেই। পুবদিকের দেওয়াল ঘেঁষে ছোটো মন্দির আছে একটা। নিত্যপুজারী রমানাথ হালদার সকাল-বিকেল পুজো করে দিয়ে যান। এই মন্দির তথাগতর ঠাকুমা বানিয়েছিলেন। যতদিন উনি বেঁচেছিলেন রোজ ঠাকুরমশাইর সঙ্গে পুজো করতেন। ওনার মৃত্যুর পর বাড়ির লোকের হাতে ভগবানের ভাগ্যে জল-মিষ্টি পাওয়া আর হয় না। বিশেষ বিশেষ দিনে নন্দু যায়। যেমন এবাড়ির প্রত্যেকের জন্মদিনে, পয়লা বৈশাখে, দুর্গাপূজোর ৪ দিন, দেওয়ালীতে ও ঠাকুরমশাইর সঙ্গে মন্দিরে পুজোর যোগান দেয়। সিদ্ধার্থ তাই ওকে নন্দু-মা বলে ডাকেন। খাবার টেবিলে বলেও বসেন—'বুঝলে ইন্দ্রাণী, নন্দুমা এসে আমার মায়ের জায়গাটা দখল করেছে। আমাদের তো নিজেদের মন্দিরেই একবার প্রণাম করারও ফুরসত হয় না। ও সেদিকটাও বজায় রেখেছে সকলের প্রতিনিধি হয়ে।'

ইন্দ্রাণী মন্দিরের ধারে কাছে নেহাত দায়ে না পড়লে যানই না বিশেষ। কিন্তু নন্দুর যে এ ব্যাপারে আগ্রহ আছে, বিশ্বাস আছে সেটা ওনার খারাপ লাগে না। আসলে ইন্দ্রাণী অন্যের বিশ্বাসকে মর্যাদা দিতে জানেন। স্বামীর খোঁচা মোটেই গায়ে মাখেন না উনি—'কে সুনন্দাকে পছন্দ করেছিল বান্টুর (তথাগত) জন্য সেটা বল? আমার মধ্যে যেসব জিনিষ কম আছে, সেগুলো সুনন্দা পূর্ণ করবে এটাই আমার আশা ছিল। ও পূর্ণ করার চেষ্টা করে বলেই তোমার ওকে মায়ের মতো মনে হয়। আমারও মা কে মনে পড়ে। মা আমাকে এগুলো শেখাতে চেয়েছিলেন, আমি শিখতে পারিনি কারণ শিখতে চাইইনি বলে। ছোটোবেলা থেকে বিদেশের সংস্কৃতিতে বিদেশের মাটিতে মানুষ হয়েছিলাম। বিয়ের মাত্র ৩/৪ বছর আগে বাবা দেশে ফিরে এলেন। তখন আমার বয়স ২৩ বছর। ওই বয়সে কি আর নতুন করে বাঙালি সংস্কৃতি চট করে শিখে ফেলা যায়? প্রথম প্রথম তো এদেশে এসে কারও সঙ্গে মানাতেই পারতাম না! কত কষ্ট হয়েছে নিজেকে অ্যাডজাস্ট করতে। সুনন্দা যে ওর ঠাকুমার কাছে সবই শিখেছে! আবার দার্জিলিং লরেটো হাউসে থেকে পড়াশুনো করেছে। ওর পক্ষে দুটো কালচার মেনে চলা যতটা সহজ আমার পক্ষে সেটা একেবারেই সম্ভব ছিল না সিদ্ধার্থ।'

—'তবু তুমি কিন্তু আমার মায়ের সঙ্গে খুব সুন্দর অ্যাডজাস্ট করে নিয়েছিলে ইন্দ্রাণী। সেটা তোমার মস্তবড়ো গুণ ছিল। এখন আর কে বলবে যে তুমি ইংল্যান্ডে জন্মেছ, ওখানে বড়ো হয়েছ? এখন তোমার মধ্যে একজন পরিপূর্ণ বঙ্গললনাই দেখতে পাই।' —'না। তা বললে বেশি বলা হয়ে যাবে। আমার কোনো অবদান ছিল না। তোমার মা—সরি, আই মিন, আমাদের মা আমাকে সাহায্য না করলে, সহ্য না করলে আজকে যেটুকু বঙ্গ ললনা দেখতে পাচ্ছো সেটুকুও পেতে না।'

তথাগত খেতে খেতে এতক্ষণ শুনছিল। এবার ফুটকাটে—'আচ্ছা মম্ তোমার কি ওয়েডিং গাউন পরে বিয়ে হয়েছিল নাকী বেনারসি-টসি পরে?'

সিদ্ধার্থ হো হো করে হাসতে থাকেন। নন্দুরও হাসি এসে যায়। ইন্দ্রাণী একটুও না দমে হাসতে হাসতে ছেলেকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলেন—'একেবারে বেনারসি-টসি পরে, চন্দন সাজে সাজিয়ে, একগাদা গয়না পরিয়ে, মুখে পানপাতা চাপা দিয়ে ২৭ বছরের মেয়েকে পিঁড়িতে বসিয়ে সাতপাক ঘুরিয়েছিল বুঝলে বান্টু? — অবশ্য বিয়ে টিয়ে হবে জেনে আমার মা ও খাটাখাটনী করে আমাকে শাড়িটাড়ি পরানো শিখিয়ে ছিল। জিজ্ঞেস কর না তোমার ড্যাড কে, বিয়ের আগে সিদ্ধার্থর সঙ্গে কোর্টশিপ করার সময় শাড়ি পরে বের হতাম না গাউন পরে?'

নন্দুর দ্রুতলয়ে চলা হাত আর ভাবনার মাঝখানেই ঘামচপচপে তথাগত কিচেনে এসে ঢোকে। কিচেন টেবিলের সামনের একটা চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ে বলল—'হল ঘাসপাতা বাটা দাদিমার ঘরোয়া টোটকা তৈরি? এবার একটু আমার দিকে দেখ? ঘামটা মুছে দাও না।' নন্দু ট্রেতে দাদিমার টোটকার ছোটো গ্লাসগুলো বসিয়ে এগিয়ে দেয় তথাগতর দিকে—'নাও ধরো। এটা নিয়ে চলে যাও ওপরে।' নন্দুর ড্রেসিংগাউনের হাতাটাতে তথাগত ওর ঘাম মুছে ফিসফিস করে বলল—'ম্যাডাম, আমার বর্তমান স্ট্যাটাসটা কি ডিমোশন হয়ে বেয়ারা পদে গিয়ে ঠেকেছে?'

নন্দু চেঁচিয়ে ওঠে—'সেই আমার পরিষ্কার কাপড়ে ঘাম মোছা? ওহ! পারও বটে! তোমার ডিমোশন হওয়াই তো উচিত! যাও, এটা নিয়ে চলে যাও, সামসুদ্দিন জুসের ট্রে নিয়ে যাবে। আর দয়া করে ডোনাকে গিয়ে ডেকে তোলো। পৌনে সাতটা বাজতে চলেছে এখনও ওঠার নাম নেই!'—'জী হুজুর!'—বলে তথাগত বাধ্য ছেলের মতো ট্রে নিয়ে রওয়ানা দেয়। ওর যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে প্রসন্ন মুখে নন্দু বলে—'পাগল একটা! যত্রতত্র এত তোয়ালে থাকলেও বাপ-ছেলে দুজনেরই নন্দুর কাপড়ে মুখ মোছার বদ অভ্যেস যতসব! এ বেলায় আর আধুনিক হয়ে উঠতে পারেনি। জোজোটাও এখানে এলে মার শাড়ির আঁচল, দোপাট্টার খুঁট ছাড়া আর কিছু খুঁজে পায় না মুখ মোছার জন্য।'

—'সামসুদ্দিন!'

—'জী মেমসাব।'

—'এবার ইডলীগুলো ভাপে চড়িয়ে দাও। আমি তাহলে যাচ্ছি, ঠিক আছে?'

—'জী, লেকিন ছোটাসাবকে লিয়ে কোই দুসরা আইটেম বনা দুঁ ক্যা? উনকো ইডলী পসন্দ নহী হ্যায় না?'

—'নহী। ইডলী খাওয়া ভালো মাঝে মাঝে। আজ ইডলীই খাবে।'— বলে নন্দু বেরিয়ে আসে কিচেন থেকে। বিয়ের পর এবাড়িতে এসে রোজ ব্রেকফাস্টে থোড় বড়ি খাড়া আর খাড়া বড়ি থোড় অর্থাৎ পাউরুটি টোস্ট, মাখন আর ডিমের পোচ খেয়ে খেয়ে ওর পেটে চড়া পড়ে গিয়েছিল। একটু নতুন বউ-এর গন্ধটা গা থেকে সরতেই ও ব্রেকফাস্টে পরিবর্তন শুরু করেছিল নিত্য নতুন। কোনোদিন চিঁড়ের পোলাও, কোনোদিন আলুপরোটা, প্লেইন পরোটার সঙ্গে শুকনো আলুরদম, লুচি-আলুকপির চচ্চড়ি—এইরকম।

মাঝে হয়তো একদিন ব্রেড-বাটার, পোচ। ইডলী হলেই তথাগতর বিরক্তি। খেয়ে নেবে ঠিকই কিন্তু দশটা কথা শুনিয়ে খাবে। নন্দু পাত্তা দেয় না। ওর বাপের বাড়িতে কোনোদিন একঘেয়ে ব্রেকফাস্ট করেনি ওরা। আসলে জেঠিমা-মা ওরা রান্নার ঠাকুরের হাতে সবটা ছেড়ে দিত না তো! বিয়ের পর কতকাল যে ও কুরকুরে মুড়ি—চানাচুর, মুড়ি-চিঁড়ের মোয়া, নারকেল তক্তি-নাড়ু খায় না তার ঠিক নেই। এবাড়িতে পিঠে-পুলি, নাড়ু-মোয়ার কথা চিন্তাও করা যায় না। নন্দু আগে ঘন ঘন বাপের বাড়ি যেত যখন, তখন ঠামা কার্টন বক্স ভরে শুধু কৌটোর পর কৌটো দিত। তাতে এসব অতি সুখাদ্য মুখরোচক বস্তুগুলো থাকত। সিদ্ধার্থর তো কথাই নেই, ইন্দ্রাণীও খুশি হয়ে খেতেন, কিন্তু একথা বলতেও ছাড়তেন না—'তুমি কিন্তু সুনন্দা এসব মুখরোচক খাবার বানাবার জন্য কিচেনে পড়ে থাকবে না।'— নন্দু মনে মনে ভাবত পড়ে থাকলেও হবে না কারণ এসব বানানোর কায়দা নন্দুর অজানা। ও শুধু খেয়েছে, বানানোর সময় ওদের রান্নাঘরে থাকেনি কখনও। নন্দুর হাসি পায় ভেবে ওর বাপের বাড়ি আর শ্বশুরবাড়ি যেন পূর্ব-পশ্চিমের যুগলবন্দী। একেবারে আলাদা হয়েও সমে এসে একাকার, একসুর।

একটু পরে নন্দু ছোট ডাইনিং রুম মর্নিংগ্লোরিতে এসে দেখে খবরের কাগজহাতে এখনও ট্র্যাকস্যুটে থাকা মা, বাবা আর ছেলে মিলে আসর জমিয়ে দিয়েছে। নন্দু বসে নিজের মধু-গরমজলের গ্লাস টেনে নিয়ে জিজ্ঞেস করে—'ডোনা কোথায়? ওঠেনি এখনও?' তথাগত বলল—'উঠিয়ে দিয়ে এলাম তো! মহারানি হয়তো এখনও ব্রাশ করে চলেছে! সময়জ্ঞান আর হবে না মেয়েটার!'

ইন্দ্রাণী কাগজ থেকে মুখ না সরিয়েই বলেন—' তোমারও ছিল না বান্টু। ডোনা তো তোমার মতোই হয়েছে। আরাম প্রিয়!'

—'আমি আরাম প্রিয়? তুমি না মম্ তোমার নাতনির দোষ দেখলেই ওর সাপোর্টে কথা বল দেখেছি আমি।'—প্রতিবাদ করে তথাগত।

ইন্দ্রাণী বলেন—'না, এখন আর তুমি আরাম প্রিয় নও। ওর বয়সে ছিলে, সেকথাই বলেছি। ডোনা যখন তোমার এই বয়সে পৌঁছবে তখন ও আর আরামপ্রিয় থাকবে না।' সিদ্ধার্থ বললেন—'জানিস, দাদু-ঠাকুমা-দিদিমারা নাতি-নাতনির সাপোর্ট করবেই, এটাই নিয়ম। আমার মা আমাকে মারলে ঠাকুমা মাকে এই মারে তো সেই মারে হত। আর এই সুযোগটার যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করতাম আমি। খুব দুষ্টু ছিলাম ছোটোবেলায়। জোজো, ডোনারা তো দুষ্টু হয়নি আমাদের সময়কার বাচ্চাদের মতো। আমাদের সময় আমরা প্রায় বাঁদরের মতোই দুষ্টুমি করতাম। আসলে বাঁদরেরই সভ্য সংস্করণ, উত্তরসূরি তো আমরা!'—হাসলেন সিদ্ধার্থ।

শ্বশুরের মুখে বাঁদরের মতো দুষ্টুমির কথা শুনে নন্দুর আবার ওর নিজের ছোটোবেলার কথা মনে পড়ে যায়। মা বলত ওই অপুটার সঙ্গে মিশে মিশে তুই আর মানুষ নেই। একেবারে বাঁদর হয়ে যাচ্ছিস। কি যে করি আমি তোকে নিয়ে? মা তো

আহ্লাদ দিয়ে দিয়ে মাথায় তুলেছেন, বোর্ডিংয়ে পাঠাতেও দিতে চান না। ওই মেয়েটা তোর সর্বনাশ করেই ছাড়বে। অসভ্য একটা মেয়ে! লেখাপড়া নেই, স্কুলে যাওয়া নেই সারাদিন ধিঙ্গীপনা করে বেড়াচ্ছে কোন শাসন নেই! এবাড়ির মেয়ে হয়ে তুই যে কেন ওর সঙ্গে মিশিস তাই বুঝি না।'

নন্দু মার বকুনিতে তখনকার মতো দুঃখ পেতো। ও তবে কার সঙ্গে খেলবে?—দুপুর হলেই যখন অপু জাগিয়ে দিত, ঠোঁটে আঙুল চাপা দিয়ে ইশারায় নন্দুকে বলতো দরজা খুলে বাইরে আসার জন্য, নন্দুও অমনি উঠে পা টিপে টিপে পাশের ঘরে গিয়ে উঁকি মেরে আগে দেখে নিত অ্যালি আম্মা ঘুমোচ্ছে কিনা; তারপর আস্তে করে দরজাটা খুলে বাইরে চলে আসত। এরপর শুরু হত দুজনের দ্বিপ্রাহরিক পাড়া অভিযান। রায়চৌধুরি বাড়ির বিশাল কম্পাউন্ডের পরের বাড়িটাই ছিল বেজবড়ুয়াদের বাড়ি। বেজবড়ুয়াদের বাড়ি রায়চৌধুরি ভিলার মতোই বিরাট। ডিব্রুগড় শহরের কিছুদূরে ওদের জমিদারী ছিল। গ্রাম থেকে গোরুর গাড়ি বোঝাই হয়ে ধান আসত ওদের বাড়িতে। ও বাড়ির পেছন দিকে একটা ঢেঁকি ঘর ছিল। গ্রাম থেকেই অসমীয়া বউরা ধান কুটে চাল বের করার জন্য বেশ কিছুদিন ধরে এসে থাকত বাড়ির পেছন দিকের চালাঘর গুলোতে। দুপুর বেলা প্রায়ই অপু ওই বাড়িতে হয় ফলের বাগানে, নয়তো ঢেঁকি ঘরে অভিযান চালাতো। অনেক উঁচু গাছে কেমন তরতর করে উঠে পড়ত অপু। আম, জাম, কাঁঠাল, পেঁপে, পেয়ারা, আতা, সীতাফল, আমলকি, শশাখেতের শশা—কিছু রেহাই পেতো না। এতবড়ো বাড়ির অতবড়ো বাগানের কোন্ কোণায় কে কি করছে সেটার নজরদারি করা বাড়ির লোকের পক্ষে সবসময় সম্ভব হত না। বাগানে বসে বসেই ওরা দুজনে কিছু ফল খেয়ে নিত আর বাকিগুলো অপু বাড়ি নিয়ে যেত পরে খাবে বলে। নন্দুর সে সাহস ছিল না। একটা দুটো যা খেতে পারত সেটাই আনন্দ। ঢেঁকি চালানো গ্রামের বউ-রা দুপুর বেলা চালাঘরে বিশ্রাম করত, আর সেই ফাঁকে অপু ধানের সরাই থেকে গোছা গোছা ধানের ছড়া বের করে নন্দুকে বলতো— 'তুই ঢেঁকির ওপর দাঁড়িয়ে পা চালাবি আর আমি হাতে করে ধানগুলো সরিয়ে সরিয়ে দেব। অপুর একান্ত আজ্ঞাবাহী নন্দু ও যা বলত তাই করতে কখনও দ্বিধা করত না। মাঝে মাঝে ধরা পড়ে খুব বকুনিও খেত দুজনেই। নন্দু কোনোদিন মার খায়নি, কিন্তু অপুকে বহুবার পাড়ার বিভিন্ন বাড়িতে মারধরও খেতে হয়েছে। তবু ওকে কেউ থামাতে পারত না। একবার তো ঢেঁকি ঢেঁকি খেলতে গিয়ে ওর হাতের ওপর ঢেঁকি পড়ে গিয়ে রক্তারক্তি কান্ড হয়েছিল। ভাগ্যিস সেদিন নন্দু ছিল না ওর সঙ্গে সেখানে! নন্দুর মা খুব রাগারাগী করতেন মেয়ের ওপর, অনেক বোঝাতেন। ঠামাও বলত—'নন্দু তুই অপুটার সঙ্গে মিশে মিশে একেবারে জংলি হয়ে যাচ্ছিস। খেলতে হয় বাড়ির ভেতরে পুতুল খেল, রান্নাবাড়ি খেল। পরের বাড়িতে দুষ্টুমি করতে কেন যাস বল তো? তোর বাপি জানতে পারলে খুব রেগে যাবে কিন্তু, এই বলে রাখলাম!' অ্যালিস

তো একদিন মা কে বলেই দিল—'অপুর সঙ্গে সুনন্দার মেলামেশা আপনারা যে ভাবেই হোক বন্ধ করুন। ওই মেয়েটা সুনন্দাকে স্পয়েল করে দেবে।'

এসবের পর নন্দু কিছুদিন অপুর সঙ্গে বাইরে যাওয়ার প্রোগ্রামগুলো বন্ধ রাখত। বকুনির ভয়ে সাহস হত না ওর। কিন্তু খেলার সাথী না থাকায় অপুর সঙ্গ লাভের জন্য ছট্‌ফট্ করত। কি যে তীব্র আকর্ষণ ছিল অপুর মধ্যে, নন্দুকে যেন অপু বশীকরণ করার মত করে টানত। কিছুদিন চুপচাপ থাকার পর সবাই যখন বেশ ঢিলে দিয়েছে, তখন আবার নন্দু বের হতে শুরু করত অপুর সঙ্গে। একদিন বেজবড়ুয়াদের বাগানে আতাগাছে চড়ে অপু আতা পেড়ে পেড়ে নীচে দাঁড়ানো নন্দুর ফ্রকের কোঁচড়ে ফেলছে, আর তক্ষুনি একেবারে ওদের সামনে এসে হাজির হলেন বেজবড়ুয়া সাহেব নিজে। হাতে নাতে ধরা পড়ে নন্দুতো কাঁদতে শুরু করে দিল আর অপু গাছ থেকে নামতেই চায় না। বেজবড়ুয়া সাহেব টেনে ওকে গাছ থেকে নামালেন, তারপর টেনে মোক্ষম থাপ্পড়। যাচ্ছে তাই ভাবে গালাগাল করেছিলেন উনি অপুকে। তারপর নন্দুর দিকে ফিরে বলেছিলেন—'তুমি হরু চুয়ালী (তুমি ছোটো মেয়ে) কিন্তু এটা কথা মনত রাখি দিবা, তুমি রায়চৌধুরি ঘরর চুয়ালী পাহরি না জওয়া (তুমি রায়চৌধুরি বাড়ির মেয়ে ভুলে যেও না) ইহকল বেয়া আগাছার লগতে ন থাকিবি দেই।' (এসব খারাপ আগাছার সঙ্গে মিশবে না) বলে চলে গিয়েছিলেন আয়নার মতো চক্‌চকে কালো চামড়ার চটি ফট্‌ফটিয়ে। আতাগুলো সব মাটিতে পড়ে গিয়েছিল নন্দুর কোঁচড় থেকে। অপু আতাগুলো কুড়িয়ে তুলল। তারপর নিজের ঢলঢলে জামাটা তুলে কোমরের কাছে প্যান্টের মধ্যে একটা একটা করে গুঁজে রাখল। ওর পেট আর কোমরের কাছটা ফুলে উঠেছিল বড়ো বড়ো পাঁচ-ছটা আতা গুঁজে। বাইরের লোকের হাতে মার খেয়ে, গালাগাল শুনে ও এমন অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল যে, বেজবড়ুয়া সাহেবের জোর থাপ্পড়ে ওর ফর্সা গাল যে লাল হয়ে উঠেছে, হয়তো বা জ্বালাও করছিল খুব এসব ও গায়েও মাখল ন। ওইটুকু বয়সে সেদিন নন্দু কিন্তু খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিল যে ওকে অপুর সঙ্গ ছাড়তে হবে, বেরোনো এবার বন্ধ করতে হবে তা না হলে একদিন হয়তো অপুর মতোই ওর গালেও কেউ এমনি করে থাপ্পড় মারবে। নন্দু কোনোদিন কারও কাছে মার খায়নি, মার খাওয়াতে ওর বড়ো ভয়। আজ এই মুহূর্তে পুরনো সেই দিনগুলোর কথা ভাবতে গিয়ে সুনন্দার মনে হল ওই বয়সেই বোধহয় ওর মধ্যে আত্মসম্মান বোধের জন্ম হয়ে গিয়েছিল। সেই সাত-আট বছর বয়সেই সেদিন ও বুঝতে পেরেছিল এসব কথা দাদু বা বাপির কানে গেলে ওনাদের উঁচু মাথাটা নীচু হয়ে যাবে একেবারে। সেদিন ওই আতাগাছের তলায় দাঁড়িয়ে অপু নন্দুর চোখের জল মুছিয়ে দিতে দিতে বলেছিল—'অ্যাই নন্দু, তুই কাঁদছিস কেন? আজ ধরা পড়ে গেছি বলে কি রোজ ধরা পড়ব নাকি রে বোকা?' দ্যাখ্ না ওই বুড়ো বেজিটাকে (বেজবড়ুয়া) কী নাকাল করি আমি! আমাকে এত জোরে থাপ্পড় মেরেছে যে গালটা জ্বলছে রে। নে, চল্ এখন, বেজিটাকে থাপ্পড় মারার শাস্তি দেবোই আমি। চল।' — বলে অপু নন্দুর হাত ধরে টানতে

টানতে নিয়ে চলল বেজবড়ুয়াদের বাড়ির ভেতরের দিকে। বেজবড়ুয়াদের বাড়ির একতলায় একটা বড়ো ঘর ছিল যেখানে লাইন করে বড়ো বড়ো কাঠের ব্যারেলে করে চাল রাখা থাকত। অপু নন্দুকে নিয়ে ওই ঘরে এসে ঢুকল পা টিপে টিপে। তারপর একটা ব্যারেলের চালের মধ্যে কোমর থেকে আতা ফলগুলো বের করে একটা একটা করে অনেক নীচের দিকে গুঁজে দিতে লাগল। সব কটা গোঁজা হয়ে গেলে ও কানে কানে ফিসফিস করে নন্দুকে বলল—'তুই এখানটায় হাঁটু গেড়ে বসে পড়।'— নন্দু ইতস্তত করছে দেখে অসহিষ্ণু গলায় ধমকে উঠল —'বলছি বসতে, বসে পড়!' — নন্দু ধমক খেয়ে ভয়ে ভয়ে বসে পড়ল মাটিতে আর সঙ্গে সঙ্গে অপু ওর পিঠের ওপর পা রেখে একলাফে একটা চালের ব্যারেলে উঠে পড়ল। পোকা যাতে না লাগে সে জন্য পর পর লাগানো প্রত্যেকটা ব্যারেলই ঢাকনাহীন খোলা অবস্থায় রাখা থাকত। অপু খোলা ব্যারেলে উঠে প্যান্ট খুলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পেচ্ছাপ করতে লাগল চালের ওপর। এবং ওই অবস্থায়ই লাফিয়ে লাফিয়ে একটা ব্যারেল থেকে অন্য ব্যারেলে যেতে লাগল পেচ্ছাপ করতে করতেই। বেশ কয়েকটা ব্যারেলের চালে এভাবে নিজের পেচ্ছাপ মিশিয়ে দিয়ে নন্দুর বিস্ফারিত ছানাবড়া হয়ে যাওয়া চোখের সামনে অপু লাফ মেরে নীচে নেমে এল। দরজার সামনে গিয়ে এদিক ওদিকে দেখে নন্দুর হাত ধরে সুড়ুৎ করে বেরিয়ে যে দিক দিয়ে এসেছিল সেদিক দিয়েই বেজবড়ুয়া বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। বাইরে এসে আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে বলল—'দেখলি তো, অপুকে থাপ্পড় মারার ফল? ওই বুড়ো বেজি এখন অপুর পেচ্ছাপ শুদ্ধু ভাত খাবে রোজ বুঝলি? আতাগুলো চালের ভেতর দু-তিন দিনের মধ্যেই পেকে যাবে। যে দিন ওগুলো নিতে আসব সেদিন হেগে রেখে যাব চালের মধ্যে বুঝলি? আজ নেহাৎ সকালেই পায়খানা করে ফেলেছিলুম তাই হল না। সেদিন পায়খানা করব না, চেপে চেপে রাখব। আর দুপুরে ভাত খাওয়ার পরই যেই পায়খানা পাবে অমনি আসব এখানে। আর চালের মধ্যেই—হেঁ-হেঁ- বুঝলি তো?'—নন্দু মাথা নেড়ে বলল বুঝেছে। কিন্তু মনে মনে অপুর ওপর খুব রাগ হতে লাগল ওর। ছি ছি! অপু ওব বন্ধু ঠিকই কিন্তু এমন খারাপ কাজ করবে সেটা নন্দুও ভাবতে পারেনি। নন্দু সেদিন খুব ভয় পেল আর নিজের থেকেই ঠিক করে নিল, আর ও অপুর সঙ্গে বেশি বের হবে না।

এবার নন্দু সত্যিই অপুকে এভয়েড করতে শুরু করেছিল। যদিও ওর আর কোনও খেলার সঙ্গী ছিল না বলে খুব একা একা লাগত, মনটা সব সময় অপুর চারপাশেই ঘোরাফেরা করত তবু ও নিজেকে অপুর থেকে দূরে রাখার কায়দাটা নিজে নিজেই বের করে নিল। অ্যালি আম্মা দুপুরে বারান্দার দিকের দরজা বন্ধ করে শুতে গেলে ও নিজেই উঠে বিছানার দিকের জানালাটা বন্ধ করে পর্দা টেনে দিত, যাতে অপু এসে আঁকশির খোঁচা মেরে ওকে আর না ডাকতে পারে। এর কিছুদিন পরই একটা মারাত্মক ঘটনা ঘটে

গেল, আর যে নন্দুকে ঠামা কিছুতেই বোর্ডিং স্কুলে পাঠাতে রাজি হত না, সেই ঠামাই দাদুকে নিজে থেকে বলল ওকেও ছেলেদের মতো বোর্ডিং-এ পাঠিয়ে দিতে।

সেদিনটা সুনন্দার স্পষ্ট মনে আছে। আজ এখনও এখানে বসে ভাবতে গিয়েও ওর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল সেদিনের কথা মনে পড়ে। সেদিন সকালে বাগানের লন ছাঁটছিল মালি মোওয়ার দিয়ে। নন্দুর সময় কাটাবার কোনো রাস্তা না থাকায় ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখছিল। এমন সময় অপু এসে হাজির হল সেখানে। ওকে দেখেই নন্দু কুঁকড়ে গেল একেবারে। অপু বলল—'কি রে, এখন যে একদম খেলতে আসছিস না? ওই খালি -হাম্বা অ্যালিস তো তোর ঘরের জানলাটাও এখন বন্ধ করে রাখে। আমি রোজ যাই আর ফিরে আসি। খুব আটকে দিয়েছে তোকে, তাই না?'— নন্দু কিছু বলল না। অপু ওর হাত ধরে টেনে বলল—'চল্ না রে, আজ একটু নদীর ধারে বেড়িয়ে আসি! নন্দুর কোনো আপত্তি না শুনে অপু একরকম টেনে নিয়ে চলল লন পেরিয়ে গেটের দিকে। বাহাদুর বোধহয় এদিক ওদিক কোথাও গিয়েছিল সেই সময়। ওর কেবিন খালি পড়েছিল। গেটে অবশ্য তালা দেওয়াই ছিল। ওরা পাশের ছোটো ফোকরটা দিয়ে বেরিয়ে এল। রাস্তার ওপারে অল্পদূরেই ব্রহ্মপুত্র তার বিশাল, বিরাট আকার নিয়ে বয়ে চলেছে। এ রাস্তাটার নামও তাই রিভারসাইড রোড। শহরের সবচেয়ে অভিজাত মহল্লা। এ মহল্লার প্রত্যেকটা বাড়িই যেন এক একটা ছবি। কেউ যেন নানা রংয়ে এঁকে রেখেছে ছবিটাকে। ওরা দুজনে নদীর ধারে এল। ব্রহ্মপুত্র এখানে এত চওড়া যে ওপার দেখা যায় না। কোনো ঢেউ নেই ওপরে। কিন্তু নন্দু শুনেছে জলের তলায় আন্ডার-কারেন্টের কথা। ও এমনিতেই এই নদীকে খুব ভয় পায়। বন্যার সময় কি ভয়ংকর হয়ে ওঠে ও দেখেছে। অপু পাড়ের কাছাকাছি গিয়ে বলল—'আয় এখানটায় বসি।'— দুজনেই বসল। অপু ওর প্যান্টের কোমর গুঁজি থেকে দুখানা হলুদ রংয়ের পাকা আতা বের করল। একটা নন্দুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল—'এই নে। সেদিনকার আতা। তোর সঙ্গে তো দেখা হচ্ছে না তাই দিতেই পারছি না। খা। সবকটা চালের ভেতরে পেকে গেছে জানিস?— কী হল? নে!'

'না রে, আমি আতা খাব না। আমার পেট খারাপ।'

—ও! তাহলে থাক্। খেতে হবে না। আমিই খাই।'— বলে ও আতা খেতে লাগল। খেতে খেতেই হঠাৎ বলল—'অ্যাই, নদীতে চান করবি? আমি মাঝে মাঝে করি। জানিস, মা জানতে পারলে বকবে বলে লুকিয়ে চান করতুম। তোদের গ্যারেজ ঘরে একটা গাড়ির চাকা ছিল, চাকা নয়-চাকা নয় ওই যে চাকার ভেতরে রবারের আর একটা চাকা থাকে না, ওটা আমি একদিন নিয়ে গেছি তোদের গ্যারেজ থেকে। কেউই টেরই পায় নি! ওটাকে নিয়ে সাইকেলের দোকানে গিয়ে ফুলিয়ে এনেছি। তারপর ওটার ওপর চেপে, এই এখানটায়— অপু হাত দিয়ে সামনেটা দেখিয়ে বলে—'এখানটায় জলে নেমে চান করেছি। এমনিই করতে করতে এখন আমি সাঁতার কাটতে পারি জানিস? তুই তো কিছুই শিখলি না।'—নন্দু অবিশ্বাস এবং আশ্চর্য দুটোর কোনও ভাবটাকেই গোপন করতে না পেরে

বলে—'তুই সাঁতার শিখেছিস? টিউবে চেপে এই ব্রহ্মপুত্রে? যা ! মিথ্যে কথা আর বলিস না।'

অপু রেগে গিয়ে বলে—'আমি মিথ্যে কথা বলছি? দেখবি তুই আমি সাঁতার কাটতে পারি কি-না? দাঁড়া, এক্ষুনি দেখাব তোকে। আগে আতাদুটো খেয়েনি, তারপর টিউবটা বের করছি। ওই ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছি ওটাকে।'

নন্দু বলল—'না বাবা আমার দেখে কাজ নেই। তারপর তুই যদি ডুবে যাস তখন কি হবে?'

—'ধ্যাৎ! ডুবে যাব কেন? আমি সত্যিই নিজে নিজে সাঁতার শিখেছি রে। এখন তো টিউব ছাড়াই সাঁতার কাটি। জানিস, টিউবটাকে মাথা দিয়ে গলিয়ে পেটের কাছে এনে জলে নামতে হয়। দুহাতে টিউবটা ধরে থাকলে তুই চেষ্টা করেও ডুবতে পারবি না-বুঝলি? তোকেও শিখিয়ে দেব। তবে কাউকে কিন্তু বলতে পারবি না।'—একটু থেমে বলে—'আমি তো সাইকেল চালাতেও শিখে গেছি। বাবার সাইকেলটা নিয়ে দুপুরে এই রাস্তাতেই শিখেছি। সেটা অবশ্য বাবাও জানে। কিছু বলেনি আমাকে। এই কালই তো, রান্না করতে গিয়ে মা দেখে নুন নেই। আমি অমনি সাইকেল চালিয়ে গিয়ে দোকান থেকে মাকে নুন এনে দিয়েছি। জিজ্ঞেস করে দেখে নিস মাকে।'— এসব শুনে অপুর থেকে মাত্র ছমাসের ছোটো নন্দুর মোটেই ভালো লাগছিল না। অপু সব জানে বলে খুব হিংসে হয়েছিল। নন্দু তো এসব কিছুই পারে না। গাড়িতে ছাড়া পায়ে হেঁটেই ও কখনও কোথাও যায়নি, সাইকেলে করে যাওয়া তো ও স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। দাদু-ঠামা, বাপি আর মা ওকে কখনও সাইকেল চালিয়ে নুন আনতে দেবে না। না তো ওরা টিউব নিয়ে ব্রহ্মপুত্রে সাঁতার শিখতে দেবে। নন্দুর সেই সময় খুব ইচ্ছে হচ্ছিল অপুর মতো হতে। —'দাঁড়া এবার টিউবটা বের করে আনি।' আতা খাওয়া হাতটা জামায় মুছতে মুছতে বলেছিল অপু। ঝোপের ভেতর থেকে টিউবটাকে গড়াতে গড়াতে নিয়ে এল ও। তার পর জামাটা খুলে মাটিতে রেখে টিউবটাকে দিব্যি তুলে নিয়ে মাথা দিয়ে গলিয়ে নিল। দুহাতে টিউবটাকে দুদিকে ধরে ও নীচে নেমে গেল জলের মধ্যে। খানিকক্ষন সাঁতার কেটে দেখাল ও। তারপর জল থেকে উঠে টিউবটাকে খুলে পাড়ের কিনারায় রেখে এবার টিউব ছাড়াই জলে নেমে সাঁতার কাটতে লাগল অপু। বেশিদূরে গেল না, কিন্তু নন্দুর বিস্মিত চোখের সামনে দিব্যি হাঁসের মতো জলে ভেসে থাকল ও। অভিভূত নন্দু পাড়ে বসেই চেঁচিয়ে বলল —'আমাকে সাঁতার শেখাবি অপু?'

—'কেন শেখাবো না। তুই জামা খোল। আর নীচে নেমে এসে টিউবটা গলিয়ে নে মাথার ওপর দিয়ে। প্রথম প্রথম টিউব নিয়েই শিখতে হবে, বুঝলি?— ভিজে শরীরে হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে জ্ঞান দেয় অপু। — নন্দু লতাপাতা, ঝোপঝাড়ের শেকড় ধরে ধরে ব্যালেন্স করতে করতে নামল জলের ধারে। অপু জল থেকে উঠে এসে টিউবটা পরিয়ে দিল ওকে। তারপর টিউবের দুদিকে ওর হাতদুটো রেখে বলল—'শক্ত করে ধরে থাকবি

কিন্তু। ছেড়ে দিসনি যেন। ছেড়ে দিলে কিন্তু ডুবে যাবি। তখন আমি কিছু জানি না— এ কথা বলে রাখলুম। নে, আয়। আমার হাত ধর।' — হাত বাড়িয়ে অপুর হাত ধরে নন্দু একহাতে। অন্যহাতে কোনও রকমে টিউবটাকে ম্যানেজ করে ধরে রাখে। জলে পা দিতেই ওর ভীষণ ভয় ধরে গেল। সামনের দিকে তাকিয়ে শুধু জল ছাড়া আর কিছু দেখতে পেল না। পাতা ডোবা জলে দাঁড়িয়ে নন্দু বলে উঠল—'না, না। আমি নামব না। আমি সাঁতার শিখব না। আমার ভীষণ ভয় করছে অপু। আমায় ছেড়ে দে, আমি বাড়ি যাব।' — 'ছি: ছি:! তুই একটা ভিতুর ডিম। জলে নেমে এসে এখন বলছিস 'সাঁতার শিখব না',—'বাড়ি যাব'— মুখ ভ্যাংচালো অপু। তারপর এক হ্যাঁচকা টানে নন্দুকে জলে নামিয়ে ফেলল। টানের চোটে নন্দুর হাত টিউব থেকে খসে গেল। যতক্ষণে নন্দু জলে পড়ল ততক্ষণে টিউব ওর কোমরের নীচে দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে জলে ভাসতে লাগল। আর নন্দু টাল সামলাতে না পেরে একেবারে হুমড়ি খেয়ে জলের মধ্যে পড়ে খাবি খেতে লাগল। এদিকে টিউব ভেসে চলে যাচ্ছে দেখে অপু নন্দুর দিকে না তাকিয়ে সাঁতরে গিয়ে টিউবটাকে ধরল। ততক্ষণে নন্দু প্রায় ডুবে যাচ্ছে। একটা হাত জলের ওপর সোজা হয়ে আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে আর মাথার চুলগুলো জলে ভাসছে। ঠিক সেই সময় একটা বলিষ্ঠ হাত নন্দুর ভাসমান হাতটা শক্ত করে ধরে টেনে তুলেছিল ওকে এবং টানতে টানতে শক্ত জমিতে নিয়ে এসে ফেলেছিল। নন্দু জ্ঞান হারিয়েছিল। যখন জ্ঞান ফিরল তখন দেখল ও হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছে। আর ওর মুখের ওপর ঝুঁকে আছে ঠামা। বাপি, মা, দাদু, জেঠুরা, জেঠিমারা এমনকি লক্ষ্মীদিদাও বেডের চারপাশ ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে ঠামার কাছে শুনেছিল, অ্যালিস নন্দুকে কোথাও খুঁজে না পেয়ে নীচে লনে এবং বাগানে দেখতে এসেছিল। তখনই মালি ওকে বলে যে নন্দু অপুর সঙ্গে বাড়ির বাইরে একেবারে রাস্তার ওপারে নদীর দিকে গেছে। ততক্ষণে বাহাদুরও ওর কেবিনে ফিরে এসেছিল। সব শুনে অ্যালিস আর দেরি না করে মালি আর বাহাদুরকে সঙ্গে নিয়ে নদীর পাড়ে এসে ওদের ফ্রক দুটো দেখতে পায়। তার পর জলের দিকে তাকিয়ে দেখেই পুরো ব্যাপারটা বুঝতে পারে। মালি ব্রজেন কাকতি সঙ্গে সঙ্গে জলে লাফিয়ে পড়ে নন্দুকে তুলে আনে। অনেক জল খেয়ে ফেলে ছিল ও। অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। ব্রজেন মালিই তক্ষুনি পেট থেকে জল বের করে দিয়েছিল যতটা সম্ভব তারপর নন্দুকে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে ছোটা হয়। এ যাত্রা ও প্রাণে বেঁচে গেছে। আর দু-এক মিনিট দেরি হলে ওকে আর খুঁজেই পাওয়া যেত না।

এরপর নন্দুর মুখ থেকে ওনারা সেদিনকার ঘটনা সব শুনেছিলেন। জেরায় জেরায় অস্থির করে অ্যালিস এতদিন ধরে চলতে থাকা অপুর সমস্ত কুকর্মের কাহিনী নন্দুর কাছ থেকে বের করে নিয়েছিল। তারপর নন্দুর দাদু নবীন ব্যানার্জিকে ডেকে সব কথা খুলে বলেছিলেন। দাদু নবীন ব্যানার্জিকে ডেকে এনে প্রচণ্ড রেগে বলেছিলেন যে অপু যেন

আর কখনও রায়চৌধুরি ভিলার চৌকাঠ না ডিঙোয়। যদি ডিঙোয় তবে অপুকে সারাজীবনের মতো দুটো পা-ই খোঁড়া করে দেওয়া হবে। সেই ঘটনার পর লক্ষ্মীদিদা বা নবীনদাদু অপুকে মারধোর বা শাসন করেছিলেন কি-না তা কেউ জানে না। তবে অপু আর এ বাড়িতে ঢোকার সাহস করেনি। আর তখনই ঠামা ঠিক করে ফেলেন যে নন্দুকেও দার্জিলিং লরেটোতে চলে যেতে হবে। নন্দুর বোর্ডিং-এ যাবার একেবারেই ইচ্ছে ছিল না। খুব কান্নাকাটি করেছিল ও। ঠামাই একমাত্র ভরসার স্থল। তাই ঠামার কাছে অনুনয় বিনয় করেছিল। প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, আর কখনই অপুর সঙ্গে মিশবে না। কিন্তু ঠামা অত্যন্ত শক্ত হয়ে রইল। একেবারেই নরম হল না ওর কান্নাকাটিতে। বলে দিল—'তুই না মিশতে চাইলেও ওই দস্যি মেয়ে ঠিক আসবে তোকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে যেতে। ও মেয়ে সর্বনাশী। আমি আর কিছুতেই তোকে এখানে রাখব না। ওর সংস্পর্শে থেকে যখন তোর প্রাণ যেতে বসেছিল, তখন আর কোন্ ভরসায় তোকে এখানে রাখব আমি?'— নন্দুর বাবা-মা তো দাদুকে বলেছিল নবীন ব্যানার্জিকে এবাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলতে। অসভ্য, অশিক্ষিত কতগুলো ছেলেমেয়ে একেবারে এবাড়ির ভেতরে বসবাস করছে। বাড়ির মান সম্মান কিছু থাকছে না। ওরা এখান থেকে চলে যাক্ ওদের মতো লোকরা যেখানে থাকে সেখানে।—দাদু কিন্তু নবীন ব্যানার্জিকে তাড়িয়ে দেন নি। দাদু অচ্যুৎনারায়ণও নবীনবাবুকে ভালোবাসতেন খুব।

নন্দু চলে গেল দার্জিলিং। ছুটিতে যখন এল, লাল টুকটুকে গাল নিয়ে আরো রূপসী হয়ে, অপু দেখল ওকে। দেখে হাত নাড়ল, ইশারা করল, হাসল। নন্দুও বারান্দায় দাঁড়িয়ে প্রতি উত্তরে হাত নেড়ে হাসল। কিন্তু কথা হল না দুজনে। সেবার শীতের ছুটিতে বাড়ি থাকতে থাকতেই অপুর দাদা বাদলকাকু মরে গেল। কানাঘুষো, ফিসফাস থেকে নন্দু, বিশেষ কিছু বুঝতে পারল না। ; শুধু কতগুলো শব্দ শুনল যে গুলো ওর কাছে সেই সময় অবোধ্য ছিল। যেমন—'রোজই তো খেতো'—'ওখানেই তো পড়ে থাকত' — 'শেষদিকে তো বাড়িই আসতনা, ওখানেই থাকত'—'ছি ছি! শেষ অব্দি জঘন্য রোগে মরল'—'সিফিলিস হয়ে পচে গেছে একেবারে'—এসব টুকরো টুকরো কথা কানে শুনল—কিন্তু কিছুই বুঝল না তখন। নন্দু শুনছিল লক্ষ্মীদিদার কান্নার শব্দ। ঠামা একা গিয়েছিল লক্ষ্মীদিদার কাছে। জেঠীমা, মা'রা কেউ যায় নি। পরে দেখেছিল একটা মাচায় বেঁধে বাদল কাকুকে কয়েকটা কি বিশ্রী দেখতে লোক নিয়ে এলো। ওরা বাড়ীর ভেতরে বাদলকাকুর শবদেহটা ঢোকাতে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই নবীনদাদু বেরিয়ে এসে রুক্ষ গলায় ওদের বললেন মাচাটা একেবারে বাইরে রাস্তার ওপর রাখতে। এ বাড়ীর গেট পেরিয়ে যেন না ঢোকে ওরা। লোকগুলো রাস্তায় মাচাটা রেখে বসে পড়ল। একথা বলেই নবীনদাদু পেছন ফিরে সোজা বাড়ীতে গিয়ে ঢুকে পড়লেন। আর বেরোলেন না। লক্ষ্মীদিদা আর ওনার সব ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে এসে রাস্তার ওপরই বাদলকাকুর মরা শরীরের ওপর কাঁদতে লাগল। নবীনদাদু একবারও আর এলেন না। তারপর লোকগুলো

বাদলকাকুর মরাটাকে নিয়ে চলে গেল। বাদলকাকুর নাকি শ্রাদ্ধ করবেন না নবীনদাদু। লক্ষ্মীদিদা যখন ঠামার কাছে বসে এসব কথা বলছিল, নন্দু তখন ঠামার ঘরেই ছিল। ঠামা বলছিল—'লক্ষ্মী, তোমার জন্য আমার দুঃখও হয়না এক এক সময়। যা কিছু ঘটেছে তার জন্য দায়ী তুমি নিজে। নবীনবাবু একরকম, ছেলেরা হয়েছে একেবারে অন্যরকম। নবীনবাবুর কোথায় লেগেছে সেটাও কি তুমি বুঝতে পারছ না? এমন একটা সৎ মানুষের উঁচু মাথাটা নীচু করে দিচ্ছে তোমার ছেলে মেয়েরা। একটু যদি শাসন করতে তুমি সময় থাকতে তাহলে হয়তো আজ ছেলেটাকে হারাতে হত না। এই অপু যে সব কাণ্ড করে চলেছে সেটাই কি তোমাদের সম্মানের পক্ষে ক্ষতিকর নয়? কিন্তু কই, তোমাকে তো আজ অব্দি ওকে কোনো শাসন করতে দেখলাম না। তোমার দশটা সন্তান, একটিও লেখাপড়া করল না। বড়ো মেয়ে তিনটিকে তোমরা বিয়ে দিয়েছ ঠিকই, কিন্তু কি বিয়ে দিয়েছ? মনসাতলার গ্রামে ওরা যে সুখে নেই, অভাব অনটনের মধ্যেই রয়েছে একথা তো তুমিই বলেছ। বাদলটা নষ্ট হয়ে গেল। তুমি তো সব জানতে, কিন্তু কোনও কথা নবীনবাবুর কাছে বলোনি। ছেলে মেয়ের প্রতি তোমার অন্ধ স্নেহ ওদের সর্বনাশ করে দিয়েছে। এখন আর কেঁদে কি হবে? নবীনবাবুর জন্যই আমার কষ্ট হচ্ছে লক্ষ্মী, তোমার জন্য নয়। যা ঘটেছে তার জন্য দায়ী তুমি নিজে। এমন বেয়াদপ, দুশ্চরিত্র ছেলেটাকে যদি নবীনবাবু মনে মনে ত্যাগ করে দিয়ে থাকেন তবে ঠিকই করেছেন। শ্রাদ্ধ করতে চাইছেন না এই কারণেই যে বাদলকে উনি নিজের ছেলে বলে নিতে পারছেন না আর। এ ব্যাপারে আমি তোমাকে কোনও পরামর্শ দেব না লক্ষ্মী। নবীনবাবুর মাথাটা নীচু করে দেওয়ার পেছনে তোমারও হাত আছে। আমার ছেলে এমন জঘন্য কাজ করলে আমিও ক্ষমা করতাম না। তুমি এখন বাড়ি যাও লক্ষ্মী। আমাদের এই বাড়ির পরিবেশটাই তোমার ছেলে মেয়েরা নষ্ট করে দিচ্ছে। আমি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে আছি তোমার ওপর এ কথা স্বীকার করতে বাধা নেই। আমাদের মানসম্মানও নষ্ট হচ্ছে ওদের জন্য।'

নবীনদাদু যখন মারা গেলেন তখন নন্দু দার্জিলিং-এ। ওখানে বোর্ডিং স্কুলে ওর তখন অনেক বন্ধু হয়েছে। অপুর অভাব বোধ করার কোনো কারণই ওর আর নেই। বড়োও হয়ে গেছে বেশ। তখন বাড়ি এসে অপুর সঙ্গে দেখা হলেও মেলামেশা খুব বেশি হত না আগের মতো। বড়ো জোর—'কি রে, কেমন আছিস' পর্যন্তই। অপুও নন্দুর ধারে কাছে ঘেঁষার সাহস আর পেতো না। তাও একবার নন্দু যখন অ্যালিসের সঙ্গে গাড়ি করে বাইরে যাচ্ছে তখন দৌড়ে এসে জানালা দিয়ে বলেছিল—'নন্দু কাল দুপুরে একটু তোদের লনে থাকবি? বাইরে নয় বাড়ির মধ্যেই, তোকে একটা কথা বলব।' অ্যালিস কড়া চোখে তাকাতেই ছুটে চলে গিয়েছিল উত্তর না শুনেই। পরদিন কি জানি কি ভেবে দুপুর বেলা নন্দু লনে এল। অপু নিজেদের বাড়ির গেটের কাছেই অপেক্ষা করছিল। ওর তো এ বাড়ির চৌহদ্দীতে ঢোকা বারণ তাই নন্দুকেই ওদের গেটের কাছে ডাকল। নন্দু এগিয়ে আগের মতো হাসিমুখেই জিজ্ঞেস করল —'কি রে কেন ডেকেছিস? কি এমন

জরুরি কথা আছে তোর?'—অপু অনেকক্ষণ ধরে নন্দুকে দেখল। তারপর বলল—'তুই দিন দিন কি সুন্দর হচ্ছিস রে! বড়োলোকের মেয়ে, বড়ো স্কুলে পড়িস, ঠান্ডা জায়গায় থাকিস,— গালগুলো লাল হয়ে গেছে তোর। আর আমায় দেখ্। তোর থেকেও ফর্সা আমার গায়ের রং, তোর থেকে পুরো ছমাসের বড়ো আমি। আমার এখন চোদ্দো বছর বয়স হল। শুধু বুকের সাইজ ছাড়া লম্বায় তোর থেকে ছোটো মনে হয় আমাকে। জানিস, এখন কেউ আমাদের দুজনকে দেখলে তোকেই বড়ো বলবে। কি মজা! আমার বয়সটা বুঝতেই পারবে না! তুই ছোটো হয়েও দিদি দিদি হয়ে থাকবি!' —লরেটো স্কুলের বোর্ডিং-এ থাকা নন্দুও আর সেই নন্দু ছিল না তখন। তার ভেতরকার অভিজাত মন এখন আর অপুর কথায় ওঠে বসে না। তাই নন্দু নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলেছিল—'তুই কি একথা বলার জন্য আমাকে ডেকেছিস যে এখন আমি তোর দিদি হয়ে গেছি?' — নন্দুর গলার স্বরে অপু একটু থমকে গেল। তারপর সামলে নিয়ে বলল —'না রে, সেজন্য নয়। রাগ করছিস কেন? আমরা তো ছোটোবেলা থেকে বন্ধু বল? এক থালায় কত বার খেয়েছি। — অ্যাই শোন্ না, যে জন্য তোকে ডেকেছিলাম; সিনেমায় যাবি? টিকিট লাগবে না। লীলাবতী সিনেমায় যে লোকটা ভেতরে টিকিট দেখে ওর সঙ্গে আমার খুব আলাপ আছে। আমি তো সব সিনেমাই বিনে পয়সায় দেখি ম্যাটিনীতে। চল্ না কাল আমার সঙ্গে চুপি চুপি। দুপুর বেলায় কেউ জানতে পারবে না। একটা হিন্দী বই হচ্ছে। দেখে আসবি চল।' — নন্দু বলেছিল — 'একথা যদি আমি বাপিকে বা ঠামাকে বলে দিই তাহলে তোর কি হবে জানিস না তুই? এতর পরও তুই আবার আমাকে সিনেমায় নিয়ে যেতে চাস? তাও বিনে পয়সায়? লাইটম্যানকে ধরে? তুই কি মনে করিস আমি এখনও সেই ছোটো নন্দু রয়েছি যে তোর কথায় উঠব আর বসব? তোর তো পড়াশুনো করতে হয় না, আমার অনেক হোমওয়ার্ক আছে জানিস? ও গুলো করতে হবে। চলি রে।' — বলে নন্দু চলে আসছিল। পেছন থেকে অপুর মুখ ভেংচে বলা কথাগুলো ওর কানে আসছিল—'উঁঃ! দেমাক্। তোদের মতো বড়োলোক অনেক দেখেছি। তুই আমার বন্ধু না ছাই! দেখে নিস্ এই অপরাজিতা ব্যানার্জি একদিন তোদের থেকেও বড়োলোক হয়ে দেখিয়ে দেবে। দুপাতা ইংরেজি পড়ে মাটিতে পা পড়ছে না। দেমাক বেরিয়ে যাবে তোর। এই আমি তিন কিরে দিচ্ছি। এই অপুর পায়ে এসে পড়তে হবে তোকে। হে মা কালী, আমার কিরে যেন সত্যি হয় মা।' —নন্দু কোনো কথা বলেও নি পেছন ফিরে তাকায়ও নি। অপুরা যে একেবারেই ছন্নছাড়া, মেলামেশার অযোগ্য এই বোধটুকু এতদিনে নন্দুর হয়েছে। সেবারের ছুটির মধ্যেও অপুর নানা কীর্তিকলাপের সঙ্গে নন্দু অনিচ্ছাসত্ত্বেও জড়িয়ে পড়েছে। জেনে বুঝেও কেন কি জানি অপুকে ও অস্বীকার করতে পারত না। নবীনদাদু টাকাপয়সা কিছুই রেখে যেতে পারেননি। মৃত্যুর পর দোকানের জিনিষপত্র, গয়নাগাঁটী যৎসামান্য যেটুকু ছিল সেসব বিক্রি করে লক্ষ্মীদিদা নাকি কিছুকাল কাটিয়েছিলেন। ঠামা গোপনে অর্থসাহায্য করতেন, শাড়ি-জামাকাপড় দিতেন।

কিন্তু কতকাল দেবেন? একটি ছেলে মরেছে, তিনটি মেয়ের বিয়ে হয়েছে, নবীনদাদুও নেই—তবু এখনও তো সাতটি পেট রয়েছে। ঠাম্মা বুঝতে পেরেছিলেন সাহায্য করা বন্ধ না করলে এরা ধীরে ধীরে এবাড়িরই বোঝা হয়ে উঠবে। তাই একদিন সাহায্যের হাতটা গুটিয়ে নিতেই লক্ষ্মীদিদা একেবারে পথে বসলেন। গ্রামে ফিরে যাওয়া ছাড়া আর উপায় রইল না। নন্দু শুনেছিল অনেকদিন অব্দি ঠামার সঙ্গে লক্ষ্মীদিদার চিঠি চালাচালি হত। তারপর সেটাও বন্ধ হয়ে যায়। শেষ চিঠি নাকি এসেছিল অপুর বিয়ের খবর নিয়ে। মাত্র ষোলো বছরের অপুকে বিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন যূথিকা পিসি। লক্ষ্মীদিদা নাকি ঠামাকে দুঃখ করে লিখেছিলেন—অপুকে সামলানো যাচ্ছিল না তাই ওর ওপরে তখনও তিনটে দিদি থাকা সত্ত্বেও ওকেই আগে বিয়ে দিতে বাধ্য হতে হচ্ছে। দুঃখ একটাই, অর্থাভাবে ওইটুকু মেয়েটাকে বাপের বয়সি একটা লোকের সঙ্গে বিয়ে দিতে হচ্ছে। পাত্রের বয়স ছত্রিশ, অপুর থেকে কুড়ি বছরের বড়ো। স্বাস্থ্যও খুব একটা ভালো নয়। বাবা, মা, বড়োভাই, বউদি আছে পাত্রের। দেশের বাড়ি সরিষায়, কোলকাতায়ও হেদুয়ার কাছে নিজেদের পৈতৃক বাড়ি আছে। সেলস্‌ম্যানের কাজ করে একটা দোকানে। ঠামা যেন আশীর্বাদ করেন যাতে চিরচঞ্চল অপু সংসারে মন দেয়, শ্বশুরবাড়িতে ভালো হয়ে থাকে। আর ঠামা যদি কিছু টাকা দিয়ে সাহায্য করেন তবে লক্ষ্মীদিদা চির কৃতজ্ঞ থাকবেন। —ইত্যাদি। —ঠামা টাকা পাঠিয়েছিলেন— বেশ মোটা টাকাই। টাকার রসিদ এসেছিল আর সেই শেষ। তারপর দীর্ঘ পঁচিশ বছর ওদের কোনো খবরই রায়চৌধুরি পরিবার জানত না। হয়তো যোগসূত্রটা ধরে রাখার তাগিদ অনুভব করেন নি ওনারা নানা কারণে, তাই সম্পর্কটা ওখানেই ইতি হয়েছিল। পঁচিশ বছর পর অপু ওখানে হঠাৎ করে গিয়ে আবার নতুন করে গড়ে তোলার চেষ্টা করছে সম্পর্ক, সুনন্দা সেটা বুঝতে পারছে। ওর নিজেরও অপুকে দেখতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে। সেই শেষ দেখার দিনে চোদ্দো বছর বয়সে, নন্দু বুঝতে পেরেছিল ওর ওপরে অপুর ঈর্ষা আছে, পুরো রায়চৌধুরি বাড়ির ওপরই ওর ঈর্ষা আছে। আর সেজন্যই নন্দুর অপুকে দেখার বেশি ইচ্ছে। কত বড়োলোক হয়েছে অপু? বড়োলোক হবার স্বপ্ন দেখে শুধু চালিয়াতি করত অপু সেই ছোটোবেলা থেকেই। মনসাতলা গ্রামে ওদের জমিদারী আর বড়ো বড়ো পাঁচটা দিঘিতে রাজহাঁস চড়ে বেড়ানোর গল্প শুধু অপুই নয়, ওর দিদি টগর, বেলি, কেয়াও বলতো। সেই বয়সে জমিদারী কি তা জানত না না নন্দু। তাই হাঁ করে শুনতো। কল্পনায় রাজহাঁস চড়ে বেড়াতে দেখত দিঘির জলে।

সুনন্দা লরেটোর পাটচুকিয়ে কোলকাতায় পড়তে এসেছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে বি. এ. পাস করল। তারপর ক্যালকাটা ইউনিভারসিটি থেকে ইংরেজিতে এম. এ. করল। এরপর ওর বিয়ে হয়ে গেল। ওর শ্বশুরবাড়িও কোলকাতার নাম করা শিল্পপতি। রাজপুত্রের মতো দেখতে ওর স্বামী তথাগত মুখার্জি। বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, স্মার্ট যুবক। সারা ডিব্রুগড় শহর দেখেছিল রায়ভিলার একমাত্র মেয়ের

বিয়ের ঘটা। কোটিপতির মেয়ে আবার কোটিপতির ঘরেই বউ হয়ে এল। চাবাগান মালিকের বাড়ি থেকে সুনন্দা ফ্যাক্টরি মালিকের বাড়িতে চলে এল একমাত্র পুত্রবধু হয়ে। ওর এখানে কোনও অসুবিধাই হল না নিজেকে মানিয়ে নিতে, যদিও দুবাড়ির মধ্যে কালচারের প্রভেদ প্রচুর। ওদের বাড়িতে ঠামার গার্হস্থ্য প্রাধান্য পেত। মা, জেঠিমারাও বড়ো বড়ো পার্টিতে যেত অবশ্য, নিজেদের বাড়িতেও যখন তখন পার্টি লেগেই থাকত, লনে আলোর রোশনাইয়ে দেশী-বিদেশী অতিথি থাকত। তবু অন্যরকম ছিল। নন্দুর শাশুড়ি যেমন সুন্দরী তেমনি শিক্ষিতা, শুধু তাই নয়, উনি নানা সোস্যাল ওয়ার্কিং অরগেনাইজেশনের সঙ্গে যুক্ত। রোটারির ইনার হুইল ক্লাবের প্রেসিডেন্ট, স্প্যাসটিক, হিউম্যান রাইটস, ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, সব খবর নন্দু নিজেও জানে না। সুনন্দার ব্যক্তিগত কোনো ব্যাপারে এবাড়ির কেউ নাক গলায় না; — ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী এই পরিবার সুনন্দাকেও সবরকম স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছে। ঠামা তো কুষ্ঠিতে বিশ্বাস করত। তথাগতর কুষ্ঠি নেই শুনে ঠামা নিজে উদ্যোগী হয়ে কুষ্ঠি বানিয়েছিল। তারপর সুনন্দার সঙ্গে তথাগতর কুষ্ঠির মিল হতে তবেই রাজি হয়েছিল বিয়েতে। রাজযোটক কুষ্ঠি নাকি হয়েছিল ওদের। সত্যিই রাজযোটকই বটে। সুনন্দা ভাবতে একটু গর্বই বোধকরে যে ওরা দুজনে যখনই একসঙ্গে কোথাও যায়, তখন ও লক্ষ্য করেছে লোকে ওদের তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। পোশাকে আশাকে, দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে, রূপে আর আভিজাত্যে ওরা সত্যিই তাকিয়ে দেখার মতোই বটে। ব্যক্তিগত জীবনেও ওরা একে অন্যের পরিপূরক। ঠামার কলজের টুকরোটিকে ঠামা এক্কেবারে উপযুক্ত জায়গায় গচ্ছিত রাখতে পেরেছে দেখে শুধু ঠামা নয়, বাড়িশুদ্ধু সকলেই নিশ্চিন্ত আরামে থাকতে পারে। ঠামা বলতো, —'আগেকার দিনে শুধু নয়, এখনও দেখবি রাজপরিবার গুলোর রাজত্ব না থাকলে কি হবে, বিয়ে হবার সময় কিন্তু ওরা সাধারণ পরিবার থেকে মেয়েও আনে না, ছেলেও সিলেক্ট করে না। বিয়ে দেবার সময় একটা রাজপরিবার আর একটা রাজপরিবাবের সঙ্গেই সম্পর্ক তৈরি করে। আর তাতে ফলও ভালো হয়। কেন বলতো?—কারণ দুটো পরিবারই একধরনের কালচারে অভ্যস্থ বলে! জানিস নন্দু, অসমান বিয়ে কোনোদিন সুখের হয় না। ওই প্রথম প্রথম কদিন একে অন্যকে নিয়ে বিভোর হয়ে থাকে—ওই অব্দি। তারপর যেই প্রথম দিকের ঘোরটা কেটে যায় অমনি শুরু হয় অসন্তোষ। তখন অমিলগুলো কাঁটার খোঁচা হয়ে চোখে ফুটতে থাকে বুঝলি? তাই দেখিস না চারিদিকে শুধু ডিভোর্স আর ডিভোর্স। তাই সমানে সমানে বিয়ে হওয়াই ভালো। তবে এতেও যে দুর্ঘটনা ঘটে না, তা নয়! আজকাল যুগটাই এমনি পড়েছে রে। কেন যে সবকিছুর মিল থাকলেও ছেলে-মেয়েগুলো মানিয়ে গুনিয়ে চলতে পারে না সেটা বুঝি না আমি। স্বামী-স্ত্রীতে সামান্য মনের মিল না হলেই ছেড়ে চলে যাওয়া এখন ফ্যাশন হয়ে গেছে। বিয়ে কি ছেলেখেলা?' — নন্দুকে ঠামা বোধহয় ঠারে ঠোরে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিল যে—'তুমি বড়োঘরের মেয়ে, প্রায় এক রাজকন্যাই তুমি। কলেজে-ইউনিভার্সিটিতে

পড়ছ, তোমার রূপের টানে, অর্থের লোভে, ভন্‌ভনে মাছিদের অভাব হবে না তোমার চারপাশে উড়তে'। ভুল করেও যেন ভন্‌ভনে মাছিকে কখনও ময়ূর ভেবে বসো না।' সে অভিজ্ঞতা সুনন্দার প্রচুর হয়েছে। কিন্তু সুনন্দা কখনোই ভুলে যেত না ও রায়চৌধুরি বাড়ির একমাত্র মেয়ে, ও অনেক দামী, সস্তার দোকানে সাজানো পশরা নয়। ওকে যে পাবে তাকেও মহামূল্যবান হতে হবে। আর হয়েছেও তাই। জীবনের পথটা সাজানো সুন্দর বাগানের নরম সবুজ মখ্‌মলের মতো ঘাসের ওপর দিয়ে পার হতে হতে, অপু নামের বাল্যের সাথীর কথা ভুলেই গিয়েছিল ও। ২৫ বছর পর আবার হঠাৎ সমস্ত কথা মনে করিয়ে দিল, যেন অনেক পুরনো প্রিয় একটা বইয়ের কয়েকটা পাতা আচমকাই পাওয়া গেল বহুদিনের ফেলে রাখা একটা জং ধরা বাক্সের ভেতর থেকে।

সুনন্দা এখন রোজই অপেক্ষা করে, আজ বোধহয় অপুর ফোন আসবে, কিন্তু অপু ফোন করে না। ঠামাকে ও ফোন করে বলেছে—'কি গো ঠামা, অপু তো এখনও ফোন করল না!' — ঠামা বলে — 'আরে করবে এখন। ও মেয়েকে তো আমি চিনি রে বাবা! ও ফোনও করবে আর যাবেও তোর বাড়ি। তবে নন্দু, একটা কথা আমি তোকে বলে দিচ্ছি, বেশি আস্কারা দিস না ওকে। ছিরিছাঁদ যা দেখলাম তাতে তো মনে হল না, খুব একটা ভালো আছে বলে। তোকে ও খুব হিংসে করত ছোটোবেলা থেকেই, এখন হয়তো আরও করবে তথাগতকে দেখে। ওর বরটা বুড়ো। দেখিস বাবা, তুই আবার, ওকে একেবারে বুকে তুলে নিস না। যা মতলবি মেয়ে,—সারাক্ষণ এটা ওটা চাইতেই থাকবে।'

—'কি যে বলো ঠামা। আরে ওরও তো বয়স হয়েছে। এখন কি আর ছোটো আছে নাকি? না, না, ওসব কিছু করবে না। তুমি যত সব উদ্ভট চিন্তা কর।'

—'জানিস নন্দু, ওরা যে এ বাড়িতে এসে উঠেছিল সেটা তোর বাপি আর মা কিন্তু ভালো ভাবে নেয়নি। আদিত্য সেই ব্রহ্মপুত্রে তোর ডুবে যাওয়ার কথাটা তো ভোলে নি এখনও। আর শ্রীলা তো একটু বেশি অহংকারী ছিলই, চিরকাল। ও তো কথাই বলেনি প্রায় ওই পনেরো দিনে। কেউই বেশি কথাবার্তা বলেনি ওদের সঙ্গে। ওই এসে উঠে পড়েছে ঠিক আছে থাকো খাও, ওই পর্যন্ত—বুঝলি? যা আদর যত্ন করার সে আমিই যতটুকু পেরেছি করেছি আর কি! তোর মাকে তো জানিস!'

এরপরও প্রায় মাস তিনেক পার হয়ে গেল, অপুর কোনো খবর নেই। ফোন টোন করেনি। ঠামার চিঠি পাবার পর প্রথম দিকে যে উত্তেজনাটা অনুভব করেছিল সুনন্দা সেটা এখন আর নেই। আবার প্রায় ভুলেই যাচ্ছিল ও অপুর কথা। সুনন্দাদের আলিপুরের এই বাড়িতে ওদের নিজস্ব বিউটিপারলার কাম ম্যাসেজ রুম আছে, সুইমিং পুল আছে, জিম আছে। ওর শ্বশুর মি. সিদ্ধার্থ মুখার্জি, বর তথাগত, শাশুড়ি ইন্দ্রানি মুখার্জি বা সুনন্দার মেয়ে ডোনা, ছেলে জোজো এরা কেউই কোনো বিউটিপারলারে বা স্পাতে যায় না। শহরের সেরা পারলার থেকে মেয়েরা এবাড়িতে এসে এবাড়ির লোকেদের নিজস্ব

পারলারে, বিদেশের নামী কোম্পানির লোশন টোশন দিয়ে এদের সৌন্দর্য রক্ষা করে দেয় কনট্রাকটে। যে সাঁতার শেখাবার নাম করে অপু একদিন প্রায় নন্দুকে ডুবিয়েই দিচ্ছিল—সেই সাঁতারও নন্দু খুব ভালো করেই শিখে নিয়েছে নিজেদের সুইমিং পুলে। তথাগত নিজে শিখিয়েছে ওকে।

সেদিন সুনন্দার হাত-পায়ে প্যাডিকিওর, ম্যানিকিওর হচ্ছিল পারলার রুমে, ঠিক সে সময় ওর পারসোনাল এইড বা হেল্পার যাই বলা যাক না কেন—রুনা নামের মেয়েটি এসে বলল—'ম্যাম্, গেট থেকে দারোয়ান ইন্টার কমে বলছে যে একজন মহিলা আর একটি মেয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। দারোয়ান ওদের এর আগে কোনোদিন দেখে নি, তাই ওদের ঢুকতে দেয় নি। ওরা গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।'

—'আমার সঙ্গে দেখা করতে? কে এল? নামটাম বলেছে কিছু?'

—'হ্যাঁ ম্যাম্। নাম বলেছে—অপরাজিতা মুখার্জি। বলেছে অপু বললেই আপনি নাকি চিনবেন।'

॥ দুই ॥

যুথীকার টি. বি. রুগি স্বামী অতুল্য মুখোপাধ্যায় হোমিওপ্যাথি ডাক্তার। নামেই ডাক্তার, প্র্যাকটিশ জমাতে পারেনি কোনোদিন। মনসাতলা গ্রামেরই ছেলে। জানাশোনা পরিবার। যুথী নবীন ব্যানার্জির প্রথম সন্তান। মেয়েটা লেখাপড়াও করেছে। আরও করতে চায়। এরই মধ্যে সেবারে দোকানের কিছু জিনিষপত্র কেনা আর তার সঙ্গে মনসাতলার পৈতৃক বাড়িটাতে নিজের অংশটুকু ঠিকঠাক আছে কিনা দেখতে নবীন কোলকাতা যাওয়া স্থির করলেন। যুথীকার তখন ম্যাট্রিক পরীক্ষা শেষ হয়েছে। বাবাকে চেপে ধরলো নিজেদের দেশ দেখতে ওনার সঙ্গে এবার ও যেতে চায়। নবীন বারণ করতে পারলেন না। ওনার ছেলেমেয়েরা সব কটাই ডিব্রুগড়ে জন্মেছে। বড়োছেলে বাদল ছাড়া আর কেউ এখনও দেশের বাড়ি দেখেনি ওরা। এর আগের বারে বাদলকে নিয়ে এসেছিলেন এবার যুথীর আবদার রাখতে হল। ট্রেনের দু'খানা টিকিটই কাটলেন খরচ বেশি হবে জেনেও। কোথাও তো যায়নি ওরা ডিব্রুগড়ের বাইরে।

যুথীর আনন্দ ধরে না। বাবার মুখে শুধু কোলকাতার গল্পই শুনে এসেছে এতদিন। এবার সেই স্বপ্নের নগরীকে দেখবে নিজের চোখে। যদিও ও জানে ওদের বাড়ি শহর থেকে অনেক দূরে, এক গ্রামে। তবু কোলকাতা দেখাতে নিয়ে যাবে বাবা। যুথী দৌড়ে আসে রায়চৌধুরি ভিলায়।— ঠামা তখনও ঠামা হননি, মাসিমা ছিলেন যুথীদের ভাই-বোনদের। নন্দু-অপুরা তখন কোথায়? নবীন ব্যানার্জির বাড়িতে একমাত্র অপুই তো নন্দুর ঠামাকে মাসিমা না বলে ঠামা বলতো নন্দুর সাথে সাথে। যুথী এসে ডাকাডাকি করতে থাকে —'আদিত্য, অ্যাই আদিত্য! কোথায় রে তুই?'—যুথী আর রায়চৌধুরি

বাড়ির সব চেয়ে ছোটো ছেলে আদিত্য ছ'মাসের ছোটোবড়ো। পরবর্তী সময়ে নন্দু আর অপুর যেমন ভাব ছিল তেমনি আদিত্য আর যুথীও খেলার সাথী হয়ে শুরু করে পরে বন্ধু হয়ে গিয়েছিল। আদিত্য যেদিন দার্জিলিং-এ পড়তে চলে গেল যুথী সেদিন কেঁদে ভাসিয়েছিল। আদিত্য দার্জিলিং থেকে কদিনের ছুটিতে বাড়ি এসেছে, ওকে এমন খবরটা না দেওয়া অব্দি যুথীর মনে শান্তি নেই। আদিত্যকে না পেয়ে যুথী মাসিমার ঘরে এসে ঢোকে—'ও মাসিমা, আদিত্য কোথায় গো? জানো, আমি এবার বাবার সঙ্গে কোলকাতা যাচ্ছি। টিকিট কাটা হয়ে গেছে। খবরটা প্রথমে আদিত্যকে দেব ভাবলাম কিন্তু ওকে ডেকে ডেকে হয়রান হয়ে গেছি। তোমার ছেলে কিন্তু বাড়িতে নেই!'

যুথীকে এ বাড়িতে সবাই ভালোবাসে। ওকে দেখতে যেমন সুন্দর তেমনি স্বভাবটাও ভারী মিষ্টি। সুহাসিনী, মানে যুথীর এই মাসিমা, আদিত্যর মা বললেন—'সে কি রে? কই আগে তো বলিসনি?'

—'ওমা! আগে কি আমিই জানতাম নাকি? পরীক্ষা হয়ে গেছে বলে বাবাকে খুব চেপে ধরে ছিলাম। ভাবতেই পারিনি গো বাবা যে রাজি হয়ে যাবে! আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে না মাসিমা, কি বলব তোমাকে!'

সুহাসিনীও খুশি হয়ে বলেন—'যা, ঘুরে আয়। নিজেদের দেশের বাড়ি একবার দেখা উচিত। লক্ষ্মীর তো আর যাওয়াই হল না ওদিকে। না বাপের বাড়ি না শ্বশুরবাড়ি। অবশ্য শ্বশুরবাড়িতে তোর মার আর কে-ই বা আছে? কিসের নেশায়ই বা যাবে? নবীনবাবু নিজেই তো এদেশী হয়ে গেলেন!—তা, হ্যাঁরে, তোকে নিয়ে গিয়ে উঠবেন কোথায়? একা যখন যান তখন তো শুনেছি সারা গাঁ জুড়ে নেমন্তন্ন খেয়েই চলে যায়। তুই গেলে কি হবে? নেমন্তন্ন খাবি তুইও?'

যুথীকাও হাসতে থাকে, বলে—'না মাসিমা, দেশের বাড়িতে বাবার অংশটা তো আছে। আমি রান্না-বান্না করব। নিজেদের বাড়িতে থাকব যখন, তখন নেমন্তন্ন খেলেও নিজে রান্নাও করব। কতকাল আমাদের ভিটেতে উনুন জ্বলেনি বলতো? বাবার জ্যাঠার ছেলেরা তো খারাপ নয় বলে বাবা। এতকাল ধরে ওরা তো বাবার অংশটা রেখেছে, দেখাশুনোও করে। তবু তো নিজের আপনজনকে দেখতে পাব মাসিমা!'

সুহাসিনী যুথীর থুতনী নেড়ে দিয়ে বলেন—'এজন্যই তো তোকে এত ভালোবাসি। কারও নিন্দে করিস না তুই। তোর চোখে সবাই ভালো। যা, নিজের আপনজনদের দেখে আয়, কোলকাতা ঘুরে আয় ভালো করে। তোর সঙ্গে টাকা দিয়ে দেব কালীঘাটে পুজো দেবার জন্য। সেই কোন জন্মে, দর্শন করে পূ --- এই তো আদিত্য! কোথায় ছিলি রে তুই? যুথী খুঁজছে তোকে?'

—' কেন? তোর কি রাজকার্য দরকার পড়ল যে আমাকে খুঁজছিলি?'

—' বেশি ফরফর করিস না বুঝলি? আমি চল্লুম কোলকাতা। টিকিট হয়ে গেছে এই খবরটা দিতেই খুঁজছিলাম।'

—'ও। এই কথা? তা কদিন থাকবি? মেসোমশাই তো একসপ্তাহের বেশি থাকেন না। শুধু শুধুই যাচ্ছিস। সাতদিন পরই তোকে ফেরৎ নিয়ে চলে আসবে মেসোমশাই। হাওড়া ব্রিজ, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল এসব দেখার সময়ই পাবি না। যাক গে, শোন কোলকাতা দেখিস আর না দেখিস ল্যাংড়া আম নিয়ে আসতে কিন্তু ভুলিস না।' যুথী রেগে গিয়ে বলে—'দেখেছ মাসিমা কি হিংসুটে আদিত্যটা! আম আনব না ছাই, তোর জন্য কামরাঙ্গা নিয়ে আসব। বুঝলি?

যুথী—আদিত্যরা তখন ১৬ বছরের। তখনতো দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের দামামা বেজে গেছে। চারিদিকে নিগ্রো সোলজারদের ভয়ানক চেহারা দেখা যায়। এরই মধ্যে যুথীকাকে সঙ্গে নিয়ে নবীনবাবু রওয়ানা হলেন। ডিব্রুগড় থেকে কোলকাতা যেতে তখন পুরো চারদিন লাগত। প্রথম দিন বিকেলের ট্রেনে চড়ে ঝিকুস ঝিকুস মিটারগেজ ট্রেনে পরদিন বেলা গড়িয়ে দুপুর হলে গৌহাটীর পান্ডুতে পৌঁছবে। সেখানে ব্রহ্মপুত্র পার হতে হবে স্টিমারে। ওপারে গিয়ে আবার অন্যগাড়িতে চাপো।। সে গাড়ি তারপরদিন এনে ফেলবে সাহেবগঞ্জ--সকড়ীগলির খেয়াঘাটে। ওখানেই খাওদাও তারপর গঙ্গার বালির ওপর দিয়ে হেঁটে অনেকটা গিয়ে আবার স্টিমার। এপারে আসতে ঘণ্টা দেড়েক। আবার মিটার গেজ ট্রেন পরদিন আনবে শিলিগুড়িতে। তারপর দিন কোলকাতা। কোলকাতা থেকে বাসে, রিক্সায় মনসাতলায় আসতে আসতে সন্ধে। ট্রেনে কালো কালো সব নিগ্রো সৈন্যদের মুখ, প্রত্যেক স্টেশনে ওদের বুটের আওয়াজে প্ল্যাটফর্ম কাঁপছে আর কাঁপছে যুথী। শাড়ির আঁচল দিয়ে মাথা-মুখ ঢেকে বসে থাকে ও। মনে মনে ঠাকুরকে স্মরণ করে—কালীঘাটে পুজো দেব মা, কোনোমতে পৌঁছে দাও। কি ভয়ানক দেখতে এদের!

নিরাপদেই ওরা পৌঁছতে পেরেছিল মনসাতলায়। জ্ঞাতিরা আদরে, আপ্যায়নে ভরিয়ে তুলেছিল ওর মন। সেদিন রাত হয়ে গিয়েছিল বলে দেখতে পায়নি, পরদিন সকাল হতে দেখেছিল নিজেদের ভিটে। মনটা দুমড়ে গিয়েছিল ওর। বাংলা সিনেমায় দেখা গ্রাম আর এগ্রামে কোনো প্রভেদ নেই। খড়ের চালে মাটির ঘর দুখানা। একটুকরো উঠোন তাতে জ্ঞাতিদের ছাগল, পাতিহাঁস চরে বেড়াচ্ছে। ডিব্রুগড়ের বাড়ির সঙ্গে এবাড়ির আশমান জমিন ফারাক। তবু যুথীকার মনে একধরনের তৃপ্তি আসে। একান্ত আপন একটুকরো পৈতৃক জমি তো আছে ওদের। কদিন ধরে সারা মনসাতলা গ্রাম ঘুরে চষে বেড়ায় ও। সবাই অচেনা কিন্তু ওকে দেখে ঠিক জিজ্ঞেস করে চোখভরা কৌতূহল নিয়ে—'এ গেরামে নতুন দেকচি! কাদের বাড়ি এয়েচ গা?' —ওর বাবার নাম শুনে কৌতূহল আরও তীব্র হয় ওদের। নানা প্রশ্ন করতে থাকে—'নবীন বাঁড়ুজ্জের মেয়ে? তোমরা তো সেই কোন দেশে থাকো শুনিচি। তা ওখান থেকে চলে এলে বুঝি? এখন এখানেই থাকবে? ক'ভাই-বোন তোমরা? তোমার মা এলো না কেন? ভাই—বোনরা কি করে? তুমিই বড়ো? আবার চলে যাবে? তা সেই দেশটা বুঝি খুব ভালো?'—এমনি হাজারো প্রশ্নের

জবাব দিতে হয় ওকে। ভালোও লাগে সবাই আপন করে ডেকে ডেকে কথা বলে দেখে। যুথী লম্বা করে চিঠি লেখে মাকে।

মনসাতলা গ্রামটা একেবারে এলি তেলিদের গ্রাম নয়। মূল গ্রাম জুড়ে কুলিন-অকুলিন ব্রাহ্মণ কায়স্থদেরই দপদপা। তিলি-তাম্বুলি, কুমোরদের সেই সময় পর্যন্ত গ্রামের একপাশেই থাকতে হত। এ গ্রামেরই নাম করা হোমিওপ্যাথি ডাক্তার অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায়। চিকিৎসার গুণে লোকে ধন্বন্তরী বলে জানে। একজন হোমিওপ্যাথ অম্বিকাচরণ ছাড়া আর কোনো ডাক্তার নেই। সেই আকড়া ফাটক থেকে শুরু করে মেটিয়াবুরুজ অব্দি উত্তরে, আর মহেশতলা থেকে বজবজ পর্যন্ত দক্ষিণে বিস্তৃত পসার। হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ই ডাক্তারবাবুর চিকিৎসায় বিশ্বাসী। হোমিওপ্যাথি ডাক্তারি করে পয়সাকড়ি ভালোই করে ফেলেছেন অম্বিকাচরণ। নবীন ব্যানার্জি যখন ভাগ্য অন্বেষণে গ্রাম ছেড়ে চলে যান তখনও কিন্তু এত রমরমা ছিল না অম্বিকাচরণের। চাকা ঘুরে গিয়ে খড়ের চালের মাটকোঠা এখন একতলা ঢালাই ছাদের ইটের বাড়ি হয়েছে। সামনে চেম্বার। প্রশস্ত ঘেরা বারান্দায় বেঞ্চে বসা রুগির ভিড়।

জন্ম থেকে ডিব্রুগড় শহরে কলের জল খাওয়া যুথীকা মনসাতলার পরিষ্কার পুকুরের জল খেয়েও হজম করতে পারল না। আসার একসপ্তাহের মধ্যেই মারাত্মক পেট খারাপ হয়ে গেল ওর। হাওড়া ব্রিজ, ভিক্টোরিয়া, কালীঘাট-কিছুই দেখা হলো না এখনও। মাঝরাত থেকে পেটে ব্যথা দিয়ে শুরু হয়ে ভোররাত অব্দি যখন সাতবার যুথী পায়খানা করল তখন নবীন দৌড়ে গেলেন অম্বিকা ডাক্তারের কাছে। অম্বিকাচরণকে নবীন অম্বিকাদা বলে ডাকেন। বয়সে কিছু বড়ো হলেও ছোটোবেলায় খেলাধুলো একসাথে করেছেন, মনসাতলার পাঠশালায় দুজনেই পড়েছেন। অম্বিকা নবীনবাবুর সঙ্গে আসার পথে খুঁটিনাটি সব জিজ্ঞেস করে জেনে নেন, যেমন কি কি খেয়েছে, পুকুরের জল ফুটিয়ে খেয়েছে কি না, ওদেশে কি কলের জল খায় না পুকুরের, না টিউকলের? তারপর পারিবারিক সংবাদ, ব্যক্তিগত জীবনের কথা—সবই পথ চলতে চলতেই জিজ্ঞাসা করা হয়ে যায়।

যুথীর নাড়ী টিপে, পেট বাজিয়ে, চোখ-জিভ দেখা হলে বুকে পিঠে স্টেথস্কোপ লাগিয়ে পরীক্ষার শেষে অম্বিকাচরণ নিজের ডাক্তারি ব্যাগ খুলে ওষুধ বের করেন। ছোটো কাগজে সর্ষের দানার মতো গুলিগুলো ঢেলে নিজেই খাইয়ে দেন। শিশি বন্ধ করতে করতে বলেন—'সব ঠিক হয়ে যাবে। তা ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে এসেছ শুনলাম, ওখানে কি স্কুলে হাইজীন পড়ায় না?

যুথী বলল—'হ্যাঁ, পড়েছি তো!'

—'পড়েছ? তাহলে মা নতুন জায়গায়, প্রথমবার গ্রামদেশে এসে কোন আক্কেলে পুকুরের জল না ফুটিয়ে খেলে বলতো? আজ থেকে কিন্তু যতদিন থাকবে ফোটানো জল ছাড়া খাবে না।— চিন্তা নেই, ভালো হয়ে যাবে তুমি। কোলকাতা দেখতে পারবে।'

রুগি দেখা শেষ হবার পরও অম্বিকাচরণ চট্ করে ওঠার নাম করেন না। —'তা, নবীন ব্যাবসাপত্র ভালোই চলছে তোমার—কি বল?'

নবীন ইতস্তত করেন।—'না মানে, আগে যে খুব একটা আহামরি চলছিল তা নয়। তবে যুদ্ধটা লেগে যেতে এই কিছুদিন হলো একটু ভালো দেখতে পাচ্ছি। এতকাল তো যা আয় তাই ব্যয়, এই অবস্থায় ছিল।'

অম্বিকাচরণ বলেন—'হ্যাঁ যুদ্ধটা লেগেই গেল শেষ অব্দি। আমরা তো এই গ্রামে বসে বিশেষ কিছু টের পাই না। তোমাদের ওদিকে তো শুনছি মার-মার কাট-কাট লেগে যেতে পারে। আজাদ-হিন্দ ফৌজ মণিপুরের দিকে এগোচ্ছে। কতদূর মণিপুর তোমাদের শহর থেকে?'

—'খুব একটা দূরে নয় অম্বিকাদা। আসার সময় প্রচুর নিগ্রো সৈন্য চলাচল দেখতে দেখতে এসেছি ট্রেনের ভেতরে, প্রত্যেক স্টেশনে। আসলে, দোকানের প্রয়োজনীয় কিছু জিনিষপত্র কিনে নিয়ে গিয়ে মজুত করব বলেই আমার আসা। যুথীর পরীক্ষা হয়ে গেছে বলে ও বায়না ধরল দেশ দেখবে বলে। আমি আর না বলতে পারলুম না। কিন্তু ---।'—থেমে যান নবীন।

অম্বিকাচরণ বলেন—'চিন্তা তো হবারই কথা। তোমরা এদিকে পরিবারের বাকি সবাই ওদিকে। ক'দিন থাকবে বলে এসেছ নবীন? জিনিষপত্র সব কেনাকাটা হয়ে গেছে?'

নবীন উত্তর দেন—'এসে তো ছিলাম দিন পনেরো-কুড়ি থাকব ভেবে। যুথীকে ঘুরিয়ে দেখাতেও হবে কোলকাতা শহরটা। জিনিষপত্রও কিছু কেনা হয়েছে, কিছু বাকি আছে। এরই মধ্যে তো মেয়েটা কাল রাত থেকে অসুস্থ হয়ে পড়ল। বেশি দেরি হয়ে গেলে মেয়েকে নিয়ে ট্রেনে যাওয়াই মুশকিল হয়ে যাবে। কি ভয়ানক চেহারা ওই নিগ্রোসৈনা গুলোর—বাপ রে! তাকাতেই ভয় করছিল।'

'হুঁম্।'— অম্বিকাচরণ একটা গুরুগম্ভীর হুঁম করে বলেন—'আচ্ছা নবীন, আমি এখন তাহলে আসি। মেয়ে কালকের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে। যে ওষুধটা এখন দিলাম ওটা কিন্তু আজ সারাদিনে আরও দুবার আর কালও দিনে তিনবার দশটা করে গ্লোবিউল খাবে। জল অবশ্যই ফুটিয়ে খাবে। কাচা আম একদম খাবে না। ঝোলভাত খাবে। বুঝলে? পরশু থেকে কোলকাতা ঘুরতে যেতে পারবে।'

নবীন পকেট থেকে টাকা বের করে বলেন—'অম্বিকাদা, তোমার ভিজিটটা-।' অম্বিকাচরণ ব্যাগ নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হাওয়ায় হাতের একটা নব্যঞ্জক মুদ্রা তৈরি করে বলেন—'ভিজিট? তোমার কাছ থেকে? যেদিন পাকাপাকি দেশে বাস করতে আসবে সেদিন থেকে নাহয় নেব। এখন তো তুমি ঘরের ছেলে নিজের ঘরেই অতিথি হে। —ও হ্যাঁ, আজ বিকেলে একবার গিয়ে খবর দিয়ে এসো যুথী কেমন আছে। চলি রে মা। চলি নবীন।'

দু-দাগ ওষুধের পরই যুথীর পেট কামড়ানো, মোচড় দেওয়া একেবারে উধাও। বিকেল হতে হতে ওদিকপানে যাওয়াও বন্ধ হল। নবীন ব্যানার্জি খুশি মনে ছুটলেন অম্বিকা ডাক্তারকে খবর দিতে। সন্ধে পার হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ আগেই গ্রামের ঘরে ঘরে শাঁখ বাজানোর আওয়াজ বন্ধ হয়েছে। দুপাশে দুটো হ্যারিকেন জ্বালিয়ে অম্বিকাদা তখনও রুগি দেখে চলেছেন। নবীনের কাছে যুথীর সুস্থতার পথে যাওয়ার খবর পেয়ে বললেন—'ও তো হবারই ছিল নবীন। তবে তুমি কিন্তু এখনই চলে যেও না, একটু বসো ভাই। আর তিনজন আছে। এদের দেখেই আজকের মতো শেষ। তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে।'

—'কি কথা অম্বিকাদা?'—নবীন একটু অবাক হয়েই প্রশ্ন করেন।

—'আছে, আছে। রোসো না। চেম্বারে বসে কি সব কথা হয়?' — অম্বিকা রুগির দিকে মন দিলেন। নবীনবাবু বসে বসে অম্বিকাচরণের রুগি পরীক্ষা করা দেখে যেতে লাগলেন। গুমোট গরম পড়েছে, একফোঁটা বৃষ্টি হয়নি উনি এখানে আসার পর থেকে। ডিব্রুগড়ের আবহাওয়ার সঙ্গে এদিককার আবহাওয়ার বেশ অমিল। আজকাল দেশের বাড়িতে এলে নবীনের বেশ অসুবিধেই হয়। হ্যারিকেনের আলো, পুকুরের জলে স্নান-খাওয়া, খাটা পায়খানায় যাওয়া— এসব অভ্যেসগুলো উনি তো জীবনের অনেক পেছনে ফেলে এসেছেন। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, যুথী একবারও বলেনি কোন অসুবিধের কথা। ও যেন এখানে এসে একটা স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে রয়েছে। খড়ের চালের মাটির ঘর, সন্ধে হতে না হতেই নিঝুম হয়ে যাওয়া গ্রাম, ঝিঁঝি ডাকা মাটির পথ ধরে হ্যারিকেন হাতে কচ্চিৎ কেউ এপাড়া থেকে ওপাড়ায় যাচ্ছে কিন্তু যুথীর সন্ধের পর কোথাও যাবার জায়গা নেই একমাত্র উঠোনের বাঁশের বেড়ার ওপারে নবীনের জ্যাঠতুতো ভাইদের বাড়ি ছাড়া। তবু যুথী একবারও বাবাকে বলেনি—দূর! এখানে কি মানুষ থাকে?

অম্বিকাচরণ রুগি দেখা শেষ করে বললেন—'চলো হে নবীন বাড়ির ভেতরে চলো। তোমার বউদির সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়ে দেব। এত কাল পর দেশে এলে এককাপ চা আর দুটো মুড়কি অন্তত খেয়ে যাও।'

নবীন তাড়াতাড়ি বলেন—'আরে না-না। এতসব দরকার কি? বউদির সঙ্গে পরিচয় হলেই হল।'

বাড়ির ভেতরে আসার আগে নবীন কল্পনাও করতে পারেননি অম্বিকাচরণ এত খাতির করে কেন তাকে ডেকে নিয়ে এলেন। থালা ভর্তি লুচি, ছোলার ডাল, বেগুন ভাজা, মিষ্টি নিয়ে অম্বিকাদার স্ত্রী এলেন হাসিমুখে। নবীন এতশত দেখে আঁতকে উঠে বলেন—'একি করেছেন বউদি? ভর সন্ধেবেলা এত খাওয়া যায়? এ তো রাত্তিরের খাওয়া?'

—'ওসব জানি না ঠাকুরপো। সব খেয়ে উঠতে হবে।'—বউদির হাসিমুখে সাফ জবাব।

খেতেই হল একটু একটু করে। খেতে খেতে অম্বিকাচরণ একটু একটু করে মোড়ক খুললেন। যুথীকে দেখে বড়ো বেশি পছন্দ হয়েছে অম্বিকাচরণের স্ত্রীর। এ পথ দিয়ে নাকি কার সঙ্গে যাচ্ছিল যুথী। এ গ্রামের মেয়ে যে নয় সে তো দেখেই বুঝেছেন। পরে খোঁজ নিয়ে জেনেছিলেন ব্যানার্জি পাড়ায় বেড়াতে এসেছে আসাম থেকে। বাবার নাম, নবীন বাঁড়ুজ্জে। অম্বিকাচরণ হাসতে হাসতে বললেন—'আমার মাথাটাই চিবিয়ে খেয়ে ফেলছিল প্রায়। যোগাযোগ করো, যোগাযোগ করো বলে বলে। আমি যাব যাচ্ছি করতে করতেই তুমি মেয়ের পেটখারাপের জন্য আমাকে ডাকতে এলে। ওখানে গিয়ে যুথীকে দেখে আমার অপছন্দ হবার কোনো কারণই খুঁজে পেলাম না নবীন। অতি সুলক্ষণা মেয়ে।

নবীন একটু একটু আঁচ করতে পারছেন তখন। অম্বিকাদার একটিমাত্র ছেলে—জানেন নবীন। গত যাত্রায় যখন এসেছিলেন মাল কিনতে তখন বোধহয় কলেজে পড়ত। দেখতে শুনতে ভালো। ওরা কি তবে যুথীকে নিজেদের একমাত্র ছেলের জন্য পছন্দ করেছেন? এতবড়ো সৌভাগ্য কি যুথীর হবে?— গলায় প্রায় আটকাতে বসা লুচিকে জল দিয়ে নীচে নামিয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন নবীন পরবর্তী কথা শোনার জন্য। এবারে অম্বিকাডাক্তারকে থামিয়ে বউদি হাল ধরেন—'ঠাকুরপো, যুথীকে আমার বড়ো পছন্দ হয়েছে। আমার তো একটা মাত্র ছেলে। কলেজে পড়েছে, তারপর ওর বাবার মতো ডাক্তারিও শিখেছে। আমাদের কোনো দাবি নেই ঠাকুরপো। সবই তো আছে ঠাকুরের কৃপায়। আমার ছেলেটার আবার রুচিজ্ঞান বড়ো বেশি। কত সম্বন্ধ এল কিন্তু ওর আর পছন্দ হয় না। আমার বিশ্বাস আপনার মেয়েকে ওর পছন্দ হবেই হবে।'

—'শোনো নবীন তোমার আপত্তি না থাকলে যুথীকে দেখতে যাওয়া যেতে পারে ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে। আমাদের তো দেখা হয়েই গেছে। তুমি যদি এখন মেয়ের বিয়ের কথা ভেবে থাকো তাহলে বলো।'

নবীন হাতে স্বর্গ পেলেন যেন। অম্বিকাদা খুবই সজ্জন মানুষ। এমন একটা সুযোগ হাতছাড়া করতে মন চাইল না। একটি দুটি নয়—তিনটি মেয়ে ওনার (তখনও ছ'টি সন্তান হয়েছে নবীনের) বড়ো হচ্ছে সবাই, পার তো করতে হবে! কিন্তু এখনই বিয়ে দিতে বললে তো সম্ভব নয়। তাই আমতা আমতা করে বললেন—'অম্বিকাদা, এতবড়ো সৌভাগ্য হবে যুথীর সে আমি ভাবতেও পারি নি। আপনারা ছেলেকে নিয়ে দেখতে যাবেন সে তো খুবই আনন্দের কথা। যুথীকে তো দেখে এলেন, শরীরটা একটু ভালো হোক তারপর একটা দিন ঠিক করে জানাবো। তবে ছেলের পছন্দ হয়ে গেলে এক্ষুনি তো বিয়ে দিতেও পারব না দাদা। ওরা সবাই ডিব্রুগড়ে রয়েছে যে।' খুশি হয়ে বউদি বললেন—'ওসব পরে ভাবা যাবে। আগে যাই, গিয়ে যুথীকে ভালো করে দেখি, কথা বলি। ছেলের পছন্দ হলে কিন্তু ঠাকুরপো আমি কোন ওজর শুনব না।'

নবীন সেদিন বাড়ি ফিরে যুথীর পাশে অনেকক্ষণ বসে রইলেন। এখনই ওকে কিছু

বলার দরকার নেই। আগে জ্যাঠতুতো ভাইদের সঙ্গে কথা বলে অম্বিকা ডাক্তারের ছেলের সম্বন্ধে খোঁজ নিতে হবে। যুথীর সিঙ্গি মাছের ঝোল ও বাড়ি থেকে উঠোন পেরিয়ে ওর কাকিমা এসে খাইয়ে গেছে। যুথী জিজ্ঞেস করল—'বাবা তুমি খাবে না?'

নবীন বললেন--' না রে, অম্বিকাদার স্ত্রী এত খাইয়ে দিয়েছে যে আর জায়গা নেই পেটে। আচ্ছা যুথী তুই তো পাড়াগাঁয়ে এই প্রথম এলি। নানা অসুবিধে এখানে। লাইট নেই, ভালো বাথরুম, পায়খানা নেই, —তোর এসবে অসুবিধে হচ্ছে না? গাঁয়ে থাকতে ভালো লাগছে তোর?' যুথী বলল—'হ্যাঁ, ওগুলো নেই বলে একটু অসুবিধে তো হচ্ছে বাবা, কিন্তু এত ছায়া ছায়া, এমন সুন্দর এই গ্রামটা যে ওগুলো বাদ দিলে আমার কিন্তু বেশ ভালই লাগছে।'

নবীন আপন মনেই বলেন--'এবার ভাবছি টাকাপয়সা জমিয়ে ইটের বাড়ি তুলে দেব। তোরা তো জন্মালিই ওমন সুন্দর বাড়িতে, এই মাটির বাড়িতে এলে কত কষ্ট! অম্বিকা ডাক্তারেরও আগে মাটির বাড়িই ছিল। এখন ইটের বাড়ি, শান দেওয়া মেঝে, মাথার ওপর ঢালাই ছাদ। বেশ ভালো বাড়ি করে নিয়েছে।'

যুথী বললো—'আমরা যে বাড়িতে জন্মেছি সেটা তো আমাদের নয়। পরের বাড়ি। এই বাড়ি মাটির হলেও আমাদের নিজেদের তাই না? জানো বাবা, মনসাতলা গ্রাম হলে কী হবে, এখানে ছেলেমেয়েরা কত কষ্ট করে হাইস্কুলে, কলেজে পড়তে যায় শুনলাম। শিক্ষিত লোক কিন্তু অনেক আছে। শহরের স্কুল-কলেজে যেতে আসতেই দিন কাবার। পড়ে কখন কি জানি?'

—'উঁ! আচ্ছা তোকে যদি বরাবরের জন্য এগাঁয়ে থাকতে হয় তাহলে থাকতে পারবি?'

—'বরাবরের জন্য?' —যুথী একটু ভাবে। তারপর জিজ্ঞেস করে—'কেন বাবা? তুমি দেশে ফিরে আসতে চাও?'

—'সে তো সবাই চায় রে। নিজের দেশের টান কি কেউ ভুলতে পারে? আমি তোকে জিজ্ঞেস করছি। আমি তো এখানে জন্মেছি, এখানেই বড়ো হয়েছি। তুই তো তা নোস। এখানে পাকাপাকি থাকতে হলে তোর কেমন লাগবে?'

—'খুব একটা খারাপ লাগবে না মনে হয়। তবে বন্ধুরা তো সবাই ডিব্রুগড়ে, ওদের জন্য মন কেমন করবে। ডিব্রুগড়ের জন্য মন কেমন করবে—এই আরকি? তাই বলে মানুষ কি আর একস্থান থেকে অন্য স্থানে যায় না বাবা? তুমিও তো দেশ ছেড়ে বিদেশে চলে গিয়েছিলে ব্যবসা করার জন্য?'

—'হ্যাঁ। জীবিকার জন্য ঘুরতে ঘুরতে আসামে গিয়ে ঠেকলাম। প্রথম প্রথম যখন ব্যাবসা জমে ওঠেনি তখন জানিস দেশের জন্য খুব মন কেমন করত। মনে হত ফিরে যাই। খুদকুঁড়ো যা জোটে তাই সই।' —নবীন অতীতে হারিয়ে যান।

যুথী বাবাকে হারিয়ে যেতে দেখে বলে—'তারপরের সব কথা আমি জানি বাবা। এখন কি তোমার আবার দেশে ফিরে আসতে খুব ইচ্ছে করছে?—জায়গাটা তো খারাপ নয়, কাছেই কোলকাতা। তুমি এখানেও দোকান করতে পারো।— ও বাবা, কোলকাতা দেখাতে কবে নিয়ে যাবে? শেষে কোলকাতা না দেখেই ফিরে যেতে না হয়। তাহলে আর কারও কাছে মুখ দেখাতে পারব না।'

—'নিয়ে যাব রে। একটু ভালো হয়ে যা তুই। — আচ্ছা, আমি একটু ও বাড়ি যাচ্ছি, তুই ঘুমো।'—নবীনের যুথীর মন জানার দরকার ছিল গ্রামে থাকার ব্যাপারে—জানা হয়ে গেছে।

বিয়ে ঠিক হয়ে গেল বেড়াতে এসে। কথাবার্তা পাকা হয়ে গেল। অম্বিকাচরণের কোনো দাবি নেই। শুধু বললেন—'আশীর্বাদটা করে যাও নবীন। যুথীকে তোমার বউদি আর কিছুতে হাতছাড়া করতে চান না'— অম্বিকাচরণ হাসতে থাকেন।

ডিব্রুগড়ের বাড়িতে বিশদে চিঠি লিখে সবই জানিয়েছেন নবীন। ওরা চিঠিটা পেলে তবেই জানবে। প্রথম মেয়ের বিয়ে। নবীনের সামর্থ্য এমন নয় যে বরপক্ষের বড়োরকম দাবিদাওয়া থাকলে রাজি হতে পারতেন। ভাগ্যদেবী সত্যিই সুপ্রসন্ন হয়েছেন তার ওপর। অম্বিকাদার এইটুকু দাবি মেনে নিতেই হবে। লক্ষ্মীকে, ছেলেমেয়েদেরকে ছাড়াই শুধু জ্ঞাতিদের সঙ্গে নিয়েই আশীর্বাদটা করে যেতেই হবে।

কোলকাতা, দেশের বাড়ি দেখবে বলে বাবার সঙ্গে গিয়ে বিয়ের অর্ধেক পথ পরিক্রম করে ফিরে এল যুথী। শ্রাবণ মাসে বিয়ের তারিখ। নবীন ব্যানার্জির বাড়িতে তাড়াহুড়ো পড়ে গেছে, হাতে সময় কম। অতগুলো লোককে যেতে হবে দেশে। যুথীর বিয়ের খবরে রায়চৌধুরি বাড়িও খুশি। ওকে যে সবাই ভালোবাসে। যুথীরা যেদিন ফিরল তার পরদিনই আদিত্য চলে যাবে শিলং-এর বোর্ডিংয়ে। যুথী এসে সুহাসিনীকে প্রণাম করে পাশে বসে। কেমন যেন চুপ চাপ। সুহাসিনী ওর মাথায় হাত রেখে বলেন—'বাবা! বিয়ের নাম হতেই ফরফরানী বন্ধ? ভালো ভালো। শ্বশুরবাড়িতে নাম হবে। —তা হ্যাঁরে তোর বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছে? আদিত্য তো কাল সকালেই শিলং-এ চলে যাচ্ছে। জানিস, আদিত্য তোর বিয়ে শুনে হেসেই সারা। বলে—যুথীর বিয়ে? এখনই? এহ বাবা! ওর আর কলেজে পড়া হল না। ঘোমটা মাথায় দিয়ে হাঁড়িকুড়ি নিয়ে ঘরকন্না করবে।' —যুথী তবুও আগের মতো ডানা ঝটফটিয়ে পাখিটার মতো ঝগড়া করে না। বলে না—ও মা! আদিত্যটা কালই চলে যাচ্ছে? আমার বিয়েতে যাবে না ও? —শান্ত গলায়ই জিজ্ঞেস করে—'আদিত্য কোথায়?'

—'যা না, ওপরে গিয়ে দেখ। ওখানেই হবে হয়তো।'

—'এখন তোমার কাছে বসি, পরে দেখা করে নেব।'

—'ভালো বিয়ে হচ্ছে তোর, আমি কেন সবাই খুশি। এবার বল, আমার কাছ থেকে কি নিবি? শাড়ি-গয়না-যা চাইবি দেব।

যুথী হঠাৎ উঠে বলে—'আমি এখন যাই গো। পরে আসব।'— বলে হন হন করে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে, রায়চৌধুরি ভিলা থেকে। পরদিন সকালে নিজেদের বাড়ির জানালা দিয়ে দেখেছিল গাড়িতে আদিত্যের স্যুটকেশ উঠল, ব্যাগ উঠল, আদিত্য উঠল। তারপর গাড়ি বেরিয়ে গেল খোলা গেট দিয়ে। রায়চৌধুরি বাড়ির ছোটোছেলে, ১৭ বছরের সুপুরুষ আদিত্য রায়চৌধুরি পারিবারিক ঐতিহ্যের পতাকা উড়িয়ে জীবনের মহাকাশের মাধ্যাকর্ষণের টানে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্য নিয়ে চলে গেল শিলং নামের শৈলশহরে উচ্চতর শিক্ষার বিচরণ ভূমিতে।

না। যুথীকার সঙ্গে ওর দেখা হয়নি সেদিন। যুথী নিজেই ওপরে যায়নি আবাল্যের খেলার সাথী, বন্ধু আদিত্যের সঙ্গে দেখা করতে। ফিরে এসেছিল নিজের ঘরে। ছোটোবেলা থেকে খেলা-ঝগড়া-হাতাহাতি করতে করতে কখন কোন অসতর্ক মুহূর্তে যে যুথী বসে পড়েছিল রং-তুলি নিয়ে ওর মনের আকাশের বিশাল ক্যানভাস জুড়ে একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত সাতটা উজ্জ্বল রংয়ের এক স্বপ্নীল রামধনু আঁকতে সেটা ও নিজেও মনে করতে পারে না। যুথীর যোলো বছরের কচি সবুজ দুর্বাঘাসে ছাওয়া হৃদয়ের নরম জমিটাতে নিজের অজান্তে আদিত্য একটা বলিষ্ঠ পদচিহ্ন এঁকে দিয়ে চলে গেল চিরদিনের জন্য। হোমিওপ্যাথি ধন্বন্তরী অম্বিকাচরণের হোমিওপ্যাথি পড়া, ইন্টারমিডিয়েট পাস ছেলের সঙ্গে ওর বিয়ের আনন্দে মাতোয়ারা যারা, তারা কখনও জানতেও পারে নি যুথীর হৃদয়ের উত্তাপে অঙ্কুরিত হওয়া একতরফা ভালোবাসার সুলুক।—গাড়ি গেট পেরিয়ে খোলা রাস্তা ধরে চোখের আড়ালে চলে গেল দ্রুতগতিতে। সেই শূন্য পথের দিকে তাকিয়ে জানালায় বসে রইল যুথী। একতরফা প্রথম প্রেমের মৃত্যুর নিদারুণ শোক ওকে ভেঙে গুঁড়িয়ে চূর্ণবিচূর্ণ করে অশ্রুস্নান করাতে লাগল। —যা কখনও হবার নয় এমন একটা অবাস্তব ভালোবাসা যে যুথীর মতো বুদ্ধিমতি মেয়ে নিজের জীবনে ঘটিয়ে ফেলতে পারে একথা কেউ জানল না, কেউ জানবেও না কোনোদিন। একা জানালায় বসে নীরবে কেঁদে চলল যুথীকা ওর গোপন প্রেমের অকাল মৃত্যু শোকে। সেটা ১৯৪২ সাল। অপু—নন্দু কেন? নবীনবাবুর চারটি সন্তান যুথীর বিয়ের পর জন্ম নিয়েছে।

রুনার মুখে অপরাজিতা মুখার্জি নামটা শুনেই ধড়াস করে উঠল সুনন্দার বুকের ভেতর! অপু? —শেষপর্যন্ত সত্যিই এসেছে? প্রায় বছর ঘুরতে চলল। নন্দু তো প্রায় ভুলেই যাচ্ছিল যে অপু আসবে বলে ঠামার কাছ থেকে ঠিকানা ফোন নম্বর নিয়েছে। অপুর আসার প্রতীক্ষায় তিন-চারমাস কেটে যাওয়ার পর ও ধরেই নিয়েছিল অপু আর আসবে না। কত কিছুই না ভেবেছে ওর অহংকারী মন! ভেবেছে, অপু তো কোলকাতায় থাকে। মুখার্জি অ্যান্ড মুখার্জি ইন্টারন্যাশনালের নাম নিশ্চয়ই শুনেছে। ও না জানলেও ওর স্বামী তো জানবেই। হয়তো বা আলিপুরে মুখার্জি ম্যানশনও দেখেছে। ঠামা বলেছিল ছিরিছাঁদ দেখে অপু খুব ভালো আছে মনে হয়নি। অপুর মতো চালিয়াত মেয়ের হয়তো

ইগোতে বেঁধেছে মুখার্জি ম্যানশনে নন্দুর সঙ্গে দেখা করতে আসতে! —এতদিন পর এল তাও ফোন না করে, না জানিয়ে হাজির হয়েছে এই প্রায় দুপুর হতে চলা সময়ে। অপুর জটিল মন কি নন্দুকে অফগার্ড অবস্থায় দেখতে চেয়েছিল? - কি জানি? ওর মতো মোস্ট আনপ্রেডিক্টেবল মেয়ে অনেক কিছু ভেবেই অনেককিছু করে ফেলে। — রুনা তখনও অপেক্ষা করে আছে খেয়াল হতেই নন্দু বলল—'ও হো! হ্যাঁ, ওর আসার কথা ছিল অনেকদিন আগে। ঠিক আছে রুনা, তুমি গেটম্যানকে গেট খুলে দিতে বলো। —এদিকে আমার তো এখন সেশন চলছে! কি করি বলতো? উঠতেও তো পারব না!

রুনা বলল—'নীচের ড্রইংরুমে বসাই তাহলে? আপনার হয়ে গেলে আসবেন।'

—'আমার তো এখনও বেশ দেরি হবে রুনা। কতক্ষণ বসে থাকবে একা একা?' রুনা আর কিছু না বলে ম্যামের দিকেই তাকিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। আর সুনন্দা দ্রুতগতিতে ভাবতে থাকে এই পারলার রুমটা মুখার্জি পরিবারের একেবারে প্রাইভেট এরিয়া। আজ আবার শাশুড়ির ম্যাসাজ ও করবে এরা। এখানে অপুকে ডেকে নিয়ে আসা কি উচিত হবে? পারলারের মেয়েরা আর তথাগতদের জন্য ছেলেরা ছাড়া আজ অবধি বাইরের লোক কখনও আসেনি এঘরে। অপুকে নিয়ে ভয়ও আছে। ছোটোবেলার পাঁচটা দিঘিতে রাজহাঁস চরে বেড়ানোর মতো কথাবার্তা এসব মেয়েদের সামনে বললেই নন্দুর ইজ্জত ঢিলে হয়ে যাবে। যাকগে যাক্! এখানেই আনতে বলে দিই। —'রুনা তুমি ওকে এখানেই নিয়ে চলে এসো।'—বলে দেয় নন্দু।

রুনা অবাক হয়ে যায় এমন কথা শুনে—'এখানে?'

—'তাছাড়া আর এখন কি করা যাবে? ও আমার ডিব্রুগড়ের লোক!'

—'আচ্ছা ম্যাম। তাহলে নিয়ে আসছি।'

গরমজলের বাকেটে পা ডুবিয়ে বসে আরাম লাগছিল খুব।—অপু! ২৫ বছর পর আজ দুজনের দেখা হবে। কেমন হয়েছে ওকে দেখতে? চিনতে পারবে তো নন্দু? ঠিক, চিনবে, কারণ অপুর থুতনীতে একটা মটরডালের মতো বড়ো উঁচু তিল আছে। তিলটার মধ্যে একটা মাত্র ছোটো চুল। ওর মনে পড়ে গেল যুথীপিসিরও ওমনি একটা তিল আছে বাঁ দিকের থুতনীর নীচের দিকে, তবে তাতে চুল নেই। যুথীপিসিকে দেখতে খুব সুন্দর। নবীনদাদু খুব লম্বা আর অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন। আর লক্ষ্মীদিদা ছিলেন বেঁটে, মুখটা একেবারে রুটির মতো গোল। যূথী পিসি আর মল্লিকাপিসি দেখতে নবীন দাদুর মতো। অপু কিন্তু একেবারে লক্ষ্মীদিদার মতো হয়েছে দেখতে। বেঁটে, ফর্সা গোল রুটির মতো মুখ।

যুথীপিসি যেন নবীনদাদুর দশটা ছেলেমেয়ের মধ্যে দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ। কী সুন্দর ব্যবহার, কী মার্জিত মানুষ। প্রায় বছরই বাপের বাড়িতে বেড়াতে আসতেন। ঠামা-জেঠিমারা, মা-বাপি সবাই যুথী পিসিকে খুব পছন্দ করত সেটা সেই ছোটো

বেলাতেই বুঝত নন্দু। ঠামার কাছে শুনেছে যুথীপিসি নাকি লেখাপড়ায়ও ভালো ছিল। বিয়ে না হয়ে গেলে হয়তো বি. এ. এম. এ. পাস করতে পারত। ম্যাট্রিকে নাকি সেকেন্ড ডিভিশন পেয়েছিল। যুথী পিসির স্বামীকে ওরা সবাই মুখুজ্জেমশাই বলে ডাকত। মুখুজ্জেমশাই যেন কেমন খেঁকুড়ে ছিল দেখতে। খুব সিগারেট খেত। ঠামা প্রত্যেক বার যুথীপিসি, মুখুজ্জেমশাইকে আর ওদের ছোটোবোন অপুকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াতো। কী ফুটফুটে ছিল যুথী পিসির মেয়ে। অনেক দেরিতে যমজ ছেলে-মেয়ে হল। নন্দুদের থেকে কত ছোটো। এসেছিল একবার ওদের নিয়ে। তখন একেবারে ছোটো ছিল। বিয়ের বহু বছর পরে নাকি যাগযজ্ঞ করে বাচ্ছা হয়েছিল। ঠামা বলত—'যুথীর যে কোনোদিন বাচ্চা হবে সে আশাই আমরা ছেড়ে দিয়েছিলাম। বছরের পর বছর যায় যুথীর আর ছেলেপুলে হয় না। যে শাশুড়ি এত আদর করে সাত তাড়াতাড়ি যুথীকে বউ করে নিয়ে গিয়েছিল সেই শাশুড়িই দিন রাত ওকে বাঁজা বাঁজ বলে গালাগাল করত, কপাল চাপড়াতো বংশ রক্ষা হবে না বলে। যদি না জামাই অতুল্য ছেলেটা আর ওর শ্বশুরমশাই ভালো হত, তাহলে যুথীর মতো এত ভালো মেয়েটার জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠত—জানিস?' —ঠামার গল্পের অনেকটাই জুড়ে থাকত নবীন ব্যানার্জির পরিবার। নন্দুর বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর যখনই ও ডিব্রুগড়ে যায় ঠামা ঘুরে ফিরে ঠিক সেই অতীতের দিনগুলোতে বিচরণ করতে যাবেই যাবে। বাড়ির অন্যরা সবাই নবীনদাদুদের প্রায় ভুলেই গেছে, কিন্তু নবীনদাদু, লক্ষ্মীদিদা আর যুথীপিসি ঠামার মনের অনেকটা জায়গা জুড়ে যে এখনও বিরাজ করছে সেটা নন্দু বুঝতে পারত।

লক্ষ্মীদিদা পাঠশালায় ক্লাস থ্রি অব্দি পড়েছিলেন। ঠামা বলতো —'জানিস, আমি ক্লাস এইট অব্দি পড়েছিলাম। খুব গল্পের বই পড়তে ভালোবাসতাম। শরৎচন্দ্রের সব কটা বই আমি বার বার পড়েছি। মাসিক পত্রিকা বসুমতির গ্রাহক ছিলাম যতদিন চোখটা ভাল ছিল। কিন্তু খবরের কাগজ পড়তে একটুও ভাল লাগত না আমার। এদিকে লক্ষ্মী মাত্র পাঠশালার বিদ্যে নিয়ে দুপুর হলেই যুগান্তর পত্রিকা নিয়ে বসে গড় গড় করে পড়ে যেত গোটা কাগজটা। কী নেশা ছিল ওর—বাপরে! বর্ষাকালে আবহাওয়া খারাপ থাকলে প্লেন আসত না, কাগজও আসত না। লক্ষ্মীর সেসব দিনে জর্দা-দোক্তা খাওয়া বেড়ে যেত।'

এসব আর ঠামা বলবে কি? নন্দুও তো দেখেছে চোদ্দো বছর বয়স অবধি। ডিব্রুগড়ে ভোরবেলা কাগজ পাওয়া যায় না। প্লেনে দুপুরবেলা কাগজ যায় কোলকাতা থেকে, তারপর ডিস্ট্রিবিউট হয়। নবীনদাদু রোজ সকাল আটটায় সাইকেল নিয়ে দোকানে চলে যেতেন, ফিরতেন সেই দুপুর একটায়। স্নান খাওয়া সেরে যুগান্তর পত্রিকাটা নিয়ে শুতেন। যেমনি উনি ঘুমিয়ে পড়তেন ওমনি লক্ষ্মীদিদা কাগজ বগলদাবা করে সোজা রায়চৌধুরি ভিলায় এসে ঠামার ঘরের মেঝেতে শীতল পাটী বিছিয়ে ফ্যানের নীচে যুগান্তর নিয়ে

শুয়ে পড়তেন আর জোরে জোরে গড়গড় করে খবর পড়ে শোনাতেন ঠামাকে। এভাবেই গল্পের বইও পড়ে শোনাতেন। একটু পরেই ঠামার নাক ডাকত তখন লক্ষ্মীদিদা মনে মনে পড়তেন। সেই বয়সে এসব নিয়ে নন্দুর ভাবনা চিন্তার ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু আজ যখন দৃশ্যটা ভেসে উঠল চোখের সামনে তখন ওর মনে হলো ক্লাস থ্রি অব্দি বিদ্যা নিয়েও লক্ষ্মীদিদার মনে লেখাপড়ার কত ইচ্ছে ছিল! তাহলে ওনার মত মানুষের ছেলে মেয়েরা কেউ কেন লেখাপড়া করতে পারল না একমাত্র যুথীপিসি ছাড়া? নবীনদাদু আর লক্ষ্মীদিদার মতো এত ভালোমানুষদের এমন কু-সন্তান কি করে হয়? নবীনদাদুদের সিলিং ফ্যান ছিল না। লক্ষ্মীদিদা যে রোজ দুপুরে ঠামার ঘরে এসে খবরের কাগজ পড়তেন সেটা পাখার বাতাস খাবার লোভে নয়। ঠামার চোখে পাওয়ার ফুল চশমা, পড়া বারণ ছিল। লক্ষ্মীদিদা আন্তরিক ভাবে ঠামাকে পড়ে শোনাতে চাইতেন। ঠামা তো কতবার বলেছে—'লক্ষ্মী এমন বদ অভ্যেস করে দিয়েছে যে আজকাল ও কাগজ পড়ে না শোনালে আর বোধহয় দুপুরের ঘুমটা হবে না। ও কিছুক্ষণ পড়লেই আমার চোখ বুজে আসে।' —পরে নন্দু দেখেছিল নবীনদাদু সিলিংফ্যান কিনেছিলেন তবু লক্ষ্মীদিদা দুপুরে ঠামার ঘরেই শুতো।

সুনন্দার অতীতে ফিরে দেখায় ছেদ পড়ল—'ম্যাম ওনাকে নিয়ে এসেছি।'— দরজা ফাঁক করে রুনার মুখ উঁকি মারল।

—'কোথায়? ভেতরে আসতে বল!'—পেডিকিওরিস্ট তখন নন্দুর পা ঘষছে।

এক নজর তাকিয়েই নন্দু অপুকে চিনতে পারল। সেই গোল মুখ, সেই তিল। কপালে কয়েকটা বলিরেখা পড়ে বয়সের ছাপ পড়েছে। কথা বলতে ভুলে গিয়ে নন্দু অপুকে দেখতে থাকল ২৫ বছর পর। ওর পেছনে একটা কমবয়সি মেয়ে। গায়ের রং শ্যামলা কিন্তু মুখে নবীনদাদুর তীক্ষ্ণ নাক-মুখের ছাপ।

অপু ঘরে ঢুকে একটু হকচকিয়ে গেছে পরিষ্কার বোঝা যায়। 'একবার চেয়ারে বসা নন্দুর দিকে, একবার বিউটি ক্লিনিকের মেয়েগুলোর দিকে তাকাচ্ছে। ওরও মুখে কোনো কথা গজায় না।

প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিয়ে নন্দুই বলে ওঠে—'অপু!' অপু যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। একগাল হাসি নিয়ে বলে—'যাক বাবা, চিনতে যে পেরেছিস! আমি তো বুঝে উঠতেই পারছিলাম না কোথায় এলাম, কি করব?'

নন্দুও হেসে বলে—'ঠিক জায়গায়ই এসেছিস। বোস বোস, ওই সোফাটাতে বোস্।'

অপু বসতে বসতে বলে—'বাবা তোর সঙ্গে দেখা হবে আজ সে তো আমি ভাবতেই পারিনি। কতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম গেটের বাইরে। দারোয়ান ভেতরে ফোন করে আর কিছু বলে না। বাড়ি তো নয় একেবারে রাষ্ট্রপতি ভবন। এতশত অনুমতির ঝামেলা আছে জানলে তো কেউ আসবে না তোর বাড়িতে।'

নন্দু বুঝে গেল অপু এখনও অপুর মতোই আছে। এতখানি বয়স গড়িয়ে গিয়েও কোনো পরিবর্তন আসেনি ওর মধ্যে। এতটুকুও দমে না গিয়ে নন্দু বলল—'তা যা বলেছিস। কোথায় এসেছিস সেটা দেখতে হবে তো? রাষ্ট্রপতি ভবন না হলেও রাষ্ট্রের অন্যতম এক শিল্পপতির বাড়ি। কিছুটা কড়াকড়ি তো থাকবেই আর সেটা মানতেও হবে। এটা মুখার্জি ম্যানশন রে। এবাড়ির লোকরা সিকিউরিটি সঙ্গে না নিয়ে এক পা বাইরে বের হতে পারে না। লাইফ রিস্ক হয়ে যাবে।'

অপু এসব কথার জবাব দেয় না। সবই বুঝতে পেরেছে জানে নন্দু কিন্তু এমন ভান করে আছে যেন কিছুই বোঝেনি। এদিক ওদিক তাকিয়ে শুধু জমি জরিপ করে চলেছে ওর কুটীল দুটো ছোটো ছোটো চোখ, নজর এড়ায় না নন্দুর। বুঝতে পারে ঠামা বলে দেওয়ার পরও ফোন করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট না করে কেন এসেছে অপু। আসলে নন্দুর প্রতি রায়চৌধুরি বাড়ির প্রতি অপুর যে হিংসা ছিল সেই ছোটোবেলায় সেই হিংসার ওপর বিগত পঁচিশ বছরের জীবনের স্রোত কোনো পলিমাটি ফেলতে পারেনি, চাপা দিতে পারেনি ওর ঈর্ষাকাতরতাকে। তবে নন্দুও এখন তৈরি। অপু খবর না দিয়ে আচমকা এসে অফগার্ড নন্দুকে ধরতে চেয়েছিল—সত্যিই নন্দু শিল্পপতি বাড়ির একমাত্র পুত্রবধূ কি না! মনে মনে নিজেকে তৈরি করে নন্দু অপুর দিক থেকে আসা যেকোনও আক্রমণের উপযুক্ত জবাব দেবার জন্য।

—'ঠামা বলেছিল বটে তোদের ব্যাবসা আছে। তা, তোদের বুঝি বিউটি পারলারের ব্যাবসা? নিজেদের বাড়িতেই খুলেছিস?'

হাসে নন্দু মধুর করে—'না রে! এটা আমাদের ব্যক্তিগত পারলার। আমরা বাজারের কোনো পারলারে যেতে পারি না তো তাই বাড়িতেই ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। থৃতী ইরানী, শেহনাজ এদের নাম শুনেছিস কি না জানি না, ওদের ওখানকার মেয়েরা বাড়ি এসে আমাদের যত্ন-আত্তি করে দিয়ে যায়। বাৎসরিক কনট্রাক্টে টাকা পেমেন্ট করা থাকে। এই আর কি! বিউটি পারলারের ব্যাবসা করে মুখার্জি অ্যান্ড মুখার্জি ইন্টারন্যাশনালের মতো বড়ো শিল্পপতি হওয়া যায় না এটা তুই খুব ভালোই জানিস।'

অপু নন্দুর চোখা চোখা কথা শুনে আবার হকচকিয়ে যায়। নন্দু যে আর সেই নন্দু নেই খুব ভালোই বুঝতে পারে অপু। কিন্তু অপু তো অপুই যার কোনো পরিবর্তন হয় না। বলে—'শিল্পপতি তুই আর আমাকে কি চেনাবি? আমার জ্যাঠতুতো আর মাসতুতো দুই ননদাই তো বিশাল শিল্পপতি তবে তোদের মতো এত ফাট নেই।'

নন্দু আবার মিষ্টি হেসে বলে— 'তাই বুঝি? কারা রে তোর দুই ননদাই? আম্বানীরা আর মিত্তলরা? নাকি বিড়লা-সিংঘানীয়ারা?' — নন্দু জানে অপু এসব নাম জীবনে প্রথম শুনছে তাই মজা দেখার জন্যই চোখে কৌতুক নিয়ে তাকিয়ে থাকে। অপু একেবারে অবিন্যস্ত হয়ে পড়েছে। ওর সঙ্গী মেয়েটি আড়ষ্ট হয়ে আছে প্রথম থেকেই এখন মুখটা

হাঁ হয়ে গেছে ওর। নন্দু ভালো করে ওদের দুজনকে দেখে। টেম্পল ডিজাইন করা পাড়ের একটা চকচকে সিন্থেটিক শাড়ি পরেছে অপু। হাতে রেক্সিন আর ফোমের ঢাউস হাত ব্যাগ, নোংরা হয়ে যাওয়া শাঁখা, প্লাস্টিকের লাল বালা যাকে পলা বলে চালানো হয় বাজারে, ঘষে ক্ষয়ে কালো হয়ে যাওয়া দুগাছা করে ব্রোঞ্জের ওপর সোনার লেপ দেওয়া চুড়ি, পায়ে ওইরকমই ক্ষয়ধরা চটি। সঙ্গের মেয়েটির সালোয়ার কামিজও তথৈবচ। নন্দু কথার মোড় অন্যদিকে ঘোরাবার চেষ্টা করতে যায় কারণ অপুর চালিয়াতি চলতে দিলে ওর নিজের মাথার ঠিক থাকবে না আর। তাই জিজ্ঞেস করে—'ও কে রে?'

অপুর তড়িৎ উত্তর—'বাবা ওকে চিনলি না চেহারা দেখেও? আশ্চর্য করলি মাইরি!'

অপুর মুখের ভাষারও কোনো পরিবর্তন হয়নি। এতগুলো বাইরের মেয়ের সামনে ওর ভাষা শুনে নন্দু নিজেই লজ্জিত হয়ে পড়ে জিজ্ঞেস করে—' তোর মেয়ে? তোর মতো তো নয় দেখতে যে চিনবো।'

—'খুব চিনেছিস! আরে ও কাজলদার মেয়ে বুলা। একেবারে কাজলদার মুখ বসানো তো!'

নন্দু বলল—'আরে! আমি কি করে জানব? কাজলকাকুর বিয়ে হয়েছে তাই তো জানি না।'

—'তোরা তো কেউ খোঁজ খবর রাখিসইনি। কিন্তু আমি দেখ ২৫ বছর পরও মনে করে গিয়ে ঘুরে এলাম।'

নন্দুও জবাব দেয়— 'দেখ অপু, দোষারোপ—পালটা দোষারোপ এসব করে কোনো লাভ নেই। কারণ তোরা যখন চলে এসেছিলি তখনও আমি ছোটোই ছিলাম। তাছাড়া আমি তখন ডিব্রুগড়েই নেই, ছিলাম দার্জিলিং-এ! ছুটিতে এসে শুনেছিলাম তোরা দেশের বাড়ি চলে গেছিস। যোগাযোগ যাদের রাখার কথা ছিল তারা কিন্তু অনেকদিন রেখেছিল। আমি লক্ষ্মীদিদা আর ঠামার কথা বলছি। ওনারা চিঠি লেখালেখি করতেন। তোর বিয়ের খবর দিয়ে লক্ষ্মীদিদা ঠামাকে চিঠি দিয়েছিলেন। টাকা পাঠাতেও বলেছিলেন। ঠামা বেশ মোটা টাকাই তো পাঠিয়েছিল! — তারপর থেকে আর কোনো চিঠিপত্র আসেনি বলত ঠামা। এরপর তুই আর কাকে দোষ দিবি?'

—'না, সে কথা বলছি না। তবে তোর দাদারা এতকাল ধরে কোলকাতায় আছে তুইও তো শুনলাম তোদের বালিগঞ্জের বাড়িতে থেকে এখানে কলেজে পড়েছিস। ইচ্ছে করলে তো মনসাতলায় গিয়ে মাকে দেখে আসতে পারতিস! মা তো কত ভালোবাসত তোকে। ইচ্ছে হয়নি তোদের তাই যাসনি!'

নন্দু এবার আবার অন্যরাস্তা ধরে—'দেখ আমার দাদারা ডিব্রুগড়ে থাকতেও তোদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ ছিল না, তোর দাদা-দিদিরাও আমাদের পরিবারের সাথে মেলামেশা করত না তেমন। একমাত্র যুথীপিসি ছাড়া। তাই আমার দাদাদের কথা ছেড়ে দে। লক্ষ্মীদিদা

আর তুই-ই রোজ আসতিস। সত্যিকথা বলতে কী বড়ো হয়ে গেলে স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে এত বেশি বন্ধু জুটে যায় যে ছোটোবেলার কথা অত আর মনে থাকেও না রে! — আচ্ছা, তুই এতকাল পর এলি, কোথায় সবাইকার কথা বলবি, তা না এসেই ছোটোবেলার মতো ঝগড়া করতে শুরু করে দিলি। এবার বল লক্ষ্মীদিদা কেমন আছে, তোর কটা ছেলে-মেয়ে —এসব বল।' —হাসতে হাসতে বলল নন্দু।

—'তোর লক্ষ্মীদিদা অনেকদিন আগেই মারা গেছে। আর আমার কোনো ছেলেপুলে হয়নি। এবার তোর কথা বল। তুই এড়িয়ে গেলে আমি ছাড়ব না। তুই কেন আমার খোঁজ নিসনি?'

সুনন্দা মনে মনে প্রমাদ গোনে। সত্যিই অপু সেই অপুই রয়েছে। ও কি করে অপুকে বোঝাবে এতকথা বলার পরও, যে ওর জীবন নদীতে অপু নামের একটা ছোটো নদী সেই কবে কোনযুগে এসে ঢুকে পড়ে আবার বেরিয়ে চলে গেছে কোনও একটা বাঁক নেবার সময়, যার স্মৃতিটুকু আছে শুধু আর কিছু নেই। নন্দু নামে মেয়েটা মূল খাত ধরে নিজের জীবন নদীকে প্রবাহিত করে চলেছে জোয়ার-ভাটার টানে? অপুকে কি করে বোঝাবে একটা জীবনে বিভিন্ন সময়ে কত মানুষ আসে যাদের সবাইকে একসাথে ঠাঁই দেবার মতো জায়গা থাকে না? কয়েক জন বিশেষ আপনই শুধু কাছে থাকে বাকিরা দূরে চলে যায়? দূরে যায় কিন্তু একেবারে হারিয়েও যায় না। অপু সেই দূরে যাওয়া দলের মধ্যে পড়ে? নন্দু বোতাম টিপে রুনাকে আসতে বলে প্রসঙ্গ পালটাবার চেষ্টা করে।

দরজা খুলে রুনা এসে ঢোকে—'ডেকেছেন ম্যাম?'

—'হ্যাঁ রুনা। ওদের একটু জল-টল দাও, অনেকক্ষণ এসেছে যে!' — তারপর অপুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে—'কি রে, কি খাবি? চা, কফি না কোল্ড-ড্রিংকস?'

অপু বেশ অবজ্ঞা মেশানো গলায় জিজ্ঞেস করে—'কি আছে ফ্রিজে? আমি তো গরম খাব না। আবার সব রকম কোল্ডড্রিংকস্‌ও আমার চলে না।'

রুনার বোধহয় এই চেহারার, এই পোশাকের মানুষগুলোর একেবারে অন্দরমহলে এসে বসে পড়া পছন্দ হয়নি। এ বাড়িতে ওর এত বছর সার্ভিসে এমন ঘটনা ও ছোটোমেমসাহেবকে প্রথম ঘটাতে দেখল। তার ওপর অপুর অবজ্ঞা ভরা ফ্রিজে কি আছে জিজ্ঞেস করাতে ও আর মেজাজ ঠিক রাখতে পারল না। তির্যক দৃষ্টিতে ও অপুর পা থেকে মাথা অব্দি দেখে ঠান্ডা গলায় জিজ্ঞেস করল—' সেলার জানেন? সেলার?'

—' সেলার? কই সেলার নামের কোন কোল্ডড্রিংক আছে বলে তো শুনিনি? থাম্‌স্‌ আপ, পেপসী, কোকোকোলা, এসবই তো খেয়েছি। আরও আছে তবে সেলার খাইনি আগে। ভালো বুঝি খুব? তাহলে খেয়েই দেখি!'

রুনার মুখের হাসি আর থামে না। নন্দুরও হাসি পেয়েছে খুব। তবু সামলে নিয়ে চুপ করে একটু মজা দেখার লোভ সামলাতে পারে না ও। অপুকে টিট করতে রুনার

মতো মেয়েই দরকার। মুখার্জি ম্যানশনের বাহির-অন্দর সব দেখার পরও চালিয়াতি করতে ছাড়ছে না। কোনোমতে হাসি ম্যানেজ করে রুনা বলল—'সেলার কোনো কোল্ডড্রিংক নয়। ওই যে আপনি জিজ্ঞেস করলেন না, ফ্রিজে কি আছে? আপনার বাড়িতে নিশ্চয়ই একটা ফ্রিজ আছে?'—প্রশ্ন করে রুনা উত্তরের আশায় অপুর ঈষৎ রিংকল ধরা শুকনো চামড়াওলা মুখের দিকে তাকায়।

অপু ব্যাপারটা ধরতে না পেরে বলে—'হ্যাঁ আছে তো! কেন?'

—'আমার বাড়িতেও একটা আছে। গদরেজের একশো পঁয়ষট্টি। আমিও ওটাতেই ২/৪ বোতল কোল্ডড্রিংকস রাখি। তবে ---- ' —রুনা দিব্যি অভিনয় করার মতো মাথা চুলকোয় কথা থামিয়ে দিয়ে। নন্দু নিজেই রুনার অভিনয় পারদর্শিতা দেখে অবাক হয়ে পরবর্তী নাটকের দৃশ্যের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

অপু এখনও কিছু বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করে—'তবে কি?'

রুনা বলে—'তবেটা হল এই যে আপনার-আমার বাড়িতে ফ্রিজে ২/৪ বোতল ড্রিংকস্ থাকে কিন্তু এ বাড়িতে মাটির তলায় একটা ঠান্ডাঘর আছে যার ভেতরে দুনিয়ার সবদেশের নামীদামী সব রকম ড্রিংকসই রাখা আছে। মদ থেকে আপনার পেপসী পর্যন্ত। সেই ঠান্ডাঘরকে সেলার বলে। আপনি কিছু মনে করবেন না, সেলার খেতে চাইলেন বলে হাসি পেয়ে গেল। এবার বলুন কোনটা খাবেন? গরম পড়েছে চিলড্ বিয়র খাবেন?'

—'অ! তুমি মশকরা করছিলে আমার সঙ্গে? যাও, গিয়ে কোকোকোলা নিয়ে এস। —ও কে রে নন্দু?' — জিজ্ঞেস করে অপু।

রুনা যেতে যেতে উত্তর দিয়ে যায়—' আমি ছোটোমেমসাহেবের পি. এ.। বোঝেন পি. এ. কি?' নন্দু থামাবার জন্য একটু গম্ভীর গলায় রুনাকে বলল—'রুনা যাও, নিয়ে এসো।'

অপুও বোধহয় এতক্ষণে ওর তীক্ষ্ণবুদ্ধিতে বুঝতে পারছিল যে এখানে ওর চালিয়াতি বেশিক্ষণ চলবে না। এবার অন্য কথা পাড়ে—'তোর ছেলে-মেয়ে কোথায়? ওদের দেখছি না?'

—'আমার ছেলে তো যথারীতি দার্জিলিং-এ আর মেয়ে এখানেই।' ও তো এখন স্কুলে। কই তোর ছেলেমেয়েদের কথা তো বললি না?'

--'আমার থাকলে তো বলব? আমার বাচ্চা হয়নি রে।'

—ঠিক এই সময় নন্দুর শাশুড়ি ইন্দ্রাণী এসে ঢোকেন ঘরে। ঢুকেই অপুদের ওখানে বসে থাকতে দেখে ভুরুটা অল্প কুঁচকে যায় ওনার। অবাক দৃষ্টিতে প্রশ্ন নিয়ে উনি নন্দুর দিকে তাকান। নন্দুর ম্যানিকিওর পেডিকিওর সবে শেষ হয়েছে। পায়ের পাতার শেষ ক্রিমটুকু তোয়ালে দিয়ে মুছে দিচ্ছে পেডিকিওরিস্ট। নন্দু উঠে পড়ে বলল—'মম্ তুমি কি আগে এগুলো করে নেবে? না কি ম্যাসাজ করাবে আগে?'— ও! মম্ এ হল অপু। সেই যে ডিব্রুগড়ে আমাদের বাড়িতে ----তোমাকে গল্প করেছিলাম না?'

অপু আর বুলা উঠে এসে ইন্দ্রাণীকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। এসবে অনভ্যস্থ ইন্দ্রাণী একেবারে অস্বস্তিতে পড়লেন বুঝতে পারল নন্দু। আর তক্ষুনি অপু ওর বাচালতা শুরু করে দিল—'আমরা ডিব্রুগড়ে একবাড়িতে এক হাঁড়িতে খেয়ে বড়ো হয়েছি মাসিমা। আপনি আমাকে নন্দুর মতোই রায়চৌধুরি বাড়ির মেয়ে বলে মনে করবেন। আর এ হলো আমার ভাইঝি বুলা।'

ইন্দ্রাণী বললেন—'ও।' তারপরই পুত্রবধুর দিকে মন দিলেন।--' তোমার তো মনে হচ্ছে আজ আর বডি ম্যাসাজ হবে না, সুইমিংও আমাকে একাই করতে হবে আজ? আমি তাহলে আগে ম্যাসাজটাই করিয়ে নিই'— বলেই উনি ফ্লোরাল ডিজাইনের কিমোনোটা খুলে ম্যাসাজ বেডের দিকে এগিয়ে গেলেন। দীর্ঘাঙ্গী, দুর্দান্ত ফিগারের অপরূপ রূপসী ইন্দ্রাণীর নিয়মিত ব্যায়াম, সাঁতারে সুগঠিত শরীরের দিকে তাকিয়ে অপুর ছোটো ছোটো চোখদুটো গোল মার্বেলের মতো হয়ে গেল একেবারে। বুলার মুখটা বন্ধ হয় না লক্ষ্য করেছে নন্দু। বুলার পুরু পুরু ঠোঁট ফাঁক হয়ে হাঁ মুখ থেকে দাঁত বেরিয়ে দেখা যাচ্ছে। নন্দু ওদের অবস্থা দেখে মুচকে হাসল। অপুর হাতটা ধরে বলল—'চল, মম্ এখন ম্যাসাজ করাবে। আজ আসলে আমার আর মমের এসব সেসনের দিন, একসাথে সাঁতার কাটার দিন। সপ্তাহে একদিন রুটিন বাঁধা নিয়ম।'

বেরিয়ে আসতে আসতে অপু জিজ্ঞেস করে—'সাঁতার? তুই সাঁতার কাটিস? কবে শিখলি রে? তোর তো জলে দারুন ভয় ছিল। আশে পাশে পুকুর আছে? নাকি হেদোয় গিয়ে শিখলি? হেদোয় তো আমার বাড়ি রে!'

নন্দু কথা না বাড়িয়ে বলে—'চল চল। ওই তো রুনাও এসে পড়েছে।'—রুনার পেছনে সামসুদ্দীন ট্রলি ঠেলে নিয়ে আসছে। নন্দু বলল—'মর্নিংগ্লোরিতে নিয়ে যাও। ওখানেই বসব।'

—'মর্নিং গ্লোরি? সেটা কি রে? তোদের বাড়িতে রেস্টুরেন্টও আছে নাকি? বাড়িটা একবার ঘুরিয়ে দেখাবি?'

নিশ্চয়ই দেখবি কিন্তু চল, আগে ওগুলো খেয়ে নে ঠান্ডা থাকতে থাকতে। মর্নিং গ্লোরি রেস্টুরেন্ট নয় ওটা ছোটো ডাইনিং রুম। দুটো ডাইনিং রুম আছে। একটা বিশাল বড়ো, অনেক লোক একসঙ্গে বসে খেতে পারে। আর মর্নিংগ্লোরিতে আমরা বাড়ির কজন শুধু খাই। চল।'

খেতে খেতে অপু বলল—'একটা কথা বলব কিছু মনে করিস না। এবাড়িটা কিন্তু তোদের বাড়ির মতো নয়। কেমন যেন ছাড়া ছাড়া ভাব। তোর শাশুড়ির কোনো আন্তরিকতা নেই। খুব দেমাক। কথাই বলল না। আমাদের সামনে তো প্রায় ন্যাংটো হয়ে শুয়ে পড়ল টেবিলটার ওপর। মাগো! তোদের বাড়ি কি রকম ছিল? ঠামার তোর

মা-জেঠিমাদের কত সভ্য পোশাক আশাক ছিল। এ তো একেবারে মেমদের মতো মাইরি! তুই আছিস কি করে রে? তোর বর তথাগত ও কি এরকম? বনছে তোর এদের সঙ্গে?'

—'অপু তুই অনেক প্রশ্ন একসঙ্গে করে ফেললি। কিছুটা অনধিকার চর্চাও করে ফেললি। আমার শাশুড়ির মতো এত সভ্য মানুষ খুব কম দেখেছি আমি। তুই যা দেখে ওনার নিন্দে করছিস সেটা উনি যে সমাজের মানুষ সেখানে নিন্দনীয় নয়। তুই তোর দেখা সমাজের সঙ্গে ওনার সমাজটাকে গুলিয়ে ফেলছিস। হ্যাঁ, আমার বর তথাগতও এরকমই আর ওর সঙ্গে আমার সম্পর্ক গভীর ভালোবাসায় মোড়া। তোর চিন্তার কারণ নেই। আমার শাশুড়ির জন্ম বিদেশে. বড়ো হয়েছেও বিদেশে, ওনার সঙ্গে মা-জেঠিমাদের তো কিছু অমিল থাকবেই -- বল? কিন্তু মানসিক মিল আছে অতিমাত্রায় বুঝলি?' অপু চুপ হয়ে যায়। এবার নন্দু বুলার দিকে মন দেয়—'তোমার পিসি এসে থেকে এত অভিযোগ করে চলেছে যে তোমার সঙ্গে কথাই বলতে পারছি না। তা. তুমি তো নিশ্চয়ই· পড়? কি পড় তুমি?'

বুলা লজ্জা পায় যেন। বলে—'পড়তাম আগে, এখন আর পড়ি না। ক্লাস টেন অব্দি পড়েছিলাম।'

—'সে কি? কেন পড়লে না আর? আজকাল পড়াশুনো না করলে চলে?'

বুলা চুপ করে মাথা নীচু করে বসে রইল। জবাব অপুর দিক থেকে এল—'কি হাতি-ঘোড়া হবে বেশি বিদ্যেধরী হয়ে? সেই তো বিয়ে হবে, হেঁসেল ঠেলবে, আর বাচ্চা বিয়োবে। তোদের মতো রাজকন্যা তো আর নয় যে রাজপুত্তর এসে তুলে নিয়ে যাবে?'

অপুর জ্বালাধরা কথা অগ্রাহ্য করে নন্দু বলে—' তোরা বাড়িটা দেখবি বলেছিলি দেখে আয়, আমি রুনাকে ডেকে পাঠাচ্ছি। আমি এখন স্নানটা সেরে নেব। আজ তো আর সাঁতার কাটা গেল না। মম একাই কাটবে আজ।'

রুনা আসতেই ও বলল—'রুনা আমার স্নানের ব্যবস্থা করো। আর এদের বাড়িটা ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিও।'

—'আমি বাথটাবে অলরেডি বাথসল্ট, কলোন মিশিয়ে রেখে এসেছি। সব রেডি। আর ও হ্যাঁ বড়ো মেমসাহেব এনাদের দুপুরে এখানেই লাঞ্চ করতে বলেছেন।'

নন্দু অপুকে তাও জিজ্ঞেস করে নেয়—'কি রে এখানে খাবি তো? সামসুদ্দীন আর জামালের হাতের রান্না খেতে আপত্তি নেই তো? মম্‌কে তুই আন্তরিক নয় বলে ভেবেছিলি না? দেখ, আমাকে বলতে হল না উনিই বললেন তোদের।'

. —'তাই তো দেখছি! খাব তো বটেই। না খেয়ে যাব কেন বল? সেই হেদো থেকে এতখানি রাস্তা তো তোর টানে তোর বাড়িতেই এসেছি, পরের বাড়িতে তো নয়? আর মোচলমানের হাতে কি আগে খাইনি? ডিব্রুগড়েই তো তোদের সঙ্গে সেই খান সাহেবের

বাড়িতে খেয়েছি ইদের সময় কতবার। মনে পড়ছে তোর? তবে হ্যাঁ, তোর শাশুড়ি চাকর বাকর দিয়ে বলে না পাঠিয়ে নিজের মুখে বললে ভালো হত।'

নন্দুর গলা চিরে ধমক্ বেরিয়ে গেল—'অপু!'

ঘরের ভেতরে যেন আলপিন পড়লেও শোনা যাবে। অপুও চুপ হয়ে গেছে। নন্দু রাগে গনগনে মুখে বলল—'এসে থেকে অনেক অপমানজনক কথা বলেছিস, ভাগ্যিস রুনা শুনতে পায় নি! তুই কাকে চাকর-বাকর বললি? রুনা একটা গ্রাজুয়েট মেয়ে, ও মুখার্জি অ্যান্ড মুখার্জি ইন্টারন্যাশনালের একজন ডিরেক্টার সুনন্দা মুখার্জির পার্সোনাল অ্যাসিস্টেন্ট। জানিস তুই ও কতটাকা মাইনে পায়? কল্পনাও করতে পারবি না তুই! ছি: ছি: ছি:। আমি ভাবতেও পারছি না। ----। যা বাড়ি দেখে আয় গিয়ে।' — বলে ও আবার রুনাকে ডাকে ইন্টারকমে। উঠে পড়ে বলে—'আমি স্নান করে আসছি।' বেরিয়ে যায় নন্দু ঘর থেকে। ও বুঝতে পারে অপুর ঈর্ষা এত বৈভব দেখে মারাত্মক চাগাড় দিয়ে উঠেছে। অপুকে দেখার যে তাগিদ এতদিন ধরে পুষে রেখেছিল ও আর সেটা নেই এখন। অসভ্য, অমার্জিত, বাঁদর একটা।

রুনা এসে অপুদের নিয়ে গেল। বাথটবে শুয়ে নন্দুর বিযাক্ত মনটা ভারি হয়ে উঠেছে। ছি: ছি:! কেন এল! আজ ওকে দেখার পর দেখার তাগিদটাই কর্পূরের মতো উবে গেছে নন্দুর মন থেকে। অপু আগে যা ছিল এখনও তাই আছে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ওর বুদ্ধির ধার, ছলচাতুরি আর ধূর্ততা হয়তো আরও বেড়েছে। কিন্তু নন্দু ওকে অ্যাভয়েড করতে চাইলেও অপু যখন একবার এসে পড়েছে। ওর জীবনে ফিরে, --আর ওকে অ্যাভয়েড করা বোধহয় সম্ভব হবে না সহজে। —দরজার নক হওয়ার শব্দে নন্দুর চিন্তাজাল ছিঁড়ে গেল। জিজ্ঞেস করল—'কে? রুনা নাকি?'

—'হ্যাঁ ম্যাম্। ওনাদের সব ঘুরিয়ে দেখিয়েছি। কোথায় বসাব এখন?'—দড়াম করে ভেজানো দরজা খুলে অপু একেবারে বেডরুমে চলে এসেছে, সঙ্গে ওর ভাইঝি। বলল--'কি সব লোক পুষে রেখেছিস তুই? কার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করতে হয় জানে না। বলে কি না কোথায় বসাবে? যেন তোর শোবার ঘরটা মন্দির আর আমরা হরিজন, অচ্ছ্যুৎ! তাড়া, তাড়া, তাড়িয়ে দে এগুলোকে। এরা তোর বদনাম করে দেবে। আজ না হয় আমি এসেছি, আমি হয়তো কিছু মনে করব না। কিন্তু দিদি, মেজদি, ফুলদি, মেজদা, কাজলদারাও আসবে বলেছে। ওরা তো খারাপও ভাবতে পারে বল?'

এবার নন্দু আর পারল না। রাগত কঠিন গলাতেই বলল—'এ বাড়িতে কারও শোবার ঘরে কেউ ঢোকে না বিনা অনুমতিতে। তুই বোধহয় ভুলে গেছিস আমাদের ডিব্রুগড়ের বাড়িতেও এ নিয়মই ছিল। একমাত্র ঠামার শোবার ঘরেই তোর মা—লক্ষ্মীদিদা আর তুই ঢুকতে পারতিস। জেঠুদের কারও বেডরুমে বা বাপি-মার বেডরুমে কিন্তু লক্ষ্মীদিদাও ঢুকতেন না কখনও। তোর দাদা দিদিরা আসবে বলে নিয়ম বদলাবার জন্য এবাড়িতে

কেউ দাঁড়িয়ে থাকবে না।' অপু এসব কথা যেন শুনতেও পায়নি এমনি ভাব করে বিছানার পাশে বেডসাইড টেবিলের ওপর রাখা তথাগত—নন্দুর আর ডোনা- জোজোর ফটোগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল। তারপর বলল—' তোর বরকে দেখতে ভালোই হবে ঠামা যেমন বলেছিল, তেমন কিছু নয়। মেয়ে তো বাপের মতো হয়েছে। ছেলে তোর মতো। ভালোই।' —নন্দুর রাগে ব্রহ্মতালু জ্বলে যাচ্ছিল। কিন্তু নিজের শিক্ষা আর রাগ প্রকাশ করতে দিল না বরং হেসেই বলল—'হ্যাঁ, ডোনা ওর বাবার মতো হয়েছে আর জোজো আমার মতো। দুজনই খুব সুন্দর।' অপু পা থেকে ধুলোমাখা চটিটা খুলে সটান ওর বিছানায় শুয়ে পড়ল। বুলা একপাশে দাঁড়িয়ে রইল। ওই ঘরে, ওই খাটে বসার সাহস ও ঠিক জুগিয়ে উঠতে পারছিল না বোধহয়। সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে অপু কমেন্টারী করার মতো বলে চলল—'ভালোই আছিস। সবই ভাগ্য? একবাড়িতে মানুষ হলুম, একসাথে বড়ো হলুম অথচ দ্যাখ তোর আর আমার ভাগ্য কত আলাদা। ডিব্রুগড় থেকে কোলকাতা নিয়ে চলে এল মা। বাবা যখন মারা গেল তখন তো তুই দার্জিলিং-এ। মেজদা, কাজলদারা আর দোকান রাখতে পারল না। । বড়দি আমাকেই সবচেয়ে আগে বিয়ে দিয়ে দিল। জানিস, আমার সঙ্গে আমার বরের কুড়ি বছর বয়সের তফাত। আমার ষোলো ওর ছত্রিশ বছর, তখন বিয়ে হল আমাদের। ফুলশয্যের রাত্রে সারারাত বাথরুমে দরজা বন্ধ করে বসেছিলাম। শুভদৃষ্টির সময় লোকটার চোখে ঘষাকাচের মতো পুরু চশমা দেখেছিলাম—ছানিপড়া লোকের যেমন থাকে। এত বেশি পাওয়ার ছিল চোখে। শুকনো শুঁটকী মাছের মতো রোগা চেহারা, গালদুটো ভেঙে কোনো খোঁদলে ঢুকে গেছে। ছত্রিশ বছর বয়সেও মানুষ কত সুন্দর থাকে। আর ঐ লোকটা যেন একটা হদ্দ বুড়ো ঘাটের মড়া। আজ এতগুলো বছর হয়েছে বিয়ে হয়েছে, —আজ অব্দি ওই লোকটাকে ছুঁতে দিইনি আমি আমাকে। একবাড়িতে থাকি, শাঁখা সিঁদুর পরি ওই পর্যন্ত। আর কিছু নেই। বড়দি আমার সর্বনাশ করেছে জানিস! এখন সেই পাপের শাস্তি ভোগ করছে।' —বুলার সামনেই নিজের স্বামীকে নিয়ে ফুলশয্যার আলোচনা নন্দুর খুব খারাপ লাগল।

—'কেন? কি হয়েছে যুথীকা পিসির?— নীরস হয়ে জিজ্ঞেস করল সুনন্দা।

—'না, তেমন কিছু এখনও হয় নি। আমার যা সর্বনাশ করেছে সে তুলনায় ওর যেটুকু হয়েছে তা এমন কিছু নয়। আরও বেশিই কিছু হওয়া উচিত ছিল। প্রথমে তো বড়দির স্বামী, মুখুজ্জেমশাই মরে গেল। তার নাহয় বয়স হয়েছিল; জন্ম টি. বি. রুগি ছিল আমার বরের মতোই। তোর মনে আছে নন্দু, একবার মুখুজ্জেমশাই ডিব্রুগড়ে এসেছিল? খুব সিগারেট খেত? সেই যে রে, মুখুজ্জেমশাইয়ের আধখাওয়া সিগারেট নিয়ে এসেছিলাম আমি খেয়ে দেখব বলে কেমন লাগে সিগারেট খেতে!'— বলে, অপু হাসল

একটু। — 'কি ই না করেছি আমি। সব কিছু জানা চাই, দেখা চাই। তারপর তোকে ডেকে নিয়ে পেছনের ফলবাগানে গেলাম দুজনে। মনে পড়ছে তোর?'

—'খুব মনে আছে। তোর কীর্তিকলাপ কি ভোলা যায়? তুই দেশলাই জ্বালিয়ে আধপোড়া সিগারেটটা মুখে লাগিয়ে ধরিয়েছিস। ঠিক মুখুজ্জেমশাই যেমন করে ধরত দু-আঙ্গুলের ফাঁকে তেমনি করে ধরে টানছিলি আর মুখ দিয়ে ধোঁওয়া বের করছিলি। আর ঠিক ওমনি সময় অ্যালিস এসে হাজির আমাকে খুঁজতে খুঁজতে। শুকনো গাছের ডাল তুলে নিয়ে তোর পায়ে কি জোরে জোরে মেরেছিল অ্যালি আম্মা। আমি তো ভয়ে থর থর করে কাঁপছিলাম, বুঝি আমাকেও মারবে।'

—'এই দ্যাখ্। বলে সায়াসুদ্ধু শাড়িটা হাঁটু অব্দি তুলল অপু। ফর্সা পায়ে হাঁটুর তলা থেকে প্রায় অ্যাংকল অব্দি দাগ রয়েছে একটা।— 'দাগটা এত বছরেও মিলোয় নি।' — বলল ও।

—'হ্যাঁ, তক্ষুনি তো কেটে গিয়ে রক্তে ভেসে যাচ্ছিল। তবু তুই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খেতে থাকলি।'

—'তোর ওই গভর্নেসটাকে কি বলে ডাকতাম মনে আছে তোর? খালি হাম্বা। ওর কাজই ছিল আমার পেছনে লাগা, ঠামার কাছে আমার নামে চুকলি কাটা, আর আমাকে দেখলেই হাম্বা, হাম্বা করে তেড়ে আসা। জানিস, কতবার ভেবেছি তখন, একদিন ইঁট মেরে ওর মাথাটা ফাটিয়ে দেব। কিন্তু তোদের বাড়ির ভয়ে পারিনি।'— একটু থেমে আবার শুরু করে ও—'হ্যাঁ, যা বলছিলাম। তো, ওই 'খালি হাম্বা সিগেরেট খাওয়ার কথাটা একেবারে বড়োদের কানে দিয়ে এসেছিল। বড়দি, খালি হাম্বা যে চেলাকাঠ মেরে আমার পা ফাটিয়ে দিল তার জন্য ওকে কিছু বলল না। উলটে আমাকেই আবার বেধড়ক পিটিয়েছিল। টি. বি. রুগি মুখুজ্জেমশাইর এঁটো সিগারেট খেয়েছি বলে। মুখুজ্জেমশাই যখন ডিব্রুগড়ে আসত তখন দেখতাম ওনার জন্য একসেট থালা বাসন তুলে রাখা থাকত, মা সেগুলো বের করে খেতে দিত। আবার চলে যাবার পর ওগুলো আলাদা করে তুলে রাখত, আবার এলে ওগুলোই বের করবে বলে। মুখুজ্জেমশাইকে বড়দির সঙ্গে একঘরে শুতেও দেখিনি। বড়দি আমাদের শোবার ঘরে আমাদের সঙ্গে ছেলেমেয়ে নিয়ে শুতো। তখন তো আর অত বুঝতাম না টি. বি. রোগ কি? —সে যাই হোক্, প্রথমে তো মুখুজ্জেমশাই মরল মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে। তারপর গেল বড়দির ছেলেটা। একটাই তো ছেলে ছিল। যমজ ছেলে আর মেয়ে। তেইশ বছরের ছেলে দিঘায় বেড়াতে গেল বন্ধুদের সঙ্গে। সমুদ্রে চান করতে গিয়ে বন্ধু ডুবে যাচ্ছিল। ওকে বাঁচাতে গিয়ে দুজনেই মরল। সে ছেলের লাশ অব্দি পাওয়া গেল না। বড়দি আজও বিশ্বাস করে ওর ছেলে বেঁচে আছে, একদিন ফিরে আসবে।' থামল অপু। নন্দুর গলাটা ধরে এসেছিল। যুথীপিসি আর ওর বাপি একবয়সি। বড়ো ভালো ছিলেন উনি। একমাত্র কিছু লেখাপড়া জানা মানুষ

পুরো ব্যানার্জি বাড়িতে। যুথীপিসি এলেই দেখা করতে আসতেন ঠামার সঙ্গে। বাপিকে বলতেন—'আদিত্য, মোটা হোসনি তো একটুও? কি করে এমন ছিমছাম রাখিস রে শরীরটাকে? আমায় দ্যাখ্, হাতি হয়ে যাচ্ছি দু বাচ্চার মা হতে না হতেই।' — নন্দুর মা শ্রীলার সঙ্গেও হেসে হেসে কথা বলতেন। আমসত্ত্ব আর আচার নিয়ে আসতেন ওদের জন্য। যুথী পিসির ছেলের মৃত্যুর খবরটা অপু যে ভাবে বর্ণনা করে গেল নন্দুর সেটা ভালো লাগল না। ওর খুব কষ্ট হচ্ছিল যুথীপিসির জন্য। আর অপুকে থাপ্পড় মারতে ইচ্ছে হচ্ছিল।

অপু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলতে শুরু করল—' মেয়েটাকে বড়দি বি. এ. পাস করিয়েছিল। দেখতেও ত ভালো মেয়েটা। বিয়েও বেশ ভালো ছেলে দেখেই দিল। দুজনের মাত্র চারবছরের বয়সের তফাত। স্বাস্থ্যবান, লম্বা, খুব সুন্দর না হলেও পুরুষালী শ্রী আছে। রেলের চাকরি। শুধু মা আর ওই ছেলে। ছোটো সংসার। নিজের মেয়ে তো? এ তো আর উড়ে এসে ঘাড়ে পড়া অপু নয়। যে ঘুম থেকে উঠে হাতের সামনে যাকে পেলাম তার হাতেই তুলে দিয়ে আপদ বিদেয় করলাম! বড়দি নিজের মেয়েকে দেখেশুনে, একেবারে মনের মতো পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দিল।'

—'কোথায় বিয়ে হয়েছে ওর?'—জিজ্ঞেস করে নন্দু।

—'জামালপুরে।' — বলে অপু আবার চুপ করে থাকে। একটু পরে আবার মনোলগের মতো বলতে শুরু করে—'প্রথম দিকে কয়েকবছর বেশ সুখেই ছিল। এরপর দুটো মেয়ে হল। ওর শাশুড়ি মারা গেল। নিজেই গিন্নি। জামাইটা খুবই ভালো ছেলে, এ ব্যাপারে কারও কোনো সংশয় ছিল না। কিন্তু কপালে সুখ সইল না বেশিদিন। জামাইয়ের পেটে ক্যান্সার। এদিকে বড়দি পড়ে গিয়ে কোমরের হাড় ভেঙে বিরাট অপারেশন হল। ভেতরে স্টিলের রড্ ফড্ লাগালে কি হবে, হাঁটতে পারে না। কোনো মতে লাঠি নিয়ে বাথরুমটুকু যায়। লোক রেখে সেবাযত্ন করাবে সে সামর্থ্যও নেই। শেষ পর্যন্ত মেয়ের কাছেই চলে গেল জামালপুরে। তবু তো বড়দি থাকলে মেয়েটা বরকে নিয়ে ডাক্তারবদ্যির কাছে দৌড়োদৌড়ি করতে পারবে। মেয়েদুটোকে আগলাবার জন্যও তো কেউ ছিল না শাশুড়ি মরে গিয়ে। তুই জিজ্ঞেস করছিলি না, এতকাল পর কেন এলাম তোর বাড়ি? এখানে ছিলাম না রে। ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো এই অপুকেই বিপদে পড়লে সবাই ডাকে। ডিব্রুগড় থেকে ফিরে এসেই শুনলাম প্রথম দুঃসংবাদ। বড়দির কোমরের হাড় ভাঙার খবর। বড়দিকে নিয়ে হাসপাতাল, ডাক্তারের কাছে দৌড়োদৌড়ি, দুবার করে অপারেশন,—এসব পালা চুকিয়ে পঙ্গু বড়দিকে নিজের কাছে এনে রাখলাম। হাজার হলেও মা যখন সর্বস্বান্ত হয়ে আমাদের ছ'ভাইবোনকে নিয়ে ডিব্রুগড় থেকে মনসাতলায় ফেরত এল, তখন তো বড়দিই আশ্রয় দিয়েছিল! সাতটা পেট। ডাল ভাতই হোক, বড়দিই বাঁচিয়ে রেখেছিল। নন্দু, অপু অকৃতজ্ঞ নয় রে। বড়দি যেটুকু করেছে অপু

সে ঋণ শোধ করে দিয়েছে। বড়দিকে নিজের কাছে রেখে কোনো রকমে তো পায়ের ওপর খাঁড়া করেছি, এমনি সময় জামালপুর থেকে দোলার চিঠি এল ওর বরের ক্যান্সারের খবর নিয়ে। বড়দিকে শুদ্ধু নিয়ে ছুটলাম জামালপুর। সেখান থেকে জামাইকে নিয়ে আমি আর দোলা গেলাম ভেলোরে। ওর আসলে পেটে একটা টিউমার হয়েছিল। জামালপুরে বায়োপ্সী করে ধরা পড়েছিল টিউমারটাতে নাকি ক্যান্সার আছে। ওরা অপারেশন করতে চায়নি ওখানে। দোলা জোর করতে লাগল ভেলোরে নিয়ে যাবার জন্য। আমি বলেছিলাম কোলকাতা নিয়ে আসি, এখানে নিজেদের পরিচিত জায়গা, তারপর দাদারা রয়েছে। তবু তো দৌড়োদৌড়িটা ওরা করতে পারবে। পয়সা দিয়ে সাহায্য নাই বা করল। আর করবেই বা কোথা থেকে বল? কাজলদা একটা জুটমিলে কাজ করে। মেজদা তো কিছুই করে না। এখনও নবাবি করে বেড়াতে চায়। কাজলদার ঘাড়ে বসে খায়। বউ, চার ছেলেমেয়ে আর ও নিজে। দ্যাখ্ এই যে বুলা পড়তে পারল না— ক্যানো? কাজলদার তো এই বুলা আর ওর ভাই, দুটোই ছেলেমেয়ে। মেজদা ওদিকে চার চার খানা বাচ্চা বানিয়ে বসে আছে। কে যে ওদের বিয়ে দেবে, কে খাওয়াবে, ওসব ভাবনা মেজদা ভাবে না। বুলাকে মাস্টার রেখে দিলে ও হয়তো মাধ্যমিকটা অন্তত পাস করতে পারত। কিন্তু ওর বাবা পারেনি। অতবড়ো গুষ্টির মুখে অন্ন জোগাতে গিয়ে বুলার মাস্টার রাখার দিকে সেসময় তাকাতে পারে নি বেচারা। কাজলদাটা তো স্বার্থপর ছিল না কখনও!'

নন্দু জিজ্ঞেস করে—'কেন, সজলকাকু দেখে না? কিছুই করে না? ওর ছেলে কি করে?'

—'দেখে । কিন্তু মেজদার কোনো বাঁধা আয় নেই। যখন যা পায় করে। মেজদার একটাই ছেলে। একে ওকে ধরে আমিই একটা দোকানে ওকে ঢুকিয়েছি। কর্মচারির কাজ করে। মাসে পনেরোশো টাকা পায়। নিজের হাত-খরচটুকু রেখে বাকি টাকাটা পুরোই ছোটোকাকার হাতেই তুলে দেয় রে। বড়ো ভালো হয়েছে ছেলেটা। মেজদাও যখন যেমন পায় কাজলদাকে দেয়। এভাবেই চলছে। তবু আমার এটাই ভালো লাগে যে এত অনটনের মধ্যেও ওরা সব ভাই এক সঙ্গে থাকে। মেজদা তো চিরকালই শুধু খেলোয়াড় হবার স্বপ্ন দেখে গেল। না হল খেলোয়াড় না কিছু। মেয়ে তিনটে ওই সেভেন—এইট অব্দি পড়েছে। ছেলেটা মাধ্যমিকে ফেল করল। তখনই আমি বললাম আর পড়ে কাজ নেই, এবার কাজে লেগে পড়ো। কাকার ঘাড় থেকে বোঝা হালকা করো একটু। মেজদা আয়েসি ছিল, এখনও তাই আছে। মরছে ছোটোভাইটা— ওই কাজলদা।'

দীর্ঘ পঁচিশ বছরের কাহিনি। সহজে শেষ হবার নয়। নন্দু শোনে সব আর ভাবে নিজেদের দারিদ্র্যকে তো ওরা নিজেরাই ডেকে এনেছে। নবীনদাদু তো ওদের লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করতেই চেয়েছিলেন। নিজে উদয়-অস্ত পরিশ্রম করতেন নবীনদাদু। কিন্তু ছেলেমেয়েরা নিজেরাই শিক্ষার রাস্তায় হাঁটে নি। লক্ষ্মীদিদা ছেলেমেয়েদের সমস্ত কুকীর্তির

কথা লুকিয়ে রাখতেন। নবীনদাদুর কাছে কিছু বলতেন না। আজ নিজেদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করছে ওরা। ঠামা বলেছিল নবীনদাদুর ব্যাবসা বেশ ভালো চলত। কিন্তু উনি মারা যাবার পর দোকানের মেশিন পত্র পর্যন্ত বিক্রি করে খেয়েছে এরা। নন্দুর বিতৃষ্ণা জাগে, একটুও করুণা হয় না অপুর মুখে ওদের পারিবারিক দুর্দশার কথা শুনে। নবীনদাদু বেঁচে থাকতে ডিব্রুগড়েও আহামরি কিছু ভালো অবস্থায় ওরা কোনোদিনই ছিল না। এখন হয়তো আরও খারাপ হয়েছে এই পর্যন্তই।

—অপু এবার পাশে বসা, নন্দুর হাতটা ধরে, বলে—'নন্দু, তোদের তো এত ফ্যাক্টরি। এত ব্যাবসা পত্র। কোটিকোটি টাকা খরচ করার পথ পাস না তোরা। কাজলদার ছেলেটাকে আর মেজদাকে ইচ্ছে করলেই চাকরি দিতে পারিস। দে না ভাই মেজদা, মেজদার ছেলে আর কাজলদার ছেলেটাকে তোদের কোনো কারখানায় চাকরি জুটিয়ে। বেঁচে যাবে পরিবারটা।' নন্দু প্রমাদ গোনে। সেরেছে! ঠিক জায়গায় এসে পড়েছে অপু। রুনা ঠিক সে সময় এসে বাঁচিয়ে দেয় ওকে — 'ম্যাম, ছোটো ডাইনিং হলে, মর্নিংগ্লোরিতে লাঞ্চ সার্ভ করা হয়েছে। আসুন আপনারা। আর আমি হাউসকিপার কে বলে দিয়েছি আপনার বেডশিট্ পিলোকেস্ সব চেঞ্জ করে দিতে।'—একথাটুকু রুনা অতিরিক্ত বলে ফেলে। অপুকে নন্দুর বেডে শুয়ে থাকতে দেখে ওর যে ভয়ানক রাগ হয়েছে, এটা তারই প্রকাশ বুঝতে পারে নন্দু। তাই তাড়াতাড়ি বলে—'না, এখন দরকার নেই । তুমি মিসেস গোমস্ কে বলো রাত্রে চেঞ্জ করে দিতে।'

নন্দু উঠে পড়ে বলে—'চল্ অপু, এসো বুলা খাবে চলো।'

অপু উঠে পড়ে জিজ্ঞেস করে—'হ্যাঁরে হোটেলে নিয়ে যাবি নাকি খাওয়াতে?'

—'হোটেলে? কই, না তো!' —অবাক হয়ে প্রশ্ন করে নন্দু।

—'ঐ যে বলল মর্নিং কি যেন তে লাঞ্চ দিয়েছে?'

—'ত্তো' —হেসে ফেলে নন্দু। বলে —'তোরা যে বাড়ি ঘুরে দেখতে গিয়েছিলি কি দেখলি? তখন তোকে বললাম না একবার মর্নিংগ্লোরির কথা? বাড়ির লোকেরা খাই?'—'ও হ্যাঁ! আমরা অবশ্য সুইমিং পুল, তারপর ব্যায়াম করার ঘর, একটা বিরাট ঘরে মিটিং করার জন্য অনেক রকম ব্যবস্থা করা রয়েছে টি. ভি. তে যেমন দেখায়, আর বাগান টাগান সব কিছু তো দেখলাম। —ও হ্যাঁ আর ঢোকার সময় তো ড্রইংরুমটাও দেখেছিলাম।'

—'তার মানে বাড়ির ভেতরটা রুনা তোদের ভালো করে দেখায়নি। এ বাড়িতে একটা মস্ত বড়ো ডাইনিং রুম আছে যেখানে একসঙ্গে কুড়ি-বাইশ জন বসে খেতে পারে। ওটার নাম 'ভিক্টোরিয়া হল্।' আব মর্নিং গ্লোরি হল ছ'জনের বসে খাবার ছোটো ডাইনিং রুম। ব্রেকফাস্ট রুমও ওরকম আলাদা আলাদা আছে। বিলিয়ার্ড রুম আছে; ড্যাডি,

মম্ আর তথাগত খেলে। টেবিল টেনিস রুম আছে ডোনা-জোজোরা এলে খেলে। পেছনে টেনিস কোর্ট আছে, মন্দির আছে।' —'ওটা টেনিস কোর্ট? আমি ভেবেছি ব্যাডমিন্টন খেলার জন্য।' চলতে চলতে আবার বলল—'তবে এবাড়িটা তোদের ডিব্রুগড়ের বাড়ির থেকে একেবারে আলাদা, তাই না? আমার তো মনে আছে তোদের রায়চৌধুরি ভিলাতে সাহেব-মেমরাও আসত পার্টিতে। লনে কত আলো জ্বলতো, কতবড়ো পার্টি হত। তবু তোদের বাড়িতে একটা গেরস্ত গেরস্ত ভাব ছিল। এবাড়িতে কিন্তু সবই কেমন প্রাণহীন। এই যে আমরা এলাম, তোর শাশুড়ি তো কথাই বলল না। আমাদের সামনেই জামাকাপড় খুলে জাঙ্গিয়া আর বডিস্ পরে মালিশ করাতে শুয়ে পড়ল—আমার বাপু ভালো লাগে নি। তোর সঙ্গে কেমন ব্যবহার করে রে? খুব সুখে আছিস মনে হচ্ছে না আমার।'— আবার সেই কথার পুনরাবৃত্তি করে অপু। বোঝে না ঠামা লক্ষ্মীদিদাকে আমল দিতেন বলেই যে ওদের ডিব্রুগড়ের বাড়ির বাকি লোকেরাও ওদের পছন্দ করত তা নয়। বরং এমন একটা পরিবার রায়চৌধুরি ভিলার চৌহদ্দীতে বাস করত বলে সকলের মনেই যথেষ্ট ক্ষোভ ছিল। কিন্তু দাদুর যে নবীন ব্যানার্জির সততার প্রতি একটা দুর্বলতা ছিল সে জায়গাটায় দাদুকে কেউ আঘাত করতে চাইত না। ওদের বাড়ির সঙ্গে এবাড়ির লোকেদের তফাত কিছু আছে। যেটা আছে সেটা সময়ের, আধুনিক মানসিকতার। নন্দুও এখন অপু নামক মেয়েটার চামচা একটা শিশু নেই। এ বাড়ির পরিবেশে অপু আর বুলা একেবারে বেমানান। এবকম কেউ যে কখনও এ বাড়িতে নন্দুর পরিচয়ের সূত্র ধরে আসতে পারে একথা শুধু ওর শাশুড়ি কেন কাজের লোকেরাও ভাবতে পারে না। এরকম লোক যে এবাড়িতে অতিথি হতে আসেনি আগে কখনও। কিন্তু এজন্য অপুদের আতিথেয়তার কোনও ঘাটতি রাখা হচ্ছে না। কারণ ওরা এবাড়ির বউ-এর পরিচিত। ইন্দ্রানী মুখার্জির মতো মহিলারা শ্রেণি বিচার করেন না। মানুষকে মানুষ বলে সম্মান দিতে জানেন বলেই সমাজের কাছ থেকে অনেক সম্মান কুড়িয়ে নিতে পেরেছেন। অপুদের এবাড়িতে প্রথমবার আসার সম্মানে উনি নিজে ওদের সঙ্গে বসে দুপুরের লাঞ্চ সারবেন তাতে ওঁর অন্য কাজের শিডিউল পালটাতে হলে তাও পালটাবেন—এসবই নন্দু জানে। কিন্তু অপু এসব জানে না, বোঝেও না। ডিব্রুগড়ে থাকতে ও যেমন ভুলে যেত যে ও রায়চৌধুরি বাড়ির মেয়ে নয় নবীন ব্যানার্জির মেয়ে। আজও তেমনি ভুলে যাচ্ছে যে ও কোনও এলেবেলে বাড়িতে নয়, শিল্পপতি সিদ্ধার্থ মুখার্জির বাড়িতে এসেছে। অপু এই বয়সেও জীবনের অভিজ্ঞতার কাছ থেকে এটুকুও শিখতে পারেনি যে সব জায়গায় ও ওর পছন্দমতো পরিবেশ পাবে না। ক্ষেত্রবিশেষে জীবনের ছবিগুলোতে নিজের পছন্দমতো রং বুলিয়ে দেন ঈশ্বর। শাশুড়ির সম্বন্ধে বক্রোক্তি করায় নন্দুর মাথাটায় পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ ঘটতে যাচ্ছিল আর একটু হলে। কোনওমতে সামলে নিয়েছে নিজেকে। হাসিমুখেই বলল—'আমাকে দেখে বুঝি তোর খুব দুঃখী বলে মনে হচ্ছে? খুব ভুল মনে হচ্ছে তোর। দ্যাখ অপু, আমার শাশুড়ির

মতো এতো ভদ্র, মার্জিত মহিলা আঙুলে গুণলে পাওয়া যায়। উনি গায়ের কিমনোটা খুললেন বলে তুই এমন বাজে কথা বলে দিলি কিছু না ভেবেই। এই মহিলার বাবা মা চিরকাল লন্ডনে কাটিয়েছেন। ওঁর জন্মও ওদেশে, পড়াশুনো, বড়ো হওয়া সবই ওদেশে। বিয়ে হল এদেশে। নিজের আপ্রাণ চেষ্টায় উনি এদেশের চালচলনের সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছিলেন। আমার ঠামা বা মা-জেঠিমাদের মতো বা তোর মায়ের মতো উনি হবেন এটা তো আশা করাই অন্যায়। শুধু এই কোলকাতা শহরে বা এদেশে নয় বিদেশেও বহুগুণীজনের সান্নিধ্যে থাকেন উনি। এতটুকুও অহংকার নেই মানুষটার। এতকাল ধরে দেখছি আজ অবধি ওঁর কোনও খুঁত ধরতে পারিনি এতই পারফেক্ট। তোর দুশ্চিন্তার কোনও অবকাশ রাখিস না আমাকে অসুখী ভেবে। আমার মতো সুখী কজন হয়? জোর করে আমাকে অসুখী করার চেষ্টা করছিস কেন? তুই কি সেটাই চেয়েছিলি?' অপু বিস্মিত হয়ে বলে—'ও বাবা, তোর যে দেখছি উলটো পুরান। লোকে শাশুড়ির নিন্দে করতে পারলে খুশি হয় তুই রেগে গেলি। রাগ করিস না ভাই, এরকম মহিলা তো আগে দেখিনি তাই বুঝতে পারিনি। বেশি কথা বলল না দেখে মনে হয়েছিল, ডাঁটিয়াল। সুখে আছিস সেটাই ভালো। আমার মতো ভাগ্য তো আর নয় তোর? বড়োলোকের মেয়ে ছিলিস আরও বড়োলোকের বউ হয়েছিস।'

—'তোর এ ধারণাটাও ভুল। কে বলল তোকে যে বড়োলোক হলেই মেয়েরা সুখে থাকে আর গরিব হলেই খুব দুঃখে থাকে? আমি তো অনেক বড়োলোকের বউকেই নানা সমস্যায় জর্জরিত হয়ে খুব অসুখী হতে দেখেছি। আবার সামান্য সাধ্যের মধ্যেও অনেককে খুবই সুখে থাকতেও দেখেছি।'—নন্দু প্রতিবাদ করে বলে।

অপু ঝাঁঝিয়ে উঠে বলে—'ওসব কেতাবি বুলি বুঝলি। অর্থই সব। অর্থ না থাকলেই অনর্থ। আমরা কেউ কেন তবে কখনও তোর মতো সুখে থাকতে পারলাম না? অর্থ নেই বলেই সাধপূর্ণ হয় না। আশা মেটে না। তাই মনে সারাক্ষণ ক্ষোভ জমে থাকে।--আসলে আমাদের ভাগ্যই খারাপ রে। তোর ভাগ্যে ভগবান সারাজীবনের জন্য রাজরানি হওয়া লিখে দিয়েছিল, তুই আমাদের ব্যাপারটা বুঝবি না।' নন্দু হেসে ফেলে। ওর প্রতি অপুর হিংসে ছোটোবেলার মতোই এখনও যথেষ্ট উজ্জীবিত আছে বোঝা যাচ্ছে। কথা চাপা দেবার জন্য বলে—'চল চল এখন খাবি চল। মম হয়তো বসে অপেক্ষা করছে। ভাগ্যে বিশ্বাস করিস আর এটা জানিস না যে কেউ কারও সঙ্গে ভাগ্য বদল করতে পারে না?--চল এখন।'

সত্যিই ইন্দ্রাণী অপেক্ষা করছিলেন। নন্দু লজ্জিত হয়ে বলে—'সরি মম। তোমায় বসিয়ে রেখেছি একা একা।'

--'ও ঠিক আছে। আমি অ্যাপিটাইজার খাচ্ছিলাম। তোমরা বসো।'

ওরা সবাই বসে পড়ল। এবাড়ির খাবার টেবিলে সাজানো কাঁটা চামচ-ছুরি দেখে

অপু আর বুলার মুখ শুকিয়ে গেছে লক্ষ্য করল নন্দু। খাবার ঘরটা যেন হঠাৎ কেমন চুপচাপ হয়ে গেছে। ইন্দ্রাণীই কথা বলতে শুরু করে হঠাৎ হওয়া নৈঃশব্দ ভাঙেন—'তোমরাও ডিব্রুগড়ে থাকতে?'

অপু বেশ শান্ত গলায় উত্তর দেয়—'হ্যাঁ, আমার প্রায় ১৪/১৫ বছর বয়স অব্দি ওখানেই ছিলাম। জন্মও ডিব্রুগড়েই। আমিও ওই রায়চৌধুরি বাড়িতেই জন্মেছি নন্দুর জন্মের ছমাস আগে।' ইন্দ্রাণী জিজ্ঞাসু চোখে সুনন্দার দিকে তাকান। নন্দু তখন শাশুড়িকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলে। ইন্দ্রাণী এবার অপুকে জিজ্ঞেস করেন — 'এখানে কোথায় থাকো?'

—'আমি হেদুয়ায় থাকি আর এ হল আমার ভাইঝি বুলা। ওরা বজবজের কাছে মনসাতলা বলে একটা জায়গা আছে সেখানে থাকে। আসলে ওখানেই আমার বাপের বাড়ি।

—'ও। আরে তোমরা হাতগুটিয়ে বসে আছ কেন? খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই, শুরু করো। সেই কখন এসেছ তোমরা। লজ্জা করো না। আমাদের আবার হালকা রান্না হয়, তোমাদের কেমন লাগবে কি জানি।'

ইন্দ্রাণীর কথাবার্তার মধ্যে আন্তরিকতা, ঠাটবাটের কোনও চিহ্ন নেই। সেসব আছে ওঁর চেহারায়, ওঁর পোশাকে। অপুর মতো মেয়েও কেমন নিস্তেজ হয়ে বসে আছে। লক্ষ্য করে নন্দু। ইন্দ্রাণী সামসুদ্দিনকে বলেন—'সামসুদ্দিন তুমি ওদের প্লেটে বেড়ে দাও ওরা লজ্জা পাচ্ছে নিতে।'

বুলা বেচারি বোবা হয়ে কুঁকড়ে বসে আছে। বোঝা যাচ্ছে ওর জীবনে এমন পরিবেশে এমন একটা লাঞ্চ খাওয়ার এটাই প্রথম অভিজ্ঞতা। অপুরও তাই কিন্তু ধুরন্ধর অপুর মধ্যে এমন প্রাথমিকতার কোনও প্রকাশ দেখা যাচ্ছে না বরং বেশ সাহসী সাহসী মুখভাবে অভ্যস্থতার অভিব্যক্তি প্রকাশের চেষ্টা রয়েছে।

টেবিলের ঠিক মাঝখানে ওভাল ডিশে ইটালীয়ান স্যালাড ছিল বর্ণসম্ভারে জিভে জল আনার মতো। সিল্কের পাঞ্জাবি আর পাজামা পড়ে আছেন ইন্দ্রাণী। নন্দুও প্রায় ওরকমই একটা পোশাক পরেছে কবজি অব্দি হাতাওয়ালা। নন্দু নিজের শাশুড়িকে দেখে গর্ব বোধ করছিল। কি সুন্দর যে লাগছে মম্‌কে। সত্যিকারের রূপসী ইন্দ্রাণী। বয়স ধরা কারও সাধ্য নেই। রেগুলার জিম্, রেগুলার সুইমিং, টেনিস, ম্যাসাজ করে করে বয়সটাকে প্রায় ওদেরই কাছাকাছি করে ধরে রেখে দিয়েছেন। কোনো মেক্‌আপ নেই শুধু ফেস লোশনের তেলতেলে ভাবটুকু ছাড়া। ঘন, দীর্ঘ কালো চুল একটা হাতখোপায় বাঁধা ঘাড়ের কাছে। মমের তরতাজা ভাবটা সবসময় নন্দুকেও তরতাজা থাকতে যেন উজ্জীবিত করে। সপ্রশংস চোখে তন্ময়, আজ অপুর হিংসুটে চোখের সামনে ও মম্‌কে দেখে দু চোখ ভরে। সিল্কের পাঞ্জাবির হাতা অল্প তুলে উনি প্লেটে স্যালাড্ তুলে নেন। নন্দুও স্যালাডই খায়। শাশুড়ি

বউয়ের মোটামুটি এধরণেরই লাঞ্চ। এবাড়িতে স্পাইসি রান্না খুব কমই হয়। সেদ্ধ সেদ্ধ রান্না, নানা রকমের, নানা দেশীয় স্যালাড্ রোজ ওদের খাবার মেনুর প্রধান আইটেম। মশলা ছাড়া গ্রীলড্ ফিশ হয়েছে আজ। নন্দু চোখে প্রশ্ন নিয়ে সামসুদ্দিনের দিকে তাকালো। সামসুদ্দিন অর্থবহ দৃষ্টি দেখে বুঝে গেল ব্যাপারটা। ও কয়েকটা পটের ঢাকনা খুলে পাশে রাখল। তারপর, নিজেই বুলার প্লেটে বাসমতি চালের জিরা রাইস দিল। অন্য পট থেকে ঘন নারকোল দেওয়া ছোলার ডাল একটা ছোটো বোলে তুলে দিল। একটা ফ্ল্যাট্ প্লেটে গোটা গ্রীলড্ পমফ্রেট্ তুলে দিল। সামসুদ্দীন বলল—'হাঙ্গেরীয়ান চিকেন আছে। আর ডেসার্টে মিষ্টি দই, ম্যাম।'

অপু আর বুলাও ওদের দেখে নিজেদের পাশে রাখা স্যালাড্ প্লেটে, স্যালাড তুলে নিল। বুলার চামচ টামচ দিয়ে খেতে প্রচণ্ড অসুবিধা হচ্ছিল দেখে ইন্দ্রাণীই বললেন—'আরে, তুমি হাতে করে খাও। এতে কোনো লজ্জা নেই। দেখ, আসল কথা হল খাওয়ার সুখটা অনুভব করা। কেউ হাতে করে খেলে অনেক ভালো করে খেতে পারে আবার কেউ কাঁটা চামচে। এতে কিন্তু আড়ষ্ট হবার কোনো কারণ নেই। লজ্জা পাবারও কারণ নেই। তুমি হাতেই খাও বুলা।'—বুলা যেন হাতে স্বর্গ পেল। এবার হাতে করে দিব্যি ভালো করে খেতে লাগল। অপুও কাঁটা চামচ ছেড়ে হাত লাগাল। ইন্দ্রাণী আর নন্দু স্বল্পাহারী। ওদের স্যালাডই প্রিয় খাদ্য আর শেষে নুন-গোলমরিচ গুঁড়ো দেওয়া টক দই। স্যালাড খাওয়া শেষ হয়ে গেল। অপু জিজ্ঞেস করল—'তোরা ভাত ডাল এসব খাবি না?'

—'একটু খাব। এগুলো বাবুর্চি তোদের জন্য রান্না করেছে। হাজার হলেও তোরা গেষ্ট তো!

মম্ আর আমার আসল খাবার স্যালাড্। আজ অবশ্য ডাল, ভাত, মাছ একটু খাব।'

—'তোদের পেট ভরে শুধু স্যালাড খেয়ে? বেঁচে আছিস কি করে তোরা?' —অপু হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করে। এতক্ষণে এই প্রথম ওর স্বাভাবিক কথা বলার ধরণ লক্ষ করল নন্দু।

—'স্যালাড কেমন লাগল বল? আমাদের বাবুর্চির স্যালাড বানানোর হাত খুব ভালো।'

—'দারুন লেগেছে। মিথ্যে বলব না এরকম স্যালাড কখনও খাইনি আগে। শুধু স্যালাড কেন? মশলা ছাড়া এমন মাছ, মুরগির মাংসও খাইনি। সত্যি খুব ভালো লেগেছে।' —নন্দুর মনে বারবার সেই শেষদিনে বলা অপুর কথাগুলো আসছিল—'তোকে আমার পায়ে পড়তে হবে।'

বুলার খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। ও গ্লাস থেকে জল ঢেলে প্লেটের মধ্যে হাত ধুতে শুরু করতেই সামসুদ্দীন আর্তনাদ করে ওঠার মতো বলে উঠল—'আরে, করছেন কি?

এই যে ফিঙ্গার বোল, এতে হাত ধুয়ে ওখানে বেসিনে চলে যান প্লিজ।' নন্দুও অপ্রস্তুত একেবারে! ইন্দ্রাণী মুখে কিছু বললেন না। কপালে বিরক্তির একটা কুঞ্চন পড়েই মিলিয়ে গেল। উনি ন্যাপকিনে মুখ মুছে চেয়ার ঠেলে উঠতে উঠতে বললেন—'আমি উঠছি কেমন? তোমরা বিকেলে চা খেয়ে যেও।' —উঠে চলে গেলেন ইন্দ্রাণী, একেবারে রাজকীয় চালে, —সত্যিকারের ইন্দ্রাণীর মতো। একডালা রূপ যেন মর্ত্যে নেমে এসেছিল ক্ষণিকের জন্য স্বর্গ থেকে, আবার চলে গেল। নন্দু নিজেও অত্যন্ত রূপসী কিন্তু ইন্দ্রাণীর মধ্যে যেন একটা স্পেসিয়েল ব্যাপার আছে যা ওনাকে অনেক অনেক বেশি রূপসী করে তোলে। এটার জন্য নন্দুর কোনো হিংসে নেই, বরং নিজের শাশুড়িকে নিয়ে ওর খুব অহংকার আছে। অপুও ইন্দ্রাণীর উঠে যাওয়া দেখল, তারপর বুলাকে বকতে শুরু করল—'তোদের নিয়ে না কোথাও যেতে নেই। কোথায় কি রকম চলতে হয় কিছু জানিস না। প্লেটে হাত ধুলি কেন তুই? এটা কি মনসাতলার বাড়ি পেয়েছিস যে মাটিতে আসনপেতে বসে সস্তার স্টিলের থালায় চটকে মেখে খেয়ে, থালাতে হাত-মুখ ধুবি? ছি: ছি:! আমার প্রেস্টিজ্ টা একেবারে ঢিলে করে দিলি তুই।'

—'আমি বুঝতে পারিনি গো ছোটো পিসি।'—সারাদিনে বুলার এটা দ্বিতীয়বার কথা বলা। নন্দু চাপা দেবার জন্য তাড়াতাড়ি বলে—'আরে বকছিস কেন ওকে। এমন কিছু ঘটে নি। যা:!'

খাওয়ার শেষে ওদের এবার ড্রইংরুমে নিয়ে এল নীচে। কারণ এতক্ষণে বোধহয় রুনা মিসেস গোমস্ কে দিয়ে ওর বিছানার পুরো খোল-নলচে পালটে দিয়েছে। ম্যামের বিছানায় ওই মহিলা শুয়ে আছে—এটা রুনার পক্ষে সহ্য করা খুব কষ্টকর, নন্দু সেটা জানে। তাই ওপরের ড্রইংরুমেও নয়, একেবারে নীচেরটায় নিয়ে চলে এসেছে। নিজের বুদ্ধিকে নিজেই তারিফ করে নন্দু। বাঘের চামড়া মোড়া সোফার ওপর পা তুলে বাবু হয়ে বসে অপু। নন্দু মনে মনে ঈশ্বরকে স্মরণ করে রুনা যেন এখন এখানে না আসে। অপুর আগমনে নিজের পার্সোন্যাল অ্যাসিস্ট্যান্টকে ভয় পেতে শুরু করেছে নন্দু। মনে মনে হাসে ও।

নীচের ড্রইংরুমে বসে অপু আবার ফিরে গেল ডিব্রুগড়ে। বলতে লাগল সেই সময়টাই সবচেয়ে ভালো ছিল। সব পুরনো দিনের স্মৃতিচারণ। নন্দু লক্ষ করল যে এসেই অপুর মধ্যে যে একটা চালিয়াতির ভাব প্রকাশ পেয়েছিল সেটা এখন আর নেই। বার বার বলতে লাগল ওর দাদাদের আর ভাইপোদের চাকরি দেবার কথা। ওদের সংসারের অচল অবস্থার কথা। বলল—'তোকে একদিন মনসাতলায় নিয়ে যাব। নিজের চোখে দেখে আসিস তবে বুঝবি।'

নন্দু এতটা শোনার পর আর না বলে পারল না—'আচ্ছা অপু এরজন্য সজলকাকু কাজল কাকুরা কাকে দোষ দেবে? তোর বাবা তো আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন ছেলে

মেয়েদের লেখা পড়া শেখাতে। ওরাই করেনি। নিজেদের পায়ে নিজেরাই কুড়ুল মেরেছে। শুধু শুধু ভাগ্যকে দোষ দিয়ে কি হবে? কে কার জন্য কত করবে বলতো? তুই খানিকক্ষণ আগে আমার ভাগ্য আর তোর ভাগ্য নিয়ে বলছিলি। আমিও রেগে গিয়ে দুটো অপ্রিয় কথা বল ফেললাম্। অহংকার করে ফেললাম। কিন্তু সত্যি করে বলতো আমার সঙ্গে একবাড়িতে বড়ো হওয়ার কথাটা তুই গর্ব করে বলছিস যেমন করে তেমনি করে বলতে পারবি কি, যে তুই নিয়মিত স্কুলে যেতিস, পড়া শুনো করতিস, আমার মতো নিজেকে তৈরি করার চেষ্টা করেছিলি? ডিব্রুগড়ে থাকতে সেই ১৪/১৫ বছর বয়সেই তুই উচ্ছন্নে যাবার পথটা ধরে নিয়েছিলি। নিজেই বললি আমাকে লীলাবতী সিনেমাহলে হিন্দী সিনেমা দেখাতে নিয়ে যেতে চেয়েছিলি? তাও টিকিট কেটে নয়, লাইটম্যানের সঙ্গে তোর বন্ধুত্বের জোরে। যুথী পিসি তোকে ভরসা করতে পারেনি তাই বিয়ে দিয়ে বেঁধে রাখতে চেয়েছিল। কবে তোরা নিজের দোষ দেখবি অপু?'

অপু খানিকক্ষণ নন্দুর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে—'বাব্বা! তোর মুখে তো বেশ কথা ফুটেছে রে আজকাল? ছোটোবেলায় তো আমার কথাই তোর কাছে বেদবাক্য ছিল। কত পালটে গেছিস তুই!'

—'মানুষ কি সারাজীবন ছোটোবেলায় পড়ে থাকে অপু? আমাদের বয়স আর পরিস্থিতিই তো বদলে দেয় চরিত্রগুলোকে। তোর প্রতি ছোটোবেলায় যে ভালবাসা ছিল সেটা বদলায়নি। সেজন্যই তো তুই আসবি জেনে আনন্দে অপেক্ষা করে থেকেছি। কিন্তু তাই বলে এবয়সেও তোর কথা বেদবাক্য বলে মেনে ব্রহ্মপুত্রের জলে সাঁতার কাটতে নেমে পড়ব—এমনটা তো আর হয় না রে! এখন কিসে ভালো কিসে মন্দ, কোথায় বিপদের গন্ধ—এসব ভেবে নিয়ে কাজটা করার অভ্যাস হয়ে গেছে যে! ছোটোবেলা অনেক পেছনে ফেলে এসেছি আমরা!'

অপু দমবার পাত্রী নয়, নন্দুর ইঙ্গিত পাত্তাই দিল না। বলল—' সে বাপু তুই যতই পালটাস না কেন তবু আমাদের চোখে তুই নন্দুই রয়েছিস। তোর মা তো আমাকে দেখতে পারত না কখনও । এবার এত যুগ পরে গেলাম তাও কিন্তু শ্রীলাবউদি বেশি ঘনিষ্ঠতা করল না। আবাহনও নেই আর বিসর্জনও নেই ভাব করে থাকল। ঠামাই খুব আদর যত্ন করেছে। সেই আগের মতোই আপন বলে মনে করেছে। জানিস, মেজদা, কাজলদারা সবাই বলছিল আর যেই যা করুক নন্দু আমাদের ফেলতে পারবে না। ও ওরকম মেয়েই নয়। তাই তো ভরসা করে বলতে পারছি যে একদিন মনসাতলা চল, নিজের চোখে কাকাদের দুরবস্থা দেখলে বুঝবি! তোদের এতবেশি আছে যে খরচ করার পথ খুঁজে পাস না। আর ওদের একটা মাস চালাতে হাড়গোড় হিম হয়ে যাচ্ছে। যাকগে— শোন মেজদারা একদিন আসবে। আর তুই আমার ঠিকানাটা লিখলি না তো? যাবি না আমার বাড়ি?'

নন্দু অপ্রস্তুত হয়ে বলে —'তাই তো? দ্যাখ কথায় কথায় ভুলেই গেছি।'—ও

ইন্টারকমে রুনাকে কলম আর প্যাড নিয়ে আসতে বলে। মনের মধ্যে ঠামার কথাটাই নড়াচড়া করছিল ওর। মতলবি অপু চিরকালই ছিল, এখন হয়তো আরও বেড়েছে। ডিব্রুগড়ে গিয়ে নন্দুর শ্বশুরবাড়ির এতগুলো ফ্যাক্টরি আছে শুনে মতলব চাগাড় দিয়ে উঠেছে ওদের সবকটা জোয়ান-বুড়ো, দাদা-ভাইপোর একটা হিল্লে হয়ে যাবে নন্দুর কাছে এসে কেঁদে পড়লেই। —রুনা কলম আর প্যাড নিয়ে এসে দিল।

অপু, মল্লিকা, মাধবী, বেলি, কেয়া পিসিদের গল্প শোনাচ্ছিল। সব বোনেরাই ওয়েল টু ডু। সকলেরই নিজের বাড়িঘর আছে, ছেলেরা ভালো ভালো চাকরি করে, মেয়েদের খুব বড়ো চাকুরে ছেলের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে, সবাই সুখে আছে। কিন্তু নিজের ভাইদের দিকে কেউ ফিরেও দেখে না। একমাত্র অপুই দাদাদের ভরসা। নন্দু ওর গল্প বলা শোনে চুপ করে। এইব গল্পের কতটা সত্যি আর কতটা মিথ্যা ও জানে না। ওর মনে পড়ে যায় ছোটোবেলায় অপু গল্প করত মনসাতলায় ওদের জমিদারী আছে। পাঁচটা দিঘি, যতদূর চোখ যায় ততদূর ধানের খেত—সব ওদের। আর ঠামার কাছে আবার অন্য কাহিনী শুনত। নবীন ব্যানার্জি, অত্যন্ত দরিদ্রঘরের মানুষ ছিলেন কিন্তু দারিদ্র্য ওনার সততাকে কখনও নষ্ট করতে পারেনি তাই রায়চৌধুরি পরিবারের সকলেই নবীন ব্যানার্জিকে শ্রদ্ধা করত। নন্দু ভাবে এমন একজন মানুষের ছেলেমেয়েরা কি করে উচ্ছন্নে যায়? যূথীপিসি ছাড়া বাকি ন'টা সন্তানই অপদার্থ, চালিয়াত কি করে হয়?

দেখতে দেখতে বিকেল হয়ে গেল। রুনা এসে জিজ্ঞেস করল—'ম্যাম চা কোথায় সার্ভ করবে? বড়ো মেমসাহেব তো নেই, বেরিয়ে গেছেন।'

নন্দু বলল—'এক কাজ কর না, এখানেই দিয়ে দিতে বল। আর ওপরে যেতে ইচ্ছে করছে না। রুনা স্ন্যাকস দিও কিন্তু।'

—'হ্যাঁ ম্যাম।' — বলে রুনা চলে যায়। একটু পরেই চা-এর সরঞ্জাম, স্ন্যাকসের প্লেট সাজানো ট্রলি নিয়ে আসে। নন্দু চায় না রুনা অপুর কথাবার্তা শুনুক তাই বলে—'তুমি যাও। আমি ঢেলে দেব।'

॥ তিন ॥

যূথীর বিয়ে হয়ে গেল অতুল্যর সঙ্গে। মেয়ের বিয়ে দিয়ে ফিরে এল নবীন ব্যানার্জির পরিবার ডিব্রুগড়ে। লক্ষ্মী পঞ্চমুখে যূথীর শ্বশুরবাড়ির গুণগান করতে লাগলেন সুহাসিনীর কাছে। মেয়ের বিয়ের ৬ মাস হতে না হতেই লক্ষ্মী অন্তঃসত্ত্বা হলেন। লজ্জায় অধোবদন হয়ে সুহাসিনীকে জানালেন—'দিদি, কী যে বলি আর কী যে করি বুঝতে পারছি না। কোথায় এখন যূথীর কাছ থেকে এখবর পাওয়ার আশায় ছিলুম, তা নয় আমারই ------। কোন মুখে মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে এখবরটা দেব বলুন তো?'

বিয়ের ক'দিন পরই ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়েছিল। যূথী সেকেন্ড ডিভিশনে

বেশ ভালো নম্বর পেয়ে পাস করেছিল। নবীনবাবু টেলিগ্রাম করে অম্বিকাচরণকে সুখবর জানিয়েছিলেন। যে খবর পেয়ে লোকে খুশি হয়ে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করে সেই খবর যুথীর মনে কোনো আনন্দ দিতে পারেনি। নিজের ঘরে একা একা কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছিল। আর তো পড়াশুনো হবে না। শ্বশুর আর অতুল্যর ইচ্ছে থাকলেও শাশুড়ি রাজি হচ্ছেন না। ঘরের বউ ড্যাং ড্যাং করে গ্রাম থেকে রোজ সকালে কলেজ করতে শহরে যাবে একা একা—এ হতেই পারে না। অতুল্য মানুষটা ভালো। যুথীর মনজুগিয়ে, ওকে খুশি রাখার চেষ্টা করে। শ্বশুর-শাশুড়িও খুবই অমায়িক। যেমন আদর করে ঘরে বউ এনেছিলেন তেমনি আদর দিয়েই রেখেছেন। যুথীর এখনও পর্যন্ত কোনো কষ্ট নেই শ্বশুর বাড়িতে। তবু মনটা পড়ে থাকে ডিব্রুগড়ে। মা-বাবা, ভাই-বোনদের আশে পাশে ঘুরে বেড়ায় মন। আদিত্যর সঙ্গে কাটানো বাল্য থেকে কৈশোর জীবন উৎপাত করে যখন তখন স্মৃতির দরজায় এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। শেষ দিনটাতে আদিত্যের চলে যাওয়ার দৃশ্যটা মুছে ফেলার অনেক চেষ্টা করেও মুছতে পারে না যুথী। আদিত্যের নামটা ও তো জল দিয়ে লেখেনি ওর হৃদয়ে যে, হাওয়ায় শুকিয়ে উবে যাবে কিংবা এক ঘষায় মিটে যাবে? ওর ধমনীতে প্রবাহিত রক্ত নামটাকে কখন যেন লিখে দিয়েছে হৃদয়ে। আদিত্য জানেও না একথা। যুথীকে নিয়ে ওর মনে কোনো কল্পনার অঙ্কুরও ছিল না যে! যুথী তো ওর কাছে শুধুমাত্র এক সমবয়সি খেলার সাথী ছিল। বড়ো হওয়ার পর বন্ধু। ব্যাস। আর তো কিছু নয়! যুথী ভেবে পায় না কি করবে ও ওর এই একতরফা ভালোবাসার যন্ত্রণা নিয়ে।

অতুল্যকে দেখতে ভালো। জ্ঞান-বুদ্ধিও যথেষ্ট আছে। যতক্ষণ বাড়িতে থাকে যুথীর চারপাশে পরিক্রম করতে থাকে। গত ৬ মাসে সারা কোলকাতার সব খুঁটিনাটি ঘুরিয়ে দেখিয়েছে। সিনেমাও অনেকগুলো দেখা হল। অন্য অনেক শাশুড়ির মতো ওর শাশুড়ির এসব নিয়ে নখরাবাজী নেই, বরং নিজেই বলেন—' বউটা সারাদিন ঘরে বসে থাকে ওকেএকটু ঘুরিয়ে নিয়ে আয়না কোথাও থেকে!'—যুথী নিজের মনকে জিজ্ঞেস করে—' এতর পরও তুমি কি নিজেকে অসুখী মনে করো যুথীকা?' উত্তরও পেয়ে যায় সেই মনের কাছ থেকেই—'না না! অসুখী নই তো? এতটা পাব আশা করিনি কখনও। বিয়ের পর প্রত্যেক মেয়ে যা চায় আমি তো সবটুকুই পেয়েছি। সুখী নিশ্চয়ই। শুধু যদি একটা মুখের ছবি আঁকা না থাকত মনে, একটা নাম ---------।'

বিয়ের একবছর পর যুথী আর অতুল্য ডিব্রুগড়ে এল। ডিব্রুগড়ে আসার আনন্দের বেলুনটাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে আরও বড়ো করে দিল অতুল্য সকলের জন্য ছোটো ছোটো নানা উপহার কিনে যুথীর বাক্সে ভরে দিয়ে। স্টেশন থেকে রিক্সায় চেপে বাড়ি পৌঁছনোর রাস্তাটা যেন বড্ড বেশি লম্বা মনে হচ্ছিল ওর। বাড়ির সামনে রিক্সা থেকে নেমে ছুটে চলে এল যুথী, ভুলে গেল অতুল্য প্রথমবার এসেছে, ওকে সঙ্গে নিয়েই ঢোকা উচিত

ছিল। অতুল্য অবশ্য এসব নিয়ে কোনো কিছুই ভাবে না। যুথীকে খুশি হতে দেখেই ও খুশি। কিন্তু ঘরে ঢুকে নিজের মায়ের সামনে এসে দাঁড়াতেই আনন্দ বেলুনটা ফট্ করে ফেটে গেল ওর। মা একি করেছে?—আবার? ছি: ছি:। অতুল্যর সামনে যাবে কী করে মা? একবছর ওদের বিয়ে হয়েছে এখনও সন্তান সম্ভাবনা হয়নি আর এদিকে ৬ সন্তানের জননী সপ্তম গর্ভ ধারণ করে নতুন জামাইয়ের সামনে ঘুরে বেড়াবে?

যুথীর চোখে কঠিন দৃষ্টি, দৃষ্টির মধ্যে ভর্ৎসনা, —লক্ষ্মী একেবারে কুঁকড়ে যান। আমতা আমতা করে সাফাই দেন—'চাদরটা কোথায় গেল? ওটা তো গায়ে দিয়েই থাকি! —এ এখানেই তো ছিল!'

যুথীর মাথাটা হেঁট হয়ে যায়। নিজের বাবা-মাকে সন্তান হয়ে কি বলা যায় — 'এবার বন্ধ করো?' মায়ের অসহায় মুখটা দেখে ওর মায়াও হয়। মার একার তো দোষ নয়! কোনোমতে গলায় শক্তি জোগাড় করে বলে—'কি দরকার মা? চাদর চাপা দিয়ে ঢেকে রাখলেই যদি সমস্যাটা মিটে যেত তাহলে কথা ছিল। একসময় তো খবরটা সবাই জানবে। তারচেয়ে তুমি এমনিই থাকো মা!'

লক্ষ্মীর চোখে জল এসে যায়—'যুথী আমি এসব আর চাই না রে! বিশ্বাস কর! ---- কি করব বল, মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছি যে? আমার শরীরেই তো প্রকাশ পাবে।'

—'থাক মা ওসব কথা। এক্ষুনি তোমার জামাই ঢুকে পড়বে ঘরে।' —যুথী সরে যায় ওখান থেকে।

১৫টা দিন যুথী সারা ডিব্রুগড় চষে বেড়ালো, সব বন্ধুদের সঙ্গে, স্কুলের টিচারদের সঙ্গে দেখা করল। দুপুরবেলা সুহাসিনীর কাছে রায়চৌধুরি ভিলায় কাটালো, কিন্তু একবারও আদিত্যর কথা জিজ্ঞেস করল না। সুহাসিনী এসব লক্ষই করলেন না, যুথী যে বিয়ে হয়ে সুখী হয়েছে তাতেই ওনার খুব আনন্দ। অনেক আশীর্বাদ করলেন ওকে, যেন আরও সুখ উপচে পড়ে ভালো মেয়েটার জীবনে। রায়চৌধুরি বাড়িতে যুথীর অবারিত দ্বার। ছাদ থেকে রান্নাঘর সর্বত্রই যাওয়ার ছাড়পত্র। যুথী এক দুপুরে আদিত্যর ঘরে এসে ঢুকলো। ঠিক যে অবস্থায় দেখে গিয়েছিল তেমনিই আছে ঘরটা শুধু মানুষটা এখানে নেই। নিজের শাড়ির আঁচল দিয়ে টেবিলের বইপত্র ঝাড়লো, ঝাড়া-পরিষ্কার বিছানাটাকে আবার টানটান করে চাদর গুঁজলো, প্রাণের ভেতরে লুকিয়ে রাখা ভালোবাসার সমস্ত উত্তাপটুকু এঘরের প্রত্যেকটি জিনিষ স্পর্শ করে, পরিষ্কার করে, ছড়িয়ে রেখে দিয়ে যেতে চাইল। এই ঘরের জানালায় দাঁড়ালে পেছনের ফলের বাগানটা দেখা যায়। জানালার গরাদ ধরে নির্নিমেষ তাকিয়ে রইল যুথী আম, জাম, কাঁঠাল, পেয়ারা, আরও কত রকমের গাছগুলোর দিকে। বৈশাখের ঝড় ডালপালা গুলোকে দোমড়াচ্ছে-মোচড়াচ্ছে, আকাশে ঘন ঘন বিদ্যুতের ঝলক। তারই মধ্যে একটা ছেলে আর একটা মেয়ে গাছ থেকে ঝরে পড়া ডাঁসা কাঁচা আম কুড়োচ্ছে দেখতে পেলো ও। হঠাৎ মাথায় টুক করে একটা ছোট্ট পাথর

পড়ল যেন।—'এই যুথী, শিল পড়তে শুরু করেছে রে! চল চল পালাই এখন।'—যুথীর হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল ছেলেটা বাড়ির ভেতরের নিরাপদ আশ্রয়ে। ঘরে এসে ঢুকতে ঢুকতে ভিজে একশা। একটা গামছা ওকে দিয়ে আর একটায় নিজের মাথা মুছতে মুছতে বলল—'তাড়াতাড়ি মুছে নে, মা যদি জানতে পারে এই ঝড়ে আমরা বাগানে আম কুড়োচ্ছিলাম তাহলে আজ হবে আমাদের।'

কাক-পাখিতে ঠোকরায় বলে সবকটা বেঁটে বেঁটে কলমের লিচুগাছে জাল দিয়ে ঘিরে দিয়েছে। সবে রং ধরতে শুরু করেছে, পাকেনি তখনও। ক্লাসনাইনে পড়া লম্বা ছেলেটা সাবধানে জাল সরিয়ে ঢুকে পড়ে গাছের গোড়ায়। দুহাতে জালটার এক দিক তুলে ধরে ডাকে—'আয় না ভেতরে।'

—'নিজেদের বাগানের ফল নিজেরাই চুরি করে খাওয়া কি ঠিক?'

—'ধ্যাৎ। তখন তো চিনির মতো মিষ্টি হয়ে যাবে। এখন টক-মিষ্টি। আয় চলে আয়।'

জালের ভেতরে বন্দি দুটো পাখির মতো বেঁটে গাছের ডালে পা ঝুলিয়ে বসে লিচু খায়। যুথী জিজ্ঞেস করে—'তুই গরমকালে কি করে এলি রে?'

—'তোর সঙ্গে গাছের ডালে বসে লিচু খাব বলে এলাম।'

—'ইয়ার্কি করবি না। আসার কারণটা বল।'

—'দার্জিলিং-এ খুব ডায়ারিয়া হচ্ছে জল থেকে। অনেক লোক মরেছে শহরের বস্তিগুলোতে। ভয় পেয়ে হোস্টেল বন্ধ করে দিল, আমাদের এক সপ্তাহের জন্য বাড়ি পাঠিয়ে দিল। ভালোই তো হল, বেশ লিচু খাচ্ছি! নিজেদের বাগানের কোন ফলটা খেতে পাই বলতো? সবই তো গ্রীষ্মকালের ফল। তবে দার্জিলিং-এ শীতের ছুটি পড়ার আগে অব্দি কমলালেবু প্রচুর খাই।'

—'তোর খালি খাই খাই কেন রে? শুধু খাওয়ার গল্প!'

—'দুর! হোস্টেলের খাবার যে রোজ একরকম হয়। ভালো লাগেনা না আমার। ওসব তুই কি বুঝবি? থাক্ গে যা না হোস্টেলে তখন টের পাবি।'

—'তোর এখানে থাকার ইচ্ছে ছিল?'

—'নাহ! এখানে থাকার সে রকম ইচ্ছে ছিল না। কোলকাতা, দিল্লি, আজমীড় এসব কোনো একটা জায়গায় পড়তে গেলে ভালো হতো। কিন্তু এবাড়ির ট্র্যাডিশন তো ওই সেন্ট পলস্! ট্র্যাডিশন বলে কথা, ভাঙা যায়?'

নিজের পারিবারিক ট্র্যাডিশনে অন্ধবিশ্বাসী ছেলেটার কথা শুনে যুথী জেনে যায় জীবনে নিজের পারিবারিক ট্র্যাডিশন মেনে চলবে।—খোলা জানালার পাল্লার ওপর একটা কাক এসে বসে পড়ল। যুথী যে দাঁড়িয়ে আছে গরাদ ধরে সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে কর্কশ গলায় কা-কা করতে শুরু করল। বাস্তবে ফিরে এসে যুথী আস্তে আস্তে বেরিয়ে

এল ঘর থেকে। জীবনের সবচেয়ে কঠিন বাস্তব সত্যটা তো ১৫ বছর বয়সে লিচু গাছের ডালে বসে সরলমনে বলে দিয়েছিল আদিত্য! নবীন ব্যানার্জির মেয়ে যুথীকাকে এ বাড়ির সকলে যতই ভালোবাসুক ট্র্যাডিশন ভেঙে ওকে আপন করার কথা কল্পনাতেও আনতে পারবে না কখনও। ওসব উপন্যাসেই ঘটে,—বাস্তব জীবনে নয়।

অতুল্য বুঝতেই পারেনি যে ওর শাশুড়ি সন্তানসম্ভবা। রাত্রে শুতে এসে যুথী যখন অনেক দ্বিধা, অনেক সংকোচ শেষে কথাটা বলল চলে আসার ক'দিন আগে, অতুল্য আকাশ থেকে পড়ল প্রথমে।—'মা কে নিয়ে এসব ঠাট্টা করতে নেই।' — গম্ভীর গলায় বলল তারপর।

—'ঠাট্টা করছি না। যা সত্যি তাই বলছি, লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে। দেশে ফিরে গিয়ে তোমার বাবা-মাকে কি করে বলব একথা?'

—'কিছু বলো না। যা জানাবার এখান থেকেই জানালে ভালো। তুমি আগবাড়িয়ে আমার মাকে কিছু বলতে যেও না। একে তো মা রোজই বলছে একবছর পার হল এখনও বউমার কোনো লক্ষণ নেই। কবে যে নাতি-নাতনীর মুখ দেখব? —এরপর যদি জানে তোমার ভাই-বোন হবে তাহলে মায়ের মনের অবস্থা খারাপ হবে আরও। তোমার বাবা জানাবেন এখন নিজের সপ্তম সন্তান হবার খরবটা।'

যুথীরা ১৫ দিন কাটিয়ে মনসাতলায় ফিরে এল। অতুল্যর উপদেশ মেনে যুথী কোনো কথা ভাঙল না শাশুড়ির কাছে। প্রাচুর্য্য না থাকলেও ওদের সংসারটা সুখের। অতুল্য ওর বাবার সঙ্গে রুগি দেখে। বিশেষ ইমার্জেন্সী ছাড়া আজকাল অম্বিকাচরণ অতুল্যকেই রুগির বাড়িতে পাঠানো শুরু করেছেন। ছেলেকে এই প্রফেশনে প্রতিষ্ঠা করে দিয়ে যেতে চান উনি।

যুথীর দিন কাটতে চায় না। ৪ জন মানুষের ছোটো সংসার শাশুড়ি—বউ মিলে সহজেই সামলে নেয়। তারপর অফুরন্ত অবসর। এরই মধ্যে গ্রামের সরকারি পাঠশালায় একটা পোস্ট খালি হল। অনেকদিনের পুরনো দিদিমণি সরলা চক্রবর্তী মারা গেলেন। অতুল্যই প্রথমে যুথীকে উৎসাহ দিয়েছিল—'যুথী চাকরি করবে?'

যুথী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল—'চাকরি? কোথায় পাবো?'

—'আছে। তুমি যদি রাজি থাকো তাহলে বল। মনসাতলা পাঠশালায় একটা পোস্ট খালি হয়েছে। একটু ধরাধরি করলে হয়ে যেতে পারে।'

যুথী অনিশ্চিত ভাবে বলে—'কিন্তু মা কি রাজি হবেন? কলেজে পড়তে যেতে দিতে চাননি তখন! চাকরি করতে দিতে চাইবেন?'

অতুল্য ভরসা দেয়—'আরে গ্রামে তো কলেজ নেই, তোমাকে কোলকাতা যেতে হতো পড়ার জন্য। তাই আপত্তি করেছিল। এটা তো বাড়ির কাছে, একটু বুঝিয়ে বললে রাজী হতে পারে। তোমার কি ইচ্ছে সেটা বল। স্কুলের সেক্রেটারি রমনীসুন্দর ভট্টাচার্য্য

বাবার অন্ধ ভক্ত। বাবা বললে ফেলতে পারবে না। তাছাড়া ম্যাট্রিকে তোমার রেজাল্টটাও ভালো। ভেবে চিন্তে বলো।' যুথী বললো—'ভাবাভারির কিছু নেই। একটা কিছু করতে পেলে বেঁচে যাই। তবে মা-বাবার মত থাকলে তবে করব ওনাদের অমতে নয়।'

যুথীর এধরনের কথা অতুল্যর খুব ভালো লাগে। শ্বশুর-শাশুড়িকে ডিঙিয়ে কিছু করতে চায় না মেয়েটা। তাই বলল—'না-না। অমত থাকলে তো করবেই না। বাবার তো তোমাকে কলেজে পড়ানোতেও অমত ছিল না। মা রাজি না। চাকরির ব্যাপারে মাকে আমিই বুঝিয়ে বলব।'

চাকরিটা হয়ে গিয়েছিল। ভাগ্যিস হয়েছিল! তবুও দিনের কয়েক ঘণ্টা সময় পালিয়ে বাঁচত যুথী। বিয়ের পর লম্বা আটটা বছর কেটে গেছে এখনও পরিবারে কোনো নতুন প্রাণের জন্ম দিয়ে বংশরক্ষা করার ব্যবস্থা করতে পারেনি যুথী। এককালের আদরের একমাত্র পুত্রবধূর মুখ দেখলে দিন খারাপ যাবে বলে সকালবেলায় আঁচলে মুখ ঢেকে রাখেন শাশুড়ি। শুনিয়ে শুনিয়ে পড়শিদের কাছে নিজের কপাল নিজের হাতে পোড়ানোর জ্বালা প্রকাশ করেন—'কি করে জানব মা যে নিজে সেধে বাঁজা মেয়েকে বউ করে আনছি? সবই আমার কপাল! বাঁজা মেয়ে আমাদের গলায় ঝুলিয়ে মা-মাগি লজ্জার মাথা খেয়ে এই বুড়ো বয়সেও বছরে বছরে বাচ্চা বিইয়ে যাচ্ছে। ছি: ছি: ছি:! ঘেন্নায় মরে যাই!'

যুথী প্রথম প্রথম কাঁদতো, এখন আর কাঁদে না। বলতেই পারেন শাশুড়ি নোংরা ভাষায়। গত আট বছরে একটি নয়, দুটি নয়, তিনটি ভাইবোন হয়েছে ওর। এখন ওরা ন'জন ভাইবোন। যে মায়ের এত সন্তানধারণ ক্ষমতা তার মেয়ে বন্ধ্যা? শ্বশুরের দেওয়া যতরকম ওষুধ সবই বিফলে গেছে। ধন্বন্তরী অম্বিকাচরণ পুত্রবধূর কাছে হার মেনেছেন। এরপর এম. বি. ডাক্তার, বদ্যি, কোবরেজ সবই ব্যর্থ হয়েছে। অতুল্যর মা যে যা বলেছে, যে থানে যে তান্ত্রিকের কাছে যেতে বলেছে সব করেছেন। যুথীর দুই বাহু, গলা, কোমরে ও বয়ে বেড়ায় লাল-কালো তাগায় বাঁধা অজস্র তাবিজ-কবচ। বছরে একবার বাপের বাড়ি এলে সেই তাবিজ—কবচ আরও ক'টা বাড়ে। লক্ষ্মীও চারিদিকে মানৎ করে রেখেছেন যে? ভেবে কূলকিনারা পান মা কেমন করে তার মেয়েটা বাঁজা হয়ে গেল?

নিজের বিয়ের তিনবছরের মাথায় পরের বোন মল্লিকার জন্য পাত্র ঠিক করে ফেলেছিল যুথী। মনসাতলাতেই মল্লিকার বিয়ে হল যুথীর সাহায্যে। দেড়বছর পর মল্লিকার ছেলে হল। অন্নপ্রাশনে বাড়িশুদ্ধু সবাইর যাওয়ার কথা। যুথী শাশুড়িকে সে কথা জিজ্ঞেস করতে গিয়ে বিপদে পড়ে গেল—'কিসের অন্নপ্রাশন? কার অন্নপ্রাশন? লজ্জা করে না তোমার ছোটোবোনের ছেলের অন্নপ্রাশনে যাওয়ার কথা বলতে?'—তারপরই ডাকছেড়ে কান্না আর বিলাপ—'হা ভগবান। এ তোমার কেমন বিচার? আমার উঠোনে নাতি খেলবে না, আমি ঘটা করে মুখেভাত করতে পারব না, আমাদের বংশরক্ষা হবে না—এ বড়

নিয়ে আমি কি করব? আমার অতুল্য কোনোদিন বাপ হতে পারবে না ঠাকুর? বাবা বলে ওকে কেউ ডাকবে না কোনোদিন!'

সেই চল্লিশের দশকে মানুষ যখন আণবিক বোমা বানিয়ে ফেলেছে তখনও এই পোড়া দেশের মানুষ বাচ্চা না হলেই স্ত্রীকে বাঁজা বলে বদনাম দেয়। বাচ্চা হওয়ার যোগ্যতা যে স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই থাকা দরকার সে ধারণাটুকুও ছিল না। তখনও গ্রামে-গঞ্জে দাই-রা প্রসূতির জঠর থেকে অবৈজ্ঞানিক উপায়ে বাচ্চা বের করত। কত মা, কত শিশু যে পৃথিবীর আলো দেখার আগেই মরে যেত তার ইয়ত্তা নেই। শহরাঞ্চলেও বাচ্চা কেন হচ্ছে না, দোষটা কার সে সব পরীক্ষা নিরীক্ষার সুবিধা ছিল না। তাই যূথীর মতো হাজার হাজার যূথীরা বাঁজা নামের শিরোপা ধারন করে সমাজে অশুভ বলে বিবেচিত হতো। যূথী সেদিন আর সহ্য করতে পারেনি শাশুড়ির আক্ষেপ। সত্যি তো? অতুল্যর তো কোন দোষ নেই! ও থাকলে অতুল্য কোনোদিন বাবা হতে পারবে না। ও না থাকলে কষ্ট পাবে কিছুদিন তারপর আস্তে আস্তে মন শান্ত হলে আবার বিয়ে করে বংশ রক্ষা করতে পারবে। যূথী সে রাতে বিষ খেয়ে মরতে গেল। হল না মরা। বিষে তেমন জোর ছিল না হয়ত তাই অম্বিকাচরণ বিষক্রিয়া মারাত্মক হবার আগেই বারবার বমি করিয়ে বের করে ফেললেন বিষটুকু। অতুল্যর মা'র দিবারাত্র মানসিক যন্ত্রণা দেওয়াও বন্ধ হল এরপর থেকে। অতুল্য শ্বশুরকে চিঠি লিখল—'মাধবী তো ঘরে বসেই আছে তাই ওকে যদি এবার আসার সময় এখানে এনে রেখে যান তাহলে যূথীর একজন সঙ্গী হবে। ওর মনটা ভালো থাকবে। যে ঘটনা ঘটাতে গিয়েছিল তার আর পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় সেজন্যই মাধবীকে পাঠানোর অনুরোধ করছি। তাছাড়া এখানে এলে হয়তো ওর বিয়ের ব্যবস্থা করাও সহজ হবে।

নবীনবাবুও একেবারে দেরি না করে জামাইয়ের প্রস্তাব মেনে মাধবীকে নিয়ে রওয়ানা হলেন। মাধবী যূথীর হৃদয় বেদনা কতটুকু দূর করতে পেরেছিল জানা যায়নি তবে এখানে এসেই প্রেমে পড়তে বেশি সময় ওর লাগেনি। সদ্য দেশ স্বাধীন হয়েছে, ভাগ হয়ে দু-টুকরো হয়েছে। ওপার বাংলা-এপার বাংলা বলে দুটো নতুন শব্দ তৈরি হয়েছে বাংলাভাষায়। দলে দলে উদ্বাস্তুর ঢেউ সমুদ্রের ঢেউয়ের মতোই এসে আছড়ে পড়ছে এপার বাংলার মাটিতে। যে যেখানে পারছে বসে পড়ছে। সেই রকমই এক উদ্বাস্তু ব্রাহ্মণ ছেলের সঙ্গে কালীঘাটের মন্দিরে গিয়ে বিয়ে করে চলে গেল। নবীনবাবু অতুল্যর টেলিগ্রামে খবরটা পেয়ে বললেন—'মরুক গিয়ে! এমন মেয়ে মেয়ে নয়, আপদ'

নবীনের স্ত্রী লক্ষ্মীর ঢাউশ পেটে যখন নবম সন্তান আসি আসি করছে তখন লক্ষ্মীর তৃতীয় মেয়ে মাধবীর ছেলে জন্মে গেছে। বাস্তুহারা অভাবের সংসারে মাধবীর প্রেম অচিরেই অপ্রেমে রূপান্তরিত হয়েছে। যূথীর কাছে আর নবীনবাবুর কাছে কেঁদেকেঁদে নিত্য টাকার বায়না করে চিঠি আসে—'টাকা না পাঠালে ছেলেটার জন্য দুধ-বার্লিও

কিনতে পারব না। আমার ভুলের দাম তো আমি দিচ্ছিই, তোমরা আমার ছেলেটাকে অন্তত বাঁচাও।'

লক্ষ্মী নিজের আটমাসের গর্ভ নিয়ে স্বামীর কাছে কেঁদে পড়ে—'মাসে মাসে মাধুকে কিছু টাকা পাঠাও তুমি। তা না হলে নাতিটা তো না খেয়ে মরবে! আহা রে! দুটো মাত্র নাতি, কত আদরের হবার কথা! যূথী তো মা হতেই পারল না গো! যাই বিয়ে করুক তবু তো মাধু মা হতে পেরেছে? নাতির মুখ তো দেখবে তুমি? মল্লির একটা আর মাধুর একটা—দশ বারোটা তো নয়?'

নবীন কখনও খিঁচিয়ে কথা বলেন না। মানুষটা খুবই ভদ্র তাই ভালো মুখেই বলেন—'কি করে মাসে মাসে মাসোহারা পাঠাব বল তো গিন্নি? যুদ্ধের সময় অল্পদিনের জন্য দোকানে যে আয় বেড়েছিল সেটা তো আবার আগের জায়গায় এসে ঠেকেছে। এদিকে সংসারও বড়ো হচ্ছে। এই সংসার সামলাতেই তো হিমসিম খাচ্ছি এর ওপর মাধুর সংসার টানতে গেলে তো জেরবার হয়ে যাব! যে ছেলে খেতে দিতে পারে না তাকে বিয়ে করতে কি আমি বলেছিলাম?'

—'কেন? মাধুকে বিয়ে দিতে গেলে খরচ হত না তোমার? মনে করো সেই খরচটা-ই মাসে মাসে পাঠাচ্ছ? সবসময় তো আর চাইছে না, এখন আতান্তরে পড়েছে বলে চেয়েছে। জামাই তো নাকি দোকান করেছে বাঁড়ুজ্জের হাটে। দোকান দাঁড়িয়ে গেলে অবস্থা ফিরে যাবে। তখন আর চাইবে না দেখো! যুথী একা আর কত টানবে বল? মা হতে পারল না বলে ওর নিজেরই কি শ্বশুরবাড়িতে আগের মতো জোরটা আর আছে?নেহাত চাকরি করে তাই নিজের মাইনে থেকে কিছু কিছু দেয়। মল্লিও সাহায্য করে। শুধু তুমিই-----

নবীন আর কথা বাড়ান না। ইউরোপীয়ান চা-বাগানে মালিকরাই ছিল দোকানের লক্ষ্মী। দেশ স্বাধীন হতে না হতেই বাগান বেচে দিয়ে চলে যাবার ঢেউ উঠেছে ওদের মধ্যে। এদেশের কটা লোক আর নানারকম ইলেকট্রিক সরঞ্জাম বাড়িতে রাখে? যুদ্ধের সময় বিদেশী সৈন্য-সামন্তে ভরে গিয়েছিল শহরটা। তখন প্রচুর কামিয়ে নিয়েছিলেন দুটাকার মাল পাঁচ টাকায় বেচে। এখন সব ভো-ভা। শহরে যে কটা বড়োলোকের বাড়ি আছে আর চা-বাগানের বাঙালি কিছুটা শৌখীন, ম্যানেজার সায়েবরা, এরাই ভরসা। লক্ষ্মীর দু-দিন অন্তর অন্তর সন্তান প্রসব করাটাও আর একটা সমস্যা। যুথীটার বাচ্চা হচ্ছে না বলে শাশুড়ির গঞ্জনা সইতে না পেরে মরতে গিয়েছিল মেয়েটা। গত দু-বছর ধরে আর আসে না বাপের বাড়িতে। কি জানি, হয়তো বা লজ্জাতেই আসে না?—নাহ। এবার থেকে নবীন নিজে আলাদা ঘরে শোবেন। বয়স অনেক তো হল! তিন মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল। ওনার এবারকার সন্তান তো নাতির চেয়েও ছোটো হবে বয়সে? ছিঃ! না—আর নয় অনেক হয়েছে। পরদিনই নবীন কাঠের মিস্ত্রীকে একটা তক্তাপোশের অর্ডার

দিলেন। নবীনের তক্তোপোশের অর্ডার দেওয়া দেখে বিধাতা মুচকে হাসলেন বোধহয়, তা না হলে এতর পরও অপু জন্মায়? লক্ষ্মীর দশম গর্ভ?

* * * * *

বিকেলে চা-খাবার খেয়ে সেদিন চলে গেল অপুরা। যাবার সময় সারাদিনের চালিয়াতি ভুলে নন্দুর দুটো হাত ধরে অনুনয় করে বলল—'নন্দু তুই তো আমাকে জানিস। সেই ন্যাংটো বয়স থেকে তোর চেয়ে বেশি কাছের মানুষ আমার মা-বোনরাও ছিল না। পারিস তো ক্ষমা ঘেন্না করে দিস ভাই। কোথায় তুই আর কোথায় আমি? লেখাপড়া বেশি শিখিনি তো স্বভাবদোষ গুলোও আর পালটায়নি। তোর তো কোনোদিন অহংকার ছিল না, আসবি না একদিন গরিব অপুর বাড়িতে? বল না রে? আসবি তো? অপু একেবারে সাধারণ বলে ভুলে যাবি না তো? বল্, কথা দে যে একদিন আসবি তোর বরকে নিয়ে?

ওর আকুলতা দেখে সুনন্দার মনটা আবার নরম হয়ে যায়---'এমন করে কেন বলছিস অপু? আমিও সেই নন্দুই আছি অন্য কেউ হয়ে যাইনি। তোকে কথা দিচ্ছি যাব একদিন, বিশ্বাস কর।' খুশিতে উজ্জ্বল মুখে অপু বলে—'সত্যিই যাবি তো? ভাঁওতা দিয়ে তাড়াচ্ছিস না তো?' নন্দু বলল—'আমি বুঝি তোকে তাড়িয়ে দিচ্ছি? আর ভাঁওতা দিতে আর শিখলাম কই?' — 'না-না! ছি! এই দ্যাখ আবার ভুল করলাম। এত আদর যত্ন পেয়েও আবার ভুল বললাম। রাগ করিস না মাইরি! ঠিকানাটা তো লিখে রেখেছিস। একেবারে হেদোর গায়ে।'

চলে গেল ওরা। নন্দু সত্যি বলতে কি এতক্ষণে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। মাথাটাই ধরে গেছে ওর। ওরা যেতেই ও এসে গা এলিয়ে দেয় বিছানায় আর এই পড়ন্ত বিকেলের অবেলায় ঘুমিয়ে পড়ে।

বাইরে এসে বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে বুলাও যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। বলে —'অ ছোটোপিসি এ তুমি কোথায় নিয়ে এসেছিলে গো? যতক্ষণ ছিলাম আমার শুধু হাত পা কেঁপেছে। বড়োলোক হয় লোকে শুনেছি, গাড়িতে সুন্দর সুন্দর বড়োলোকরা হুস্ করে চলে যায় সেও দেখেছি, কিন্তু ওরে বাপরে! এরা কত বড়োলোক গো? আমি তো আন্দাজই করতে পারছি না।'

—'ওসব আমারও আন্দাজ নেই কোটিপতির বাপদের কি পতি বলে। ওদের টাকা তুই আর আমি বসে সারাজীবন ধরে গুনলেও গোনা শেষ হবে না।'

বুলা বলে—'শুধু টাকা থাকলেই কি ওদের মতো হওয়া যায় পিসি? ওদের মধ্যে কি যেন একটা আলাদা কিছু আছে গো, সে জিনিষটা আমরা চিনিই না। তুমি নীচে জালের ঘরে কুকুরগুলোকে দেখেছিলে ওই সুইমিংপুলে যাবার একটু আগে? এক একটা যেন বাঘ! যা ভয় করছিল আমার।'

—'কেন? ভয় করছিল কেন? এই ভয়ই তো আমাদের গরিব করে রাখে রে। আমি এখন অন্য কথা ভাবছি।'

—'কি কথা ছোটোপিসি?'

—'দ্যাখ, ওদের এত আছে যা গুনে শেষ হবে না আর আমাদের কিছুই নেই! যদি ওদের এত থাকা ঐশ্বর্য্য থেকে আমাদের জন্য খাবলা মেরে কিছু তুলেও নিই ওরা টেরও পাবে না। কিন্তু সেটা কি করে করা যায় তাই ভাবছি?'

বুলা অবাক হয়ে প্রশ্ন করে—'খাবলা মেরে আবার কি করে তুলবে? কুকুরগুলোকে ছেড়ে দিলে? তাছাড়া কতগুলো পাহারাদার ভেতরে ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখেছ?'

অপু হেসে ফেলে বলে—'দূর বোকা! আমি কি চুরি করতে যাব না কি? অন্য ভাবে নিজেদের আখের গুছিয়ে নিতে হবে নন্দুকে ধরে। বুঝলি?'

বুলা ভয়ে ভয়ে বলে—'কি জানি বাবা! তবে আজ জানতাম না বলে চলে এসেছি তোমার সঙ্গে কিন্তু এরপর তুমি আমাকে আর কোনোদিন আসতে বলো না। বেশি বেশি বড়োলোকদের বাড়িতে ঢুকতেও ভয় করে আমার।'

রাত্রে তথাগত ফিরলে নন্দু ওর কাছে অপুদের আসার গল্প সবিস্তারে বলল। অপুকে তথাগত বিয়ের পর থেকেই চেনে। অবশ্য শুধুই নামে। কম করেও কয়েকশো বার অপুর গল্প শুনেছে ও সুনন্দার মুখে। নন্দু রেগে আছে দেখে বলল—'রাগ করছ কেন? হাজার হলেও তোমার ছোটোবেলার বন্ধু এটা তো সত্যি। ফেলে দিতে তো পার না। তবে তোমাকে দেখার ছুতোয় ফ্যামিলি শুদ্ধু সবাই যদি প্রায়ই আসতে থাকে তাহলে তুমিই মুশকিলে পড়বে। তাছাড়া অপু এখন আরও চালু হয়েছে বলছ তুমি, প্রথম দিন এসেই তিন তিনটে চাকরী চেয়েছে। খুব সাবধানে সুনন্দা মুখার্জি, এরপর বুলার মতো তিন-চারটে ভাইঝির বিয়ে দিয়ে দিতে বলবে কিন্তু!' —হা-হা করে হাসে তথাগত।

নন্দুও হেসে ফেলে। বলে—'আজ্ঞে না তথাগত মুখার্জি। সুনন্দা আর এখন অপুর চ্যালা ছোটো নন্দু নেই। সে এখন যথেষ্ট বুদ্ধি রাখে।'

তথাগত হাসে—' কত বুদ্ধি আমার জানা আছে, বেশি বুদ্ধি বলেই তো খারাপ ব্যবহারও করে ফেলেছ। প্রথম দিন এলো ----!'

—'ওরে বাবা খারাপ ব্যবহার করিনি। ওর চ্যাটাং চ্যাটাং কথা শুনে গা জ্বলে যাচ্ছিল তাই প্রথম দিনেই বুঝিয়ে দিয়েছি আমি আর সেই ছোটোবেলার নন্দু নেই। বুঝেছ?' —নন্দু সাফাই দেয়। বলে—'ওর বাড়িতে যাবার জন্য যখন বলছিল তখন আবার বিনয়ের অবতার যেন! যাব একদিন, দেখে আসব এত করে যখন বলেছে।'

—'যাও না। তবে একটু সামলে থেকো, ও কিন্তু নানা আবদার করতেই থাকবে যা হয়তো তুমি মেটাতে পারবে না। তখন বন্ধুত্ব না নষ্ট হয়ে যায়?'

—'ওকে আজকে দেখেই আমার বন্ধুত্ব পালিয়ে গেছে। সেটা কিন্তু ও সাধারণ ঘরের বউ বলে হয়নি, হয়েছে এতখানি বয়সেও ওর বদমায়েশি স্বভাবটা বদলায়নি দেখে। এত

করে হাত ধরে বলেছে তাই একটা রিটার্ন ভিজিট দেব আর কি। না হলেই বলবে খুব অহঙ্কার হয়েছে আমার।'

এরপর অপুর মাঝে মাঝে ফোন আসতে লাগল। যোগাযোগটা ধরে রাখতে চাইছে বোঝে নন্দু। কিন্তু নিজে থেকে বলে না—'কি রে, আর এলি না?' —প্রথম আগমনের প্রায় আড়াইমাস পর আবার একদিন বিকেল চারটে নাগাদ এল অপু। এবার আর এসেই চালিয়াতি শুরু করল না। বেশীক্ষন থাকলও না সেদিন। ঘন্টা দেড়েক বসে অত্যন্ত স্বাভাবিক কথাবার্তা বললো। নন্দুও বেশ স্বস্তি বোধ করল— অপু তাহলে নিজেকে পালটাবার চেষ্টা করছে। এমনি করে মাঝে মাঝে ফোন আর দেড়-দুমাস গ্যাপ দিয়ে দিয়ে এবাড়িতে আসাটা বজায় রেখে দিল অপু। ইতিমধ্যে নন্দু তথাগতর সঙ্গে একবার বেশ কিছুদিনের জন্য দেশের বাইরে চলে যাওয়াতে দেখা হয়নি অনেকদিন। নন্দু ফিরে এসে শুনেছিল অপু এসে গেট থেকেই ফিরে গেছে। ওর নিজেরও অপুর বাড়িতে যাওয়ার ইচ্ছেটা মরে এসেছে। নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে ওকে। সত্যিকথা বলতে কি প্রায় ছ'সাত মাস পার হয়ে গেছে, নন্দুর আর অপুর কথা বিশেষ মনেও পড়ে না এমনি এক রবিবার দুপুরে তথাগত, নন্দু আর ডোনা বসে একটা দারুণ মারকুটে ফিল্ম দেখছিল যখন, তখন গেট থেকে খবর এল অপু এসেছে।

শুনেই ডোনা বলল—'যাহ! মম তোমার গেস্ট এসে গেল? ইস্ তুমি আর দেখতে পারবে না কি করে মিস্ট্রিটা সলভ্ হল! কি মার মারবে হীরো ওই ভিলেনটাকে।'

—'ও। তারমানে এটা তোমার আগেই দেখা হয়ে গেছে? আজকাল খুব এসব দেখছ?'—নন্দু গম্ভীর মুখ করে মেয়েকে শাসন করে।

তথাগত বলে—'এই, তোমার ওই বন্ধু আবার ওপরে চলে আসবে না তো? আমি কিন্তু এটা দেখব এখন!'

—'না রে বাবা। রুনাকে বলে দিয়েছি নীচে বসাতে। তবে যাওয়ার আগে একবার দেখা করে নিও।'

—'যদি তখন এটা শেষ হয় তবেই কিন্তু।'

অপুকে রুনা জল দিয়েছে খেতে। নন্দু আসতেই অপু বলল—'জানিস এতকাল হয়ে গেল এই কোলকাতায় তবু এখানকার গরমের সঙ্গে আজও মানিয়ে নিতে পারিনি। আমাদের ডিব্রুগড়ে আবহাওয়াটা কত অন্যরকম ছিল না রে?'

—'যা বলেছিস। এখানে ঠান্ডা বলে যে শীতকালীন ঋতুটা আছে সেটা বোঝাই যায় না।'

—' তোর সেই পৌষ সংক্রান্তির ভেড়া-ভেড়ির ঘরের কথা মনে আছে নন্দু?'

—'ওমা! কেন মনে থাকবে না? সব মনে আছে।'

—'জানিস নন্দু, মকর সংক্রান্তিতে আমি পিঠে-পুলি বানাই। কিন্তু আজও

মকরসংক্রান্তি এলেই আমার সেই বাঁশের চুঙ্গাপিঠা খেতে ইচ্ছে করে। এদেশে তো ওই বাঁশ পাওয়া যায় না—ইচ্ছে থাকলেও তৈরি করা সম্ভব নয়।'

সেদিনও অপু বেশিক্ষণ বসল না। যাবার আগে তথাগতর সঙ্গে পরিচয় হল ওর। আর ভীষণ ভাবে চেপে ধরল একদিন ওর বাড়িতে যাবার জন্য। বলল—'আমি তো আপনাদের সমাজের থেকে অনেক দূরে থাকা মানুষ। গরিব যাদের বলে লোকে। তবে মনের দিক থেকে গরিব নই। মনপ্রাণ দিয়ে বলছি একদিন না হয় দেখেই আসুন নন্দুর বন্ধু অপুর বাড়ি?'—তথাগত না বলতে পারে না। কথা দিয়ে ফেলে একদিন যাবে।

অপু নিজে এসে নিমন্ত্রণ করে গিয়েছিল পরে আবার একদিন। যেতেই হল ওদের। বাড়ি খুঁজতে কোনো বেগ পেতে হল না। দুপাশে চারতলা-পাঁচতলার ঠিক মাঝখানে একতলা বাড়ি, রাস্তার ফুটপাথের ওপরেই কাঠের প্রবেশ পথ। একটাই ঘর, তাতে একটা পুরনো দিনের খাটে বিছানা। এক কোণায় একটা ত্রিপয়ের ওপর সাদা-কালো টি. ভি. অন্যকোনায় একটা ছোট্ট ফ্রিজ। অপু কোথা থেকে একটা চেয়ার এনে তথাগতকে বসতে দিল। বলল—'গরিবের বাড়িতে একটু কষ্ট হবে বসতে। আমি চা বানিয়ে আনছি। আপনি বসুন।' — বলে বেরিয়ে গেল সরু প্যাসেজে। নন্দুও পেছন পেছন এল। রান্নাঘরে গ্যাসটা মাটিতে। অপু পিঁড়ি এগিয়ে দিয়ে বলল — 'দাঁড়িয়ে রাঁধতে পারি না রে। কোমরে ব্যথা হয়।'—চা হয়ে গেলে বলল—'চল, তোর বর বেচারা একা একা বসে আছে ঘরে।'

ওরা যখন চা খাচ্ছে তখন একজন বুড়ো লোক এসে ঘরে ঢুকল। শীর্ণ, ভাঙাচোরা, একটা চেহারা। চোখে এত পুরু লেন্সের চশমা যে মনে হচ্ছিল ঘষা কাচের তৈরি। একটা কোঁচকানো আধময়লা পাজামার ওপর ততোধিক কোঁচকানো একটা রংচটা খাদির পাঞ্জাবি পরা। লোকটি ঘরে ঢুকে ওদের দেখে থমকে গেল প্রথমে, তারপর আবার বেরিয়ে যাবার উদ্যোগ করতেই অপু বলল—'আরে কোথায় চললে আবার? দেখ কারা এসেছে তোমার বাড়ি!' —লোকটি যে অপুর বর সেটা নন্দুর বুঝতে দেরি হল না। ও উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল। অপু বলল—'এই হল আমাদের নন্দু মহারানি, বুঝেছ? আর ইনি ওর স্বামী তথাগত মুখার্জি। তথাগত চায়ের কাপটা কোথায় রাখবে বুঝে পাচ্ছিল না। শেষে মাটিতেই রেখে উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যাস বসে হাত বাড়িয়ে দিল—'হ্যালো'!—অপুর বর ওর প্রসারিত হাতটা দুহাতে ধরলো, তারপর বলল—'আমাদের হ্যান্ডসেক করা অভ্যেস নেই ভাই। আপনার মতো এত উঁচু তলার মানুষ আমার বাড়িতে পায়ের ধুলো দিয়েছেন আমি তাতেই কৃতার্থ হয়ে গেছি। অপু বলতো বটে আপনার স্ত্রীর গল্প, ডিব্রুগড়ের গল্প, তবে সবটা আমি বিশ্বাস করতাম না। আজ বুঝলাম অপু সত্যি কথাই বলতো।' —তারপর ব্যস্ত হয়ে বলে আরে বসুন না আপনারা। দাঁড়িয়ে থাকবেন না। জানেন আমি নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছি না বিখ্যাত শিল্পপতি তথাগত মুখার্জি কখনও

আমার বাড়ি আসতে পারেন। বসুন দয়া করে, আমাদের তো ভালো করে বসতে দেবারও কিছু নেই।'

—'আরে না-না। আপনি এমন ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আমরা ঠিক আছি।' —বলল তথাগত। খুব অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল ওর ভদ্রলোকের অত্যধিক বিনয় দেখে।

অপু কেমন একধরনের নিস্পৃহ গলায় বলল—' তোমার চা রান্নাঘরে রেখে এসেছি।' ওর বর নন্দুর দিকে তাকিয়ে বলে--'আমি বাইরের জামাকাপড় ছেড়ে আসছি, কেমন?' একটু পরে একটা লুঙ্গি পরে খালি গায়ে ঘরে ঢুকলো, হাতে একটা মাদুর নিয়ে। মাদুরটা মাটিতে পেতে তার ওপর বাবু হয়ে বসল। কি সাংঘাতিক রোগা। বুকের সবকটা হাড় গোনা যাচ্ছে। পেটটা কুঁচকে আছে। গালে বা শরীরে কোথাও মাংস নেই। যেন একটা কংকালকে চামড়া দিয়ে ঢেকে দিয়েছে।—'তারপর বলুন বাড়ি চিনতে অসুবিধে হয়নি তো?'

নন্দুরা কথাটার উত্তর দেবার আগেই অপু বলে উঠল--' শোনো আমি ওদের নিয়ে বাইরে যাব। আজ রাতে নাও ফিরতে পারি। জালের আলমারিতে তোমার রুটি তরকারি রাখা আছে, খেয়ে নিও। —নন্দু তোরা ওর সঙ্গে কথা বল, আমি শাড়িটা পালটে আসি।

—'আবার কোথায় যাবি আমাদের নিয়ে? অ্যাই কিরে? কি বলছিস তুই? আমরা অন্য কোথাও আর যাব না অপু। এখান থেকেই বাড়ি যাব।'

—'চুপ কর। আসাটা নিজের হাতে–যাওয়াটা এখন আমার হাতে।' - বলতে বলতে বেরিয়ে গেল ও।

ওর বরের নামটাও জানে না নন্দু, তাই বলে —'মুখুজ্জেমশাই নীচে বসেছেন কেন? খাটে উঠে বসুন না!'

—'আমি নীচেই বসি। আমার অভ্যেস আছে। আপনার বন্ধু বড়োলোকের মেয়ে, ওর তো আমার মতো হা ঘরে লোকের সঙ্গে বিয়ে হওয়ারই কথা নয়। আপনি ওর ছোটো বেলার বন্ধু শুনেছি। অপুদের ডিব্রুগড়ের বিশাল বাড়ির একপাশে একটা বাড়িতে থাকতেন। একসঙ্গে খেলাধুলো করে বড়ো হয়েছেন— এসব গল্প কিছু কিছু শুনেছি আমি। আমার শ্বশুর মারা যেতে শালারা তো আর চা বাগান টাগান কিছু রাখতে পারেনি। একেবারে নিঃস্ব হয়ে ওরা এসেছিল নাকি এখানে। একরকম বিপদে পড়েই আমার সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়েছিল। আমার খুব দুঃখ হয় জানেন। কী বাড়ির মেয়ে, আর কোথায় এসে পড়ল! আমি ওর মর্যাদাই দিতে পারিনি, কিছু দিতে পারিনি জীবনে। বয়সেরও অনেক তফাৎ। আমাকে দেখেই বুঝতে পারছেন নিশ্চয়! স্বাস্থ্যও কোনোদিনই ভালো ছিল না আমার। আপনার বন্ধুর জীবনটা আমি একেবারে নষ্টই করে দিয়েছি। বড়ো অপরাধী মনে হয় নিজেকে। তাই ওর কোনো ইচ্ছেতে বা স্বাধীনতাতে বাধা দিই না আমি। শুনলাম ওদের ডিব্রুগড়ের ওই রাজপ্রাসাদের মতো বিরাট বাড়িটা আছে এখনও। একবার গিয়ে

দেখার খুব ইচ্ছে ছিল জানেন? হয়েই উঠল না। অপু তো গিয়েছিল কিছুকাল আগে পঁচিশ বছর পর, আমার ভাগনে অমিতও গেল। ও বলছিল কি বিরাট বাড়ি। অপুদের পরিচিত কেউই কিনেছিল ওটা। অপুরা তো গিয়ে প্রথমে হোটেলে উঠেছিল। তারপর যারা কিনেছেন, মানে আমার শ্বশুরের বন্ধু, ওনার স্ত্রী নাকি ওদের নিয়ে গিয়েছিলেন হোটেল থেকেই ওই বাড়িতে। এখানেই ছিল ওরা।' তথাগত নন্দুর দিকে তাকালো বিস্মিত এবং কিছুটা বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে। নন্দুর সুন্দর মুখটা হাঁ হয়ে গিয়ে হালকা করে দাঁতের মাড়ি উঁকি দিচ্ছে। গলা দিয়ে কোনো শব্দই আর বের হল না ওর। অপু! চিরকালের মিথ্যেবাদী, চালিয়াৎ অপু নিজের বরের কাছেও মিথ্যে কাহিনি বানিয়ে বলেছে? বিতৃষ্ণায় মনটা তেতো হয়ে গেল ওর। ইতিমধ্যে অপু সেজেগুজে অর্থাৎ শাড়ি-ব্লাউজ পালটে ফেরৎ এল। নন্দু ভাবছিল কোথায় পালটাল? আর তো ঘর নেই। অপু দেওয়ালে টাঙানো একটা ছোটো আয়নায় চুল বেঁধে, টিপ পরে বলে —'ওঠ্, চল্ আমার ফ্ল্যাটে যাব। এবাড়িতে তো বসাবারও জায়গা নেই। ফ্ল্যাটটা এখন সাজানো হচ্ছে, পুরো হয়নি যদিও। ওখানেই খাব। ওখানে তোদের কোনো অসুবিধা হবে না।'—বলে ও বাইরের গ্যাসেজটাতে আবার গেল।

নন্দু তথাগতর দিকে তাকিয়ে ইশারায় জিজ্ঞেস করল কি করবে। তথাগত বোধহয় শেষ দেখতে কৌতুহলী হয়ে পড়েছিল, তাই জোরেই বলল—'হ্যাঁ, চলো না, এসেছি যখন ফ্ল্যাটটা দেখেই যাই।'

অপু এসে আবার ঘরে ঢুকল। বলল—'চলুন, বেরিয়ে পড়া যাক, বেশি দূরে নয় অবশ্য। সিঁথির মোড়ের কাছে। আপনি তো গাড়ি নিয়েই এসেছেন, চলুন। আয় নন্দু।'

সিঁথিতে একটা চারতলা বাড়ির তিনতলায় এল ওরা। অপু চাবি দিয়ে দরজা খুলল, বলল —'এসো, ভেতরে এসো। এ আমার ওই ভাগের বাড়ির মতো নয়। এখানে তোমাদের অসুবিধে হবে না আশা করি।

ঘুরে ঘুরে ফ্ল্যাট দেখল ওরা। টু রুম, হল, দুটো বাথরুম, কিচেন আর রাস্তার দিকে ব্যালকনি। খারাপ নয়। মধ্যবিত্তের স্বপ্নের ফ্ল্যাট। সাজানো হয়েছে বেশ রুচিসম্মত ভাবে। নন্দু আর না বলে পারল না—'হ্যাঁরে, এত ভালো একটা ফ্ল্যাট থাকতে ওই ঘুপচি বাড়িটাতে থাকিস কেন?'

—'ওটা যদি ছেড়ে দিই তো কালই বেদখল হয়ে যাবে; আমার শ্বশুরবাড়ির জ্ঞাতিদের তো জানিস না। ওরা তো চায় যে আমরা এমনি এমনি বাড়িটা ওদের দিয়ে চলে আসি। ছেলেপুলে নেই, কে ভোগ করবে? এটাই ওদের কথা—বুঝলি?'

হলঘরটাতে একটা কাঠের সোফাসেট রয়েছে। এককোণায় একটা ট্রলির ওপর রঙিন টি.ভি.। এখানে ওখানে কিছু ডেকোরেটিভ আইটেম সাজানো রয়েছে। বেডরুম দুটোতেই বেশ ভালো জোড়া খাট, গদিমোড়া বিছানা সুন্দর বেডকভার দিয়ে ঢাকা। আলমারি

ঝকঝকে ড্রেসিং টেবল্, বেড সাইড টেবল রয়েছে। কিচেনেও গ্যাস, মাইক্রো ওভেন, নতুন রেফ্রিজারেটর আছে। সুন্দর করে তৈরি কিচেন ক্যাবিনেট— অর্থাৎ এ বাড়িটার সর্বত্র সুরুচি এবং আধুনিকতার ছাপ দেখতে পেল নন্দু, যা ওর হেদুয়ার বাড়ির থেকে সম্পূর্ণ আলাদা । কোথায় যেন একটা মস্তবড়ো গ্যাপ থেকে যাচ্ছে, যা নন্দু মেলাতে পারছে না। যাই হোক বাড়ি দেখা শেষ করে ওরা এসে আবার ড্রইংরুমে বসল। এইসময় বেল বাজল দরজায়। অপু উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল। ঘরে এসে ঢুকলেন এক সুদর্শন পুরুষ। অপু অনুযোগ আর আহ্লাদী সুরে ভদ্রলোককে বলতে লাগল—'কি গো এত দেরি করে দিলে। তোমার তো ও বাড়িতেই চলে আসার কথা ছিল। কী যে করো!' — ভদ্রলোক কোনো উত্তর দিলেন না এ অনুযোগের। নন্দু এবং তথাগতর দিকে তাকিয়ে নিজেই বললেন—'আমি অমিত, অমিত ব্যানার্জি, নমস্কার।'

এবার অপুর খেয়াল হল, বলল—'ও আমার বড়ো ননদের ছেলে। একটাই ভাগ্নে আমার। আর অমিত এই হল নন্দু—যার এত শত গল্প শুনেছ আমার কাছে। আর ইনি নন্দুর বর তথাগত মুখার্জি।'

নন্দু অমিতকে দেখছিল। সুবেশ, হ্যান্ডসাম, প্রায় ওদেরই বয়সি। শিক্ষাদীক্ষার ছাপ আছে চেহারাতে। কিন্তু একটু লাজুক প্রকৃতির, ঠিক সহজ হতে পারছে না। অথচ দেখে মনে হয় খুব স্মার্ট। অমিতও বসল। এর মধ্যে অপু কখন উঠে ভেতরে চলে গেছে। ও একটা বড়ো ট্রেতে নানা রকম ভুজিয়া, বাদাম, কাজু ভর্তি কয়েকটা প্লেট নিয়ে এসে সেন্টার টেবিলে রাখতে রাখতে বলল—'অমিত আমার সঙ্গে ডিব্রুগড় গিয়েছিল, ঠামা বলেছে তোকে?'

—'হ্যাঁ।' বলে নন্দু। তারপর জিজ্ঞেস করল — ' কেমন লাগল আপনার ডিব্রুগড়?' অমিত বলল—'ভালোই লেগেছে, ক'দিন থাকার জন্য ঠিক আছে। তবে পারমানেন্টলী থাকা যাবে না। কিছুই তো নেই। ব্রহ্মপুত্রটা ছাড়া দেখার মতো ও কিছু নেই।'—তারপর তথাগতর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে অমিত—'আপনার কিরকম লাগে মি. মুখার্জি?' তথাগত ঝক্‌ঝকে দাঁতের সুন্দর একটা হাসি প্রেজেন্ট করে উত্তর দেয়—'আমার তো ওটা শ্বশুরবাড়ি, গেলে খাতির টাতির ভালোই পাই। তাই খারাপ লাগে না। তবে এটা ঠিকই বলেছেন, বেশিদিন থাকা যাবে না।'

অপু আবার একটা ট্রে নিয়ে ঢুকল। নন্দু চমকে উঠল দেখে। ট্রেতে চারটে গ্লাস আর একটা ভ্যাট ৬৯ য়ের বোতল। ট্রেটা টেবিলের ওপর রেখে ও চটুল হেসে তথাগতকে জিজ্ঞেস করল—'আপনার তো নিশ্চয়ই চলে? আমি এনে রেখেছি আপনাদের জন্যই। কি রে নন্দু তুই খাস তো? আমার কিন্তু সব চলে।'— বলে আবার হাসল।—'যতটা গাঁইয়া তুই আমাকে মনে মনে ভেবেছিলি ততটা আমি নই। বুঝলি?— এই যে সায়েব, আপনারা শুরু করুন, আমি খাবারগুলো গরম করেই এসে বসব। এই অমিত, কি হলো, বসে আছ কেন এমন জড়ভরত হয়ে? বোতলটা খোলো! দাও ওদের।'

অপু আবার কিচেনে গেল।—রিডিকিউলাস! অত্যন্ত সস্তা। আর একটা জিনিষও লক্ষ করছে নন্দু, হেদুয়ার বাড়িতে অপু ওর স্বামীর সঙ্গে যে রকম কথা বলছিল বা যেরকম ব্যবহার করছিল এবাড়িতে ওর ভাগ্নের সঙ্গে ব্যবহারটা একেবারে আলাদা। ওদিকে অমিতকে দেখল বোতল খোলার কোনো চেষ্টাই করল না। তথাগতর সঙ্গে কিছু কথা বলছিল ও। অপু আবার এল, এখনও বোতল খোলা হয়নি দেখে বলল--'কি গো, এখনও শুরু করোনি তোমরা? তাহলে খাওয়া দাওয়া করবে কখন?' —অমিতের দিকে তাকিয়ে বলল—'বিকেলে কিছু খেয়েছ? খালি পেটে কিন্তু খেও না, কাজু টাজু কিছু আগে মুখে দিয়ে তবে শুরু কোরো। নাও, বলে একটা প্লেট এগিয়ে দিল। অমিত কটা কাজু তুলে নিল হাতে। অপু প্লেটট তথাগতর দিকে এগিয়ে দিল। তথাগত দুটো কাজু নিল। অমিতকে বেশ মার্জিত প্রেজেন্টব্‌ল জেন্টল্‌ম্যান বলে মনে হল নন্দুর। সলজ্জভাবে বলল—'খুলব তাহলে? আপনার আপত্তি নেই তো?' — মনে হল বাধ্য হয়ে জিজ্ঞেস করল অমিত।

না, আপত্তি নেই, তবে আমার দু-পেগই লিমিট।'

অমিত এবার বোতল খুলে গ্লাসে হুইস্কি ঢালতে লাগল। —'আপনি নেবেন তো?' — নন্দুকে জিজ্ঞেস করল ও।

—'না, ধন্যবাদ। আমি খাই না। — গলায় বিরক্তি চাপা থাকে না। অমিত কিছু না বলে তথাগতর দিকে গ্লাস এগিয়ে দিল। নন্দু উঠে কিচেনে গেল অপুর কাছে। জিজ্ঞেস করল—'কি রে, সাহায্য করব?'

—'দূর! রেঁধে রেঁধে যার জীবন কাটলো তাকে তুই কি সাহায্য করবি? এক গ্লাস জল ভরে নিজের হাতে খেয়েছিস কখনও? তাছাড়া, রান্না তো করিনি কিছু! সব্বই অমিত বড়ো হোটেল থেকে কিনে এনেছে। আমি শুধু গরম করে টেবিলে রাখব—ব্যাস্। আরে! তুই খাচ্ছিস না?' নন্দুর গ্লাসহীন খালি হাত দেখে অবাক প্রশ্ন ছোঁড়ে অপু।

—'আমি খাই না।'

—'সে কি রে! এত বড়োলোকের বউ, মদ খাস না? অবাক করলি মাইরি! তোদের বাড়িতে তো সেদিন একটা ঘরই দেখলাম, যার একপাশে কাচের আলমারি ভর্তি শুধু বোতল আর বোতল।'

—'ওটা আমাদের 'বার রুম'। আমাদের বাড়িতে ওখানে বসেই ড্রিংক করা হয় যদি কেউ করতে চায় তো। আর তোকে কে এখবর দিল যে বড়োলোকের বউরা সবাই ড্রিংক করে?'

—'আমি কিন্তু মদ - টদ খাই। আজও খাবো। তুমি যেন আবার চটে যেওনা, ভেবো না, ছিঃ ছিঃ! অপুটা অধঃপাতে গেছে। ওই যে অমিতকে দেখছো আমার একমাত্র ভাগ্নে, ও আমার থেকে মাত্র দুবছরের ছোটো। প্রায় সমবয়সি। ও কাস্টমস্ অফিসার। পয়সাকড়ি

ভালোই আছে। আর আছে জীবনকে ভোগ করার মতো একটা মন। ও ড্রিংক করে প্রচুর। ওকে সঙ্গ দিয়ে খেতে খেতে আমার ও এখন অভ্যেস হয়ে গেছে।' — 'তুই কি ভাবছিস, আমি জানি নন্দু। যা ভাবছিস্ তাই ঠিক। তোর কাছে গোপন করার কোনো কারণ নেই আমার । পরে একদিন সব খুলে বলব তোকে। সব শুনে যদি মেনে নিতে পারিস তো মেনে নিস, আর যদি ঘেন্না করতে চাস তো তাও করতে পারিস। এখন চল ও ঘরে যাই।'

নন্দুর শরীরটা কেমন শিরশির করছিল, যেন প্রথম শীত পড়েছে আর গায়ে চাদর নেই। অপুর জীবনের বাঁকা চোরা অলিগলির মধ্যে নন্দু অন্ধের মতো ঢুকে পড়ছে না তো? অপু ওকে আবার আর একটা ব্রহ্মপুত্রে নামাতে চাইছে না তো সাঁতার শেখানোর নাম করে? না। এখন আর সেসব করতে পারবে না অবশ্য! তবে এবার থেকে, না-আজকের পর থেকেই অপুর থেকে দূরে সরে যেতে হবে ওকে। এঘরে এসে ও তথাগতকে বলে—'তাড়াতাড়ি ড্রিংকস্ শেষ করো কতরাত হচ্ছে খেয়াল আছে? বাড়ি যেতে হবে না?' অপু আশ্চর্য হয়ে বলে—'সে কি রে! যাবি মানে? আজ রাত্রে এখানে থাকবি তো তোরা। সেকথাই তো বলেছিলাম।' —তথাগতর সঙ্গে নন্দুর চোখাচোখি হলো। ওদের দুজনের আজ অবধি একে অন্যের চোখের ভাষা পড়তে অসুবিধা হয় না। তথাগত বোঝালো, উঠে পড়তে পারলে বাঁচে আর সুনন্দা বোঝাল তথাগত তুমি ভাবছ 'নন্দু তুমি এ আমাকে কোথায় এনে ফেললে?' —'না রে! তুই রাগ করিস না অপু, রাত্রে থাকা সম্ভব নয়। তুই তোর ড্রিংকস্ পরে শেষ করিস, এখন খাবার দে। খেয়েই চলে যাব।' স্থির প্রত্যয়ের সুরে বলে নন্দু। অমিত এবার বলে — 'অপু, তুমি জোর করো না, মি. মুখার্জির অসুবিধে হবে থাকতে। তুমি খাবার লাগাও।' — অমিতের মুখে নিজের মামিমাকে 'অপু' বলে ডাকা নন্দুর কানে খট্ করে বাজলো। ওদের সম্পর্কটা আর যাই হক মামি-ভাগ্নের নয়। এ বাড়িটাও অপুর নয়, অমিতের। এটাও বুঝে ফেলল ও। এখানে আসার পর থেকে যে পাজল্টা মেলাতে পারছিল না, সেটা মিলে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেরিয়ে যাবার জন্য ও ভেতরে ভেতরে চঞ্চল হয়ে উঠল। খাবার ইচ্ছে টিচ্ছে উবে গেছে একেবারে। তথাগত ও নিশ্চয়ই সব বুঝতে পারছে। অপু ওর স্বামীর কাছে নিজেকে রায়চৌধুরি বাড়ির মালিকের মেয়ে বলে চালিয়াতি করেছে, এখন এখানে বসে যেভাবে মদ খাচ্ছে তা ভদ্রঘরের মেয়েরা করে না মধ্যবিত্ত সমাজে। নন্দুদের অতি উচ্চবিত্ত সমাজেও মহিলারা ড্রিংক অবশ্যই করে, কিন্তু সেটা এরকম পরিবেশে নয়। লেডিজ ড্রিংকসের কিছু কিছু নিয়ম আছে। আলাদা পরিবেশ আছে। এখানে এসে নিজেকে ওর এত চিপ্, এত নীচু মনে হচ্ছে যে তথাগতর সামনে দাঁড়াবার মুখটাও আর থাকে নি ওর।

কোনও মতে ডিনার সেরেই ওরা রওয়ানা হলো। তথাগত অপুকে জিজ্ঞেস করে—'আপনাকে নামিয়ে দিয়ে যাব।'

—'তার দরকার নেই। আমার তো একটু দেরি হবে, এখানে সব গুছিয়ে রেখে যেতে হবে তো! অমিত পৌঁছে দেবে।' —গাড়িতে বসে নন্দু চুপ করে রইল। তথাগত খানিকক্ষণ পর ওর পিঠে একটা হাত রেখে বলল—'নিজেকে খুব অপরাধী মনে হচ্ছে নন্দু আমায় এখানে নিয়ে এসেছিলে বলে? ও কিছু নয় নন্দু। জীবনের একটা দিকই তুমি চেনো, অন্য দিকটায় যে অন্ধকার আছে সেটা আজকের আগে জানতে না, তাই এত খারাপ লাগছে তোমার। আমার কিন্তু কিছুই মনে হয়নি। এ বাড়িতে পা রেখেই আমি খানিকটা আন্দাজ করেছিলাম আসল ব্যাপারটা কি হতে পারে।'

—'আমিও বুঝেছিলাম তথাগত। অপু এতটা নীচে নামতে পারে অতটা কিন্তু কল্পনাও করিনি আমি। আমার যে কি খারাপ লাগছে তোমাকে বোঝাতে পারব না। বিশেষ করে তোমাকেও এদের মধ্যে আসতে হল আমারই জন্য। এটাই বেশি কষ্ট দিচ্ছে আমাকে।'

ড্রাইভ করতে করতে তথাগত স্ত্রীর দিকে বার বার তাকিয়ে দেখছিল। ও বুঝতে পারছিল যে নন্দু মরমে মরে যাচ্ছে এই জঘন্য পরিবেশে স্বামীকেও এনে ফেলার জন্য। ও আবার নন্দুর পিঠে হাতের চাপ দিয়ে আশ্বস্ত করতে চেষ্টা করে—'আমি ঠিক উলটোটাই ভাবছি। ভাগ্যিস আজ তুমি একা আসনি? আসব না আসব না করেও শেষ মুহূর্তে ঠিক করেছিলাম তোমাকে একা ছাড়ব না। মন খারাপ করো না নন্দু। এতে তো তোমার কোনো হাত নেই, কিছু করারও নেই। তবে এদের সঙ্গে মেলামেশা আর বাড়তে দিও না।'

—'আর বাড়তে দেব? কক্ষনো না। ছি: ছি: ! আমার মনে হচ্ছে যেন তোমাকে শুদ্ধু টেনে নিয়ে একটা নোংবা নর্দমাতে পড়ে গিয়েছিলাম। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিও প্লিজ! আই অ্যাম সরি!' তথাগত এবার বকুনি দেয় — 'আবার এক কথা বলে! বলছি তো এগুলো হয় মানুষের জীবনে। তুমি তোমাকে দিয়ে অন্যলোককে বিচার করলে তো চলবে না। তোমার বন্ধুটি একজন জটিল চরিত্রের মহিলা। অর একটা সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম আছে। ছোটোবেলা থেকেই ও নিজেকে তোমার জায়গায় বসিয়ে কল্পনা করেছে। রায়চৌধুরি বাড়ির মেয়ে হতে চেয়েছে। বৈভবের মধ্যে থাকতে চেয়েছে। বাস্তবে কোনোটাই ঘটেনি ওর জীবনে। স্বপ্নভঙ্গের আঘাতে ও মরিয়া হয়ে মিথ্যে কথা বলা, চালিয়াতি করা এগুলোর মাধ্যমেই নিজেকে রায়চৌধুরি বাড়ির মেয়ে করে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছে নন্দু। এ বড়ো জটিল মনস্তত্ত্ব। তুমি বুঝবে না।'

নন্দু প্রতিবাদ করে ওঠে—'তাই বলে নিজের স্বামীর কাছেও ও এত মিথ্যেকথা বলবে? ওরা চাবাগানের মালিক ছিল আর আমরা ওদের বাড়ির এককোনায় লিজ নিয়ে থাকতাম?'

তথাগত হেসে ফেলে—'খু-উ-ব লেগেছে কথাটা তাই না? পাঁচখানা চা বাগানের মালিক আদিত্যনারায়ণের একমাত্র মেয়েকে ভাড়াটে বাড়িতে থাকার মিথ্যা অপবাদ

দিয়েছে? তুমি এখনও ছেলেমানুষ রয়ে গেছ। আরে, ওটাই তো ওর মনের অসুখ! —যাকগে ওসব যা বলেছে বলেছে। ও বলল বলেই তো আর সত্যি হয়ে যায়নি। ওই অমিত তো ঘুরে এসেছে ডিব্রুগড়। কাস্টমস্ অফিসার! ঘাসে মুখ দিয়ে চলে না নিশ্চয়ই? ও কি আর বুঝতে পারেনি ওখানে গিয়ে কোনটা জল আর কোনটা তেল? শোনো নন্দু—অপু যেহেতু তোমার জীবনটা ছোটোবেলা-বড়োবেলা কোনওদিনই পায়নি তাই তোমার প্রতি ওর কিন্তু প্রচণ্ড হিংসে আছে। আমার ভয় ও তোমার কোনো ক্ষতি করার চেষ্টাও করতে পারে। তুমি সাবধানে থেকো আর যতটা সম্ভব এড়িয়ে চল ওকে।'

সেদিন রাতে নন্দু ডিব্রুগড়ে ফোন করল। ওর মা শ্রীলা ফোন ধরলেন।

—'কি রে এতরাতে ফোন করছিস? সবাই ভালো আছিস তো?'

—'হ্যাঁ মা, সবাই ভাল আছে শুধু আমি ভালো নেই।'

—'কেন? কি হয়েছে? শরীর খারাপ?' —উৎকণ্ঠায় জিজ্ঞেস করে শ্রীলা।

—'না মা। শরীর নয় মনটা খুব খারাপ। ওই অপু ------ গড় গড় করে সব বলে যায় নন্দ মাকে। শ্রীলা সব শোনে ধৈর্য্য ধরে তারপর বলে — 'এই মেয়েটা ছোটোবেলা থেকে তোর পেছনে লেগে রয়েছে। একটা থার্ডক্লাস নোংরা মেয়ে! তুই-ই বা কেন ওর বাড়িতে যেতে গেলি তথাগতকেও সঙ্গে করে নিয়ে বলতো? দোষ তো তোরও আছে নন্দু! ছোটোবেলায়ও বারণ করলেও ওর সঙ্গে মিশতিস। এখন তো ছেলে-মেয়ের মা হয়ে গেছিস, এখনও বুঝলি না অপু একটা বাজে মেয়ে? তোর ঠামাতো সেদিন তোকে ফোনে বারণ করেছিলেন যে যাস না ওর বাড়িতে বা মনসাতলায়? তবু সেই গেলি তুই! —যা হবার হয়েছে, তবে এবার থেকে ওই অপুকে আর নবীনবাবুর কোন ছেলে মেয়েকে ঢুকতে দিবি না বাড়িতে। ইন্দ্রাণীদি আর সিদ্ধার্থদার কাছে মুখ দেখাতে পারব না আমি আর তোর বাবা। কি ভাববেন ওনারা একবার ভেবেছিস?'

নন্দু মার কাছে বকুনি খেয়ে আমতা আমতা করে বলে—'আমি আসলে প্রথমদিন আসার পর ওর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে পারিনি মা। সেদিন ওদের বেশি আপ্যায়ন করাটাই আমার ভুল হয়ে গেছে। ও একেবারে মাথায় উঠে গেছে। এখন থেকে সত্যিই আর প্রশ্রয় দেব না। ও যে এতটা বয়সেও একটু খানিও বদলায়নি বুঝতে পারিনি মা।'

ফোন রেখে নন্দু বিছানায় এসে শুয়ে পড়ে। কিন্তু অনেক চেষ্টাতেও ঘুম আসে না ওর। ওর সুন্দর মসৃণ জীবনে হঠাৎ করে কোথা থেকে অপু এসে সব গন্ডগোল করে দিচ্ছে। সেই অপু যে লাইটম্যানের সাথে দোস্তী করে লীলাবতী সিনেমায় বিনাটিকিটে হিন্দী সিনেমা দেখত। দলদলে পাঁকের মধ্যে তো সেই পনেরো বছর বয়সেই ওর প্রবেশ। নন্দুকেও নিয়ে যেতে চেয়েছিল ও। নন্দু একদিন জিজ্ঞেস করেছিল—'তোকে বিনাপয়সায় কেন সিনেমা দেখায় রে লোকটা?' অপু মুচকি হেসে বলেছিল—'তুই আমার বন্ধু তোকে বলব। কিন্তু কেউ যেন জানতে না পারে বুঝলি? লোকটা পয়সা টয়সা নেয় না তবে

--- ওই আর কি, জামার তলা দিয়ে বুকে টুকে হাত দেয়। তাতে আমার ভারী বয়ে গেল! ম্যাটিনী শো তে প্রত্যেকটা সিনেমা দেখা আমার বাঁধা বুঝলি?'

অমিত কেন নিজের মামিকে অপু অপু বলে ডাকছিল? ওর মামা তো বুড়োমানুষ। তার স্ত্রীকে নাম ধরে ডাকবে? মুখুজ্জেমশাইর সঙ্গে অপু এমন ব্যবহার করল যেন উনি ওর আশ্রিত বোঝা। অথচ অমিতকে খালিপেটে ড্রিংক না করার জন্য ওর এত আকুলতা! নানা প্রশ্ন, নানা সন্দেহে এপাশ ওপাশ করতে করতে কখন ঘুমিয়ে পড়ল সুনন্দা।

॥ চার ॥

অপুর বাড়ি ঘুরে আসবার পরদিনই নন্দু গেটে জানিয়ে দিল অপুরা এলে যেন ঢুকতে না দেয়। যেন বলে দেয় মেমসাবরা এখানে নেই, বিদেশে গেছে। রুনাকেও বলল। রুনা তো প্রথমদিন থেকেই অপুদের পছন্দ করেনি তাছাড়া বেশ কয়েক বছর সুনন্দা মুখার্জির সঙ্গে থেকে ও সুনন্দাকে খুব ভালোবেসে ফেলেছে। আর সুনন্দাও রুনাকে সব ব্যাপারেই ভরসা করে, বিশ্বাস করে। মালিক কর্মচারির আড়ালটা অনেক আবছা ওদের দুজনের মাঝখানে। এবাড়ির হাউসকীপার মিসেস গোমস্ যেমন পরিবারের একজন হয়ে গেছেন ইন্দ্রাণী মুখার্জির আমল থেকে কয়েক যুগ এবাড়িতে কাটিয়ে, রুনাও তেমনি সুনন্দার কাছাকাছি মানুষ। অপুদের আর ঢুকতে দেওয়া হবে না শুনে রুনা উৎসাহিত হয়ে ওঠে। বলে—'ম্যাম আমি তো সোজা বলে দেব দেখা হবে না। সোজা রাস্তা দেখিয়ে দেব। ধূরন্ধর মহিলা। মুখার্জি অ্যান্ড মুখার্জি ইন্টারনাশনালের বাড়িতে এসে এমন ভাব দেখাচ্ছিল যেন রানি এলিজাবেথ দয়া করে পা রেখেছে দেড়শো টাকার তাঁতের শাড়ি, কুড়িটাকার ফুটপাথের চটি আর প্লাস্টিক হাতব্যাগ নিয়ে! দূর দূর করে তাড়াবো ওকে। তা না হলে অতীষ্ঠ করে তুলবে আপনার জীবন। ম্যাম, আমরা এদেরকে খুব ভালো করে চিনি বুঝি। আপনারা চিনতে পারেন না। এরা হল সর্বহাবার দল। যেখানে খালি জমি পাবে সেখানে জবর দখল করে বসতে চাইবে।'

নন্দু হেসে ফেলে রুনার কথা শুনে। বলে—'তুমি একেবারে আসল জায়গাতে ধরতে পেরেছ। আমি তাহলে এতদিন পর দেখা হওয়াতে একটু বেশিই ইমোশনাল হয়ে পড়েছিলাম প্রথম দিন। ভাবতেই পারিনি আমার ভদ্র ব্যবহারকে ও ওর ফেভারে ইউজ করতে শুরু করবে। যাকগে, আর না এলেই বাঁচা যায়।'

সেই সিঁথির মোড়ের বাড়িতে যাওয়ার রাতের পর বেশ অনেকদিন অপুর কোন খবর নেই। নন্দু যখন মনে মনে হাঁফ ছেড়েছে ঠিক তখনই একদিন রুনা খবর দিল গেটম্যান বলেছে অপু নাকি এসেছিল। ও বলে দিয়েছে মেমসাহেব এখানে নেই। কবে ফিরবেন ও জানে না। দুমাসও হতে পারে ছ-মাসও হতে পারে। এদেশেই নেই, বিদেশে গেছেন। এরপর বেশ কয়েকমাস নন্দু নিরাপদে কাটালো। তারপর অপুকে যখন প্রায় ভুলতে

বসেছে ও তখন হঠাৎ একদিন দুপুরবেলা একটা ফোন এল। রুনা ধারে কাছে না থাকায় নন্দুই ফোনটা ধরল।— 'হ্যালো' বলতেই ওদিক থেকে ঠিক যেন দুঃস্বপ্নে দেখা ভূতের আওয়াজের মতো অপুর গলা ভেসে এল একেবারে চার্জিং বুলের মতো—'কি ব্যাপার বলতো? কোথায় থাকিস যে এতদূর থেকে এসে ফিরে যেতে হয়? দারোয়ান বলে বিদেশে বেড়াতে গেছিস। তা, তোর বর, শাশুড়ি সবাই ব্যাবসা ছেড়ে বিদেশে বেড়াতে গিয়ে বসে রইল এত মাস ধরে? নে এবার এই অপগন্ড দারোয়ানটাকে গেট খুলতে বল। সামনের এস. টি. ডি. বুথ থেকে ফোন করছি। তোর দারোয়ান আমাকে দেখলেই আবার তোকে বিদেশে পাঠিয়ে দেবে।'

রাগে নন্দুর মাথায় আণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটে যায়। এত সাহস বেড়েছে ওর? কঠিন বরফের মতো শীতল গলায় বলে—'বুঝতেই যখন পারছিস যে তোকে দেখলেই একটা দারোয়ান পর্যন্ত মেমসাহেবকে বিদেশে পাঠিয়ে দেয় বার বার তাহলে আসছিস কেন? তোকে সময় দেবার মতো অপর্যাপ্ত সময় আমার খরচ করার ইচ্ছে নেই অপু। আমি তো তোকে আসতে বলিনি সেই রাত্রের পর? তুই নিজের স্বার্থে আসছিস বার বার। আর আসিস না।' — বলে অপুকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ফোন রেখে দেয় নন্দু।

কতবড়ো সাহস? ওর কাছে গুষ্টিশুদ্ধু, সকলের জন্য চাকরি চাইতে এসে ওকেই শাশাচ্ছে! ভেবেছে নন্দু এখনও ওর কথা মতো হাঁটু মুড়ে বসে পড়বে আর নন্দুর পিঠে পা রেখে বেজবড়ুয়াদের চালের ব্যারেলে উঠে পেচ্ছাপ করবে অপু?— না, এসব আর হবে না। বেল বাজিয়ে রুনাকে ডাকে ও। রুনা এলে ওকে বলে—'অপু গেটে এসে দাঁড়িয়ে আছে। দারোয়ানকে বলে দাও যা-তা বলে দিলেও আমি রাগ করব না।'

নন্দুর ফর্সা নাকের আগা রাগে লাল হয়ে উঠেছে। পাটা দুটো খুলছে বন্ধ হচ্ছে। এত রেগে যেতে রুনা কখনও দেখেনি ম্যামকে। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে—' গেটে এসেছে কি করে জানলেন ম্যাম? গেটম্যান তো আমাকে কিছু বলেনি ইন্টারকমে?'

—'সামনের পি. সি. ও. থেকে অপু আমাকে ফোন করেছিল। হুকুম করে বলল গেট খুলে ওকে আসতে দেবার জন্য বলতে।'

—'আচ্ছা?—দাঁড়ান আমিই যাচ্ছি।' — বলে রুনা তাড়াতাড়ি পা চালায়। একটু পরে ফিরে এসে বলে—'না ম্যাম, উনি গেটে আসেনইনি।'

ওষুধে কাজ হয়েছে তাহলে! ভাবে নন্দু। রাত্রে তথাগতকে সব কথা খুলে বলল। তথাগত সব শুনে বলল—'আরে এই অপু নামের মহিলা তো তোমার স্নায়ুর মধ্যে চেপে বসছে দেখছি! ওকে নিয়ে এত ভাবনা করার কি আছে বল তো? খারাপ ব্যবহার করে ফেললে? তুমি তো এরকম রেগে যাও না কখনও? মনে হচ্ছে স্ট্রেসের মধ্যে ফেলে

দিচ্ছেন তোমাকে ওই মহিলা। — চলো বাইরে ঘুরে আসি কোথাও থেকে । দার্জিলিং যাবে জোজোকে দেখতে?

খুশিতে নন্দু তথাগতকে জড়িয়ে ধরে গালে গাল রেখে বলে—'সত্যি বলছ? পরে বলবে না তো অফিসে জরুরি কাজ এসে পড়েছে?'

—'না, বলব না। কারণ জোজোকে দেখতে যাব বলে ড্যাডিকে বলেছি এক সপ্তাহ আমাকে ছাড়াই কাজ চালাতে। ড্যাডি বলল যাও ঘুরে এস। এখন কাজের প্রেশার একটু কম। অসুবিধে হবে না। —ব্যাস্, আমরা দার্জিলিং যাচ্ছি কাল-পরশু। ঠিক আছে? আর এত রেগে যেও না দুমদাম করে। — কি আর করবে হাজার হলেও ছোটোবেলার বন্ধু তো? তুমি তাড়ালেও ও আবার আসবে। কতবার তাড়াবে? মান-ইজ্জতের পরোয়া করার মতো মেয়ে তো ও নয়?'

নন্দু তাড়াতাড়ি বলে ওঠে—'না-না। আজ যা বলেছি এরপর আর আসবে না। আমি তো সাফ বলে দিয়েছি আর আসিস না। এরপর আর কি করে আসবে?

তথাগত উঠে বাথরুমের দিকে যেতে যেতে হেসে বলে—'সেই নিজেকে দিয়ে অন্যকে বিচার করছে।' — তথাগতর কথা শুনে নন্দু ভাবে ও তো এরকমই ছিল ছোটোবেলা থেকেই! নরম, দুর্বল একটা চরিত্র! অপু ওর সেই ভালোমানুষীটাকেই এক্সপ্লয়েট করেছে চিরকাল। এখনও নতুন করে করার চেষ্টা চালাচ্ছে। অপুর সঙ্গে লড়তে হলে অপুর মতো হতে হবে সেটা কি ওর পক্ষে সম্ভব?

শীত আসার আগেই রায়চৌধুরি ভিলার মতো আলিপুরের এবাড়িতেও শরৎকাল থেকেই শুরু হয়ে যায় শীতের ফুল ফোটানোর আয়োজন। ইন্দ্রাণী আর সুনন্দা দুজনে মিলেই মালিদের সঙ্গে লেগে পড়ে এই সময়টা। ইন্দ্রাণী মুখার্জি সোসাইটি লেডি, অনেক কাজ, অনেক ব্যস্ততা ওনার জীবনে। তবু কিন্তু এই ঋতুগুলোতে উনি বাগান করার কাজটাকে কখনও হেলা ফেলা করেন না দেখেছে নন্দু। আজও শাশুড়ি-বউ মিলে মালীদের পাশে থেকে কোথায় কি ধরনের বেড হবে এসব বোঝাচ্ছিল। ম্যাটাডোরে করে শহরতলীর এক নার্সারি থেকে নানা রকম প্রাকৃতিক সার এসেছে। প্রত্যেকবারই আসে আর সে সময়টা বাড়ির বাতাস ভারী হয়ে থাকে কয়েকদিন দুর্গন্ধে। ম্যাটাডোর গেটের বাইরে রয়েছে তখনও তবুও গন্ধ অনেকটা দূরে দাঁড়িয়ে থাকা এদের দুজনের নাকে এসে লাগে। ইন্দ্রাণী নাকে রুমাল চাপা দিয়ে বলেন—'এখন কদিন আর শ্বাস নিতেও পারব না ভালো করে। জানো সুনন্দা, এই গন্ধটার জন্য প্রত্যেকবার ভাবি আর আমার ফুলবাগানের দরকার নেই। কিন্তু একবছর পর ভুলে যাই।'

নন্দু হেসে বলে—'মম্ এখানে তো তবু তৈরি হয়ে যাবার পর সার আসে। ডিব্রুগড়ে জানো বাড়ির পেছনদিকেই তৈরি করা হত। ওরে বাবা, সে দুর্গন্ধ সহ্য করা যেত না। ঠামা প্রত্যেক বার বলতো বাপিকে—তুই আমায় বাপের বাড়ি দিয়ে আয়। আর

জেঠু-বাপিরা খুব হাসতো। বলতো—মা তোমার বাপের বাড়ি কোথায়?—ঠামা নাকি আমার বাপির জন্মের পর লাস্ট টাইম একবার বাপের বাড়ি গিয়েছিল সেই ঢাকা বিক্রমপুরে, তারপর আর যায়নি। জানো, ঠামা নিজেও বলতে পারে না বাপের বাড়িতে এখনও কেউ আর আছে কি-না।'

ম্যাটাডোরটা ঢুকে গেছে। মালিরা সারের বস্তা নামাতে ব্যস্ত। গেট ম্যানও হাত লাগিয়েছে। এমন সময় ইন্দ্রানী বললেন—' তোমার সেই বন্ধুটি আসছে। সঙ্গে কজন ভদ্রলোকও রয়েছেন।'

নন্দু গেটের দিকে পেছন করে ছিল। ইন্দ্রাণীর কথা শুনে চমকে ওঠে ও। পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখে সদলবলে খোলা গেট দিয়ে এগিয়ে আসছে অপু। সঙ্গের কাউকেই ও চেনে না। কি যে করবে ভেবে উঠতে পারে না ও। ইন্দ্রাণী বলেন—'তুমি যাও সুনন্দা, ওদের দেখাশুনো করো। আমি এদিকটা সামলে নেব।'— বলে ইন্দ্রাণী লন পার হয়ে বাড়ির পেছনদিকের রাস্তা ধরেন।

—'কি রে নন্দু! বাপরে বাপ তোর তো দেখা পাওয়াই মুশকিল! দ্যাখ কারা এসেছে তোকে দেখতে! বলেছিলাম না সবাইকে নিয়ে আসব? দ্যাখ কথা রেখেছি।' — গালভরা এঁটো হাসি হেসে বলে অপু। নন্দু স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে অপুর সঙ্গে আসা অচেনা লোক গুলোকে। একজন বুড়োমানুষ গালে দুতিনদিন না কামানো পাকা দাড়ি খোঁচা খোঁচা হয়ে আছে। আর একজনও বয়স্ক মানুষ গাল ভাঙ্গা, চোখ বসা। আর দুজন যুবক। এরা কারা? অপু এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন এদের নিয়ে এসে নন্দুকে উদ্ধার করে দিয়েছে। নন্দু একটুও হাসে না, একটি কথাও বলে না! ঠান্ডা চোখে ও শুধু সারা অঙ্গে সর্বহারার ছাপ মারা মানুষগুলোকে জরিপ করতে থাকে।

—'কি রে? এমন থম মেরে গেলি কেন? চিনতে পারছিস না? এই তো মেজদা।—'বলে অপু পাকা পাকা না কামানো দাড়িওলা লোকটাকে দেখালো।—'আর এই হল কাজলদা' —এবার গালবসা লোকটাকে দেখায়। তারপর দুই যুবকের দিকে আঙ্গুল তুলে বলে—'এটা মেজদার ছেলে মনা আর ওটা কাজলদার ছেলে পুটু। আর এই হল নন্দু। যিনি ওদিকে চলে গেলেন ওই মহিলা নন্দুর শাশুড়ি।'

অপুর মেজদা এগিয়ে এলেন একগাল খোঁচাখোঁচা পাকা দাড়ির মাঝখান থেকে উঁকি মারা দু-চারটে অবশিষ্ট দাঁতে হাসি ঝুলিয়ে। প্রচুর পানদোক্তা খাওয়ার চিহ্ন দাঁত কটাতে। নন্দুর পিঠে হাত রেখে বললেন—' তোকে দেখে নয়ন জুড়িয়ে গেল রে! কতটুকু দেখেছিলাম তোকে! এখন তো ছোটোবেলার থেকেও বেশি সুন্দর হয়ে গেছিস!'

অপু বলে—'কি রে? এখানেই দাঁড় করিয়ে রাখবি? ভেতরে নিয়ে যাবি না? তোর রাজপ্রাসাদ দেখবে বলে এসেছে ওরা। দেখাবি তো—নাকি?

এতক্ষণের স্তম্ভিত ভাবটা কাটিয়ে উঠেছে নন্দু। ভেতরে ভেতরে অসম্ভব অসন্তোষ

থাকলেও এতগুলো লোকের সামনে আজ অপুকে জব্দ করা যাবে না। অপু আঁটঘাট বেঁধেই এসেছে। মনে পড়ে গেল তথাগতর বলা সেদিন রাত্রের কথাটা—‘ সেই সবাইকে নিজে মতো ভাবে।’— সত্যি কত ভুল ভাবনা ওর! অপু জোঁকের মতো লেগে থাকা শ্রেণির মানুষ। আত্মসম্মান বলে কিছু থাকলে তো স্বার্থ উদ্ধারের আশা থাকে না তাই ওই বস্তুটা শৈশবেই ও বিসর্জন দিয়েছিল আর ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেনি। অগত্যা বাধ্য হয়েই নন্দুকে বলতে হয়— ‘হ্যাঁ, চলো ভেতরে চলো।’—বলে নিস্পৃহ ভাবে ও আগে আগে নীচের ড্রইংরুমের দিকে এগিয়ে যায় বিনা বাক্যব্যয়ে। পেছন পেছন ওরাও আসে। ড্রইংরুমে ঢুকে সজলকাকু বলে ওঠে—‘ওরে বাবা, এতো দেখছি সত্যিই রাজবাড়ীরে নন্দু!’ —বাঘের চামড়ামোড়া সোফাগুলোতে হাতবুলিয়ে বলে—‘এগুলো তো সত্যিকারের বাঘের ছালরে। রায়চৌধুরী ভিলাকেও হার মানিয়ে দিয়েছে একেবারে!’

কাজলকাকু এতক্ষণ একটি কথাও বলেনি। ওর হাবভাব দেখে নন্দুর মনে হচ্ছিল একমাত্র ও অনিচ্ছায় এসেছে এবাড়িতে। হয়তো অপুর চাপে পড়েই এসেছে সেই কাজলকাকু—অপুদের ছোড়দা আস্তে আস্তে বললো—‘বাড়িটা মুখার্জি অ্যান্ড মুখার্জি ইন্টারন্যাশানালের ভুলে যাস না মেজদা।’

সঙ্গে সঙ্গে অপু ফোঁড়ন কাটে—‘ওসব জেনে আমাদের কি? আমরা তো আমাদের নন্দুর বাড়ি বলেই এসেছি বল? নন্দুর বাপের বাড়ির লোক আমরা, আমাদের খাতির না করে যাবে কোথায় মুখার্জি ইনটাশন?’

—‘ইন্টাশন নয় ইন্টারন্যাশনাল’—শুধরে দেয় কাজলকাকু।

অপু একটুও না দমে গিয়ে বলে—‘ওই হল! ঘাড়ের নামই গর্দান!

—‘কি হল নন্দু তুই তো কথাই বলছিস না! তোর শ্বশুর-শাশুড়ি এদের ডাকবি তো? পরিচয় করিয়ে দিবি না? হাজার হলেও সম্পর্কে আমরা তো ওদের বেয়াই।’ —সজলকাকুর কথা শুনে সুনন্দার পিত্তি চটে যায়। বলে ওঠে—‘ওরে বাবা ওসব আশা করো না। প্রথম কথা তো শ্বশুরমশাই এখানে নেই। একসপ্তাহের জন্য জাপান গেছেন। আর দ্বিতীয় কথা হল বিনা অ্যাপয়েন্টমেন্টে ওনাদের সঙ্গে দেখা হওয়া অসম্ভব। শাশুড়ী আছেন এখানে, তোমরা তো দেখলে ওনাকে। উনি হাতে সময় থাকলে নিজে থেকেই দেখা করেন কিন্তু আজ খুবই ব্যস্ত। আজ উনি দেখা করবেন না বলেই তখন তোমাদের ঢুকতে দেখে চলে গেছেন।’

সঙ্গে সঙ্গে অপু বলে ওঠে—‘এসব তোর কথা। যেদিন প্রথম আমি আর বুলা এসেছিলাম সেদিন তো আমাদের সঙ্গে বসে খেলেন, কত ভালো ব্যবহার করলেন। চল তো ওপরে দেখি কেমন উনি না দেখা করে থাকেন আমাদের সঙ্গে?’

অপুর আস্পর্ধা এক্ষুনি ভাঙ্গতে হবে তানাহলে আরও বাড়াবাড়ি করবে ও। গম্ভীর ছিলই ও ওরা আসার পর থেকে এবার ততোধিক গম্ভীর গলায় বলল—‘ভুলে যাস না

অপু তুই কোন বাড়িতে এসেছিস। এটা ঠিক তোদের বাড়ির মতো বাড়ি নয় যে যার যখন ইচ্ছে হল কেউ এল আর আত্মীয়তা করার জন্য একেবারে রান্নাঘরে পিঁড়ি পেতে বসে পড়ল। এবাড়িতে প্রচুর নিয়ম মেনে চলতে হয়। আমার বাপের বাড়িতেও এত নিয়ম না থাকলেও কিছু কিছু ওখানেও মানতে হত। আমার শাশুড়ি কোনো ফালতু লোক নন যে যার তার আগমনেই উনি দেখা করতে চলে আসবেন। আমি তোমাদের সঙ্গে ওনার দেখা করিয়ে দিতে পারব না। এবার বল কি দরকারে এসেছ?'

—' তোর অহং---

অপুকে থামিয়ে দিয়ে সজল বলে ওঠে—'থাম তো অপু! বাজে কথা বলাটা তোর অভ্যেস্। না রে নন্দু, আমরা বুঝতে পারছি এরকম সব বাড়ির নিয়মকানুন আমাদের মতো হয় না। তুই ভুল কিছু বলিস নি। আসলে, অনেক আশা নিয়ে তোর কাছে এসেছি রে। পরিবার বড়ো, খাওয়া পরার কষ্ট -- বুঝতেই তো পারছিস। কাজলটার ওপরে সব বোঝা হয়ে আছি। তুই এতবড়ো শিল্পপতির বাড়ির একমাত্র ছেলের বউ, তোর কথার তো দাম আছে। যে কোনো রকমের কাজে দে না রে আমাদের ঢুকিয়ে! বড়ো বড়ো কাজ তো চাইছি না। কারখানার শ্রমিকের কাজই আমাদের জন্য যথেষ্ট। এটুকু উপকার করবি না কাকা আর দুটো ভাইয়ের জন্য?' —'চাকরি? তাও তিনজনকে একসঙ্গে? চাওয়াটা বোধহয় একটু বেশি হয়ে গেল তোমার। আমি তো শুনিনি যে আমাদের কোনো ফ্যাক্টরিতে এখন লোক নেওয়া হবে? তাছাড়া আমাদের তো শুনেছি শ্রমিকদেরও কিছু যোগ্যতা থাকলে তবেই নেওয়া হয়। এমনি এমনি চেনাজানা আছে বলে কিংবা কারও সুপারিশে কোন চাকরিই দেওয়া হয় না। এ আমি কি করে করব? অসম্ভব! তোমরা যদি নিজেদেরকে ট্রেইন্ড বলে মনে করো তাহলে আমাদের যত কারখানা আছে সে সব জায়গায় বায়োডাটা দিয়ে অ্যাপ্লাই করো। লেবার অফিসার উপযুক্ত মনে করলে আর ভেকেন্সি থাকলে ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাকবে। পাশ করলে চাকরি হবে। এসব ব্যাপারে তো আমার নাক গলানোর কোনো প্রশ্নই ওঠে না।'

সজলকাকুর মুখটা শুকিয়ে যায় নন্দুর কথা শুনে। অপু বলে—'নিজের আপনজনের জন্যও তোর কিছু করার নেই এটা আমাকে বিশ্বাস করতে বলিস? বড্ড অহংকার তোর। দেখিস, তোর এই বড়োলোকি অহংকারই না আবার তোর পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়?' নন্দু রাগ চেপে রেখে বেশ ডিপ্লমেটিক একটি হাসি মুখে রেখে প্রত্যুত্তোর দেয়—' সেই ছোটো বেলা থেকে আমাকে শুধু হিংসে করে গেলি অপু। এখন সেটা আরও বেড়েছে তোর। মনে আছে তোর, দার্জিলিং থেকে ছুটিতে বাড়ি আসতেই তুই আমাকে বিনেপয়সায় লাইটম্যানের সঙ্গে তোর জানাশোনার সুবাদে লীলাবতী সিনেমা হলে হিন্দী সিনেমা দেখাতে নিয়ে যেতে চেয়েছিলি ম্যাটিনী শো তে? আমি যেতে চাইনি বলে সেদিনও তুই বলেছিলি আমার নাকি বড়োলোকের মেয়ে বলে খুব অহংকার। এ অহংকার বেশিদিন

থাকবে না। তুই আমাদের চেয়ে দশগুণ বেশি বড়োলোক হয়ে আমার অহংকার ভেঙে দিবি। আমাকে এসে তোর পায়ে পড়তে হবে?— কী হল দ্যাখ। এই সেদিনও তোকে বলেছিলাম ভাগ্য কেউ পালটা পালটি করতে পারে না। তুই হাজার হিংসে করলেও তো আমার ভাগ্যটা কেড়ে নিতে পারবি না! পারলে সেই ছোটোবেলাতেই কেড়ে নিতিস। আমার কোনো অহংকার নেই অপু। তুই অহংকার আর শৃঙ্খলা এদুটোকে সবসময়ই গুলিয়ে ফেলেছিস। নিয়ম মানার শৃঙ্খলা একেবারে ছোটোবেলাটা বাদ দিলে আমার মধ্যে কিন্তু সব সময়েই ছিল। আজও সে কথাই বলেছি তোদের। যে নিয়ম মেনে লোক নেওয়া হয় সেই পথেই যেতে বলেছি মনা-পুটুদের। আমি কখনোই তথাগতকে বা ড্যাডিকেএদের জন্য বলব না—এটা একেবারে সত্যি কথা।'

অপুর মুখটা দেখবার মতো লাগছে এখন। রাগ আর হিংসা মিলে মিশে ফর্সা মুখটাকে লাল করে তুলেছে। সব চোটপাট থেমে গেছে এখন। সজল কাকুও চুপ। কাজলকাকু আর মনা পুটু তো প্রথম থেকেই আড়ষ্ট হয়ে বসে ছিল। এমন সময় রুনা এল ঘরে—'ম্যাম আপনার কি এদের সঙ্গে কথা বলা শেষ হয়েছে। সাড়ে এগারোটা বাজে, মেমসাহেব সুইমিংপুলে আপনার জন্য অপেক্ষা করে এখন জলে নেমে পড়েছেন। সাঁতার কাটবেন তো আজ? উঠুন তাহলে!'

—'হ্যাঁ রুনা, এক্ষুনি যাচ্ছি। তুমি প্লিজ মমকে বল দেরি হবার জন্য আমি সরি। পাঁচমিনিটে চলে আসছি।'— রুনা চলে যেতে নন্দু উঠে পড়ে। বলে—'সজলকাকু কিছু মনে করো না প্লিজ, এটাও এবাড়ির নিয়ম। আমার শাশুড়ি বাড়িতে ফ্রী হয়ে যেদিন থাকেন সেদিন আমরা দুজনে একসাথে সাঁতার কাটি। আমাকে এখনই যেতে হবে, শুনলে তো উনি অপেক্ষা করছেন।'

—'চল মেজদা। ওঠ রে তোরা। আমারই ভুল হয়েছিল তোদের এখানে এনে। শুধু শুধু কিছু বড়ো বড়ো চালিয়াতি শুনতে হল তোদের।—উঠে দাঁড়ায় অপু লাল গনগনে মুখ নিয়ে। বাকিরা সবাই উঠে পড়ে। এতক্ষণে কাজলকাকু মুখ খোলে,—'নন্দু, অপুর কথাবার্তায় তুই খুব রেগে আছিস বুঝতে পারছি। অপুকে তো জানিসই, ও একই রকম রয়ে গেছে রে। আর কেউ না বুঝলেও তোর বলা প্রত্যেকটা কথা আমি বুঝেছি। যত ছোটই হোক তবু আমাদের পরিবারে একমাত্র আমিই একটা জুটমিলে চাকরি করি। পি. ডিভিশনে মাধ্যমিক পাশ করে , কোন টেকনিক্যাল জ্ঞান ছাড়া মুখার্জি অ্যান্ড মুখার্জি ইটারন্যাশনালে চাকরি পাওয়া যায় না—এটা আমি বুঝি। তোর প্রবলেমটাও বুঝতে পারছি বইকি! অপু নিজের লিমিট বুঝতে পারে না—এটা ওর সবচেয়ে বড়োদোষ। —যাকগে, আজ তাহলে আসি রে নন্দু!'

ওরা চলে যাবার পর যেন একটা অসময়ে আসা ঝড় থামল বলে মনে হল নন্দুর। ঝড়টা যে তখনকার মতো থেমে গিয়ে আবার আসার জন্য আকাশে কালো মেঘগুলো

রেখে গেছে সেটা বুঝতে পারেনি ও। একদিন তথাগত বলল—' তোমার অপু এখন আমাকে অফিসে ফোন করতে শুরু করেছে।'

—'মানে? নম্বর কোথা থেকে পেলো?'

—' সে আমি কী করে বলব? তোমার বন্ধু তুমিই বলতে পারবে।'

—'আমি? কি যা-তা বলছ তুমি? আমি অপুকে তোমার অফিসের নম্বর দেব?'

তথাগতর গলার স্বর উঁচু হয়ে যায়—'তাহলে ও আমার সবকটা ফোনের নম্বর পেলো কি করে ? ফোন করে সন্ধেবেলা ওর বাড়ি যেতে বলছে। থার্ডক্লাশ! রিডিকিউলাস!'

—'ছি-ছি-ছি-ছি! তুমি পুলিশে খবর দাও। আমি আর ভাবতে পারছি না।'

—'পুলিশে? এইরকম একটা বাজে ব্যাপার নিয়ে পুলিশে গেলে কি হবে জানো তুমি? তোমার ওই বন্ধুর সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে খবরের কাগজে রসালো আলোচনা হবে সেটা সহ্য করতে পারবে?'

নন্দু বুঝতে পারে মহাবদমাশ মেয়ে অপু এতকালপর ওর জীবনে ঢুকে পড়ে সব তছনছ করে দিতে চাইছে। কিন্তু ও সেটা ঘটতে দেবে না। অপুর মতো একটা অশিক্ষিত, সামান্য মেয়ের কাছে ও হার মানবে না। তথাগতর বুকে মাথা রেখে নন্দু ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। তথাগত বলল—' কেঁদো না। আমি সব টেলিফোন গুলো বদলে নেব তুমি কষ্ট পেও না।'

—'তথাগত আমার জন্য তোমাকেও ভুগতে হচ্ছে। আমার যে কী খারাপ লাগছে! কী করি বল তো?' তথাগত ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে—'করার বিশেষ কিছু নেই নন্দু! আমাদের ঠিকানা, ফোন নম্বর ওর কাছে আছে যখন, তখন মাঝে মাঝেই বিরক্ত করবে এটা জেনে রাখো। ঠামা নিজেও না বুঝেই ওকে ঠিকানা-ফোন নম্বর দিয়ে ফেলেছেন। হয়তো ভেবেছিলেন ছোটোবেলায় যেমনটা ছিল এখন আর তা নেই। কাউকেই তো দোষ দেওয়া যায় না। তুমিই কি প্রথম দিন যখন এসেছিল তখন ফেলে দিতে পেরেছিলে? সবচেয়ে বড়ো ভুল আমরা দুজনে করেছি ওর বাড়ি গিয়ে। সবচেয়ে বেশি আস্কারা ও এখানেই পেয়েছে।' — তথাগত খুব হাসতে শুরু করে এই অব্দি বলে। নন্দু মুখ তুলে জিজ্ঞেস করে—'হাসছো যে? হাসবার কী হল?' হাসি থামিয়ে তথাগত বলে—'না, ভাবছিলাম। মুখার্জি অ্যান্ড মুখার্জির এ. ডি. এম. আর তার বউকে কোথাকার মনসাতলা গ্রামের এক প্রায় গ্রাম্য মেয়ে একেবারে কোণঠাসা করে ফেলেছে। দেশে বিদেশে বড়ো বড়ো কম্পিটিটরকে ঘায়েল করে বাণিজ্য করা তথাগত মুখার্জি অপু নামে মহিলার ওপর রাগ করে নিজের বউকে মেজাজ দেখাচ্ছে জীবনে প্রথম বার! এলেম আছে মেয়েটার।' নন্দু ওসব কথায় কান দেয় না। ওর মনে একটাই চিন্তা—কী করে অপুকে এভয়েড করা যায়। তাই বলে—'কী করে যে ওর হাত থেকে রেহাই পাবো বুঝতে পারছি না। এত অপমানেও যে টলে না তাকে কি করে ছাড়াবো বল তো?'

—'শোনো নন্দু, তুমি যত বেশি অপমান করবে ওর জেদ তত বেশি বাড়বে। তার চেয়ে তুমি বরং ফোন করলে কথা টথা বলো। আসতে চাইলে অজুহাত দেখিয়ে কাটিয়ে দিও। একটা কথা বললে তোমার শুনতে খুব খারাপ লাগবে তবু বলতে বাধ্য হচ্ছি। এরা হল ওই শ্রেণির লোক যারা চালিয়াতির ওপর বাস করে নিজেদের দৈন্য ঢাকতে চায়। দেখ গিয়ে যাও অপু ওর যত চেনা-জানা, বন্ধু, আত্মীয়-স্বজনকে গল্প করে বেড়চ্ছে শিল্পপতি সিদ্ধার্থ মুখার্জির ছেলের বউ ওর বিশেষ বন্ধু। রোজ আসা-যাওয়া, খাওয়া-থাকা লেগেই আছে দু-বাড়ির মধ্যে।' —আবার হাসে তথাগত।' নন্দুর মাথাটা নেড়ে দিয়ে বলে—'ম্যাডাম সুনন্দা, তুমি অপুকে এই আনন্দ পাওয়া থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না বুঝেছ? তাই বলছি এসব ভেবে ভেবে নিজের চেহারা খারাপ করো না। আমাকেও ফোন করে আর পাবে না। অফিসে বলে দিয়েছি অপারেটরকে অপুর ফোন এলে যেন আমাকে থ্রু না করে। আর আমার চেম্বারের নম্বরগুলোও পালটে যাবে দু-একদিনের মধ্যে। হল তো শান্তি? এবার হাসো তো?' কিন্তু নন্দু আর হাসতে পারে না। চিন্তার ভাঁজ ফুটে ওঠে ওর কপালে।

* * * * *

অপু এত বাধা পাওয়ার পরও কিন্তু থেমে থাকল না। দু-একমাস পর পর ফোন করত নন্দুকে তবে আসব বলত না। ফোনেই মামুলি কথাবার্তা বলত। এটুকু নন্দুও মেনে নিয়েছিল। এমনি করেই শরৎ গিয়ে শীত ফুরিয়ে চৈত্রের হু হু করা শূন্যতা প্রায় শেষ হয় হয়, বেশ গরম পড়ে গেছে এরকম এক দুপুরে সামনের পি. সি. ও. থেকে অপু ফোন করে বলল—'নন্দু আমি আজ এসেছি রে। সামনের বুথটা থেকে বলছি এখনও তোদের গেটে যাইনি। তুই দারোয়ানকে একটু বলে দে না রে আমাকে গেট খুলে দিতে! এত গরমে এই দুপুর বেলা ফিরিয়ে দিসনি লক্ষ্মীটি। একাই এসেছি রে।' ওর বলার মধ্যে এমন একটা আকুলতা ছিল যা নন্দুর হৃদয় স্পর্শ করে ফেলল। নন্দু তো জীবনে কোনোদিন একটি মানুষের সঙ্গেও খারাপ ব্যবহার করেনি, কাউকে আঘাত দেয়নি কখনও। অপুর কাছে নানাভাবে বিরক্তিকর ব্যবহার না পেলে ওর সঙ্গেও করত না। অপু ওকে কঠিন হতে বাধ্য করেছিল ওর ন্যক্কারজনক স্বভাবে। নন্দু আজ আর অপুকে ফেরাতে পারল না।

রুনা বিরক্তমুখে অপুকে নন্দুর ওপরের ড্রইংরুমে নিয়ে এল। ওর মাথায় কিছুতেই আসে না ম্যাম এই মহিলাটির ওপর কখনও নরম কখনও গরম কেন থাকেন? যাকগে বাবা কোটিপতিদের মুড! এসব বোঝা ওর কর্ম নয়! অপুকে বসিয়ে ও নন্দুর বেডরুমে গিয়ে খবর দিল।

—'ইস্ কি ঘেমেছিস রে? রুনা এ. সি. টা চালু করে যায়নি?' — বলতে বলতে নন্দু গিয়ে এ. সি অন করে দেয়। বেল বাজিয়ে রুনাকে ডেকে ঠান্ডা জল দিতে বলে।

অপু একেবারে নরম আজ। মুখে বিষণ্ণতার ছাপ। যেন অনেক পথ হেঁটে শ্রান্ত শরীরে নন্দুর ইঁদারায় ঠান্ডা জল খেতে থেমেছে। রুনা জল এনে দিল। ঢক ঢক করে জলটা খেয়ে অপু বলে—'আঃ। প্রাণটা যেন বাঁচলো। সেই, সকাল থেকে ঘুরছি। সরিষার বাড়িতে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে তোর এখানে এলাম। বাইরে কি গরম বুঝবি না ঠান্ডাঘরে থেকে। এখনই এই, পরে তো আরও বাড়বে।'

নন্দু চুপ করে শোনে। ও বেশি কথা আজ আর বলবে না। দেখাই যাক অপু আজ আবার কি উদ্দেশ্যে এসেছে। মুখটা তোয়ালে রুমালে মুছে অপু বলে —'আজ আমি তোর কাছে মাফ চাইতে এসেছি রে। আমি জানি তুই খুব রেগে আছিস. আর রাগবি নাই বা কেন? যা সব কাণ্ড করেছি তুই বলে সহ্য করেছিস। আচ্ছা নন্দু তোর একবারও আমার কথা জানার ইচ্ছে হয়নি? কিছু তো জিজ্ঞেস করিস নি আমি সুখী কিনা? আমার কত্তাকে তো দেখলি সেদিন, মনে হল না যে বাপের বয়স এই কঙ্কালসার লোকটার সঙ্গে অপুর কেন বিয়ে দিল তোর যুথীপিসি? আমার কথা না ভেবে, শুধুমাত্র আমার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য বাপের বয়সি ওই রুগ্ন, ভাঙাস্বাস্থ্য, লোকটার সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে দিল। শুভদৃষ্টির সময় মুখ থেকে পানপাতা সরিয়ে দেখলাম একটা রোগা প্যাকাটি লোক, ভাঙা তোবড়ানো মুখ, আর পুরু চশমা। ছাদনাতলা থেকে ঘরে আনার পর থেকে শুধু কেঁদেছি। মা আর বড়দির পায়ে পড়ে কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছি আর বলেছি —'আমাকে তোমরা অনাথ আশ্রমে দিয়ে দাও, আমি মেনে নেব, তবু ওই লোকটার সঙ্গে যেতে দিও না, আমি থাকতে পারব না। বড়দিরা কেউ শোনেনি। আজ তোকে বলব সব তুই বুঝবি। ষোলো বছরের মেয়েটাকে পাঠিয়ে দিল বুড়ো বরের সঙ্গে। পালিয়ে যাব ঠিক করেছিলাম পালাতে পারলাম না। ফুলশয্যার রাতে আমাকে বসিয়ে দিয়ে সবাই বেরিয়ে গেল যখন ঘর থেকে, বরকে ঘরে ঢোকাবার আগেই খোলা জানালা দিয়ে টপকে সরিষার দেশের বাড়ির বাগানে টুপ করে পড়লাম। তারপর শুধু ছুটেছি। নতুন বউয়ের সাজে নয়। কনেচন্দন মুছতে মুছতে, ফুলের সাজ খুলে ফেলতে ফেলতে শুধু দৌড়েছি বড়ো রাস্তা ধরে। শুধু বেনারসি শাড়িটাই পরা ছিল—এছাড়া নতুনবউয়ের আর কোনো চিহ্ন ছিল না। গয়নাগাঁটিতো কিছু দিতে পারেনি বড়দি। বিনে পয়সায় বিদেয় করেছিল আমাকে। এদের বাড়িতে শাশুড়ি একটা চেইন দিয়ে আশীর্বাদ করেছিল, আর বড়জা কানের দুল। ওই শুধু ছিল গয়না। অনেক দৌড়ে মোড়ের কাছে এসে বেহালার বাসে চড়ে পড়েছিলাম। যখন টিকিট চাইল ততক্ষণে চৌরাস্তায় পৌঁছেছে বাসটা। টুক্ করো নেমে পড়লাম বাস থেকে। তখনও তো এত রাস্তাঘাট চিনি না, যে আবার একটা বাসে চড়ব আর সোজা মনসাতলায় পৌঁছে যাব? দেখি একটা বাস আসছে তাতে লেখা হাওড়া-কদমতলা । যা আছে কপালে, ভেবে আবার ওই বাসটাতে উঠে বসলাম। হাওড়ার বাসটার কন্ডাক্টার যখন টিকিট চাইল-বললাম পয়সা নেই। লোকটা বলে তাহলে

নেমে যেতে হবে। কিছুতেই নামাতে পারেনি। গালাগাল করে, খারাপ মেয়ে মনে করে খারাপ খারাপ কথা বলেও নামাতে পারল না। দাঁতে দাঁত চেপে বসে রইলাম। হাওড়া স্টেশনে নেমে বাকি রাতটা ওপরে যে ওয়েটিং রুম আছে সেখানে বসে কাটালাম। সকাল হতেই একটা বুড়োমানুষ ড্রাইভার দেখে নিয়ে ওর ট্যাক্সিতে উঠে বসে বললাম বজবজ মনসাতলা নিয়ে যেতে।'—এতখানি একটানা বলে থামল অপু। ওর চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছিল না কিন্তু জলভরা ছিল, চিক্ চিক্ করছিল। নন্দু ওর কাহিনী শুনতে শুনতে গলে গিয়ে আবার সহানুভূতির পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। ও অপুর হাতটা ধরতেই অপুর আটকে রাখা কান্নাটা গাল বেয়ে নেমে এল। মনে হল ও বোধহয় এটুকু সহানুভূতি ও এর আগে পায়নি কারোর কাছ থেকে। —'সেই ছোটো বেলা থেকে শুনে আসছি আমি জংলী, অসভ্য, খারাপ মেয়ে। কই, আমাকে ভালো মেয়ে তো করল না কেউ? আমার ফিরে আসাতে বাড়িতে কী হল সে সব আর বলে শুধু শুধু তোর সময় নষ্ট করব না। আমার কাহিনিটা তো আর ছোটো খাটো নয়, একটা উপন্যাস রে, তাও মোটা। কপাল আমার কোনোদিনই ভালো ছিল না নন্দু, তাই আমি যখন বাড়ি পৌঁছে মারধর লাথিঝাঁটা খাচ্ছি বাড়িশুদ্ধ সকলের কাছে, ঠিক সেই সময় আমার শ্বশুরবাড়ি থেকে শ্বশুর আর ভাশুর অন্য একটা ট্যাক্সি করে এসে হাজির হল। মা আমাকে একটা ঘরে শেকল তুলে আটকে রেখেছিল। সঙ্গে পাহারায় থাকল মেজদা আর কাজলদা। এ বাড়িতেও যে জানলায় গরাদ নেই, যদি আবার পালাই? শ্বশুর-ভাশুরের সঙ্গে মা-বড়দির কি কথা হয়েছিল সে সব কিছুই আমি জানি না। একটু পরে বড়দি শেকল খুলে আমাকে বের করল আর খুব আদর করে বোঝাতে লাগল যে ওখানে আমাকে যেতেই হবে, আমার এখন বিয়ে হয়ে গেছে, ওটাই এখন আমার বাড়ি, আমার সব। আমি না গেলে ওরা আর সমাজে মুখ দেখাতে পারবেন না আর বড়দিরাও গাঁয়ে ইজ্জৎ বাঁচাতে পারবে না। শ্বশুর নিজে নিতে এসেছেন। এত বড়ো একটা অন্যায় করেছি আমি তার পরও ওরা আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন. তাই আমাকে যেতেই হবে। ফিরিয়ে নিয়ে এল ওরা। ফিরে আসার পর এবাড়িতে কেউ কিছু বলল না, বকাবকি করল না। বরং আদরের ঘটা দেখাতে শুরু করল। আমার বরকে কোথাও দেখতে পেলাম না। শাশুড়ি সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখল পুরো দিনটা। আমাকে আমার যে ঘরটায় থাকার কথা সেখানে যেতেও বলল না। নিজের ঘরেই রাখল। রাতে খাওয়ার পর আবার ভয়টা আমাকে চেপে ধরল। এখন তো ওরা আমাকে ওই বুড়ো লোকটার সঙ্গে থাকবার জন্য ওই ঘরে পাঠিয়ে দেবে। কী করব আমি? আর তো পালাতে পারব না। পালিয়ে যাবার কোন জায়গা তো নেই আমার। —নন্দু, এই ডাকাবুকো মেয়েটা, এই অপু. যে দুরন্ত ব্রহ্মপুত্রকেও ভয় পায়নি, সেই নির্ভয় ডাকাতে মেয়েটা ভয়ে আতঙ্কে অস্থির হয়ে উঠল রাত বাড়তে দেখে। বড়োজা এসে ডাকল আমাকে. ওর ঘরেই খাটের ওপর বসেছিলাম খাওয়ার পর। ভয়ে ভয়ে

উঠে ওর সঙ্গে গেলাম। দেখি ও আমাকে শাশুড়ির ঘরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। বুঝলাম যে এখন শাশুড়ি আর ও মিলে আর একবাব জ্ঞান দেবে আমাকে-আর তারপর ওই কুৎসিৎ মানুষটার সঙ্গে শুতে পাঠাবে।'

—'তারপর ?' — আপনা হতেই নন্দুর মুখ থেকে বেরিয়ে এল উত্তেজিত স্বরের প্রশ্নটা।

—'যা ভয় করছিলাম, সেটা হল না। শাশুড়ি পাশে বসিয়ে আদর করেই বললেন—' ছোটো বউমা, তুমি আমার সঙ্গে শোবে। তোমার ঘুম হবে তো মা আমার সঙ্গে শুলে?' সেইরাত থেকে শাশুড়ির সঙ্গে শোওয়া শুরু। আমার বরকেও দেখতাম বাড়িতে। সে আমাকে এড়িয়ে চলত। আর আমি তো ওর দিকে তাকাতামও না। শাশুড়ি আর মায়ের বয়সি বড়োজাকেই আঁকড়ে ধরলাম। তাদের পেছন পেছন ছায়ার মতো থাকতাম সারাক্ষণ। ওদের ওপর বিশ্বাস আর ভরসা বাড়তে লাগল। শাশুড়ি একদিন জিজ্ঞেস করলেন—'বাপের বাড়ির কথা, মনসাতলার কথা মনে পড়ছে, তাই না ছোটো বউমা? যাবে ওখানে? গিয়ে কদিন মা-ভাইবোনদের সঙ্গে থেকে এস। মনটা ভালো লাগবে।'

—'না মা, আমি মনসাতলায় যাব না। এখানেই থাকব।'—বলেছিলাম।

শাশুড়ি বললেন—'রাগ করে আছ মা ওদের ওপর? ভুল আমাদের সবাইর হয়েছে মা। তোমার বড়দি আর মারও হয়েছে এ বিয়েতে রাজি হওয়ায়। আর আমাদেরও মস্ত বড়ো ভুল হয়েছে যে ওনারা মেয়ে দিতে আগ্রহ দেখালেন বলেই আমরাও কোনোকিছু না ভেবে খুশিমনে রাজি হয়ে গেলাম। বয়সের কথা ভাবলাম না। তোমার মনের কথা ভাবলাম না। যে ভুল হয়ে গেছে সে তো আর পালটানো যাবে না ছোটো বউমা। তোমার ভাগ্যে এই লেখা ছিল বলে মেনে নেওয়া ছাড়া তো আর উপায় নেই। আমি তোমাকে কখনও জোর করব না আমার ছেলেকে এখনই মেনে নিতে, তবে যদি পারো তো ধীরে ধীরে নিজেকে বুঝিয়ে একটু চেষ্টা করে দেখো।' — অপু অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। নন্দু যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো কোনো উপন্যাস পড়ছে! যার পরতে পরতে, ভাঁজে ভাঁজে জড়িয়ে আছে অপুর বেদনা। আজকের দিনে, এযুগেও কন্যাদায় মুক্ত হতে যুথীপিসি আর লক্ষ্মীদিদা তাদের এত আদরের অপুকে আশীর্বাদের বদলে অভিশাপ, বোধনের আগেই বিসর্জন দিয়ে বসে রইলেন। নন্দুর প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল যুথীপিসির ওপর। অপু ঠিকই বলেছে, সাতাশ বছরের টগর পিসির বিয়ে দিতে পারত ওরা। টগরপিসি দেখতে ভালো ছিল না, একটু বোকা সোকাও ছিল। ওর সঙ্গে বয়সে অপুর বরের তবুও মানাতো। ছোটো বেলা থেকে কখনও ওরা অপুকে শাসন করেনি, কোনো সুশিক্ষা দেয়নি — যার ফলে অপু উদ্দাম-উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছিল। এরজন্য অপুর থেকেও ওর পরিবার বেশি দায়ী ছিল। ডিব্রুগড়ে থাকতে যখন ওর নামে স্কুল থেকে, পাড়ার লোকেদের কাছ থেকে প্রায় রোজই কমপ্লেইন আসতো, তখনও ওরা সাবধান হন নি, উলটে প্রশ্রয় দিয়ে গেছেন

স্নেহান্ধ হয়ে। তারপর এত বড়ো অন্যায় কেন করলেন ওর সঙ্গে? তবে কি অপু এমন কোনো কাণ্ড করেছিল যার জন্য ওরাও বাধ্য হয়েছিলেন? যুথী পিসির আর্থিক অবস্থা খুব ভালো ছিল না অতবড়ো পরিবারকে পোষার মতো। সে তো যে তিন মেয়ের বিয়ে হয়েছিল তাদের কারোরই ছিল না। দারিদ্র্যের কারণেই যদি হবে তবে টগর পিসি, বেলি পিসি নয় কেন? ষোলো বছরের অপু কেন? একটা কোনও কারণ তো আছে যা অপু বলছে না, আর নন্দুও জিজ্ঞেস করতে পারছে না।

—'তিনমাস এভাবেই কেটে গিয়েছিল, জানিস? আমার বর আমার সামনে আসত না। লুকিয়ে লুকিয়ে থাকত যতক্ষণ বাড়ি থাকত। তিনমাসে,—তিনমাসে কেন বলছি? বিয়ে হয়ে থেকে তিনমাস অব্দি একদিনও একটি কথাও আমাদের হয়নি। আস্তে আস্তে আমার তো ভয়টাও কেটে যাচ্ছিল। ধরেই নিয়েছিলাম যে লোকটা আমার দিকে হাত বাড়াবার সাহস কোনোদিন পাবে না। ঘাটের মড়াটা আমাকে ভয় পায়। জানিস, শ্বশুর বুড়োমানুষ, খুব ভালোবাসতো আমাকে, সবাই ভালোবাসতো। একদিনও কোনও অসভ্যতা করিনি, কোনও অন্যায় কাজ করিনি আমিও। ভাশুর তো নিঃসন্তান ছিল—আমি ওর মেয়ের বয়সি, তাই সব সময় আমাকে এটা-ওটা এনে দিত, বড়োজাকে দিয়ে আমাকে সিনেমা দেখতে পাঠাতো। ওদের কারুর প্রতি আমার কোনো রাগ নেই রে নন্দু! ওরা যেন ওদের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করছিল। বড়দি আমাকে মনসাতলায় নিয়ে যাবার জন্য কয়েকবার এসেছিল। যাওয়া তো দূরের কথা, বড়দির সঙ্গে দেখাও করিনি আমি। আমার বরের উপস্থিতি ছাড়া এবাড়িতে আমি বরং অনেক ভালো ছিলাম। একধরনের সুখেই ছিলাম বলতে পারিস। ঘাটের মড়াটা তো সকালে নটায় বেরিয়ে যেত কাজে আর সন্ধের পর, কোনো কোনোদিন রাত নটার সময় ফিরতো।'

—'একদিন, সেটা নীলষষ্ঠীর দিন ছিল। শাশুড়ি আর জা বেলা দুটোর সময় জল ঢালতে গেছে। আমি দুপুরে আমার ঘরেই ঘুমোতাম আর রাত্রে শাশুড়ির সঙ্গে। ও বাড়িতে একটা কাজের ঝি ছিল দিনরাতের। সেদিন আমি আমার ঘরেই দুপুরে ঘুমুচ্ছি আর কাজের মাসি রান্নাঘরে ঘুমোচ্ছিল।'—অপু আবার থামে একটু, তারপর বলে,—'গভীর ঘুম ঘুমোচ্ছিলাম —কালঘুম। কখন যে ফাঁকাবাড়ি পেয়ে ওই বুড়ো শকুনটা ঘরে এসে ঢুকেছে কিছু টেরও পাইনি।' —আবার থেমে যায় অপু। সোফা থেকে উঠে পায়চারি করতে থাকে ঘরের মধ্যে। নন্দু দম বন্ধ করে বসে থাকে ভয়ানক কিছু শোনার জন্য। অপু পায়চারী থামায় নন্দুর সামনে এসে। নন্দুর সোফার দুটো হাতলে হাত রেখে ঝুঁকে পড়ে ফিস্ ফিস্ করে বলে —'তথাগত তোকে কখনও রেপ্ করেছে নন্দু? —হাসে অপু —করেনি। তোদের যা হয়েছে সেটা ফুলশয্যা। ভালোবাসার মিলন। দুজনের প্রবল ইচ্ছেতে একের অন্যের সঙ্গে প্রথম শারীরিক মিলন। নানা সুন্দর সুন্দর শব্দে এটাকে তোরা বিভিন্ন নামে বলতে বা সাজাতে পারিস। আমি পারি না, কারণ ওই লোকটা,

যার সঙ্গে আমার শুধু বিয়ের নামে একটা প্রহসন হয়েছিল, যাকে একদিনের জন্যও স্বামী ভাবা তো দূরের কথা, মানুষ বলেও ভাবিনি আমি, শুধু ঘেন্না করেছি-ঘেন্না! যার সঙ্গে কোনো পরিচয় হয়নি, একটি কথাও হয়নি তিনমাসে, যার চেহারাটা সঠিক কেমন তাও জানি না শুধু, ভাঙাচোরা, দোমড়ানো-মোচড়ানো একটা বুড়োটে, কুশ্রী আবছা আকৃতি ছাড়া, সেই লোকটা আমাকে রেপ করেছিল--স্বামীত্বের অধিকারে।' — নন্দুর শিরদাঁড়া বেয়ে যেন বরফগলা জল নামতে থাকে। অপু আবার পায়চারি শুরু করে। আর নন্দু ভাবতে থাকে যদি ওর নিজের জীবনে এমন ঘটনা ঘটত? ও যাকে চায় না, ভালোবাসে না, ঘেন্না করে—এমন কেউ জোর করে ওর শরীরটাকে শুধু ভোগ করতে চাইত যদি? যে কোনও মানসিক সম্পর্ক তৈরি করতেই পারেনি ওর সঙ্গে, শুধু শরীরটাকে চেয়েছে এবং জোর জবরদস্তি দখলও করেছে তবে নন্দু এটাকে কি নাম দিত? একমাত্র রেপ ছাড়া অন্য কোনো নাম কি দিতে পারত ও? এমনকি যদি মানুষটি ওর স্বামীই হত?—অপু ইজ এ্যাবস্‌লিউটলি রাইট। বেশি লেখাপড়া না জেনেও জাগতিক নিয়মেই ষোলো বছর বয়সেই এই গভীর তত্ত্বটা মগজে এসে ছিল ওর।

—'জানিস, প্রবল বাধা দিয়েছিলাম। আঁচড়ে, কামড়ে রক্তাক্ত করে দিয়েছিলাম। কিন্তু পশু যেমন শিকারকে একবার ধরলে পেট ভরে না খাওয়া পর্যন্ত ছাড়ে না, তেমনি ও আমাকে ছাড়েনি। জীবনে ওই একবার। মাত্র একবারই পেরেছিল। আমার ঘুমের সুযোগ নিয়ে। এ জীবনে আর দ্বিতীয়বার ও আমাকে পায়নি। ছুঁতেও পারে নি। কারণ ও বুঝতে পেরেছিল যে আর কখনও আমার দিকে হাত বাড়ালে ও খুন হয়ে যাবে। আমাকে ধর্ষণ করার পর ওর আর বিছানা থেকে ওঠার মতো শক্তিও ছিল না, একেবারে ন্যাতা কাঁথা একটা মরা পড়ে পড়ে হাপরের মতো শব্দ করে শ্বাস নিচ্ছিল হেঁপো রুগি, অস্থিচর্ম সার ওই লোকটা। আর আমি একলাফে উঠে ঘরের কোণায় টেবিলের ওপর রাখা ভারী কাঁসার গ্লাসটা তুলে গায়ের জোরে মেরেছিলাম ওর মাথায়। থ্যাঁতলে দিতে চেয়েছিলাম মাথাটাকে। ওর চিৎকারে কাজের মাসি রান্নাঘর থেকে ছুটে এসে জাপটে ধরে আটকে ছিল আমাকে। আর তখনই শাশুড়ি আর জা ফিরে এসেছিল নীলের থানে জল ঢেলে। আমার রণচণ্ডী মূর্তি দেখে কেউ আমাকে ঘাঁটাতে সাহস পায়নি। জানিস, সেদিন, সেমুহূর্তে আমি যে কোনো কাউকে খুন করতে পারতাম। শাশুড়ির সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলেছিলাম —'যার জন্য নীলের থানে জল ঢেলে এসেছ, তোমার সেই ঘাটের মড়া বুড়োছেলেকে তাকিয়ে দেখ আমি কি করেছি। মাথা থ্যাঁতলে দিয়েছি। আমার ইজ্জৎ লুটেছে ওই বুড়ো বাপের বয়সি ঘাটের মড়াটা। এ জীবনে আর যদি কোনোদিন আমায় স্পর্শ করার সাহস করে, তবে জেনে রেখো নীলষষ্ঠী আর তোমাকে করতে হবে না। আজ মরে গেছে কিনা জানি না—কিন্তু এরপরের বার একেবারে খুন করে ফেলব।' — চুপ করে অপু।

'তারপর' — ফিস ফিসে কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করে নন্দু অপুর উত্তেজিত গনগনে লাল মুখটা দেখে।

—'তার আর পর নেই। মাথায় চোদ্দোটা সেলাই নিয়ে, মাথাজোড়া ব্যান্ডেজ বেঁধে আমাকে দেখলেই কুকুরের মতো ল্যাজ গুটিয়ে পালাতো কাপুরুষটা।'

—'আর তোর শ্বশুর বাড়ির লোকরা? তারা কি করল? তোকে তাড়িয়ে দিল না বা পুলিশে ------।'

—'নাঃ। তাড়াবে কি করে? ভয় দেখিয়ে দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, সোজা পুলিশের কাছে গিয়ে রিপোর্ট করব যে গরিব বলে নাবালিকা মেয়েকে বুড়োটার সঙ্গে জোর করে বিয়ে দিয়েছে। আমি এ বিয়েতে রাজি ছিলাম না, জোর করে তুলে নিয়ে এসেছে অসুস্থ ছেলের বউ করে। একে আমি স্বামী বলে মেনে নিইনি। লোকটা আমাকে ইচ্ছের বিরুদ্ধে ধর্ষণ করেছে। বলেছিলাম, কেলেংকারীর চূড়ান্ত করে ছাড়ব আমি। সমাজে যাতে আর কখনও ওরা মুখ দেখাতে না পারে তার জন্য যতদূর যেতে হয় যাব। —ভয় পেয়ে ছিল ওরা আমার মহিষাসুরমর্দিনী রূপ দেখে। তাই চেপে গেল।'

—'তুই ওখানেই থেকে গেলি, নাকি মনসাতলায় চলে এলি?'

—'মনসাতলায় কেন আসব? ওখানেই বা আমার কে আছে? শ্বশুরবাড়িতেই রইলাম।'

—'তারপর কি হল? এখন তাহলে ওর সঙ্গে হেদুয়ার বাড়িতে আছিস কি করে?'

—'এখন কেন? বহুবছর ধরেই তো আছি। সরিষার বাড়িতে তো মাত্র ক'বছরই ছিলাম। ওটা ওদের দেশের বাড়ি। বাড়িটা যখন ভাগাভাগি হল, তখন আমরা হেদোর বাড়িতে চলে এলাম। ওখানে তো এখনও ভাশুর আর জা আছে। আমার বরের স্বাস্থ্যের জন্য ওর কষ্ট হত সরিষা থেকে রোজ ডালহৌসীতে ওই শরীর নিয়ে আসা যাওয়া করে চাকরিটা করতে তাই শ্বশুর বেঁচে থাকতেই হেদোর বাড়িটার ভাগ আমাদের লিখে দিয়ে গিয়েছিল। সেই থেকেই এখানে আছি।'

—'তুই বলছিস তোর বরের সঙ্গে কোনো মানসিক বা শারীরিক সম্পর্ক নেই, তাহলে তোরা কী করে থাকছিস রে একসঙ্গে? তাও এতগুলো বছর ধরে?'

—'খুব অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে, তাই না? কিন্তু এভাবেই চলছে। কথা বলি এখন, যদি প্রয়োজন হয় তবে। আমার রান্নাঘরটা তো দেখেছিস, ওটার পেছনটাতে ওরকমই আর একটা ছোটো ঘর আছে। একটা তক্তাপোশ আঁটে কোনোরকমে। ও ঐ ঘরটাতে থাকে। টি. বি. তো বিয়ের আগে থেকেই ছিল। কি রোগ নেই ওর জিজ্ঞেস কর না! -- তবু দিব্যি টিঁকে আছে।'

—'চিকিৎসা করায় না?'

—'আগে তো মনে হতো করাতো। এখন বোধহয় আর কিছু করে না। চোখের ছানি

অপারেশন হয়েছে। তখন সঙ্গে গেছি। রান্না করে ওর থালা বাটি. টিফিন কৌটোতে খাবার রেখে দিই জালের আলমারীতে। নিজে নিয়ে খায়। একসঙ্গে বসে কোনোদিন খাইনি। ওই ঘটনার পর আজ অব্দি কোনোদিন একঘরে থাকিনি, একসঙ্গে কোথাও যাইনি। দুটো চাবি আছে বাড়ির। আমার যখন যেখানে যাবার ইচ্ছে হয় চলে যাই। ও বাড়ি থাকলে অবশ্য এটুকু বলি যে আমি বেরোচ্ছি—আর কিছু নয়। ও নিজেও বলে না ও কোথায় যায়, কখন ফিরবে।—আমি কেন ওকে বলে বেরুবো?

—'আচ্ছা অপু, এভাবে জীবনটা নষ্টা না করে ডিভোর্স করতে পারতিস, আবার বিয়ে করতে পারতিস। সেটা কেন করিস নি?'

—'দ্যাখ নন্দু, আমার যখন বিয়ে হয়েছিল তখন বয়স ছিল ষোলো। মা আর বড়দি দেখেশুনেই তো দিয়েছিল বিয়েটা। আমি লেখাপড়া কতটুকু জানি সে তো তুইও জানিস। ডিভোর্স এর চল আমাদের সময় ছিল কি? বল? তাছাড়া কে করাতো ডিভোর্স? বড়দি ছাড়া আর তো কেউ ছিল না। আর বড়দি নিশ্চয়ই চাইত না যে আমি আবার গিয়ে ওর ঘাড়ে পড়ি! আর সেই সময় কি লোকের ডিভোর্স হত? বউ পছন্দ না হলে স্বামীরা প্রথম পক্ষকে ত্যাগ করে আর একটা বিয়ে করত। বউটা বাপের বাড়ি ফিরে এসে ভাইদের গলগ্রহ হয়ে থাকত। আমার তো ডিভোর্স সম্বন্ধে কোনও ধারণাই ছিল না রে। আর বড়দির কাছে ফিরে যাব না এটা একেবারে প্রতিজ্ঞা করে নিয়েছিলাম। এতর পরও শ্বশুরবাড়িটা ভালো ছিল বলে তাড়িয়েও দেয়নি আমাকে।' —অপু হতাশার ভঙ্গীতে দুদিকে দুহাত ছড়িয়ে বলে—'সেই থেকে এভাবেই চলছে!'

—'আচ্ছা একটা কথা বল তো আমাকে, যুথীপিসির তোর ওপর এত বিতৃষ্ণার কারণটা কি? যুথীপিসিকে যা দেখেছি আমি, ঠামা-মা জেঠিমাদের যা বলতে শুনতাম তাতে তো মনে হয় না যে বিনা দোষে, বিনা কারণে উনি তোর ওপর শুধু শুধু ঝাল মেটাবেন। দ্যাখ অপু আমি তো তোকেও জানি বরং বলা ভালো যে আমার থেকে বেশি তোকে আর কেউ জানে না। সত্যি কথা বলতে চাইছিস আমার কাছে, তাহলে সত্যি করে বলতো—তুই কি এমন কিছু অন্যায় করেছিলি যে জন্য উনি এত বিরক্ত ছিলেন তোর ওপর? লুকোস না অপু। অযথা একজনকে দোষী করার আগে ভেবে দ্যাখ তোর নিজের কি দোষ ছিল।'

অপু সহজে এ কথার উত্তর দেয় না। সোফা থেকে উঠে জানালাটায় গিয়ে দাঁড়ায়। নন্দুও চুপ করে বসে অপেক্ষা করতে করতে ভাবতে থাকে—কিছু একটা ব্যাপার আছে, যা অপু বলছে না। সকলের এতদিনের জানা যুথীপিসির চরিত্রের সাথে অপুর বলা আজকের যুথীপিসির কোনও মিল নেই। সবচেয়ে ছোটো বোন, প্রায় নিজের মেয়েরই মতো, তাকে কেন এমন কষ্ট দেবেন উনি? কত স্নেহময়ী ছিলেন যুথী পিসি। আর যদি সত্যিই বিনাদোষে অপুকে বাপের বয়সি, অসুস্থ একটা লোকের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে থাকেন তাহলে নন্দুর নজরে ওনার প্রতি আর কোনও শ্রদ্ধার স্থান থাকবে না।

—'বড়দির সাধের কথা তোর মনে আছে?'—জানালা থেকে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে অপু।

নন্দু নিজের স্মৃতিকোঠায় হাতড়ে বলে—'হ্যাঁ একটু একটু মনে আছে। তখন তো কত ছোট ছিলাম সবকথা মনে নেই। হঠাৎ যুথীপিসির সাধের কথা কেন মনে পড়ল তোর?'

—''আমার তখন ন'বছর বয়স। তোর মনে আছে আমি লীলাবতী সিনেমাহলে বিনেপয়সায় সবকটা সিনেমা দেখতাম?'

—'তা আবার মনে নেই? সে তো কতপরে, তখন আমরা চোদ্দো বছরের। নবছর বয়সেও কি যেতিস নাকি?'

—'চোদ্দোবছরে তোকে একদিন নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। তুই তখন দার্জিলিং-এর বোর্ডিং থেকে এসেছিলি বাড়িতে। তার অনেক আগে থেকেই আমি ম্যাটিনীতে সিনেমা দেখতাম।'

—'এরসঙ্গে যুথীপিসির সাধের কি সম্পর্ক? উনি তোকে ধরে ফেলেছিলেন ওইটুকু বয়সে সিনেমা দেখতে যাস? মারধোর করেছিলেন সেই সিগারেট খাওয়ার মতো?'

অপু আবার মৌন হয়ে যায়। নন্দু এবার খোঁচা মারে ওকে—'কি রে চুপ করে গেলি?'

—'উঁ? না, ভাবছিলাম!'—জানালা থেকে সরে এসে আবার সোফায় বসে অপু। তারপর হঠাৎই বলে—'তুই ঠিকই বলেছিস, একেবারে নির্দোষ ছিলাম না আমি। লীলাবতী সিনেমা হলে লাইটম্যান হীরামন সৈকিয়া আমাকে টিকিট ছাড়া ঢুকিয়ে দিত হলে।'

—'সে আমি জানি। তুই তখনই বলেছিলি আমাকে জামার তলা দিয়ে ----

—'মনে আছে তোর? তখন তো তেরো- চোদ্দো বছরের বুক। একটুখানি উঠেছে সবে। সে সব অনেক পরের কথা। বড়দির সাধের দিনে তো মাত্র নবছরের।'

—'কি হয়েছিল সেদিন? তখন থেকে কেবল সাধের দিনে সাধের দিনে করে যাচ্ছিস। দুপুরে একসঙ্গেই খেয়েছিলাম আমরা। কই কিছু তো হয়নি!'

—'হয়েছিল। তোরা কেউ জানিস না। কাকপক্ষীতেও জানে না।'—অপু পা তুলে নন্দুর সামনা-সামনি বসে বলে — 'সেদিন দুপুরে সকলের নজর এড়িয়ে আমি ঝনক ঝনক পায়েল বাজে দেখতে গিয়েছিলাম লীলাবতীতে। আর সেদিনই প্রথম জানতে পারি বর-বউরা কি করে।'

—'তার মানে? ঝনক ঝনক পায়েল বাজে তো আমিও দেখেছি। ওতে তো ওসব কিছু ছিল না! খুব ভালো ডান্স ছিল।' — অবাক হয়ে প্রশ্ন করে নন্দু।

—'সিনেমায় ছিল না কিন্তু হীরামন সৈকিয়া আমার সঙ্গে করেছিল।'

আর্তনাদের মতো—'এ্যাঁ' বলে নন্দুর মুখ হাঁ হয়ে যায়। চোখে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মেলানো মেশানো এক অদ্ভুৎ দৃষ্টি নিয়ে ও অপুর দিকে তাকিয়ে থাকে।

—'চমকাস না। আমাকে ধর্ষণ করেনি। আসলে শরীরের নানা জায়গায় হাত চালাতো লোকটা। নীচে হাত দিলে আমারও ভালো লাগত। এমন রক্তারক্তি কাণ্ড হবে, এত ব্যথা লাগবে সেটা জানা ছিল না। সন্ধের পরও ভয়ে বাড়ি ফিরতে পারি নি। ছাদের ঘরে বসেছিলাম। হীরামনই বসিয়ে রেখেছিল। বলেছিল সন্ধের শো শুরু হবার পর আমাকে ছাদের ঘর থেকে নামিয়ে এনে রিক্সায় তুলে দেবে। কাউকে যেন না বলি এসব কথা। দুদিন পর সব ব্যথা চলে যাবে, সব ঠিক হয়ে যাবে।—সেটাই আমার কালসর্প হল। বাড়ি আসতেই ধরা পড়ে গেলাম। একে হাঁটতেই পারছিলাম না তায় রক্ত বের হচ্ছিল পা গড়িয়ে।' — অপু আবার কি ভাবতে থাকে। নন্দুর বিস্ময়ের ঘোরও তখনও কাটেনি। এসব কি সত্যি কথা বলছে অপু? বানিয়ে বানিয়ে বলছে না তো নবছর বয়সেই ও সব জেনে ফেলেছে একথা নন্দুকে বোঝাবার জন্য। অপু সব সময় বানিয়ে মিথ্যে কথা বলতো। নন্দুর থেকে ওর জ্ঞানগম্মী বেশি সেটা ছোটোবেলায় সবসময় জাহির করতে চাইত। কিন্তু ---- এটা তো ছোটোবেলা নয়?'

—'মুখুজ্জেমশাই হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলেছিল। বড়দি রাজি হয়নি জানাজানি হবার ভয়ে। হোমিওপাথী চিকিৎসা করত মুখুজ্জেমশাই—তাতেই ভালো হয়ে ছিলাম। সবাইকে বলেছিল আমার হাম বেরিয়েছে।--সেই সিগারেট খাওয়া আর তারপর এই ঘটনা। বড়দি এমন খিঁচড়ে গেল আমার ওপর যে ছোটোবয়সের ভুল বলেও ক্ষমা করতে পারল না।' নন্দু এবার না বলে আর পারে না —'তুই যতই নিজের সাফাই দিস না কেন আমি কিন্তু এখন আর যুথীপিসিকে দোষ দিতে পারছি না। প্রথমটা শুনে আমারও যুথীপিসির ওপর রাগ হয়েছিল, এখন আর হচ্ছে না। তুই নবছর বয়সে সেক্স বুঝে গিয়েছিলি অপু? তাও আমাদের ছোটোবেলার যুগে?— কি করেছিস তুই? আচ্ছা আর একটা কথার সত্যি জবাব দে তো?—অমিতের সঙ্গে তোর সম্পর্কটা কি মামি-ভাগ্নে সম্পর্ক?—নাকি আরও বেশি কিছু?'

হঠাৎ নন্দুর এই প্রশ্নে অপু একেবারে চমকে ওঠে। মাথা নীচু করে নেয় অফ্‌গার্ড হয়ে।

নন্দু ছাড়ে না—'কি রে, চমকে উঠলি? মামি-ভাগ্নের নয় তাই না?'

অপু এবার মাথা তুলে দাঁত দিয়ে ডানহাতের নোখ কাটতে ব্যস্ত হয় তারপর একেবারে পরিষ্কার গলায় বলে—'তুই তাহলে বুঝতে পেরেছিস? তোর তো মাথা খুলে গেছে দেখছি। —না, মামি ভাগ্নে সম্পর্ক নয় বরং বলতে পারিস ওর সঙ্গেই আমার স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক। কি, খুব খারাপ লাগল তো শুনে?'

—'কিন্তু ও তো তোর থেকে বয়সে অনেক ছোটো, তোর আপন ননদের ছেলে? এটা তুই কি করে করতে পারলি? অমিত না হয়ে যদি বাইরের কেউ হত তাহলে আমার খারাপ লাগত না। কারণ তোর যা কাহিনি শুনলাম তাতে তুই তোর আসল স্বামীকে

মেনে নিতে পারিসনি বলে দোষ দেব না, এটা খুব স্বাভাবিক। তুই অন্যপুরুষে অনুরক্ত হয়েছিস, এটাও স্বাভাবিক। তোর জায়গায় আমি থাকলে আমিও হয়তো অন্য কাউকে খুঁজে নিতে বাধ্য হতাম। কিন্তু তাই বলে নিজের ননদের বয়সে ছোটো ছেলে? নিজের, ভাগ্নের সঙ্গে? অসম্ভব!'

অপু বলল—'আমার মতো জীবন কি তোর হয়েছে? তুই কি করে বুঝবি? মুখে ওরকম বলা সহজ। পরিস্থিতি মানুষকে অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করেত বাধ্য করে। সেই সময়ে আমার আশে পাশে সরিযাতে একমাত্র অমিত ছাড়া আর কেউ ছিল না। আর বাইরের কোন অন্য লোকের কথা বলছিস? তারা তো ফুর্তি করতে আসত। বুড়ো বরের কচি বউ-এর বরকে পছন্দ নয় সেই মওকা বুঝে আমাকে শুধু ব্যবহার করার ধান্দা থাকত শুওরের বাচ্চাদের। অমিতের সঙ্গে যে সম্পর্ক আমি গড়ে তুলেছিলাম সেটা কিন্তু সেরকম ছিল না।'

—'অমিতের বিয়ে হয়নি? ও কি তোর একার হয়েই আছে এখনও?'

—'বিয়ে হয়েছে। যখন বিয়ে ঠিক হল তখন অমিত বেঁকে বসেছিল বিয়ে করবে না বলে। ননদের ওই একমাত্র ছেলে, মেয়েও নেই। ওকেও আমার মতোই প্রায় জোর করে বিয়ে দিল ওরা।'

—'সিঁথির ওই ফ্ল্যাটটা অমিতের তাই না?'

—'হ্যাঁ। ওটা ও আমাদের দুজনের ব্যবহারের জন্য কিনেছিল। ও নিজেই মনের মতো করে সাজিয়েছে ফ্ল্যাটটাকে।'

—'আর ওর বউ? সে কোথায় থাকে?'

—'বউ-এর নাম ঝুমা। ও ননদ-ননদাইয়ের কাছে অমিতদের বাড়িতে থাকে।'

—'অমিত সেখানে যায় না?'

—'যাবে না কেন? যায়। তবে রাত্রে ও আমার কাছেই ফিরে আসে রোজই প্রায়।'

—'সেকি? ওর বউয়ের সঙ্গে রাত্রে থাকে না তাতে বউ আপত্তি করত না?'

—'বললাম না, মাঝে মাঝে বাড়িতেও থাকে তবে বেশিরভাগই আমার সঙ্গে থাকত। বউ রাগ করে কিনা ওসব নিয়ে আমার মাথাব্যথা করে কি লাভ? বউয়ের সঙ্গে এক-আধটা রাত তো কাটাতেই হবে? বউয়েরও তো অধিকার আছে ওর ওপরে? বউ তো আর আমার সঙ্গে ওর সম্পর্কের কথা জানত না। আজও জানে না। আমি এটাতে বাধা দেব কি করে? বেশি বাড়াবাড়ি করলে তো ফাঁস হয়ে যেত সব কথা। তখন অমিতকে হারাতে হত আমাকে। অমিত তো কাস্টমসে চাকরি করে তাই সুবিধে ছিল ওর। ঝুমাকে মিথ্যে কথা বলত। বলত রেইড আছে কিংবা রাতের ডিউটি আছে এসব। ঝুমা অবশ্য স্বামী অন্ত প্রাণ, তাই ঝামেলাও করত না।'

—'ওদেব ছেলেপুলে হয়নি?'

—'হয়েছে অনেক পরে। সে আর এক কাহিনি। পরে কোনওসময় বলব তোকে। তোকে ছাড়া আর কাকে বলব? যতটা হিংসে তোকে করতাম একসময় তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি বিশ্বাস করতাম তোকে, আজও করি। আমার তোর প্রতি একটা অদ্ভুত অনুভূতি আছে, তোর কিন্তু আমার প্রতি সেই অনুভূতিটা নেই—জানি আমি। জানিস, আমার কি মনে হত ছোটোবেলায়, আর এখনও হয়?—আমার মনে হয় তুই আর আমি যেন আলাদা দুটো মেয়ে নই, আমি যেন তোর মধ্যে মিশে আছি—বিশ্বাস কর। তা নাহলে নিজের জীবনের এতসব গোপন কথা কেউ কাউকে বলে কখনও? তুই কি বলতে পারবি আমাকে? পারবি না। কেউ পারে ন। কিন্তু আমি পারি তোকে বলতে কারণ আমি ছোটোবেলা থেকে নিজেকে অপরাজিতা ব্যানার্জি বলে ভাবতেই শিখিনি, সুনন্দা রায়চৌধুরি বলে ভেবেছি। তোর জায়গায় নিজেকে বসিয়ে কল্পনা করেছি। তোর জীবনে সব সুখ গুলোকে পেতে চেয়েছি। —পাইনি অবশ্য ছিঁটেফোঁটাও তাই হিংসে হত'—বলে হাসে অপু।

নন্দু হাসতে পারে না। কি বিচিত্র মানুষের মন! শিশুবেলা থেকে এই মেয়েটা নিজেকে অন্য একজন বলে ভেবেছে। তার জীবনের সুখের দিকগুলো পেতে চেয়েছে কিন্তু সুখ, ঐশ্বর্য্য, বিলাসিতা পাবার জন্য ভুল পথ বেছে নিয়ে নিজেকে ঘোলাজলের ঘূর্ণীতে ফেলে দিয়েছে। যদি সুনন্দার মতো জীবনটার প্রতি এত আকর্ষণ ছিল ওর তাহলে কেন নিজেকে সেই ভাবে তৈরি করল না ও? শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত হতে পারলে আজ হয়তো সম্পূর্ণ সুনন্দা না হতে পারলেও অনেকটাই তো হতে পারত?

—'তোর ননদ-ননদাইরা এসব কথা জানত? জেনেও ছেলেকে আটকায়নি?'

—'প্রথমটা জানতে পারেনি, পরে সবই জেনেছে। তোর মুখুজ্জেমশাইও জানে, বড়দিরাও জানে। হেদুয়ার বাড়িতে তো একটামাত্র ঘর দেখেছিস তো! ওই ঘরটাতে আমি থাকি, অমিত এলে ও আমার সঙ্গে থাকে। ওরা সবাই ভেবেছিল অমিতকে বিয়ে দিয়ে উপযুক্ত বউ এলে বোধহয় আমার নেশাটা ওর কেটে যাবে। সেটা হয়নি।— এখন তো ননদাই ওকে কলকাতার বাইরে অনেকদূরে বদলি করিয়ে দেবার জন্য উঠে পড়ে চেষ্টা চালাচ্ছে। তাতে কি? অমিত তো আগেও বদলি হয়েছিল, আমি তো চুপিচুপি চলে গিয়ে থেকে এসেছি ওর কাছে। এখন বদলি হলেও তাই করব। জানুক না ঝুমা, তাতে আমার কি কাঁচকলা গেল আর এলো?' অমিতের অসহায় নিরপরাধ বউ ঝুমার জন্য নন্দুর প্রাণটা আনচান করে ওঠে। অপুকে বোঝাবার চেষ্টা করে ও—'আহা, বেচারি ঝুমা! কিচ্ছু না জেনে পরম বিশ্বাসে স্বামীকে ভালোবেসে যাচ্ছে। ওর কি হবে অপু? ছেড়ে দে না অমিতকে! তোর তো বয়স হয়ে গেছে, অনেক পাপ করলি এই জীবনে, এখন না হয় একটা ভাল কাজ কর? ঝুমা তো কোনও অপরাধ করেনি। ওকে কেন শাস্তি দিচ্ছিস? স্বামীর ওপর আইনত অধিকার থাকা সত্ত্বেও ও তাকে পাচ্ছে না আর তোর কোনো

অধিকার না থেকে তুই নিজের ভাগ্নেকে বশ করে রেখে দিচ্ছিস। একবারও কি তোর বিবেক দংশনও হয় না? ছি:!'

—'বিবেক দংশন? কেন হবে? আমার কি অপরাধ ছিল যে একটা বুড়ো—অসুস্থ লোকের গলায় বড়দি আমাকে ঝুলিয়ে দিল?—মামি-ভাগ্নে! কেন, রাধা-কৃষ্ণ করলে সেটা শুদ্ধ সম্পর্ক, ঠাকুরের লীলা? আর আমি করলে ছেনালী? ঝুমার না পোষালে ঝুমা ছেড়ে দিক না অমিতকে! আমি কেন এতকাল পর ছাড়তে যাব? সকলেই নিজের দখল বজায় রাখতে চায় বুঝলি?'

—'সারাক্ষণ যুথীপিসিকে দোষ দিয়ে গেলি একবারও নিজে কি কি করে বিশ্বাস ভেঙেছিস সেটার কথা ভাবলি না। এখন বুঝতে পারছি যুথীপিসি কতটা নিরুপায় হয়ে তোর বিয়েটা দিয়েছিল। আমার মনে হচ্ছে তুই সবকথা আমাকে খুলে বললি না। এমন আরও কিছু তুই নিশ্চয়ই করেছিলি যার জন্য যুথীপিসিকে তাড়াতাড়ি পার করতে হয়েছে তোকে। সাত-আট বছর বয়স থেকে শুধুমাত্র সিনেমা দেখার লোভে তুই হিরামনকে তোর শরীরে হাত দিতে পেরেছিস যখন তখন বড়ো হয়ে আরও বেশি কিছু করেছিস বুঝতে পারছি আমি। অপু, জীবনে একটা সময়ে সব কিছুতেই সীমারেখা টানতে হয়। এখনও সময় আছে নিজেকে শোধরাবার, শুধরে নে। ঝুমা আর অমিতকে ওদের স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবনটা ফিরিয়ে দে। এতেই মঙ্গল হবে।' —নন্দুর কল্পনায় ফুটে ওঠে এক বিষদৃশ্য। হেদুয়ার ওই বাড়িতে একটামাত্র ঘরে বছরের পর বছর ধরে অমিতের সঙ্গে একই বিছানায়, স্বামীর সামনে শুয়ে, অমিতকে কত ভালোবাসে তার প্রদর্শন করে অপু আসলে মুখুজ্জেমশাই আর ওর ফ্যামিলির ওপর নিদারুণ প্রতিশোধ নিয়ে চলেছে। আর মুখুজ্জেমশাই প্রতি পলে পলে মরছে। তাহলে লোকটা আত্মহত্যা করল না কেন? --কিংবা ও অপুকে ত্যাগ করল না কেন? তবে কি মুখুজ্জেমশাই অপুকে ভালোবাসে? এমন একটা ভালোবাসা যা সব কষ্ট সইতে পারে? যা, নিজে আগুনের মধ্যে দাঁড়িয়ে জ্বলতে পুড়তে থেকেও ভালোবাসার পাত্রীটির গায়ে বালতি ভরে জল ঢালে যাতে ও না জ্বলে যায়? নাকি — মুখুজ্জেমশাই একটা কাপুরুষ? অপুর ভাষায় 'একটা ক্লীব?' —নন্দু ভেবে ভেবে কুল পায়না কোনটা ঠিক। অপু বলে—'কি ভাবছিস এত? আমাকে তোর খুব খারাপ লাগছে, ঘেন্না করছে তাই না? ভাবছিস, অপু এত নীচে নেমে গেছে? দ্যাখ নন্দু, আমার জীবনে যা কিছু ঘটেছে তার সব কিছুর জন্য দায়ী শুধু বড়দি। বড়দিকে আমি ক্ষমা করিনি আর করবোও না। কিন্তু জানিস, আমার জীবনটা নষ্ট করে দিয়েও বড়দির কোনো অনুশোচনা নেই। বড়দি তোর বাবার বয়সি নন্দু; সেদিক থেকে যদি দেখিস তাহলে ছোটো বোন হলেও আমি বড়দির মেয়েরই বয়সি। নিজের দরকারে, নিজের মেয়ের সামান্যতম দরকারে, বড়দি কত অনায়াসে আমার সাহায্য নিতে চলে আসে। আমার দাদারাও তাই। সবাই কিন্তু অমিতের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা জানে—কিন্তু কেউ

এব্যাপারটা নিয়ে কিছুই বলে না। যেন, এটা হওয়াই স্বাভাবিক পরিণতি। যতক্ষণ অমিত আছে আমার জীবনে, ততক্ষণ টাকার জোগান আছে ; ততক্ষণ ওদের হাত পাতা আছে, টাকা পাওয়া আছে। অপু কি জীবন যাপন করছে সেটা ওদের মাথাব্যথা নয় ; অপু ওদের অভাব মেটাতে না পারলেই মাথাব্যথা হবে। আমার আপনজনরা যদি এত স্বার্থপর হতে পারে তবে আমি কেন হব না? আমার কি শুধু দেবার জন্যই জন্ম হয়েছে? কিছু পাবার অধিকার নেই?'

—'সবই তো বুঝলাম অপু। তুই তোর দিক থেকে ঠিকই বলছিস, আমি মানছি। শুধু যদি অমিত না হয়ে বাইরের কেউ হত!'

—' কেন? ভগবান যখন করে তখন সেটা লীলা হয়? আর মানুষে করলেই ব্যাভিচার? রাধা শ্রীকৃষ্ণের মামি ছিল, বয়সে বড়ো ছিল,—ভুলে যাস না। একটু আগেও বললাম তোকে কথাটা।

—'ভুলে যাচ্ছি না, শুধু ভাবছি অমিতের সঙ্গে তোর সম্পর্কটার নাম কি? তুই মামি হয়েও ওর মামি নোস ; বিবাহিতা স্ত্রী ওর আছে, তাই স্ত্রীর পরিচয়ও তোর নেই। একটাই নাম আছে এধরনের সম্পর্কের—রক্ষিতা। তুই কি সেটা অস্বীকার করতে পারবি? সমাজ কিন্তু ওই নামেই ডাকবে তোকে।'

—'তুই বা সমাজ আমাকে যে নামেই ডাকিস না কেন আজ আর আমার কোনো ভয় নেই।'—একটুক্ষণ চুপ করে থাকে অপু, তারপর যখন মুখ তুলে তাকালো তখন ওর চোখ ভরা জল টলটল করছে। বলল —'আমি অমিতকে ভালোবাসি নন্দু। ওকে ছাড়া আমার কোনো অস্তিত্ব নেই। আমার সুখ, দুঃখ, পাপ, পুণ্য সব অমিত। —অমিত ছাড়া অপু একটা মস্তবড়ো শূন্য।' — 'আর একটা কথা, তোর বরকে ফোন করার পেছনে একটাই উদ্দেশ্য ছিল রে আমার। যদি ওর সঙ্গে যোগাযোগ রাখলে কখনও ভাইপো দুটোর একটা হিল্লে করে দেয়। তুই তো বলেছিলি তোরা অফিসের ব্যাপারে নাক গলাস না তাই এব্যাপারে তুই কিছু করতে পারবি না।—তাই মাঝে মাঝে তথাগতর সঙ্গে ফোনে কথা বলতাম--যাতে একটা বন্ধুত্ব তৈরি হয়। হ্যাঁ সত্যি, স্বার্থ ছিল আমার। যে ভাইরা আমার কথা কোনওদিন ভাবেও নি, ওদেরই ছেলেদের চাকরির জন্য। অন্য কোনো কারণে নয়। তথাগত যে আমার দিকে কখনও, ফিরেও তাকাবে না সে ধারণাটা আমার খুব স্পষ্টই আছে?'

—'তুই ফোন, সেলফোনের নম্বর কোথায় পেয়েছিলি?' —জিজ্ঞেস করল নন্দু।

—' তোর টেলিফোন ডাইরি থেকে। তোর বেডসাইড টেবিলের ওপর পড়েছিল ডাইরিটা। তুই বাথরুমে ঢুকেছিলি। পাতা ওলটাতে তথাগতর সব ফোনের নম্বর গুলো দেখলাম। তুলে নিয়েছিলাম নিজের নোট বইতে। সোজা ব্যাপার!' — হাসল অপু। তারপর বলল — 'নন্দু আমি হঠাৎ করে তোর জীবনে ফেরত এসে তোকে বোধহয়

একটু বেশিই জ্বালিয়েছি - নারে? তোর এমন সুন্দর সুখী নিস্তরঙ্গ জীবনে হঠাৎ কয়েকটা ঢেউ এসে পড়েছিল। মাফ যদি করতে পারিস তাহলে করিস। তোর সঙ্গে আর দেখা হবে না আমার, আর বিরক্ত করব না তোকে কোনোদিন। কথা দিলাম।' —অপু নন্দুর হাতদুটো ধরে বলে —'নন্দু, তোর প্রতি আমার একদিকে দারুণ হিংসে যেমন ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি ভালোবাসা ছিল, আজও আছে রে! দুটোই। বিশ্বাস কর।

সেদিনের পর অপু আবার হারিয়ে গেল। জীবন সমুদ্রের স্রোত ওকে কোথায়, কোন কূলে নিয়ে ফেলল সে খবর নন্দু আর রাখে নি। উলটে অপু যে ওর জীবন থেকে সরে গেছে সেটা নন্দুকে অনেক ঝঞ্ঝাটের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিল। অপুর সঙ্গে ওর মেলামেশা এ বাড়ির কেউ ভালো চোখে দেখছিল না। এমন কী এ বাড়ির কাজের লোকরা অব্দি কেমন অবাক দৃষ্টিতে তাকাতো নন্দুর দিকে। অপু চলে গিয়ে যেন এবাড়িতে ওর হারিয়ে যাওয়া মান-সম্ভ্রম আবার ফেরত দিয়ে গেল। ও নিজেও অপুর কোনো খবর নেয় নি একবারও । আর কখনও নেবে না বলে ঠিক করে নিল। অপু যেন গত দেড় বছর ধরে এই বাড়ির পরিবেশটাকেই দূষিত করে দিয়েছিল। পাঁচটা বছর কেটে গেছে এরপর। সময় সবকিছুই ফিকে করে দেয়। অপুর সাথে যে ঝড়ের পূর্বাভাস এসেছিল সে তো কবেই কেটে গেছে। নন্দুর সুখী জীবন আবার পুরনো সুখের খাতেই বইতে থাকে। এর মধ্যে নন্দু দুবার ডিব্রুগড় ঘুরে এসেছে কিন্তু অপুর গোপন কথা কাউকে বলেনি এমনকি ঠামাকেও নয়, তথাগতকেও নয়। থাক না এসব ওর নিজের কাছেই রাখা? অপু তো বিশ্বাস করে বলেছে ওকে!

সেদিন অপুর কথায় নন্দুর বাড়িতে গিয়ে এরকম অপদস্ত হয়ে ফেরৎ আসতে হবে একথা ভাবতেও পারেনি সজল, কাজলরা। ডিব্রুগড়ে থাকার সময় নন্দুদের বাড়ির সঙ্গে ওরা কখনও ঘনিষ্ঠতা করেনি, ঘনিষ্ঠতা শুধু মায়ের সঙ্গেই ছিল নন্দুর ঠাকুর্মার। ওরা নিজেরা সাহসই পেত না নন্দুর জ্যাঠতুতো দাদাদের সঙ্গে কথা বলার। কি ওদের রাজপুত্রের মতো চেহারা! কি চালচলন! মুখে ফরফর করে ইংরেজীর খই ফুটছে! — ওদের সঙ্গে কি সজল-কাজলরা মিশতে পারে? একই বাড়ির কম্পাউন্ডের মধ্যে থেকেও তো ওরা নিজেরাই নিজেদের আড়ালে সরিয়ে রাখত। নন্দু ছোটো বাচ্চা ছিল, একটামাত্র মেয়ে, খেলার সাথী ছিল না বলে সমবয়সি অপুর সঙ্গে খেলাটেলা করত। ওর দাদাদের তো সে সমস্যা ছিল না। পর পর অতগুলো ভাই, শীতকালে কেউ শিলং থেকে কেউ দার্জিলিং থেকে এসে নামত ডিব্রুগড়ে, নিজেরাই একে অন্যের সঙ্গী ছিল ওরা। ভাইয়ে ভাইয়ে ভাবসাবও খুব ছিল। ওদের হাবভাব দেখে তো মনেও হত না যে ওই বাড়ির একপাশে সজল-কাজলরা যে আছে সেটাও ওরা জানে? একমাত্র বড়দির বিয়ের আগে পর্যন্ত নন্দুর বাবা আদিত্য নারায়ণের সঙ্গে মিশত, কথাটথা বলতো। বিয়ের পর যখন আসত বরের সঙ্গে তখনও বড়দি ও বাড়িতেই বেশি সময় কাটাতো কারণ বড়দিকে কি জানি কেন ওই বাড়ির সবাই খুব পছন্দ করত—যা সজল-কাজল বা অন্য বোনদের ভাগ্যে

মোটেই জোটেনি। এমনকি নন্দুর ছোটোবেলায় ও নিজে তো ব্যানার্জি বাড়িতে বেশি আসতো না তাই সজল-কাজলরাও ওর সঙ্গেই বা কথা বলেছে কবে? চোখে দেখা আর কথাবলা—মেলামেশা করা কি এক হল?

হঠাৎ করে অপুর জোর জবরদস্তিতে রাজি হতে হয়েছিল ওদের। কাজল তো প্রথমেই বলেছিল—'মুখার্জি ম্যানশনে আমরা যাব? তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে অপু? তুই কতটুকু জানিস ওদের সম্বন্ধে?'

অপু মুখ বেঁকিয়ে বলেছিল—'ওদের সম্বন্ধে যেটুকু জানলে আমাদের কাজে লাগবে সেটুকু প্রথমদিন গিয়েই জেনে বুঝে এসেছি। দ্যাখ, ওদের অগাধ ঐশ্বর্য্য আর আমাদের ভাঁড়ার ঠনঠন গোপাল। নন্দু রাজরানি হলে কি হবে বুদ্ধি-সুদ্ধি সেই আগের মতোই রয়েছে বুঝলি? তা নাহলে এমন সমাদর করত না আমাকে আর বুলাকে। আমাদের যা চেহারা-ছবি, যা পোশাক-আশাক, এসব দেখে প্রথমদিনই কাটিয়ে দেবার চেষ্টা করত। তা তো করেনি? খুবই আপ্যায়ন, খাতির করেছে তো? —তবে? দ্যাখ্ চেপে ধরলে এইবেলা যদি পুরনো বন্ধুত্বের দোহাই পেড়ে তোদের ছেলেগুলোকে ওখানে একবার ঢুকিয়ে দিতে পারি তাহলে কি লাভটা আমার হবে নাকি তোদের হবে? সুযোগ বারবার আসে না রে কাজলদা। হাতছাড়া হয়ে গেলে পরে পস্তাতে হবে। বুঝলি?'

—'বাবা, আমার কিন্তু মোটেই ইচ্ছে নেই যে তোমরা ওখানে যাও। ছোটোপিসি এদিকে বলছে আমাদের যা চেহারা, যা পোশাক এসব কথা, ওদিকে সেদিন ওখানে ছোটোপিসি যা-তা কথা বলেছে। নন্দুপিসি তো খুব রেগে গিয়েছিল! কড়া কড়া কথাও শুনিয়েছে ছোটোপিসিকে। কি গো, এখন সব চেপে যাচ্ছো কেন ছোটপিসি? বল জেঠুকে আর বাবাকে কেমন জব্দ করেছিল তোমাকে? থোঁতা মুখ একেবারে ভোঁতা করে ভর্তা বানিয়ে ছেড়েছে। ওদের সঙ্গে গুল মেরে চালিয়াতি করতে গিয়েছিলে তুমি? ধন্য বটে!' — বুলা সুযোগ পেয়ে সব ফাঁস করে দিল।

অপু তাতে দমবার পাত্রীই নয়—'তাতে আমার ভারি বয়ে গেল! ভগবানের বিচার দেখে রাগে আমার গা জ্বলে যাচ্ছিল ওখানে গিয়ে! নন্দু বাপের বাড়িতে যা ছিল তার চেয়ে আরও হাজার গুণ বেশি বড়োলোক হয়েছে, বেশি সুখে আছে —সহ্য করা যায়? ওকে যেন ভগবান ঢেলে উপুড় করে দিয়েও ভাবছে—কম দিলুম না তো? —আর এদিকে আমাদের বেলায় দেখ? শালার ভগবান একেবারে মক্ষীচুষ! হাঁড়ি চড়াতে গিয়ে চাল থাকে না। নন্দু অনেক লেখাপড়া শিখেছে তো? একটু বড়ো বড়ো বুক্‌নি হয়েছে তাই। ওসব ধুয়ে জল খাবো আমি? আমার এখন নিজের স্বার্থচিন্তা করতে হবে বুঝলি? কি করে ওখানে মনা আর পুটুকে ঢোকানো যায়!'

সজল অপুর কথায় সায় দেয়। বলে—'অপু কিন্তু ঠিকই বলছে রে কাজল। এখন নিজের স্বার্থ দেখাটাই বড়ো কথা। আরে, মুখার্জি এ্যান্ড মুখার্জিতে একটা আর্দালীর চাকরি

পেলেও তো হিল্লে হয়ে যাবে আমার! ওদের যা মাইনে, পূজোয় মোটা বোনাস শুনেছি, —আহ! একবার যদি নন্দুটাকে ভজিয়ে আদায় করে নেওয়া যায় তাহলে আর পায় কে?—চল্ কাজল গিয়েই দেখি না! অপু আর বুলাকে তো ওর শাশুড়ি নিজে খাতির করেছে! বাবা কম কথা নয়? খবরের কাগজে ছবি বেরোয়, দেখেছি।'

—'তোর বা মনার বা পুঁটুর কি কোয়ালিফিকেশন আছে রে মেজদা? আমাদের দারিদ্র্য দেখে দুঃখে গলে গিয়ে নন্দুর বর সঙ্গে সঙ্গে চাকরি দিয়ে দেবে বিশ্বাস করছিস তুই?

একটা নয় দুটো নয় একেবারে তিনটে? মাথা না হয় অপুর খারাপ ছিল চিরকাল এখন নন্দুর আরও বেশি বড়োলোক হওয়া দেখে এসে ওর মাথাটুকু আরও বেশি খারাপ হয়ে গেছে! তাই বলে তোরও? একি ভূতের রাজার বরদান করা নাকি? না বাপু আমাকে মাফ করে দাও। আমি গিয়ে কাজ নেই!' — কাজল হাত উলটে দেয়।

ঘরের ভেতরে নৈঃশব্দ নেমে এসেছে। অপুও চুপ করে আছে যা সচরাচর ঘটে না। সজল পায়ের তলায় কড়ার চামড়া নোখ দিয়ে ছিঁড়তে ব্যস্ত। অপু ওর নিজস্ব কায়দায় দাঁত দিয়ে হাতের নোখ কেটে যেতে থাকে, মনা-পুঁটু আর বুলা বোকা বোকা চোখে বাপ-জ্যাঠা-পিসির দিকে দেখতে থাকে। সমাধান সূত্রটা কি হবে বোঝা যাচ্ছে না। তবে মনা আর পুঁটুর বড়ো সাধ একবার অন্তত দেখে আসে স্বচক্ষে ঐশ্বর্য্য দেখতে সত্যি সত্যিই কেমন হয়? বুলাটা তো ভাগ্য করেছিল বটে! ওই ওদের সঙ্গে বসে ভাতও খেয়ে এসেছে!

—'থাক, তবে! তোদের যখন পেটের খিদের চেয়েও প্রেস্টিজ জ্ঞান বেশি তখন গিয়ে কাজ নেই। আমার কি? আমার তো আর নুন আনতে পান্তা ফুরোয় না? তোদের ভালোর জন্যই নন্দুকে বলে এসেছিলাম যে তোরা যাবি।' — মুখ থেকে হাত নামিয়ে শুনিয়ে দেয় অপু। কাজল প্রশ্ন করে— 'বেশ, তুই নন্দুকে বলে দিলি আমরা যাব, তা নন্দু কি বলল?

—'না, সেরকম কিছু বলেনি তবে একথাও তো বলেনি যে না নিয়ে আসিস না!'

—'কিছু বললই না? চুপ করে রইল?' —এবার সজল জিজ্ঞেস করে।

অপু এবার স্বমূর্তি ধারণ করে —'না। একটি কথাও বলে নি। একান দিয়ে ঢুকিয়ে ওকান দিয়ে বের করে দিয়েছে। হল তো?' — চেঁচিয়ে বলল অপু। তারপর বলে যেতেই থাকে ও —'এজন্যই বলে কারও জন্য কিছু করতে নেই। তোরা নিজেদের খুব বুদ্ধিমান ভাবিস তো? এই না হলে তোদের বুদ্ধি? ওদের অসম্ভব বেশি আছে যার প্রয়োজন নেই আর আমাদের কিছুই নেই তাই যেমন করেই হোক ওদের কাছ থেকে কিছু আদায় করে নেবার চেষ্টা তো করতে হবে? তোরা মাইরি চেষ্টাটুকুও করতে চাস না! তোদের কোনো প্রেস্টিজ আছে? নেই। তো যা নেই সেটা চলে যাবার শোকে কাতরাচ্ছিস কেন? আজ না হোক কাল, কাল না হোক পরশু—একদিন না একদিন অন্তত একজনকে চাকরি দিতেই

হবে ওকে, এমন জ্বালাতে থাকব গিয়ে গিয়ে, ফোন করে করে। এদের কাছ থেকে আদায় করতে হলে চাপ দিয়ে আদায় করতে হয় বুঝলি? ওমনি ওমনি কেউ কাউকে কিছু দেয় না আজকাল ধর্না না দিলে।'

অপুর ওপর ভরসা করেই ওরা সবাই মিলে এসেছিল। এমনটা যে হবে অপু নিজেও ভাবতে পারেনি। নন্দু একেবারে পালটি খেয়ে যাবে ভাবেনি ও। এক কাপ চা খেতে পর্যন্ত বলল না সেদিন! সাঁতার কাটবে শাশুড়ির সঙ্গে জাঙ্গিয়া আর বডিস পরে! ন্যাকা! পাছায় লাথি মারতে ইচ্ছে করছিল ওর। গা জ্বালা জ্বালা করছিল হিংসেয়। কিচ্ছু করতে পারেনি, নন্দুকে দুটো কথাও শোনাতে পারেনি মনের জ্বালা ঝাল মিটিয়ে এই কাজলদার জন্য। সমানে নন্দুর পাতে ঝোল টেনে কথা বলে গেল। আর এখন কিনা মনসাতলার বাড়িতে বসে ওকেই দোষ দিচ্ছে! অপুর জন্যই নাকি ওদের প্রেস্টিজ পানচার হয়েছে।

ওদের ভাইবোনের যখন ঝগড়া চলছে পুরো দমে ঠিক সেই সময় লাঠি ভর দিয়ে বড়দি এসে ঢুকল ঘরে। কি করে যে খবর পায় কে জানে। দুদিন আগে এসেছে নাকি জামালপুর থেকে। এ বাড়ি থেকে বড়দির বাড়ি কাছে হলেও ওই খোঁড়া কোমরেও লাঠি ভর করে চলে এসেছে। রাগে গা জ্বালা করে অপুর। বড়দির শুকনো চ্যালাকাঠের মতো চেহারাটা দেখলেই অপুর বিতৃষ্ণা আসে। — 'কি হল, তুমি এখন এলে?' — জিজ্ঞেস করে অপু।

—'কেন? তুই যা নয় তাই করে বেড়াবি আর আমি চুপ করে দেখে যাবো?'

—'যা নয় তাই কি করেছি? তোমার সেবা, তোমার জামাইয়ের সেবা করেছি। সেগুলোর কথা বলছ?'

যুথী ঠান্ডা বরফের মতো চোখে অপুর দিকে তাকিয়ে থাকে তারপর ঘরে উপস্থিত সবাইকে বলে—'তোরা বাইরে যা। ওর সঙ্গে আমার কথা আছে।' এই পরিবারের ছেলেমেয়েরা নবীন ব্যানার্জি বা লক্ষ্মীকে কোনোদিন ভয় না পেলেও বড়দিকে চিরকাল ভয় করেছে, শুধু হয়তো অপু ছাড়া। সুড়সুড় করে সবাই বিনা বাক্যব্যয়ে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে একেবারে উঠোনে।

—'কি আরম্ভ করেছিস তুই? আবার নন্দুর পেছনে পড়েছিস? এবার কি সর্বনাশ করতে চাস ওর? কেন বারবার ওর বাড়িতে যাচ্ছিস তুই? তুই কি ওর চাকরানি হবার উপযুক্ত?'

—'বেশি বাড়াবাড়ি কোরো না বড়দি। তোমাকে কে বললো নন্দুর ওখানে যাচ্ছি প্রায়ই?'

—'বুলা। একটা কথা জেনে রাখ, নন্দুর জীবনে কোনো রকম ঝড় উঠতে দেব না আমি। তোর নোংরা চেহারাটা তাহলে সবাই দেখবে। ব্যারাকপুরে অনাথ আশ্রমে সূর্যকে দেখাতে নিয়ে যাব সবাইকে।'

জীবনে কোনওদিন এরকম মোক্ষম কথা অপুকে কেউ শোনায় নি। অপুর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। একেবারে বোবা দৃষ্টিতে বড়দির জ্বলন্ত চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে রইল ও বিস্ময়ে হাঁ করা মুখে। কতক্ষণ যে ঘরে কোনও শব্দ শোনা গেল না সে খেয়াল দুবোনের কারও নেই। যুথীই এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আর পারছিল না তাই লাঠির ঠুকঠুক আওয়াজ তুলে তক্তাপোশের কাছে গিয়ে বিছানায় বসল। তারপর অপুর বিস্ময়ে বোবা মুখের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

অনেকক্ষণ পর অপু যেন কেমন চুপসে গেছে একেবারে মনে হল। মুখে সমস্ত রক্ত যেন ব্লটিং পেপার দিয়ে শুষে নেওয়া হয়েছে। সারা মুখ জুড়ে একটা ভয়ের ছায়া পড়েছে। অপু কাঁপা গলায় মিনমিন করে বলল—'ওর কথা তুমি কি করে জানলে?'

যুথী অপুর চোখেমুখে ভয়ের ছাপটা ভালো করেই দেখে নিয়েছে। সারাজীবন ধরে এই মেয়েটা বদমাইশি করে এসেছে। অন্যের ভালোমানুষীর সুযোগ নিয়ে সর্বনাশ করার চেষ্টা করেছে। নিজের ভাই বোনের মাথার ওপর লাঠি ঘুরিয়েছে। আজ ওর গ্যাস বেলুন ফুটো হয়ে সব হাওয়া বের হয়ে গেছে। ও বলল—'সূর্যর বাপ অমিত জামালপুরে আমার কাছে গিয়েছিল সব বলতে। তোর কুকর্মের দিন এবার শেষ। তুই যে কি করে আমার বাবার মেয়ে হলি এটা ভাবতে আমার অবাক লাগে। কেন, সজল-কাজলরা তো অত অনটনের মধ্যেও কাটাচ্ছে, তাই বলে কি টাকা রোজগারের জন্য কোনও নোংরা পথে নেমেছে ওরা? আর তুই? সেই ৮/৯ বছর বয়সে সিনেমা দেখার লোভে নিজের কৌমার্য্য খুইয়ে এসেছিলি। অমিতকে জাল ফেলে মাছের মতো টেনে তুলে নষ্ট করেছিস, — সব বলেছে ও আমাকে। এতেও পেট ভরেনি তোর? কোথাকার পুলিশ অফিসার, এম. পি. এদের সঙ্গে রাত কাটিয়েছিস হোটেলে, গেস্টহাউসে! তুই তো দশটা বেশ্যা মরে আমার মায়ের পেটে কোনও অশুভ মুহূর্তে জন্ম বেশ্যা হয়ে এসে ঢুকে পড়েছিলি রে! -- শোন্, এটা তোর লাস্ট ওয়ার্নিং! তুই মনসাতলায় আর আসবি না। মনা-পুঁটুদের ভাল চাইতে হবে না তোকে। তোর সংস্পর্শে থাকলে সবাই নষ্ট হয়ে যাবে। বুলাকে নিয়ে গিয়ে ওর সর্বনাশ করার মতলব ভাজছিস কিনা মনে মনে তাই বা কে জানে? ওরা বড়োলোক হতে চায় না অসৎ পথে। তুই শরীর বেচে বড়োলোক হবার চেষ্টা করতে থাক আমাদের কিছু যায় আসে না। শুধু জেনে যা আজ থেকে তোর বাপের বাড়ি বলে আর কিছু নেই। ওরাও কেউ যাবে না আর তুইও আসবি না এখানে আর। —নন্দুকে যদি দ্বিতীয়বার বিরক্ত করতে যাস তাহলে আমার চেয়ে বড় শত্রু অমিতও বোধহয় হবে না তোর!'

অপু মাথা নীচু করে যুথীর উত্তেজিত কথাগুলো শুনলো। চোখ থেকে টপ টপ করে জল পড়ছিল ওর। ধরা গলায় বলল—'তুমি একেবারে ত্যাগ করে দিলে আমাকে? বাপের বাড়ির দরজাটাও বন্ধ করে দিলে? কিন্তু ওই বাপের বয়সি লোকটার সঙ্গে আমার

বিয়ে তো তুমিই দিয়েছিলে? ঠিক বয়সের ছেলের সঙ্গে বিয়ে হলে হয়তো এসব ঘটত না। তোমার দোষটা তো দেখছ না বড়দি!'

—'আমার দোষ? পরিবারের মানসম্মান বাঁচাতে শশধরেব মতো বয়স্ক লোকছাড়া অন্য কাউকে পেতাম তোর বিয়ে দেবার জন্য? ভুলে গেলি এখানে এসেই একটা বেহারি ট্যাক্সি ড্রাইভারের সঙ্গে লটঘট করতে শুরু করেছিলি মুখে রং মেখে? শশধর বলে তোর মতো কুলটাকে এখনও খেতে পরতে দিচ্ছে। অন্য কেউ হলে কবে পাছায় লাথি মেরে বের করে দিত। সন্ধ্যের সময় কানাগলিতে দাঁড়াতে হত তোকে। সেই শশধরকে তুই চিনলি না!—যাকগে আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। অমিত তোর সব নোংরামির খবর কাগজে-কলমে রেখেছে। এরপরও যদি বাড়াবাড়ি করিস তাহলে তোকে ছাড়ব না আমি আর অমিত। ভালোয় ভালোয় বিদেয় হ। আর মুখ দেখাতে আসিস না।'

অপু উঠে চলে এসেছিল। বুঝতে পেরেছিল অমিত বড়দির সঙ্গে হাত মিলিয়ে প্রতিশোধ নিতে চাইছে। ঝুমার কাছেও বলতে ওর আর বাঁধবে না। এরপরই শেষবার নন্দুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল ও আলিপুরে মুখার্জি ম্যানশনে।

॥ পাঁচ ॥

রায়চৌধুরি ভিলায় আনন্দ উৎসব। সবচেয়ে ছোটোছেলে আদিত্যর বিয়ে। বনেদি বাড়ির সুন্দরী মেয়ে শ্রীলা শান্তিনিকেতনে পড়াশুনো করেছে। সবচেয়ে ছোটোছেলের বিয়ে তাই সুহাসিনী বলেন—'এটাই তো আমাদের শেষ কাজ লক্ষ্মী। আমরা বেঁচে থাকতে থাকতে কি আর নাতি-নাতনীর বিয়ে দেখতে পাবো? তাই আমার জীবনের এই শেষ আনন্দ, উৎসব যাতে সারা ডিব্রুগড়ের মানুষের মনে থাকে সেরকম জাঁক করতেই বলেছি কত্তাকে।'

দুপুরের আসরে সুহাসিনীর খাটের ওপর বাবু হয়ে বসে যূথীদের মা লক্ষ্মী পান সেজে সেজে ডাবরে সাজিয়ে রাখছিলেন। একমুখ পিক সামলে বললেন—'ও কি অলুক্ষণে কথা দিদি? আপনার জীবনের শেষ কাজ কেন হবে? বালাই যাঠ! আপনি নাতি-নাতনীর বিয়ে দেবেন, নাতির ঘরের পুতিদের মুখ দেখবেন। ছেলেদের কার বিয়েতে জাঁক হয়নি বলুন তো? এবাড়ির প্রথম তিন ছেলের বিয়েতে কি কম ঘটা হয়েছে? ভাগ্যি উনি ডিব্রুগড়ে এসে দোকান করেছিলেন! তাইতো এমন রাজবাড়ির মতো বিয়ের ঘটা দেখার সৌভাগ্য হল! গ্রামে তো নমঃ নমঃ করে সব বিয়ে হত, তাইতেই কত আনন্দ করেছি গো দিদি! আমার নিজের বিয়েই তো ওই নমঃ বিষ্ণু বলে বাবা শাঁখা সিঁদুর-আলতা দিয়ে সেরেছিল।'—লক্ষ্মী পিক ফেলতে উঠে বাইরে যান। ফিরে এসে পা মুছে আবার খাটে উঠে বসে জিজ্ঞেস করেন —'তা দিদি, আগের বিয়েগুলো থেকেও বেশি জাঁক হবে, —সে কেমন হবে গো?'

—'হবে লক্ষ্মী হবে। ওসব কত্তার দায়। আমি চাই একথা জানিয়ে দিয়েছি ব্যস, আমার দায় শেষ।' — হাসলেন সুহাসিনী এক খিলি পান গালে পুরে। তারপর বললেন—'যুথী মাধু মল্লিকে এবার আসতে হবে। যুথীটা তো কতকাল এদিকে আসে না। আদিত্যর বিয়েতে না এসে পারবে না। ওদের আসা-যাওয়ার সব খরচ আমি দেব। মল্লি-মাধুদের ছেলেকে, জামাইকে, কাউকেই দেখিনি। ওরা তো সেই যে গেল তো গেলই, আর এলো না।'

—'কি করে আসবে দিদি? সংসারে অনটন লেগেই থাকে। এতটাকা খরচ করে আসা কি সম্ভব বলুন? কত্তা যে আনাবেন সেটাও সম্ভব হচ্ছে না। প্রত্যেকমাসেই তো কিছু টাকা পাঠাতেই হয়। আপনি তো জানেন যুথীও কিছু দেয়। তাইতে চলে টেনেটুনে। গাঁয়ে মুদিখানার দোকান আর কত ভালো চলবে দিদি? সবাই যে গরিব। বামুনের ছেলে মুদিখানা করেছে আগে কখনও শুনিনি, আমার জামাই পেটের তাগিদে করল, তাও চলে না খুব। বাঁড়ুজ্জে হাট জায়গাটাও তো পাড়াগাঁ!' —দীর্ঘশ্বাস ফেলেন লক্ষ্মী।

সুহাসিনীও দীর্ঘশ্বাস ফেলেন —'বুঝি সবই তবু বলব একটা মেয়ে পার তো হয়েছে জাতে গোত্রে? ভাগ্যে থাকলে ওই মুদিখানাই মা লক্ষীকে ধরে আনবেখোন।'

মল্লিকা আর মাধবীকে লক্ষ্মী চিঠি লিখলেও যূথীর কাছে সুহাসিনী নিজের হাতে চিঠিটা লিখে লক্ষ্মীকে দিলেন খামে ভরে পোস্ট করে দেবার জন্য। সে চিঠি হাতে পেয়ে স্কুলের টিফিন টাইমে যূথী প্রাণভরে কেঁদে নিল। স্কুলের বন্ধু রমা জিজ্ঞেস করল—'কার চিঠি রে? কোনো খারাপ খবর?'

—'না-না! খারাপ খবর কেন হতে যাবে? এই প্রথম মাসিমার কাছ থেকে ওনার নিজের হাতের লেখা চিঠি পেলাম। এত খুশি বহুকাল হইনি রে। চোখ ফেটে জল আসছে শুধু আনন্দে।'

রমা বলে—'শুনেছিলাম এরকম হয় আজ তোকে দেখে বুঝলাম শুধু দুঃখে নয়, আনন্দেও লোকে কাঁদে এভাবে। কি লিখেছেন তোর 'মাসিমা?'

—'যেতে লিখেছেন। মাসিমার চার ছেলে। তিনজনের বিয়ে হয়ে গেছে এবার সবচেয়ে ছোটোর বিয়ে। ও আর আমি সমবয়সী, ছমাসের ছোটোবড়ো। মাসিমা আমাদের দুজনের আসা-যাওয়ার প্লেনের ভাড়াও পাঠাচ্ছেন।'

রমা বলে– 'তবে আর চিন্তা কি? হাওয়ায় উড়ে চলে যা ছুটি নিয়ে। কতকাল তো যাস না কোথাও। বিয়েবাড়ি গেলে কত মানুষের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় যাদের আমরা ভুলে গিয়েছিলাম, নামও মনে করতে পারছি না অথচ ভীষণ চিনি—তাই না রে? যা-যা, এমন সুযোগ ছাড়িস না। মন, স্বাস্থ্য সব ভালো হয়ে যাবে দেখিস।'

যুথী সেদিন বার বার চিঠিটা পড়েছে। আদিত্য ! মনে পড়ে ওর আজ বহুদিন পরে আদিত্যের সেই গাড়িতে উঠে শিলংয়ে চলে যাওয়ার কথা, জানালায় বসে ওর নীরব

অশ্রুবিসর্জনের কথা, আদিত্যকে সেই বয়সে পাগলের মতো একতরফা ভালোবাসার কথা। কোথায় গেল ওর সেই নিষ্কাম প্রেম? আদিত্য এখন কোথায় আছে, দেখতে কেমন হয়েছে কই কিছুই তো আর ওকে তেমন করে ভাবাতো না? আজ মাসিমার চিঠিটা পেয়ে হঠাৎ করে খোলা জানালার ভেতর দিয়ে আদিত্যর স্মৃতি দমকা হাওয়ার মতো ওর মনের মধ্যে ঢুকে পড়ে সব ওলট-পালট করে দিল। নিজের জীবনের হাজারটা সমস্যায় বিভ্রান্ত হয়ে সে সবের মোকাবিলা করতে ব্যস্ত থাকা যুথীর হৃদয়ে আদিত্য নামের প্রথম কদমফুলটা কখন যেন শুকিয়ে গিয়েছিল, ও বুঝতেও পারেনি। সেই আদিত্যের বিয়ে? ওর জীবনজুড়ে অন্য এক নারী আপন অধিকারে বিচরণ করতে থাকবে। এ জীবনে ও কোনোদিনও জানতে পারবে না যুথী নামের খেলার সাথী, কৈশোরের বন্ধু, একটা অতি সাধারণ মেয়ে একা একা নিজের মনে কত কল্পনার ছবি এঁকেছে ওকে ঘিরে। থাক্, না জানাই ভালো। জানলে আরও খারাপ হত। আদিত্য সামনা সামনি ওকে প্রত্যাখ্যান করত ফ্যামিলি ট্র্যাডিশনের কথা পেড়ে। তাছাড়া রায়চৌধুরি পরিবার আজ এত বছর পরও যে ওকে এত ভালোবাসে সেই ভালোবাসাটাও যুথীকে হারাতে হত। বিয়ের প্রথম প্রথম যত বার ডিব্রুগড়ে গেছে কোনোবারেই আদিত্যর সঙ্গে দেখা হয়নি। দীর্ঘ তেরো বছর দেখা হয়নি। যুথীর বিবাহিত জীবনকে অতুল্য ওর ভালোবাসা, মমতা দিয়ে একেবারে ঢেকে রেখে দিয়েছে। হতে পারে অর্থনৈতিক সামর্থ অতুল্যর তেমন নেই তাহলেও সন্তানহীনতার চাপে একটি দিনের জন্যও যুথীকে দোষীর কাঠগোড়ায় দাঁড় করায়নি। বরঞ্চ যুথী হা-হুতাশ করতে বলেছে—'পৃথিবীতে আমরাই কি প্রথম যাদের সন্তান হয়নি? হয়নি তো হয়নি! কি করা যাবে?'

যুথী বলেছে—'কিন্তু মা যে এত আক্ষেপ করতে থাকেন বংশরক্ষা হল না বলে সেটাও তো অযৌক্তিক নয়? উনি তো বলেন তুমি আবার বিয়ে করলে নতুন বউ-এর ছেলে হবে। আমি বন্ধ্যা তাই আমার কোনোদিনই বাচ্চা হবে না।'

অতুল্যর মুখের ছবিতে কষ্ট ফুটে ওঠে —'জানি না যুথী মা কি বলে না বলে। শুধু এটুকুই জানি তোমাকে কষ্ট দিয়ে মার কথায় আর একটা বিয়ে করে ফেললেও বাচ্চা নাও হতে পারে। এরকম অনেক ঘটনা আছে তিন তিনবার বিয়ে করেও কোনো বউ-এরই বাচ্চা হয়নি। আচ্ছা, তুমি কি মার আক্ষেপের কথাই শুধু ভাববে? আমার কথা ভাববে না? আমি তো কখনও অবহেলা করিনি তোমাকে! সন্তান হয়নি বলে আমার ভালোবাসা তো একটুও কমে যায়নি তোমার প্রতি?'

সত্যিই অতুল্য ওর গভীর প্রেম, ভালোবাসা দিয়ে যুথীর চারপাশে এমন গন্ডী কেটে রেখেছিল যে সেই গন্ডী পার করে প্রথম জীবনের ভালোবাসা আদিত্যর নামটা আর প্রবেশ করতে পারেনি। অতুল্য তখনও সুস্থ-সবল পুরুষ, টি. বি. রোগের চিহ্নও ছিল না ওর ফুসফুসের ধারে কাছে। যুথী ভাবে —আমি কি সুখী নই? —না-না। নিশ্চয়ই সুখী।

একমাত্র কষ্ট একটা সন্তানের জন্য। এছাড়া আমার তো অন্য কোনো দুঃখ নেই। তাহলে আদিত্যর বিয়েতে যাওয়া তো যায়। না যাবার কোনো কারণ নেই। আমি কি সেই ষোলো বছর বয়সেই জানতাম না যে আদিত্যকে পাব না? ওটা আমার আকাশ কুসুম কল্পনা মাত্র ছিল? হ্যাঁ জানতাম বইকি! জানতাম বলেই তো অতুল্যর সঙ্গে বিয়ে হওয়াটাতে আমার কোনো আপত্তি প্রকাশ করিনি? এমন কি কলেজে পড়ার ছুতো ধরেও বিয়েটা আটকাইনি! —যাব আমি ডিব্রুগড়ে আদিত্যর বিয়ের উৎসবে যোগ দিতে। মাসিমার ভালোবাসার অপমান করব না।

রায়চৌধুরি ভিলা সেজে উঠেছে। একসপ্তাহ আগে থেকেই আলোক সজ্জায় সেজেছে গোটাবাড়ি। আদিত্যর আইবুড়ো ভাতের দিন থেকে নহবৎ বাজতে শুরু করেছে ভোর রাত থেকে। যেখানে যত আত্মীয়স্বজন ছিল সুহাসিনী সবাইকে আনিয়েছেন ছোটোছেলের বিয়েতে। সুহাসিনীর পার্শ্বচর লক্ষ্মীও খিদমৎ খেটে চলেছেন খুশিমনে। লক্ষ্মীর ছোটো বাচ্চাগুলোর দেখাশুনো এখন যারা বড়ো হয়েছে তারা করছে। এবাড়িতে এতলোকের মধ্যে কিন্তু নবীনবাবুর ছেলে মেয়েরা নেই। ওরা অতিথির মতো খাওয়ার টাইমে এসে খেয়ে চলে যায়। আদিত্যর আইবুড়ো দশা ঘোচানোর দিনই যুথী আর অতুল্য এসে পড়ল। মাধু আসেনি সুহাসিনী পথ খরচ পাঠানো সত্ত্বেও। মল্লিকাও আসতে পারেনি তবে একটা ভালো শাড়ি উপহার পাঠিয়েছে।

—'যুথী?' — যুথী এসেই ও বাড়িতে চলে এসেছে। আর ঢোকার মুখেই দাঁড়িয়ে আদিত্য। কি লম্বা, কী স্বাস্থ্য, কী অপরূপ সুপুরুষ। এতবছর পরে দেখেও যুথীর চিনতে ভুল হয় না।

—'তুই আমাকে চিনতে পেরেছিস এতবছর পর?'

—'বাহ! তোকে চিনব না? একহাজার বছর পর দেখলেও ঠিক চিনব।'

যুথী স্তব্ধ হয়ে যায় শুনে। এ কথা কেন বলল আদিত্য আজ ওর আইবুড়ো ভাতের দিনে? তবে কি ওর মনেও সেই ষোলো বছর বয়সে যুথীকে ঘিরে ফিকে একটা রং ধরতে শুরু করেছিল? পরে যে রং ও মুছে ফেলেছে পারিবারিক বা সামাজিক ব্যবধানের কারণে? যুথীকে চুপ করে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে আদিত্য জিজ্ঞেস করে —'অ্যাই। এমন ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে আছিস কেন? চল ভেতরে চল। কখন এলি তুই? জানিস, তুই এসেছিস দেখে খুব ভালো লাগছে রে আমার।'

হুঁশ ফিরে আসে যুথীর। ও যে কি সব আবোল তাবোল ভাবে! আদিত্য মোটেই কিছু ভেবে কথাটা বলেনি। যুথীর প্রতি বিশেষ ভাবনা ওর মনে কখনওই ছিল না। যুথী তাই নিজের মুখে হাসি টেনে এনে বলে—'বাজে কথা বলিস না। হাজার বছর পরেও চিনতে চাইলে খবর রাখতে হয় বুঝলি?'

—'কেন? খবর তো সবই পাই মার কাছ থেকে। খুব ভালো বর পেয়েছিস। তা সেই মানুষটি কোথায়? তাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিস তো?'

—'হ্যাঁ এসেছে। এখানে আসবে পরে। আমি তো এসেই চলে এলাম। তা আদিত্যবাবু, হবু বউ-এর সঙ্গে পরিচয় করেছ? কেমন লাগল তাকে?'

আদিত্য লজ্জা পেয়ে যায়। বলে—'ওই আর কী! একবারই কথা হয়েছিল সামনা সামনি। ভালোই তো লেগেছে। দেখতেও ভালো। এখন এবাড়িতে ভালো বউ হয়ে থাকলেই হলো।'

—'ও নিয়ে তুই ভাবিস না। মাসিমার কাছে সবাই ভালোই থাকবে ভালোই হবে।' —যুথী একটু চুপ করে থেকে অন্যদিকে তাকিয়ে যেন কিছু ভাবে। তারপর ওই ভাবেই বলে—তুই খুব সুখী হোসরে!'

আদিত্য যুথীর মাথায় একটা গাঁট্টা মেরে বলে—'একেবারে পাকা গিন্নিদের মতো কথা বলতে শিখে গেছিস দেখছি?'

—'সে তো হবেই। তোর থেকে এবিষয়ে কত সিনিয়ার বলতো?' — হাসতে হাসতে বলে যুথী। আদিত্য জিজ্ঞেস করে —'হ্যাঁ রে, মাধুরাও এসেছে তো? মা আমার বিয়েতে সব্বাইকে এনে জড়ো করতে চেয়েছে একজায়গায়।'

—'না রে। মাধুর আসা সম্ভব নয়। ওর কাছে তোর বিয়েতে আসার চেয়েও মাসিমার পাঠানো টাকাটার দাম অনেক বেশি। কী বিয়েই যে করল মাধু? নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মারল। —তাছাড়া, মাধু-টাধুরা কবে আর এবাড়িতে এসেছে বল তো? মা আর আমি ছাড়া আর কে আসতো? ওরা তো তোদের থেকে দূরে থাকাটাই পছন্দ করত কেন কি জানি! —যাকগে ওসব কথা। তাহলে? আদিত্যবাবুর আইবুড়ো দশা ঘুচলো এবার?'—হাসি মুখে বলে যুথী।

আইবুড়ো ভাত, বিয়ে সবই হয়ে গেল। সজ্জিত হাতির পিঠের ওপর সিংহাসনে বসে আদিত্য আর পেছনের পালকিতে নববধূ সারা ডিব্রুগড় শহর পরিক্রম করে এসে থামল রিভারসাইড রোডে রায়চৌধুরি ভিলার সামনে। হাতির পিঠে বসা আদিত্যর শরীর থেকে ঝোলা লম্বা রেশমের গাঁটছড়াটা পালকিতে বসা নববদুর শরীরের সঙ্গে শক্ত গিঁটে বাঁধা হয়ে এত পথ পরিক্রম করে এসে এখানে থেমেছে। সেটার দিকেই তাকিয়ে ছিল যুথী। ফ্যামিলি ট্র্যাডিশনের শক্ত হাতে বাঁধা এ গাঁটছড়ার পাকে পাকে বহুজনের আশীর্বাদ জড়িয়ে আছে একে অটুট করে রাখার কামনায়। আজ এত বছর পর আবার চোখের কোণটাতে একফোঁটা জল যেন চিকচিক করে ওঠে যুথীকার। বর-কনেকে নামাতে ব্যস্ত কেউই লক্ষ করে না বহু লোকের ভিড়ের একপাশে দাঁড়িয়ে থাকা এক সাধারণ মেয়ের সাধারণ দুটো চোখের কোলে হঠাৎ জমে ওঠা একফোঁটা চোখের জল।

যুথীকা স্কুল থেকে ফিরে যখন বাড়িতে ঢুকছে অতুল্য তখন চেম্বারে বসে আছে। ডেকে বলল —'যুথী, তোমার চিঠি এসেছে নিয়ে যাও।'

যুথীকা চিঠিটা দেখে বলল—'ডিব্রুগড় থেকে এসেছে। মা লিখেছে নিশ্চয়ই। ওখান

থেকে ফিরে পৌঁছানোর খবর দিয়ে চিঠি দিয়েছিলাম তার উত্তর তিনমাস পর এল। কি আর করবে বেচারা মা? এতবড়ো একটা সংসার সামলে কখন আর লিখবে?' — বলতে বলতে চিঠি নিয়ে বেরিয়ে যায় যুথী।

ঘরে এসে চিঠি পড়ে গুম হয়ে বসে থাকে ও। রাগে, দুঃখে, লজ্জায়-ঘেন্নায় আস্তে আস্তে ভেতরের উত্তপ্ত ভাপ জল হয়ে বেরিয়ে আসতে থাকে চোখ দিয়ে। গতবারেই শাশুড়ি একলক্ষটা কথা শুনিয়েছিল, এরপরও ......? নিজের বাবা-মার প্রতি এক অসহায় আক্রোশে জ্বলতে থাকে বন্ধ্যা যুথীর হৃদয়। ছি: ছি:। এরা কি মানুষ? —না এরা মানুষ নয়! এরা পশুরও অধম শরীর সর্বস্ব দুটো প্রায় বৃদ্ধ প্রাণী। মা আবার গর্ভবতী! যুথীর সমস্ত রাগটা গিয়ে পড়ে ইনিয়ে বিনিয়ে লেখা মা'র চিঠিটার ওপর। খাম, খাতার পাতা ছেঁড়া দুটো পৃষ্ঠা কুচিয়ে ছোটো ছোটো টুকরোয় ছিঁড়তে থাকে ও। দশম সন্তান? ' তোমার আবার ভাইবোন হবে'?—থু থু! —সত্যিই থুথু ফেলে যুথী চিঠিটার কুচিকুচি টুকরো গুলোর ওপর। একবার আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছিল আর সে রকম চেষ্টা করবে না ও। কাদের লজ্জা চেপে রাখার জন্য নিজেকে শেষ করবে ও? শুধু এ চিঠির কেন? আর কোনো চিঠির উত্তরই কখনও দেবে না যুথী। বাবা খাট তৈরি করে আলাদা ঘরে শোয়? এই আলাদা ঘরে শোওয়া? প্রবৃত্তির তাড়নার কাছে লজ্জা, বিবেক, বুদ্ধি সবকিছু বিকিয়ে বসে আছে! আগের বারে যুথী যে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল সে কথাটাও পর্যন্ত মনে রাখেনি। মাধুর বাচ্চা থেকে মাধুর মায়ের পেটের ভাইবোন বয়সে ছোটো হবে। ছি:! আর ভাবতে পারছে না ও।

নিজের তরফ থেকে বাপের বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করার স্পৃহা মরে গেলেও ওদিক থেকে চিঠি আসত। এরকমই এক চিঠিতে জানতে পেরেছিল বাবা-মার দশম সন্তান—আরও একটি মেয়ে হওয়ার কথা। সঙ্গে আরও একটি সু-সংবাদ ছিল। আদিত্যের বউ শ্রীলাও ক'মাসের অন্তঃস্বত্তা। হু হু করা বুকে রুক্ষ মরুঝড় বয়ে গেল যুথীর। নিজের নিস্ফলা পেটে হাত রেখে ভাবতে লাগল— কেমন করে নড়ে চড়ে পেটের সন্তান পেটের ভেতরে? মা হবার সম্ভাবনা জানার পর কেমন হয় একটি মেয়ের মানসিক ভাবনা। কি সেই অজানা অনুভূতিস্বরূপ যা ও কোনওদিন বুঝবে না? —নির্জলা শুকনো চোখে ছাদের কড়িবরগা দেখতে দেখতে শ্রীলা নামের রূপসী রাজরাজেশ্বরী নারীর মাতৃরূপের গভীরে প্রবেশ করার চেষ্টা করতে থাকে যুথীকার মন। শ্রীলার প্রতি ওর মনে কোনও বিদ্বেষ নেই। খুব সুন্দর সম্পর্ক ওদের। যতবার ডিব্রুগড়ে গেছে ওদেব বিয়ের আগে কোনোদিনই আদিত্যর ব্যবহারে ওর মনে হয়নি যে ও যুথীকে খুব মিস করে। শ্রীলার সঙ্গে বিয়েতে ও যে কত খুশি সেটাও বিয়েতে গিয়ে যুথী বুঝতে পেরেছিল।

বহুদিন হয়ে গেছে যুথীকা বাপের বাড়ি যাওয়া বন্ধ করেছে। বাবা দোকানের জিনিষপত্র কিনতে এলে শুধু বাবার সঙ্গেই দেখা হয়। মা কিংবা বাকি সাত-ভাইবোনের

জন্য যুথীর মন আর কাঁদে না। বাবা যখন আসে তখন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব খবর বের করে নেয় যুথী। ভাইগুলো যে একটাও মানুষ হয়নি আর হবেও না কখনও বুঝতে বাকি থাকে না ওর। বিশেষ করে বড়োছেলে বাদল যে একেবারে উচ্ছন্নে গেছে তার জন্য মাকেই মনে মনে দায়ী করে ও। বাবা-মায়ের দশম সন্তানটি এখন ৬ বছরের। বাবা বলে —'অপুটাকে দেখতে একেবারে তোর মতো ফর্সা হয়েছে রে যুথী। তবে মুখের আদল তোর মার মতো বুঝলি? ভয়ানক দুষ্টু। আদিত্যের মেয়েটা তো ওর থেকে ৬ মাসের ছোটো, ওটার ওপর সারাক্ষণ সর্দারি করে অপু। ও বাড়িতেই দিনের বেশির ভাগ সময় কাটে ওর। তুই তো ওকে এখনও দেখলিই না।

নিজের সবচেয়ে ছোটোবোনের ব্যাখ্যান শোনার বিশেষ আগ্রহ দেখায় না যুথী। ও জিজ্ঞেস করে —'আদিত্যের মেয়েটা কার মতো হয়েছে? ওর কথা বল বাবা। আমার ওদের কথা শুনতে ইচ্ছে করছে।'

মেয়ের নিস্পৃহ মুখের চেহারা আর কথা শুনে নবীনবাবু মনে মনে আহত হলেন। প্রায় ৭ বছর যুথী ডিব্রুগড় যায়নি। অপুর জন্মের খবর দিয়ে যে চিঠি দিয়েছিলেন সে চিঠির উত্তর না দিয়ে শুরু হয়েছিল ওর বাপের বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন করার বিদ্রোহ। এই ৭ বছরে মল্লিকা আর মাধু পর্যন্ত একবার গিয়ে ঘুরে এসেছে, কিন্তু যুথী সেই আদিত্যের বিয়ের পর আর যায়নি। একটা চিঠির উত্তরও দেয়নি। নবীন বোঝেন ওর বিদ্রোহের কারণ, কিন্তু উনিই বা কি করবেন? নিজেদের এতগুলো সন্তান হলো কিন্তু মেয়ের শূন্য কোল আজ অবধি পূর্ণ হল না—এ দুঃখ তো ওনাদেরও আছে। কিন্তু তাই বলে যুথী একেবারে নিজের বোনের কথা শুনতেই চাইবে না এটা কেমন কথা? তবুও নিজের মনের ভাব গোপন করে রেখেই বললেন—'আদিত্যর মেয়ে, অপরূপ সুন্দরী হবে এ তো জানা কথাই রে। যেমন সুন্দর আদিত্য তেমনি সুন্দর ওর বউ। আদিত্যের মেয়েটাকে অপু তার চ্যালা বানিয়ে নিয়েছে বুঝলি? ওদের তো ব্যাপারই আলাদা, এতগুলো ছেলের পর বাড়িতে একটা মেয়ে এসেছে, তোর মাসিমার তো নয়নের মণি এই নাতনি। গভর্নেস রেখে দিয়েছে একজন। আদিত্যের মেয়েটা অপুর মতো দুষ্টু নয়, বেশ শান্ত। তবে অপু যা দুষ্টু, ওর সঙ্গে থেকে কতদিন যে শান্ত থাকবে সে ভগবানই জানেন।' — বলে খুব হাসতে থাকেন নবীন। বাবার হাসি দেখে যুথীর গা জ্বলে যায়। নাতনির বয়সি নিজের মেয়েকে নিয়ে হাসতে লজ্জাও করে না মানুষটার।

—'গভর্নেস রেখে বাড়িতেই পড়াচ্ছে? ওদের পরিবারে তো এ নিয়ম চালু ছিল না। ছোট্ট বয়সেই তো বোর্ডিং স্কুলে চলে যায়!' —ও আবারও অপুর প্রসঙ্গ চাপা দেয়।

—'ওরে বাবা! বউঠান একেবারে ফতেয়া জারি করে দিয়েছেন নন্দু ডিব্রুগড়ে থেকেই পড়বে, বাইরে যাবে না। নাতনি ওনার অন্তপ্রাণ। ওকে ছেড়ে থাকতেই পারেন না।'

—'আদিত্যের মেয়ের নাম বুঝি নন্দু?'

—'না, আসল নাম সুনন্দা। বাড়িতে নন্দু বলে ডাকে।'

নবীনবাবু এবার অনুনয় করে বলেন—'যুথী কতকাল তুই বাড়ি যাসনি মা, এবার চল না আমার সঙ্গে? তোর মা খুব মন খারাপ করে থাকে রে! কতদিন দেখেনি তোকে। তোর মাসিমাও বলে তোর মাকে একথা। চল না মা এবার? তুই রাজি হলে আমি বেয়াইমশাইকে বলি।'

যুথী চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ তারপর বলে—'না বাবা, এখন যাওয়া সম্ভব নয়। তোমার জামাইয়ের শরীর ভালো নয়। ও যেতে পারবে না। আর ওকে রেখে আমার একা যাওয়াটা শাশুড়ি ভালো চোখে দেখবেন না। ও একটু সেরে উঠলে একবার যাব আদিত্যর মেয়েকে, মাসিমাকে দেখতে।'

নবীনবাবুর মাথাটা নীচু হয়ে যায়। বড়ো অভিমানী, আত্ম সম্মানী মেয়ে যুথী। নিঃসন্তান মেয়েটা শাশুড়ির গঞ্জনায় একবার আত্মহত্য করতে চেষ্টা করেছিল। শুধু একটা সন্তানের অভাবে এদের বংশটা এখানেই শেষ হয়ে যাবে আর উনি কতগুলো অপগন্ড সন্তান জন্ম দিয়ে বংশের মুখে কালি মাখানোর ব্যবস্থা করে রেখেছেন। বাদল উচ্ছৃঙ্খল হয়ে গেছে। সে শাসনের বাইরে। নবীনবাবু বোঝেন তার নবম আর দশম সন্তানের জন্ম দেওয়াটা যুথী মেনে নিতে পারেনি। ওর বুড়ো বাবা - মা যুথীর খেলার সাথী আদিত্যর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে একেবারে নাতনির বয়সি অপুকে জন্ম দেওয়াটা যুথী বাবা-মার অপরাধ বলে মনে করেছে। আর তাই বার বার তোলা সত্ত্বেও অপুর প্রসঙ্গ ও শুনতেই চাইছে না। ও বুঝিয়ে দিচ্ছে যে বাপের বাড়ী বলতে ও আর কিছু জানে না। ডিব্রুগড়ে গেলেও ও রায়চৌধুরী পবিবারের আকর্ষণে যাবে।

অম্বিকাচরণ জানেন একমাত্র ছেলে অতুল্যকে ক্ষয় রোগে ধরেছে। কিন্তু কথাটা নিজের আস্তীনের বাইরে বের করেননি উনি, এমনকি স্ত্রীকেও বলেন নি। গ্রাম্য সমাজ, এক্ষুনি একঘরের মতো হয়ে যেতে হবে জানাজানি হলে। ছেলের ঘন ঘন জ্বর, কাশি এবং ওজন কমে যাওয়া, সব লক্ষণগুলোই ক্ষয়রোগের। যক্ষ্মার কোনো চিকিৎসা নেই অ্যালোপ্যাথিতে। গবেষণা চলছে, হয়তো একদিন আবিষ্কার হবে জীবনদায়ী ওষুধ, হয়তো একদিন এই মারাত্মক রোগ মামুলি সর্দি-জ্বরের মতো মনে করবে ডাক্তাররা কিন্তু এখন এ রোগে একমাত্র বিশ্রাম আর রাজসিক খাওয়াদাওয়া ছাড়া আর বিশেষ কিছু নেই। হোমিওপ্যাথিতে যে সব ওষুধের উল্লেখ আছে সে গুলোই দিচ্ছেন উনি ছেলেকে। অতুল্যার এখন রুগিবাড়ি যাওয়া বন্ধ। সে চেম্বারে বসে ২/৪টে রুগি দেখে। বাকি সবই অম্বিকাচরণের ঘাড়ে পড়েছে বলা ঠিক হবে না, উনি নিজেই ঘাড়ে তুলে নিয়েছেন। এমনিতেও অতুল্য যে কোনোদিন নামকরা ডাক্তার হতে পারবে না সেটা জানতেন উনি। তবু ধন্বন্তরি অম্বিকাচরণ চেয়েছিলেন তার নামের ছায়ায় বেড়ে ওঠা অতুল্যর অন্তত

জীবিকা নির্বাহের মতো পসারটুকু থাকে। তাও হলো না আর। নিজের রোগটাকেই নিজে ধরতে পারেনি অতুল্য। ও ভাবে ওর ঠান্ডা লাগছে, সর্দিগর্মী হচ্ছে তাই কাশি সারে না, জ্বর আসে সকাল-বিকেল। এই বংশের শেষ প্রদীপটাও নিবু নিবু করছে। এটাকে জ্বালিয়ে রাখতে অম্বিকাচরণ যখন বিশ্রাম নেবার সময় এলো জীবনে তখন দ্বিগুণ পরিশ্রম করে যেতে থাকলেন। উনি জানেন কেন অতুল্যর এ রোগ হয়েছে। ওদের বংশে কারও কোনোদিন যক্ষা ছিল না, এমনও নয় যে আশে-পাশে, কারও এই মারণ-ব্যধি আছে যাদের সঙ্গে অতুল্য মেলামেশা করে। বউমার তো অটুট স্বাস্থ্য। বড়ো কষ্ট হয় নিজের একমাত্র ছেলেটার জন্য। বিবাহিত পুরুষ, যখন বাবা হতে পারে না তার যন্ত্রণা বড়ো ভয়ানক বাজে মনের মধ্যে। অতুল্য শান্ত, স্বভাবচাপা মানুষ। বউমাকে বড়ো ভালোবাসে। ওর মা যখন আবার বিয়ে দেবার কথা বলেছিল তখন ছেলের মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। বাবার কাছে এসে করুণ মুখে একটাই প্রশ্ন করেছিল—'দোষটা যে শুধু যুথীরই সেটা কি বলা যায়? আমারও তো হতে পারে অন্তত ডাক্তারি বইয়ের মতে?'

অম্বিকাচরণ বুঝতে পেরেছিলেন এ ছেলেকে দ্বিতীয় বিবাহে রাজী করানো যাবে না। সেসব তো অতুল্য যখন সুস্থ ছিল তখনকার কথা। এখন তো আর কোনো প্রশ্নই আসে না। এদিকে গিন্নির হা-হুতাশও সহ্য করতে হয় সবাইকে। অতুল্যর মনের ওপর এই বিষক্রিয়ার ফলে ভেতরে ভেতরে দগ্ধ হতে হতে ছেলেটা এ রোগ বাঁধিয়ে বসেছে। অসহায় অম্বিকাচরণ অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে শিউরে ওঠেন আর ছেলের খাদ্য তালিকায় ফল, ঘি, দুধ, মাছ-মাংসের পরিমাণ বাড়িয়ে যেতে থাকেন। যে করেই হোক টিকিয়ে তো রাখতেই হবে ওকে।

তাই নবীনবাবু যখন যুথীর কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে অম্বিকাচরণকে ধরলেন —'যুথী আর অতুল্য তো অনেকদিন যায়নি ডিব্রুগড়ে এবার যদি যেত তাহলে ----- নবীনবাবুকে থামিয়ে দিয়ে অম্বিকাচারণ বলে ওঠেন—'নিশ্চয়ই! কি যে হয়েছে বউমার জানি না! মেয়েরা বাপের বাড়ি যাবার কথা শুনলে লাফিয়ে ওঠে। প্রথম প্রথম তো প্রতিবছরই গেছে। হঠাৎ করে যাওয়া বন্ধ করে দিল। যাক না ওরা। ঘুরে এলে স্থান পরিবর্তনে স্বাস্থ্যও ভালো হবে মনও ভালো হবে। আমি বলব বউমাকে।'

বাবার সঙ্গেই আসতে না পারলেও ক'দিন পর আসতে হয়েছিল যুথী আর অতুল্যকে ডিব্রুগড়ে। সবচেয়ে ছোটোবোন অপুকে আর আদিত্যর মেয়ে নন্দুকে যুথীর সেটাই প্রথম দেখা। অপুকে দেখেই ও বুঝেছিল সর্বকনিষ্ঠ বোনটি আদরে বাঁদর তৈরি হচ্ছে আর নন্দুকেও নষ্ট করার চেষ্টা করছে। অতুল্য খুব সিগারেট খেতো। যুথীকে কেউ না বললেও অতুল্যর কাশির সাথে একদিন রক্তছিটে মেশানো কফ বেরোতে দেখেছিল ও। সেদিনই অতুল্যও প্রথম বুঝেছিল ওর সর্দি-গর্মীর জ্বর হয় না বা সিগারেট খাওয়ার জন্য কাশি হয় না। ও যক্ষ্মা রোগের শিকার। নিজেদের শোবার ঘরে সেই রাতে নিজের জন্য মাটিতে

আলাদা শয্যা রচনা করেছিল অতুল্য। যুথী মানে নি। বলেছিল—' হোক আমারও, একসাথেই মরব। তবু তোমাকে মাটিতে বিছানা করে শুতে দেব না আমি।'

—'না যুথী। তুমি মরতে চাইলেও আমি তোমাকে এরোগ উপহার দিতে পারব না। আজ বুঝতে পারছি বাবা কেন আমাকে বসিয়ে রাখে, কেন হঠাৎ করে এত এত খাবার খাওয়ায়। বিশ্বাস করো আমাদের বংশে কারও এরোগ ছিল না। আমার কী করে হল বলতে পার? এ প্রশ্নের উত্তর তো যুথীও জানে না। তাই নিজের ভাগ্যকে দোষ দেয়—আমার কপালের লিখন। খণ্ডাবে কে? আচ্ছা কোনো চিকিৎসাই নেই?'

—'নাহ্! এখনও নেই। ওই খাদ্য, মানসিক প্রফুল্লতা আর বিশ্রাম যারা পর্যাপ্ত নিতে পারে তারা সহজে মরে না। টিকে থাকে কোনওরকমে। কতজন আর পারে বল এমন দুধ, ঘি, মাখন, ফল, ডিম, মাংস রোজ রোজ খেতে? জানো, এজন্যই এটাকে রাজরোগ বলে। রাজার মতো সেবা-যত্ন চায় যে!'

—'তুমিও বেঁচে থাকবে। আমরা তোমাকে রাজার মতো সেবা-যত্ন-খাদ্য সব দেব! শুধু ওই সিগরেট খাওয়াটা ছাড়ো।'

—'ওটা আর কেড়ে নিও না। ওইটুকু থাক না। নতুন করে আর কী খারাপ হবে বল? — যুথী, এটা কিন্তু খুব ছোঁওয়াচে রোগ। আমার হাঁচি, কাশি, মুখের লালার থেকে সংক্রমণ হবে। তাই তুমি খাটে শোও, আমি নীচেই শুই। আর একটা কথা—আমার বাসনগুলো মাকে না জানিয়ে আলাদা করতে পারবে?'

কেঁদে ফেলে যুথী —'না-না। ওসব আমি পারব না। মা কে আর তাহলে বাঁচানো যাবে না নয়তো উনি পাগল হয়ে যাবেন। ওনার একটা সাধও আমি পূর্ণ করতে পারলাম না। আর এখন সংসারের ভেতরে ওনার একমাত্র ছেলেকে অচ্ছুৎ করে রাখব? ও আমি পারব না। আর তোমাকে আলাদা বিছানায় শুতে দিতেও পারব না। না হয় ----

—'না হয় কি যুথী?'

যুথীর মুখটা লজ্জা পেলে এখনও লাল হয়ে ওঠে। এত দুঃখের মধ্যেও লালমুখটা নত করে ও বলল—'আমরা নাহয় সাবধানে থাকব। তুমি আমাকে চুমু খেও না তাহলেই তো হল।'

অতুল্য হেসে ফেলল। বলল —'জীবনে অনেক কিছুই হয়তো পাইনি কিন্তু তোমাকে পেয়েছি। আমার কাছে এটাই অনেক—অনেক পাওয়া। — বেশ, সেটা নাহয় বিশেষ সময়টাতে মানা যাবে. কিন্তু এমনিতেও ডাক্তারিমতেই আমাকে আলাদাই শুতে হবে। তুমি কষ্ট পেও না।

ডিব্রুগড়ে এসে যুথীকে অনেক অভিনয় করতে হল ভাইবোনদের কাছে ব্যাপারটা গোপন রাখার জন্য। কার মুখ থেকে কখন বেরিয়ে যাবে কথাটা কে জানে? বাবা—মা প্রতিজ্ঞার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে জানলেন। এমনিতেও ওরা জানলেও ফাঁস করতেন না।

লক্ষ্মী জামাইয়ের জন্য ঝকঝকে একসেট কাঁসার বাসন বের করলেন কাঠের বাক্স থেকে। যুথী ঠেলাঠেলি করে বোনেদের তক্তপোশে ঢুকে শুতে লাগল। বলল—'প্রায় সাতবছর পর এসেছি রে। তোদের সঙ্গে শোব যে কদিন থাকব। তোদের মুখুজ্জেমশাই কদিন হাত পা ছড়িয়ে শুক শ্বশুরবাড়ি এসে।'

এসব ছাপোষা বাড়িতে অ্যাশট্রে রাখার চলন নেই। অতুল্য ধূমপান করে শেষপ্রান্তগুলো নিজের ঘরের মেঝেতেই ফেলত। একদিন নন্দুর গভর্নেস অপুর হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে এসে ঢুকলো এবাড়িতে। খাসিয়া গভর্নেসের হাতে গাছের ডালভাঙ্গা একটা চেলা কাঠ। মুখ চোখ রাগে গনগনে আগুনের মতো লাল। অপু যে হাঁটতে পারছে না খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আসছে ওর টানের চোটে সেদিকেও খেয়াল নেই। একেবারে লক্ষ্মীর সামনে এসে থামল অ্যালিস। ততক্ষণে যুথীরাও সবাই বেরিয়ে এসেছে কি হয়েছে জানার জন্য। অ্যালিস হাতে ধরা সিগারেট বাটস্ গুলো আর একটা দেশলাই দেখিয়ে বলল—'এই দেখুন আপনাদের স্পয়েল্ড অপুর কাণ্ড। অসভ্য মেয়েকে শাসন করতে না পারলে দড়ি দিয়ে বেঁধে ঘরে রাখবেন। ওবাড়ির বাগানে নিজে সিগারেট খাচ্ছিল আর নন্দুকে খেতে শেখাবার চেষ্টা করছিল। আমি এই গাছের ডাল দিয়ে মেরেছি। পা কেটে রক্ত বের হচ্ছে। এরপর কোনওদিন মেরেই ফেলব একেবারে। যা করার করবেন। একটা বদমাশ মেয়ের জন্য নন্দুকে নষ্ট হতে দেব না আমি।'—বলে একধাক্কা মেরে অপুকে সমবেত পরিবারের সামনে ফেলে দিয়ে গজগজ করতে করতে চলে যেতে যেতে বলতে থাকে অ্যালিস—'কি করে যে এরকম একটা লো গ্রেড ফ্যামিলিকে মি. রায়চৌধুরি নিজের বাড়িতে জায়গা দিয়েছেন জানি না। এই সাতবছর বয়সে যা উচ্ছৃঙ্খল মেয়ে একটা তৈরি করেছে এরা পরে চুনকালি আরও মাখাবে।'

যুথীর মাথায় রক্ত চড়ে গিয়েছিল সেদিন। একেই এসে থেকে অপুনাম্নী ছোটোবোনের কীর্তিকলাপ দেখে বিতৃষ্ণায় মন বিষিয়েই ছিল তার ওপর এই ঘটনা ওর মস্তিষ্কে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দিয়েছিল। অপুর গোড়ালির ওপর থেকে পায়ের ডিম পর্যন্ত ফালা হয়ে কেটে ঝরঝর করে রক্ত পড়ছিল। চামড়া সরে গিয়ে মাংস দেখা যাচ্ছিল অ্যালিসের পেটানোতে, সে সব কোনোদিকে লক্ষ না করে যুথী রণচণ্ডীর মতো ঝাপিয়ে পড়ল অপুর ওপর —'নিজে একটা নষ্ট মেয়ে হয়েছিস, এখন আদিত্যর ভালো মেয়েটাকে নষ্ট করতে চাস?'

কারও সাহসেই কুলোয় না মারমুখী যুথীকে বাধা দেয়। চিৎকার চ্যাঁচামেচিতে ও বাড়ি থেকে সুহাসিনীও চলে এসেছিলেন। —'কি হল? এমন করে মারছিস কেন? আবার কি করল?' —জিজ্ঞেস করল সুহাসিনী।

যুথী অপুর চুলের মুঠি না ছেড়েই লাল মুখে বলে—'কি করেছে? নিজেদের মুখে চুনকালি মাখাচ্ছে তাতে তো এবাড়ির কিছু আসে যায় না। কিন্তু এবার ওর বিষ তোমাদের ওপরও ঢালতে যাচ্ছে। নষ্ট করার চেষ্টা করছে তোমার নাতনিকে। ওকে সিগারেট খাওয়া

শেখাচ্ছিল এই নচ্ছার মেয়েটা। অ্যালিস, মেরে শুধু পা ফাটিয়েছে, এবার আমি ওকে একেবারে মেরে ফেলব। শুওরের পাল! একটাও মানুষ নয়! বছরে বছরে শুধু খোয়ারে সংখ্যা বাড়াচ্ছে।' —রাগে অন্ধ যুথীর খেয়ালই থাকে না কি সব অপমানজনক কথা নিজের বাবা-মাকে বলে ফেলল। সুহাসিনীই বাধা দেন বিরক্ত হয়ে—'আহ! কি সব যা-তা বলছিস! থাম এবার। শাসন না পেয়ে এমন বেড়ে গেছে যে এখন ওকে বাঁধা দুঃসাধ্য! রক্তে তো ভেসে যাচ্ছে রে! ওষুধ টষুধ লাগা এখন।'

—'তোমরাই বা ওকে নন্দুর সঙ্গে মিশতে দাও কেন মাসিমা? ও যে একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে সে খবর রাখো তোমরা কেউ? সেদিন বেজবড়ুয়াদের বাড়ি দেখা করতে গিয়ে যা শুনে এলাম সে সব খবর আমার মা বোধহয় জানে না। আর জানলেও চেপে চেপে রাখে। চিনি তো আমি মা কে! ছি: ছি: ! লজ্জায় বেজবড়ুয়াদের বাড়ি থেকে পালিয়ে আসতে পারলে বাঁচি যেন! এটা আমার বোন ভাবতেও আমার খারাপ লাগে। সিগারেট খাচ্ছে আবার নন্দুকেও চেষ্টা করছে খাওয়াতে।' —যুথী আরও কয়েক ঘা দেয় অপুকে। শেষ পর্যন্ত অতুল্য এসে টেনে না নিয়ে গেলে সেদিন বোধহয় অপুকে হাসপাতালের বেডে পাঠিয়ে ছাড়ত যুথী।

সুহাসিনী এবার যুথীর মা লক্ষ্মী আর সমবেত ছেলেমেয়েদের দিকে চোখ রাখেন। মনে মনে ওদের দেখে ওনারও ঘৃণা হয়। সত্যিই কতগুলো শুওরের পাল। সবকটা ছেলের বিড়ি ফোঁকা কালো কালো ঠোঁট, গালবসা চোয়াড়ে চেহারা। ভদ্রলোকের বাড়ির ছেলে বলে মনে হয় না ওদের। মেয়েগুলোও তেমনি! ফর্সা ফর্সা চেহারাতে হীনম্মন্যতার ছাপ, চোখগুলোতে কুটিলতা। উনি লক্ষ্মীর দিকে তাকিয়ে শীতল কণ্ঠে বলেন—'লক্ষ্মী , এবাড়িতে আমি বেশি আসি না নিতান্ত প্রয়োজন না পড়লে তুমি জানো। অপুকে যদি ঘরে বন্ধ রাখতে না পারো তাহলে কিন্তু আমি ওনাকে বলে তোমাদের এবাড়ি ছেড়ে যেতে বাধ্য করব। তোমার মেয়ের জন্য নন্দু খারাপ পথে যাবে এ আমি হতে দেব না। দেড়শো বছরের ইজ্জৎ আমাদের, অপুর জন্য তো আর সেটা খোওয়াতে পারি না?' — চলে আসেন সুহাসিনী ওখান থেকে।

তারপর যতদিন যুথী ছিল অপু আর এবাড়িতে আসার সাহস পায়নি। নন্দুকেও অ্যালিস নজরে নজরে রাখত। অপুর নিজেরও চলাফেরা করার ক্ষমতা ছিল না অবশ্য রামধোলাইয়ের পর। লক্ষ্মীও দু-তিনদিন এবাড়িতে পা রাখেন নি। মানে লেগেছে খুব। কিন্তু যুথী সাবলীল ভাবেই বার বাব এসেছে। সুহাসিনীর সাথে শ্রীলা, আদিত্যর সাথে অপুকে নিয়েই আলোচনা করেছে। —নিরুপায় ভাবে জিজ্ঞেস করেছে—' তোমরাই বল কি করা যায় ওকে নিয়ে?'

শ্রীলা বলে—'তুমি কি জান যুথীদি যে ও স্কুলেও যায় না? আর মাসিমা সেজন্য কিচ্ছুটি বলেন না ওকে। দেখ যুথীদি, আমি নিজেই সবচেয়ে ভয়ে ভয়ে থাকি পাছে আমার

মেয়েটা অপুর দেখাদেখি এরকম অসভ্য হয়ে যায়। আমরা আর কি করব বল? ওকে আসতে না দিলে নন্দু নিজেই যাবে ওর টানে। মহা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অপু এইটুকু বয়সে পেকে একেবারে কাঁঠালের মতো গন্ধ ছড়াচ্ছে। সারাটা পাড়া জুড়ে ওই মেয়ের জন্য তোমাদের বাড়ির বদনাম। তারপর আবার বাদ ----

—'আহ! ছোটোবউমা! এই মেয়েটা দুদিনের জন্য বেড়াতে এসেছে ওকে কি সবকথা না বললেই নয়? থাক ওসব।'

শাশুড়ির বকুনি খেয়ে শ্রীলা মাঝপথেই থেমে যায়। ও ঐবাড়ির কাউকে পছন্দ করে না। মনে মনে ভাবে এখন থামালে কি হবে যুথীদিকে একলা পেলেই বাদলদার কীর্তিকাহিনি জানিয়ে দেব। দুঃশ্চরিত্র বাদলদা তো বাইরে বলে বেড়ায় ও রায়চৌধুরি বাড়ির লোক। যারা জানে না তারা তো ওর শ্বশুরবাড়িকেই বদনাম করবে। এ শ্রীলা হতে দেবে না। যুথীদিই একমাত্র ভালো ওই পরিবারে তাই ওকে অবশ্যই বাদলের কথা জানিয়ে রাখতে হবে।

সেবারে বাকিকটা দিন নির্বিঘ্নেই কাটিয়ে আসতে পেরেছিল যুথী। তবে আসার আগে শ্রীলার কাছে বাদলের কথা শুনে বাবাকে প্রশ্ন করতে ছাড়েনি ও। মা ব্যাপারটা চাপা দেবার চেষ্টা করলেও নবীন ব্যানার্জি মাথানীচু করেই স্বীকার করেছিলেন বাদল হাতের বাইরে চলে গেছে। বলেছিলেন—'সব জানি মা, কিন্তু কিছুই করতে পারি না। প্রথম থেকে তো কোনো সন্তানটাকেই আমরা সামান্য শাসনটুকুও করিনি, এখন পাখি খাঁচা ছেড়ে বেরিয়ে গেছে, আর কি তাকে খাঁচায় ফেরত আনা যায়' —'সজল, কাজল, কেয়া, অপু এরা তো এখনও খাঁচায়ই আছে বাবা? ওদের জন্য তোমরা কতটুকু ভাবো? কেন ওদের লেখাপড়া হল না? অপু এত অসভ্য কি করে তৈরি হল বাবা? তোমাদের দোষটা আর কত চেপে রাখবে?' —নবীনবাবু কোন উত্তর দিতে পারেন না ওকে।

॥ ছয় ॥

অতুল্যর জ্যাঠামশাই, মানে অম্বিকাচরণের আপন জ্যাঠতুতো দাদা কালিকাচরণ এসেছেন মনসাতলা গ্রামে ছোটোভাই অম্বিকার বাড়িতে। কালিকাচরণ কালিসাধক তান্ত্রিক। লোকে কালিকা বাবা বলে ডাকে। চারিদিকে প্রচুর নামডাক আছে। কালিকা বাবার তাবিজ-কবচ নাকি অব্যর্থ। লম্বা, গৌর বর্ণ, সাদা ধবধবে কাশের মতো পিঠ অবধি চুল, তেমনি দাড়ি বুক ছুঁয়েছে, রক্তবর্ণ ধুতি চাদর, কপালে টকটকে লাল তেলা সিঁদুরের তিলক, গলায় বড়ো বড়ো রুদ্রাক্ষের মালা পরা কালিকাবাবাকে দেখলে বেশ সম্ভ্রম জাগে মানুষের মনে কারণ ওই রক্তবর্ণ পোশাক-তিলক বাদ দিলে ৭৭ বছরের বৃদ্ধের উন্নত নাসিকার পাশে দুটি উজ্জ্বল মায়াবী চোখ কেমন একরকম স্নিগ্ধতা এনে দিয়েছে চেহারাটাতে। কালিকা বাবার এই মনসাতলাতেই জন্ম। অম্বিকাচরনের বর্তমান বাড়ির

উত্তরদিকে, অল্পদূরেই কালিকা অম্বিকাদের মূল ভিটে। কালিকাচরণ অবশ্য বহুযুগ আগেই গৃহত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন আধ্যাত্মমার্গের সন্ধানে। অম্বিকারা তখনও ওই মূল বাড়িতেই একহাঁড়িতে ছিলেন। অনেক পরে অম্বিকা এই জমি কিনে বাড়ি করেছিলেন। জ্যাঠতুতো মেজদাদা মাঝে মধ্যে উদয় হতেন সন্ন্যাসী বেশে, নিজের মায়ের সামনেই স্বপাকে রান্না সেদ্ধ ভাত খেতেন। জেঠিমার কান্নাকাটি, জ্যাঠামশাইর ক্রোধ কিছুই কালিকাচরণকে গৃহমুখী করতে পারেনি। সে সব কত যুগ আগের কথা! মূল বাড়িতে অবশ্য কখনও ঘুঘু চরেনি। এখনও অম্বিকা-কালিকাদের ভাইপোরা থাকে। মেজদা কালিকাবাবা বর্তমানে তারাপিঠে মন্দির করে আখড়া গেড়েছেন।

যুথী আর অতুল্যকে বেশ হাসিমুখেই ডিব্রুগড়ে পাঠিয়ে অতুল্যর মা স্বামীর কাছে নাছোড়বান্দা বায়না করতে লাগলেন রোজ। মেজভাশুরঠাকুর কালিকাবাবার কাছে একবার তারাপিঠে নিয়ে যেতে হবে তাকে। এদিককার যেখানে যত ষষ্ঠীতলা, কালীতলা, শিবতলা আছে সব ঠাকুরের থানেই তো মানত করা শেষ হল এবার নিজের খ্যাতনামা ভাশুরের শরণাপন্ন হতে চান উনি বউমার সন্তান কামনায়। —'নিজের পরিবারে এতবড়ো একজন সাধু থাকতে তুমি আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাওনি কেন এতদিন?' — অনুযোগ করেন যুথীর শাশুড়ি।

—'আমি এসবে বিশ্বাস করি না গিন্নি। ডাক্তারি শাস্ত্রে সন্তান তাবিজ কবচে হয় না। সন্তান ধারণ করার উপাদান শরীরে থাকলে তবেই সন্তান হয়।'

ঝাঁঝিয়ে ওঠেন গিন্নি—'কার দোষে আজ আমার উঠোনে নাতি-নাতনীরা খেলে না? কার পছন্দে এই মেয়ের সঙ্গে আমার অতুল্যর বিয়ে হয়েছিল বল? তুমি-তুমি! তোমার জন্যই ওই বাঁজা মেয়ে এসে ঢুকল বউ হয়ে। নির্বংশ করে রেখে দিল আমাদের ওই অলক্ষি বউটা। মা মাগি বিয়োতে বিয়োতে বুড়ি হয়ে গেল, পরের বোন দুটোও বিয়ে হতে না হতেই বিয়োতে শুরু করল আর ইনি? ধিঙ্গী পানা করে ইস্কুলের দিদিমণি হয়েই কাটিয়ে দিলেন এতগুলো বছর! — ওগো তুমি জান না, মেজভাশুরঠাকুরের কাছে গিয়ে কেউ খালি হাতে ফিরে আসেনি। যে যা মানত নিয়ে গেছে সকলের আশা পূর্ণ হয়েছে। ভাশুরঠাকুরের অসীম ক্ষমতা রয়েছে? তা না হলে এত নামডাক? —এই যে, তোমাকে যে লোকে ধন্বন্তরী বলে, তুমি রোগ ভালো করে দিতে পারো বলেই তো? তেমনি ভাশুরঠাকুরও সারাজীবনের সাধনার ফলে লোকের মানত পূর্ণ করতে পারেন বলেই না লোকে তাকে এত ভক্তি করে, মানে? চলো না গো একবারটি যাই তারাপীঠে?

স্ত্রীর মোক্ষম উদাহরণের সামনে অম্বিকাচরণ থমকে যান। কিন্তু তার শিক্ষিত মন মানতে চায় না জরি-বুটিতে এসব ক্ষেত্রে কোনো কাজ হয় বলে। যুথীকে রুগি দেখতে গিয়ে বড়ো পছন্দ হয়েছিল তার। নিজের একমাত্র ছেলের জন্য এমনই একটি শিক্ষিতা মেয়ে কল্পনা করে রেখেছিলেন। তখন কি আর জানতেন যুথী কখনও মা হবে না? —তবু

ডাক্তার হিসেবে নিজের মনের সংশয়টা তো আর স্ত্রীকে বলতে পারেন না উনি? সন্তান না হওয়ার জন্য অতুল্যও দায়ী হতে পারে—যূথী নয় একথা বললে গিন্নি মানবে না। প্রায় লেখাপড়া না জানা গ্রাম্য মহিলা বুঝতেই চাইবে না যে পুরুষের দোষেও বহু মেয়ে মা হতে পারে না। উনি পছন্দ করে যূথীকে বউ করে এনেছিলেন বলে প্রতিনিয়ত গিন্নি খোঁটা দেন, যদি অতুল্যর দোষে বাচ্চা হচ্ছে না বলেন তাহলে তো হাতে মাথা কাটবেন!—পালিয়ে বাঁচেন অম্বিকা।

কিন্তু পালিয়ে যাবেনটা কোথায়? পরদিন, তারপর দিন, —এভাবে প্রত্যেকদিন বলতে বলতে শেষে মোক্ষম বানটি মারেন গিন্নি একদিন। উঠোনের মাঝখানে স্বামীর পা জড়িয়ে ধরে সটান মাটিতে শুয়ে পড়ে বলেন—'মেজভাশুরঠাকুরের কাছে যাবে কিনা বল? তা না হলে এই যে আমি হত্যে দিলুম আর উঠব না। নির্জলা পড়ে থাকব এই রোদ্দুরে।'

দুপুরে চেম্বার রুম থেকে বেরিয়ে একবার পরিস্থিতি দেখতে এসে দেখেন গিন্নি সত্যিই নিজের প্রতিজ্ঞায় অটল হয়ে উঠোনে একইভাবে উপুড় হয়ে শুয়ে আছেন। অম্বিকা বোঝেন বংশ-রক্ষা বংশ-রক্ষা করতে করতে স্নায়ুপীড়ায় প্রায় উন্মাদ রোগের শিকার হতে চলেছে মানুষটা।

অম্বিকা একাই গেলেন মেজদাদা কালিকাবাবার কাছে তারাপীঠে। অনেকদিন পর দু-ভাইয়ের দেখা হল। বেশ অনেক বছর কালিকা মনসাতলাতে পা রাখেন নি তবু দেখা মাত্রই ভাইকে চিনতে পারলেন। আশ্চর্য হয়ে বললেন—'কি রে তুই? দেশে সব কুশল-মঙ্গল তো?'

দশ বছরের বড়ো সন্ন্যাসি দাদাকে প্রণাম সেরে অম্বিকা বললেন—'অন্য সবাই ভালোই আছে মেজদাদা শুধু আমার পরিবারটা ছাড়া। তুমি তো কতকাল যাও না দেশে তাই জান না। আমাব বড়ো সমস্যা গো দাদা। তোমার বউমা উঠোনে হত্যে দিয়ে পড়ে থেকে পাঠাল আমাকে।'

—'সব শুনব পরে। আগে হাতমুখ ধুয়ে জলটল খা, একটু বিশ্রাম কর। কতদূর থেকে কত যুগ পর এলি তুই! কদিন থাকবি তো?'

—'না মেজদাদা, একদিনের বেশি কী করে থাকব বল? চেম্বার বন্ধ করে এসেছি। রুগীরা এসে ফিরে যাবে।'

—'কেন? তোর ছেলে অতুল্যও তো বসে শুনেছি হারু দত্তর মুখে। হারু মাঝে মাঝে আসে এখানে। ওর মুখেই খবর পাই।'

—'ঠিকই শুনেছ। কিন্তু অতুল্য আর বউমা গেছে ডিব্রুগড়ে —তাই!'

—'আসাম? মহামায়া কামাখ্যার দেশ। অনেকদিন ছিলাম কামাখ্যা মায়ের কাছে। সে যাইহোক তুই এখন আগে খাওয়া দাওয়া কর, একটু জিরিয়ে নে, সারা রাত তো পড়ে আছে সব শোনার জন্য।

সেই রাতে অম্বিকার মুখে সমস্ত কথা শুনে কালিকাচরণ চুপ করে প্রায় ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকলেন অনেকক্ষণ। তারপর অম্বিকার পিঠে হাত রেখে মায়াময় দুটো চোখ মেলে তাকিয়ে বললেন—'হ্যাঁ রে, তুই তো ডাক্তার! তুই নিজে কি বিশ্বাস করিস যে সাধনমার্গে বন্ধ্যা রমণীকে সন্তান ধারনের ব্যবস্থা দেওয়া আছে?'

অম্বিকা অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন। কিছুক্ষণ উত্তর দিতে পারেন না প্রশ্নের। তারপর সত্যিকথাই বলে ফেলেন—'সত্যি বলতে আমি বিশ্বাস করিনা মেজদাদা। আর বউমাকেও বন্ধ্যা বলতে পারি না আমি। অতুল্যরও দোষ থাকতে পারে যে জন্য সন্তান হচ্ছে না।'কালিকাচরণ হাসলেন। কী স্নিগ্ধ সেই হাসি। বড়ো ভরসা হল অম্বিকার। দাদার হাতদুটো ধরে বললেন—'তোমার বউমাকে বাঁচানোর জন্য একটা কিছু উপায় করো মেজদাদা। সে স্নায়ুরোগে ভুগছে নাতি-নাতনি করে করে। এরপর উন্মাদরোগ না হয়ে যায়।'

—'অম্বিকা, তুই যে তোর এসবে বিশ্বাস নেই বলে আমার কাছে সত্যকথা বলেছিস তার জন্য বড়ো গর্ব হচ্ছে রে আমার। বেশির ভাগ লোকে মিথ্যে কথা বলে। মনে মনে অবিশ্বাস নিয়ে আসে এখানে, সত্য-মিথ্যার দ্বিধা-দ্বন্দ্বের দোলাচলে দুলতে দুলতে দিব্যি মিথ্যে কথা বলে—হ্যাঁ বাবা, অগাধ বিশ্বাস করি বলেই তো এসেছি। তুই একেবারে আগের মতোই আছিস রে, ঘুণে ধরেনি তোকে। — হ্যাঁ, অতুল্যর দোষেও হতে পারে বইকি! ওর বউ বন্ধ্যা নাও হতে পারে। দেখা যাক্ মা কি বলে! মাকে আগে জিজ্ঞেস করি তারপর মায়ের দেখানো পথেই এগোব। উপায় হয়তো আছে, অনেকেরই হয়েছে। কিন্তু মায়ের অনুমতি না পেলে শাস্ত্রসিদ্ধ উপায়ও নেওয়া যাবে না রে।— অতুল্যরা ফিরবে কবে?'

অম্বিকাচরণ জানালেন ফেরার তারিখ। কালিকা পাঁজি খুলে কিছু দেখে বললেন—'আগামী শুক্লা তিথিতে আমি নিজে যাব দেশে। তোর কাছেই গিয়ে উঠব। অতুল্যর তো আবার যক্ষ্মাও হয়েছে বলছিস! মারাত্মক নয় তো?'

—'না, এখনও মারাত্মক বলা যায় না। একদিন কাশির সঙ্গে রক্তের ছিটে বেরিয়েছিল। যতটা সম্ভব যত্নে রেখেছি। চেহারাটা খাওয়া-দাওয়ার প্রাচুর্যে বরং আগের থেকে ভালোই হয়েছে। তবু রোগটাও তো আর যে সে রোগ নয়? তার ওপর কোনো ওষুধই বের হয়নি।'

—'দ্যাখ অম্বিকা, তোকে আমি হঠাৎ করে বিপদে পড়ে ভগবানে বিশ্বাসী হতে বলব না। আমার নিজের বিশ্বাস থেকে বলছি—শাস্ত্রে যে সব উপায় আছে সেসব প্রয়োগ করে কিছুদিন দেখব আমি। মায়ের আদেশ পেলে শেষ শাস্ত্রসিদ্ধ প্রক্রিয়াটি প্রয়োগ করব। কিন্তু কি ওষুধ, কি কবচ দিচ্ছি বা কি প্রক্রিয়া প্রয়োগ করছি এ নিয়ে কখনও কোন কৌতূহল প্রকাশ করবি না। তাহলে কিন্তু কোনো ফল হবে না। এটা তো শুধু তোর বংশ নয়

আমারও বংশ। একে রক্ষা করার চেষ্টা আমি করব। আগে অতুল্যকে আর ওর বউকে দেখি— তারপর ওষুধ-বিষুধ দেব। এখন ঘুমো, আর আমি মার কাছে যাই।'

—'এখন এই এত রাত্তিরে মন্দিরে গিয়ে ঢুকবে আবার? ঘুমোবে না তুমি?'

কালিকা আবার সেই স্নিগ্ধ হাসি হাসলেন। বললেন—'ছেলে তার মার কাছে যাবে তার কি কোনও সময় - অসময় আছে রে অম্বিকা? তুই যে গুরুদায়িত্ব চাপিয়ে দিলি ভাই! আমার নিজের বংশরক্ষার জন্য মাকে বলতে হবে না? না ডাকলে, না কাঁদলে ও বেটি কিচ্ছু দেয় না সহজে। —নে তুই ঘুমো এখন।'

তারাপীঠ থেকে ফিরে আসার পর থেকে গিন্নি একেবারে আগের মতো হাসিখুশি ভালোমানুষ। ভাশুরঠাকুর ওনার ডাকে সাড়া দিয়ে একযুগ পরে দেশে আসবেন, ওনার গৃহেই অবস্থান করবেন,—এ যেন মেঘ না চাইতেই জল! স্ত্রীর অগাধ বিশ্বাস দেখে অম্বিকাও মনে বল পান। কি জানি? কথায় বলে বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর। তবে মেজদাদা কালিকাবাবার সঙ্গে একদিন একরাত কাটিয়ে এত ভালো লেগেছে অম্বিকার যা মুখে বলে বর্ণন করা যায় না। মেজদাদা যে সাধন মার্গে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করেছে এবং মানুষটা যে ছোটো ভাইয়ের সঙ্গে কোনও রকম ভণ্ডামীর পথে যায়নি এটুকু বোঝার মতো জ্ঞান-বুদ্ধি ৬৭ বছরের অম্বিকা ডাক্তারের আছে। ওষুধ, জড়ি-বুটি, কবচে কাজ না হলে নিজের বংশ রক্ষা করার জন্য শাস্ত্রসিদ্ধ শেষ প্রক্রিয়াটি করতে হলে মায়ের আদেশের অপেক্ষা করতে হবে। একমাত্র মা আদেশ দিলে তবেই নিজবংশে সেই শেষ প্রক্রিয়াটি প্রয়োগ করা যাবে। অম্বিকাচরণ কুলীন ব্রাহ্মণ সন্তান, কালিকাচরণেরই ভাই। অল্প-স্বল্প শাস্ত্রজ্ঞান তার আছে। শেষ প্রক্রিয়া তিনি জানেন তাই কৌতূহল প্রকাশ করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু সেটা ভাবতেও শিউরে ওঠে তার শরীর।

কালিকাবাবা এ গ্রামে কারও জ্যাঠা, কারও দাদু, কারও বা শুধুই কালিকা, — কিন্তু অম্বিকা ডাক্তারের উঠোনে সৎসঙ্গ করতে আসা গ্রামশুদ্ধু লোকের মুখে এখন উনি একমাত্র কালিকাবাবা নামেই পরিচিত হচ্ছেন সব সম্পর্কের গণ্ডী ভেঙে। যুথীর এই সব অভিজ্ঞতা নেই। ডিব্রুগড়ে রায়চৌধুরি বাড়িতে মাসিমাদের কুলগুরুকে দেখেছে ও। সাদা ধুতি লুঙ্গির মতো করে পরা, সাদা উত্তরীয় গায়ে জড়ানো সাধারণ মানুষের মতোই এক জন। কিন্তু এই কালিকাবাবা ওরফে ওর জ্যাঠাশ্বশুর তাদের মতো নন। শ্বেত চুল-দাড়িওলা বৃদ্ধ মানুষটির চারপাশ থেকে যেন একটা জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। তন্ত্র-মন্ত্র, সাধুসন্ত নিয়ে যুথী আগে কখনও ভাবেইনি। আজ একেবারে নিজেদের বাড়ির অন্দরে উপস্থিত এই তেজস্বী মানুষটির প্রবচন শুনতে শুনতে ও ভাবছিল জীবনের এই দিকটা ওর কাছে আজকের আগে একেবারে অজ্ঞাত ছিল। নিত্যপুজো, বৃহস্পতিবারে লক্ষ্মীপুজো করতে হয় তাই করত। ধর্ম, শাস্ত্র এসব সম্বন্ধে কোনো জ্ঞানই ছিল না ওর লক্ষ্মীর পাঁচালির বেশি। কত জ্ঞানী, কত পণ্ডিত মানুষ ওর এই জ্যাঠশ্বশুরটি। শ্বশুরমশাই

বলেছিলেন একেবারে বাল্যকাল থেকেই নাকি ওনার মেজদাদার মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাবের প্রকাশ দেখা যেত। ওনার ছককুণ্ডলীতে নাকি সন্ন্যাস যোগ ছিল। তাই মাত্র ১৪ বছর বয়সেই একদিন বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন কোথায় কেউ জানত না। অনেক অনেক বছর পর রক্তাম্বর এক সাধু একদিন বাড়িতে এলে কেউ প্রথমে তাকে চিনতেই পারেনি। চিনতে পারার পর অনেক কান্নাকাটি, অনেক সাধ্য সাধনাতেও টলানো যায়নি তাকে। নিজের মানবী মাকে শোকে ভাসিয়ে মাটির মূর্তির মায়ের টানে আবার চলে গিয়েছিলেন। তবে এরপর থেকে হঠাৎ হঠাৎ দেশে এসে উদয় হতেন। কি জানি কি কারণে এই মানুষটির প্রতি প্রথম দর্শন-শ্রবণেই যুথীর মনে প্রবল শ্রদ্ধা জেগে উঠল।

পরদিন সকালে হোমকুণ্ড সাজিয়ে অসম্ভব সুরেলা স্তোত্র উচ্চারণে হোমযজ্ঞ করলেন কালিকাবাবা। অতুল্য আর যুথীকে দুপাশে বসিয়ে রাখলেন সর্বক্ষণ। মাঝে মাঝে ওদের দিয়ে আহুতি দেওয়াতে থাকলেন মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে। সব শেষ হলে দুজনকে দুটি তাবিজ বেঁধে নিতে বললেন কোমরে। বললেন—' কোনোরকম অশৌচ বাড়িতে যেও না এটা পরে। নেহাতই যেতে হলে খুলে পঞ্চগব্যে ভিজিয়ে রেখে যেও। ফিরে এসে স্নান করে আবার ধারণ করো।'

কয়েকটা ওষুধ দিলেন। দুজনেরই আলাদা আলাদা ওষুধ এবং সেবন বিধি লিখে দিলেন। পরদিন চলে যাবার আগে অতুল্যর মা লম্বা ঘোমটার আড়ালে বিধিমতো মুখশ্রী ঢেকে ভাশুরঠাকুরকে প্রণাম করলেন পা না ছুঁয়ে, মাটিতে লুটিয়ে। জিজ্ঞেস করলেন—'ঠাকুর সবকিছু ঠিকমতো হয়েছে তো? কোনও কাজে ত্রুটি হয়নি তো?'

—'না বউমা। কোনও ত্রুটি হয়নি। অন্তরের প্রবল আবেগে যে কাজ করা হয় তাতে ত্রুটি খুব কমই ঘটে।'

—'ঠাকুর, এবার কি তাহলে বউমার শূন্য কোল ভরবে?'

—'সে কথা তো দিতে পারি না বউমা। আমি আমার কাজটুকু করেছি এবার মা তাঁর কাজ তাঁর ইচ্ছে হলেই করবেন। এজন্যই তো মাকে ইচ্ছাময়ী বলে বউমা!'

রওয়ানা হয়ে যাবার আগে অন্যান্য আত্মীয় পরিজনের কাছ থেকে অম্বিকাডাক্তারকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে বললেন—'যে ওষুধ অতুল্যকে দিয়েছি তাতে ওর কাশির সঙ্গে রক্তপড়াটা বন্ধ হবে। এ একেবারে অব্যর্থ। তাই বলে মনে করিস না যক্ষ্মারোগ সেরে গেল। যেমন যত্নে রেখেছিলি তেমনি যত্নেই রাখতে হবে, তেমনি খাবারের জোগান দিয়ে যেতে হবে। আর বউ কে যে কবচ দিয়েছি সেটার আয়ু তিনমাস মাত্র। যদি এই তিনমাসের মধ্যে ওরা মিলিত হবার পরও সন্তান সম্ভবা না হয় তবে আমাকে চিঠি লিখে জানাস। অন্য উপায় করতে হবে।'

—'মেজদাদা, আমরা শ্বশুর-শাশুড়ি হয়ে কি করে জিজ্ঞেস করব ওরা মিলিত হচ্ছে কি না? এখবর জানা তো অসম্ভব!' —অসহায় মুখে বলেন অম্বিকা।'

—'তা তো বুঝলাম। একজন কারও মাধ্যমে বোঝাতে হবে ওদের। তোর স্ত্রীকে বল যুথীর কোনো বন্ধুকে একাজে লাগাতে। অবশ্য ওষুধগুলো সেবন বিধির সঙ্গে মাসের বিশেষ কয়েকটা দিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একথাটা কাগজে লিখে দিয়েছি আমি। ওরা সেটার অর্থ বুঝলেই হয়।

সাধক কালিকা বাবা চলে গেলেন তারাপীঠে। অতুল্যর মা রোজ নিজের হাতে নিয়ম করে ওষুধগুলো দিয়ে যেতে লাগলেন ছেলে-বউকে। জ্যাঠার ওষুধের অব্যর্থ গুণ যুথী এখনও না টের পেলেও অতুল্য বেশ প্রফুল্ল হয়ে উঠছিল। কাশির সঙ্গে রক্তের ছিটে বাবা শুধু একদিন দেখেছিল, যুথী এখানে একদিন আর ডিব্রুগড়ে রুমালে একদিন, এই দুদিন মাত্র দেখেছিল। কিন্তু অতুল্য জানে ওর অন্তত ৫/৬ বার সামান্য ছিটে ছিটে রক্ত বেরিয়েছে, ও জ্যাঠার ওষুধ খাওয়ার পর থেকে রক্ত বের হয়নি। জ্যাঠার প্রতি বিশ্বাসের শিকড়টা অতুল্যর মন জমিনে একটু একটু করে প্রোথিত হতে থাকে। মনে মনে ভাবে—কোন গুণ না থাকলে কি আর লোকের মন জয় করে বিখ্যাত হতে পেরেছেন মানুষটা? হতেও পারে বিয়ের ১৫ বছর পর ও আর যুথী বাবা মা হতে পারে। আশার ফুলকিটাকে অতুল্য নিজের মনের মধ্যেই একা একা জ্বালিয়ে রাখে সকলের আড়ালে। জ্যাঠার লিখে দেওয়া কাগজের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে ও। যুথী লজ্জিত হাসি নিয়ে অতুল্যকে বলে —'অ্যাই, জানো মায়ের কাণ্ড?'

—'কি হল আবার? কি কাণ্ড করলো মা?'

—'আরে ওই যে জ্যাঠামশাই কাগজে লিখেছেন না মাসের বিশেষ কয়েকটা দিন খুব গুরুত্বপূর্ণ?'

—'হ্যাঁ। তা মা আবার সেটা নিয়ে কী কাণ্ড করে বসল? তোমাকে কি সেটাও বোঝাতে চেয়েছে নাকি? মা একেবারে পাগল হয়ে যাচ্ছে দেখছি?'

—'তুমি না একটা যাচ্ছে তাই! কথাটা শোনার আগেই নিজে নিজে উপসংহার টেনে দাও। মা কি কখনও পারেন আমাকে এসব কথা বলতে? ছি:! — আসলে মা নিজে বলতে পারেন না বলেই চাটুজ্জে বাড়ির দিদাকে লাগিয়েছেন। সেদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে চাটুজ্জে দিদা পথের মধ্যে ধরলেন আমাকে। বলেন—ও নাতবউ দাঁড়া, দাঁড়া, তোর সঙ্গে কথা আছে। তো আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। উনি এসে গায়ে মাথায় হাতবুলিয়ে বললেন— জানিস নাতবউ তোর শ্বশুরকে যেমন লোকে ধন্বন্তরী বলে তেমনি তোর জ্যাঠশ্বশুর কালিকাবাবাকে ভগবান বলে ভাবে। উনি যখন ওষুধ কবচ দিয়েছেন তখন এবার তুই পোয়াতি হবিই হবি-দেখে নিস। তা হ্যারে নাতবউ, কালিকা কি সব লিখে দিয়েছিল সেসব মেনে চলছিস তো? —ওই যে রে, মাসে কদিন আমার নাতিকে খুব ভালোবাসতে হবে? ওই দিনগুলো খুব ভালোবাসা করবি দুজনে বুঝলি? এর যেন ভুলচুক না হয় খেয়াল রাখিস। সবাই তোদের দুটিকে আশীর্বাদ করছে রে?! মাকালী করুন এবার

তোর কোল ভরুক। —হাঁদারাম, এার বুঝলে? মা খবরটা জানার জন্য দিদিমা স্থানীয় একজনকে লাগিয়েছেন।' —অতুল্য আর যুথী দুজনেই প্রবল হাসতে লাগল। হাসি থামলে অতুল্য জিজ্ঞেস করল —'তুমি কি বললে? বললে যে হ্যাঁ গো দিদা আমরা খুব চুটিয়ে ভালোবাসা-বাসি করছি ওই দিনগুলোতে?'

—'ধ্যাৎ! অসভ্য কোথাকার! আমি যেন বুঝিইনি ওনার ইঙ্গিত এমন ভাব করে আসল কথাটা জানিয়ে দিলাম যাতে মা শুনে নিশ্চিন্ত হন। বললাম—'দিদা জ্যাঠামশাইর বলা প্রত্যেকটা কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করছি। আমি ও তো মা হতে চাই গো? শ্বশুর-শাশুড়িকে বংশধর দিয়ে যেতে চাই। আমি জানি আর আপনার নাতিও জানে জ্যাঠামশাইর কথামতো চললে আমাদেরই লাভ।'

—'জানো যুথী আমার গত দেড়মাসে একছিটে রক্তও বেরোয়নি। কাশিটাও কত কমে গেছে লক্ষ করেছ?'

খুশিতে, আবেগে যুথী অতুল্যকে দুহাতের নিবিড় আলিঙ্গনে বেঁধে ফেলে—'এমন কথাটা তুমি এতদিন পর আমাকে বলছো?'

'আমি আগে নিজেই নিঃসন্দেহ হতে চেয়েছিলাম তাই বলিনি। তুমি আরও একটা কথা জান না। আমিই তোমার আর বাবার চিন্তা বাড়াতে চাইনি বলে বলিনি। আমার এরোগটা বোঝার পর গত ৬/৭ মাসে দুবার নয়, ৫/৬ বার রক্তছিটে বেরিয়েছে। কিন্তু জ্যাঠামশাইর ওষুধ শুরু করার পর এই দেড়মাসে একদিনও আর রক্ত দেখিনি। —যুথী, আমার খুব ভরসা হচ্ছে জ্যাঠামশাইর ওপর। মনে হচ্ছে এবার বোধহয় কিছু ঘটবে।'

—'আমারও তাই মনে হচ্ছে জান? এবার কিছু ঘটবেই, আমার মন বলছে।'

ওদের সব মন বলাবলি আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে তিনটে মাস কোনো ঘটনা না ঘটিয়েই মসৃণ ভাবে পার হয়ে গেল। অতুল্যর মা হতাশায়, রাগে, দুঃখে আবার নতুন করে ঝাঁপিয়ে পড়ল যুথীর ওপর। অম্বিকাচরণ আর চিঠি লেখার অপেক্ষা না করে তারাপীঠে যাবার আয়োজন করলেন। অতুল্য এখন বেশ ভালো, ও চেম্বার সামলে নিতে পারবে।

—'মেজদাদা, আমি আর চিঠি লেখার অপেক্ষা করতে পারলাম না। কিছুই তো হল না। তোমার বউমা ওই অসহায় মেয়েটার ওপর আবার অকথ্য মানসিক নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। পাগল হয়ে গেছে হতাশায়। কিছু একটা করো মেজদাদা!'

কালিকাচরণ গম্ভীর মুখে দূরের মাঠে দৃষ্টি রেখে বসে রইলেন। মাঠে একটা গাভি চরছিল। কয়েকদিন আগে জন্ম নেওয়া বাছুরটা একবার করে মায়ের বাট টানছে তারপরই তিড়িং বিড়িং করে লাফিয়ে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছে। দৃশ্যটা কালিকাচরণের মনকে বড়ো বিষণ্ণ করে তুলল। এমনি একটি প্রাণীর অভাবে ছোটোভাইয়ের সুখের সংসারটার চালে আগুন লেগেছে। সে আগুন নেভাতে শেষ প্রক্রিয়াটি নিজের বংশের বধূর ওপরেই প্রয়োগ করতে হবে। এর আগেও কয়েকবার ওষুধ কবচে কাজ না হলে এর প্রয়োগ

উনি করিয়েছেন। সন্তান কোলে পেয়ে কৃতজ্ঞতায় বাঁধা পড়ে থেকেছে তার কাছে মাতা-পিতা, পরিবার। কিন্তু এ যে তার নিজের পরিবার? নিজেদের পুত্রবধূ? মনে মনে তারা মাকে বলেন কালিকা—এ তুই আমাকে কি মহা সমস্যায় ফেললি মা? — মুখে বললেন —'কাল সকালে তোকে আমি জানাব অম্বিকা। এখন স্নানটান করে বিশ্রাম কর। তুই ভালো দিনেই এসেছিস রে। আজ ঘোর অমাবস্যা। আজ রাতে আমি থাকব না আশ্রমে। শিষ্যরা সব রয়েছে তোর অসুবিধে হবে না। কাল সকালে ফিরে এসে তোকে বলব।'

—'থাকবে না? তুমি কোথায় যাবে মেজদাদা?'

—'যেতে হবে না বেটির প্রিয়স্থানে? শ্মশানে রে! আজরাতটা মনপ্রাণ দিয়ে ডাকতে হবে না মাকে? মা না ডাকলে কিচ্ছুটি ছাড়ে না হাত আলগা করে। যদি সন্তুষ্ট করতে পারি তবে কিছু না কিছু আদেশ দেবে।'

—'তুমি কি সত্যিই কখনও স্বচক্ষে দেখেছ মেজদাদা?'

কালিকাচরণ হাসলেন। বললেন—'সেই চোদ্দো বছর বয়স থেকে ৭৭ বছর বয়স অবধি স্বচক্ষে, শরীরী রূপে দেখার জন্য কম তো করলাম না। পেলাম কোথায় শরীরী রূপে? —না রে! বড়ো অভিমান আমার মায়ের ওপর। সারারাত শ্মশানে ধ্যানে বসে মানসচক্ষুতে বহুবার দর্শন করেছি, তাঁর আদেশের নমুনা রেখে গেছেন তিনি, কিন্তু আজ অবধি ছুঁয়ে দেখতে পারিনি রে আমার মার স্পর্শটি কেমন!'

—'এই বৃদ্ধবয়সে আমাদের জন্য তোমাকে শ্মশানে সারারাত ধ্যান করে কাটাতে হবে মেজদাদা?

আমার যে খুব খারাপ লাগবে, ঘুম আসবে না। নিয়ে যাবে আমাকে সঙ্গে করে?'

—'সে হবে না। সে সব গুপ্ত রাখতে হয়। পাশে কেউ থাকলে আমারও ধ্যানে অসুবিধে হবে। তোকে না বলেছিলাম কোনো প্রশ্ন করবি না, কখনও কৌতূহল দেখাবি না তাহলে ফল ফলবে না! ভুলে গেলি এরই মধ্যে? না-কি আমার ক্ষমতায় অবিশ্বাস করে যাচাই করতে চাইছিস?' অম্বিকা আহত গলায় বললেন—'তুমি আমাকে ভুল বুঝলে মেজদাদা। তোমার ক্ষমতা তো অতুল্যর রক্ত ওঠা বন্ধ হতে, কাশি কমতেই বুঝেছিলাম। আমি এই বয়সে শ্মশানে-মশানে তোমাকে একা একা ছাড়তে চাইছিলাম না। তাই বলেছি।'

কালিকাচরণ আবার হেসে বললেন—'ওরে, সারাজীবন যার শ্মশানে-মশানে, মড়ার ওপর বসে কাটলো তার আর এখন তখন কি? অম্বিকা, বধূমাতা আর অতুল্যকে হয়তো এখানে এসে থাকতে হতে পারে কিছুদিন। শুধু ওরা দুজন। তুই পাঠাতে রাজি আছিস তো কোনো প্রশ্ন না করে?'

—'তুমি যে ভাবে বলবে আমি সে ভাবেই করব। তুমি শুধু তোমার অসীম ক্ষমতা দিয়ে নির্বংশ হওয়া থেকে বাঁচাও।'

—'নির্বংশ হওয়া? ধর যদি এতর পরও বধূমাতার গর্ভসঞ্চার না হয়? তখন কি করবি?' অম্বিকা হতাশ গলায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন—'জানি না মেজদাদা।'

—'না। তাহলে অতুল্যকে আবার বিবাহ করতে হবে। তবে তার বিবাহের আগে যুথীকা মার ভরণপোষণ, সর্বপ্রকার সুবন্দোবস্ত করে দিতে হবে তোকে। বংশ রক্ষার্থে প্রথমা স্ত্রী গর্ভসঞ্চারে ব্যর্থ হলে পুরুষ দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে পারে, শাস্ত্রে এর অনুমোদন আছে। কিন্তু তাই বলে প্রথমা স্ত্রীকে সবকিছু থেকে বঞ্চিত করে নয়। ভার্যা হিসেবে সন্তান উৎপাদনে অক্ষম হলেও স্বামীর স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির ওপর তার সমান অধিকার থাকে। —জানিস, অনেকেই এই কথাটা মনে রাখে না। বন্ধ্যা হওয়াটা তো একটি মেয়ের নিজের দোষ নয়! সে যদি জানত যে সে বন্ধ্যা তাহলে তো বিবাহ থেকে দূরে সরে থাকাটাই শ্রেয় মনে করত রে। জানতে যখন পারে তখন সে অসহায়, নিরুপায়। আর সেই সুযোগ নিয়ে স্বামী তাকে ত্যাগ করে একবস্ত্রে। এ অন্যায়, ঘোরতর অন্যায়! —তুই এই অন্যায় করবি না কথা দে আমাকে তাহলেই আমি এগোব। যদি বধূমাতা বন্ধ্যা প্রমাণিত হয়, তাহলে অতুল্যকে বিবাহ দেবার আগেই তুই বধূমাতার বাকি জীবন স্বচ্ছলভাবে কাটাবার জন্য সবরকম ব্যবস্থা করবি, -- বল অম্বিকা, কথা দে মায়ের এই স্থানে বসে।' —উত্তেজনা প্রকাশ পায় কালিকাবাবার কথায়।

—'কথা দিলাম মেজদাদা! তোমাকেই ডেকে নিয়ে যাব, তুমিই বউমার ব্যবস্থা করে দিয়ে আসবে। কথা দিলাম।' —দাদার বলা কথাগুলো শুনে দাদার প্রতি শ্রদ্ধা শত গুণ বেড়ে যায় অম্বিকাচরণের। মেজদাদা কোনও সাধারণ সিদ্ধাই নন, তিনি সত্যিই এক অসাধারণ জ্ঞানী মানুষ।

গভীব ঘুমে আচ্ছন্ন অম্বিকাকে কে যেন ঠেলছে—'ও অম্বিকা ওঠ রে। সকাল হয়ে গেছে। ওঠ এবার।'

কোনও মতে আঠালাগা চোখ খুলে অম্বিকা দেখেন প্রসন্ন মুখে মেজদাদা দাঁড়িয়ে আছেন সামনে। ধড়ফড় করে উঠে বসেন উনি — 'সকাল হয়ে গেছে? কখন ফিরলে তুমি?'

—'অনেকক্ষণ। আজ আমি বড়ো প্রসন্ন রে। মা বেটির হাসি মুখটা মনে ধরে রেখেছি। আদেশ দিয়েছে মা প্রসন্নমুখে। আমার মনে আর কোনো সংশয় নেই। কোনো বাধা নেই।

—'এবার তাহলে কি করতে হবে গো মেজদাদা?'

—'এবার ওদের দুটিকে এখানে এসে মায়ের সেবা করতে হবে কদিন? বধূমাতাকে চাকরি থেকে কদিনের ছুটি নিয়ে আসতে হবে।'

* * * * *

কাশীধামে মণিকর্ণিকার ঘাটে বসে গঙ্গার বুকে হালকা হালকা ঢেউয়ের সঙ্গে অস্তগামী সূর্যের রক্তিম আভার লুকোচুরি খেলা দেখছিলেন অন্যমনস্ক চোখে যোজ্ঞেশ্বরানন্দ। উত্তব

প্রদেশের ব্রাহ্মণ সন্তান যোজ্ঞেশ্বরানন্দ কালিকাবাবার একনিষ্ঠ ভক্ত চ্যালা। গুরুজির অনুমতি নিয়ে তীর্থ পরিক্রমণ করতে করতে কাশীতে এসেছেন। এর আগে আরও বহুবার কাশীতে এসেছেন তিনি। ৪২ বছর বয়স্ক, ছিপছিপে সুন্দর মেদহীন শরীরে নিয়মিত যোগাভ্যাসের ছাপ। দেখলে মনে হয় না বয়সটা ৪০ ছাড়িয়ে আরও এগিয়েছে। মনে হয় ৩০ বছরের নীচে থাকা যুবক সন্ন্যাসী। আজ এই মুহূর্তে যোজ্ঞেশ্বরানন্দর অন্যমনস্কতার কারণ একটি চিঠি। চিঠিটা বাংলার তীর্থস্থান তারাপীঠ থেকে এসেছে। গুরুজি নিজে লিখেছেন তীর্থ পরিক্রমণ অসম্পূর্ণ রেখেই তাকে আশ্রমে ফিরে যেতে হবে। লাল রংয়ের আলখাল্লার পকেটে হাত ঢুকিয়ে যোজ্ঞেশ্বরানন্দ চিঠিটা স্পর্শ করেন। মাঝে মাঝে তীর্থ পরিক্রমণ করা খাঁটি সাধু-সন্তদের সাধনমার্গের অন্যতম মার্গ। মাত্র কিছুদিন আগেই তারাপীঠের আশ্রম ছেড়ে বেরিয়ে ছিলেন। পুরীধাম হয়ে, মথুরা-বৃন্দাবন-অযোধ্যার পর কাশীতে এসে আছেন এখন। এখান থেকে হরিদ্বার হৃষীকেশ, গোমুখ, বদ্রীনাথ যাওয়ার সংকল্প ছিল। এর আগে কোনও বারই বাধা আসেনি তীর্থ পরিক্রমণে। গুরুজি লিখেছেন অত্যন্ত জরুরি দরকার। কী এমন ঘটে গেল আশ্রমে যে পরিক্রমণ স্থগিত রেখে তাকে ফিরে যাবার আদেশ করলেন গুরুজি? জরুরি তো নিশ্চয়ই, তা না হলে যোজ্ঞেশ্বরানন্দর গুরু সাধনমার্গে বাধা সৃষ্টি করে ফেরত যেতে বলতেন না। গঙ্গার দিকে তাকিয়ে গোধূলীর আলোয় ছোটোছোটো ঢেউয়ের মাঝে কারণ হাতড়াতে থাকেন যোজ্ঞেশ্বরানন্দ—কিছুই খুঁজে পান না। আজ থেকে কতকাল আগে এই মণিকর্ণিকার ঘাটেই খুঁজে পেয়েছিলেন যোজ্ঞেশ্বর তার ঈপ্সিত গুরুকে। তখনও তিনি যোজ্ঞেশ্বরানন্দ হননি —যোজ্ঞেশ্বর শর্মা ছিলেন। পূজারী ব্রাহ্মণ পরিবারের ছেলে কাশীর সংস্কৃত কলেজে শিক্ষা নিতে এসেছিলেন গ্রাম থেকে। —তারপর জীবনটাই বদলে গেল। এক নতুন আলোর সন্ধান পেয়ে গুরুর পায়ে পায়ে তারাপীঠের আশ্রমে এসে পৌছলেন তিনি। প্রথমেই দীক্ষা হয়নি। গুরুজি তাকে নানা ভাবে পরীক্ষা করে চলেছিলেন। তন্ত্র-মন্ত্রের কোনও সুলুক-সন্ধানই পাননি বহুদিন। যোগ, প্রাণায়াম আর সংযমের শিক্ষা তার সাথে বহু প্রাচীন ছিন্ন পুঁথির ব্যাখ্যা করতে করতে কেটেছে সময়। ধীরে ধীরে জয় করে ফেলেছিলেন গুরুজির হৃদয়। দীক্ষা হল, যোজ্ঞেশ্বর শর্মা যোজ্ঞেশ্বরানন্দ হলেন। প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথিগুলোর পাঠ কণ্ঠস্ত হয়ে গিয়েছিল, এবার বাস্তব শিক্ষা শুরু হল। তন্ত্র-মন্ত্রের গুপ্তধনের অগাধ জ্ঞানভান্ডারের প্রবেশ পথ খুলে দিলেন গুরুজি। কারও কাছ থেকে কোনোদিন একটি টাকাও নিতে দেখেন নি গুরুজিকে। তাবিজ- কবচ, ওষুধপত্র বিনামূলে দেওয়ারই নির্দেশ মা তারার। মন্দিরে যারা পুজো দিতে আসেন সেই সব ভক্তদের দেওয়া প্রণামীর অর্থই যথেষ্ট কয়েকজন শিষ্যকে নিয়ে আশ্রমটি চালানোর জন্য। কোন ভোগ বিলাসের ঠাঁই নেই এই আশ্রমে। যোজ্ঞেশ্বরানন্দ শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে অবনত হয়ে থাকেন গুরুর পদতলে। এমনই গুরু চেয়েছিলেন যোজ্ঞেশ্বর, পেয়েওছেন।

—'যোজ্ঞেশ্বরানন্দ, ধরিত্রী একটি বৃক্ষের জন্য কাতর হয়েছেন। বীজটি তোমাকে রোপন করতে হবে। জমিন উর্বর কি অনুর্বর এখনও জানি না। সব রকম প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। এই শেষ প্রক্রিয়াটি প্রয়োগের আদেশ দিয়েছেন মা। সে জন্যই তোমাকে পরিক্রমায় মাঝপথ থেকে ডেকে এনেছি।' —মন্দিরে হোমের আগুনের লাল আভার, লাল বসনে, রক্তিম গুরুগম্ভীর পরিবেশে কালিকাবাবার ঘোষণা শুনলেন পুত্র প্রতীম প্রিয় শিষ্য।

—'আবার গুরুজি? এর আগে আরও দুবার তো রোপন হয়েছে! এতে কি আমার সংযমের মার্গে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে না?' — সংশয়ের দোলাচলে জিজ্ঞেস করেন যোজ্ঞে শ্বরানন্দ।

হোমের আগুনে কাঠের হাতায় করে ঘি ঢেলে দিয়ে আরো দুটি বেলকাঠ আর আমকাঠের টুকরো গুঁজে আগুনকে উজ্জীবিত করেন কালিকাবাবা। দুজনেরই গৌরবর্ণ লাল হয়ে উঠেছে তাপে। বিড়বিড় করে বলতে থাকা মন্ত্র থামিয়ে শিষ্যের সংশয়ব্যাকুল মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন—'তিনবার করা যায়। তন্ত্রশাস্ত্রে এর উল্লেখ তুমি পড়েছ। হাজার হাজার বছর ধরে এর প্রচলন আছে। এটা শাস্ত্রেরই একটি অঙ্গ, বলতে পারো অনন্যোপায় অঙ্গ। সংযমের মার্গে বাধাসৃষ্টিকারী হবে জানলে আমি এই কাজটি তোমার ওপর অর্পণ করতাম না তুমি সেটা জান না তা নয়। কোনও দ্বিধা নয় যোজ্ঞেশ্বরানন্দ! আমার নিজের বংশটির রক্ষা করার গুরুদায়িত্ব মা তারার নির্দেশ পেয়ে তোমাকে দিলাম। তুমি তোমার কাজ করবে, ফলের কথা মা তারা চিন্তা করবেন। কাজ সম্পূর্ণ হলে তুমি আবার তীর্থ পরিক্রমণে বেরিয়ে পড়ো।

—'যথা আজ্ঞা গুরুজি। কিন্তু আমার আর একটি প্রশ্ন—আরোপিত উপজনন প্রক্রিয়াও যদি অসফল হয় তখন?'

—'তখন বুঝতে হবে জমিন অনুর্বর, কখনই কোন ঘাস, লতা, গুল্মও উৎপন্ন হবে না সেই জমিনে। পুত্রের আবার বিবাহ দিতে হবে তখন। — যাইহোক, এখন গণনা করে নির্ধারিত সময়ের ২১ দিনের জন্য ওদের দুজনকে এখানে আসার জন্য পত্র তো পাঠাই! ওরা এলে এবার কিন্তু আগের দুবারের মতো সহজে কাজটি হবে না। বধূমাতা শিক্ষিতা, স্কুলে পড়ান। পুত্র এবং বধূমাতার বৈবাহিক সম্পর্ক অত্যন্ত সুখের। পুত্রটি ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হয়েছে সম্প্রতি তবুও ওদের বন্ধন এতটুকুও ঢিলে হয়নি। পুত্র নিজেও হোমিওপ্যাথ ডাক্তার। বুঝতে পারছ তো ব্যাপারটা কত জটিল। কত সাবধানে এগোতে হবে ওদের মনে কোনও সন্দেহ উদ্রেক না করে?'

—'বুঝতে পারছি গুরুজি। আপনার নিজের বংশরক্ষার দায়িত্ব আমাকে দিয়েছেন মায়ের আদেশে এই আদেশ আমি অবশ্যই পালন করব কিন্তু তারপর আমার নিজের আত্মশুদ্ধির জন্য আমাকে দীর্ঘ ছুটি দিতে হবে গুরুজি। সংসারি মানুষের থেকে,

অনেকদূরে, হয়তো বা হিমালয়ের পাদদেশে কোনও নির্জন স্থানে গিয়ে আরাধনা করতে চাই। সেই আজ্ঞা দিন কৃপা করে।'

—' বেশ। তোমার তপস্যায় কোনও বাধা প্রদান করব না। তবে তপস্যান্তে এই আশ্রমেই ফিরে আসবে তুমি। আমার দেহান্ত হলে এই মা বেটির সব ভার তোমার। তুমিও কথা দাও গুরুর আজ্ঞা পালন করবে তুমি!'

—'শিরোধার্য্য করলাম গুরুজি।'

গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটে গেল ক্রমে'—অতুল্যর বউ শেষ অব্দি পোয়াতি হয়েছে গো! বিয়ের কতবছর পর হল বলত? — কেন বাপু নিভাননীর ভাশুরপো বউ-এর তো ঘরে সতীন আসার পর বাচ্চা হয়েছিল, মনে নেই? কী দুঃখ বউটার! বলতো সেই ভগবান দিলেন কিন্তু সতীন কাঁটার জ্বালা ধরার আগে দিলেন না। —আরে এসবই কালিকাবাবার কবচের গুণ, বুঝলে? অসাধ্য সাধন করেন উনি। না হলে কি আর এতবড়ো সাধক এমনি হয়েছেন? — যাক্ তবু রক্ষা হয়েছে গো! এমন ভালো মেয়ে তোমাদের যুথী! ওর কপালে যে সতীনকাঁটা জোটেনি সেটাই রক্ষে! — যা বলেছ! শাশুড়ি মাগিটা তো অতুল্যকে আবার বে দেবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। নেহাত অতুল্য রাজি হচ্ছিল না তাই পারেনি। যাক্ বাবা, ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন শেষ পর্যন্ত!

অতুল্যর মার আনন্দ দেখে কে? মানুষটাকে লোকে যতই নিন্দে করুক আসলে তো খারাপ কখনও ছিলেন না। শুধু একটি শিশুর কামনায় রুক্ষ কর্কশ হয়ে উঠেছিলেন স্নেহময়ী এই নারী। আর এখন দেখ! যুথীকে মাটিতে পা নামাতে দিতে চান না, পারলে বোধহয় মাথায় করে রাখতেন। বেশি বয়সে পোয়াতি হয়েছে বউমা, এতবয়সে প্রথমবার পোয়াতি তাই সাবধানের মার নেই। বউমাকে বসিয়ে রেখে এইবয়সে গৃহকর্মের সমস্ত দায়টা হাসি মুখে নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। সারা মনসাতলা গ্রামে খুশির লহর বয়ে চলেছে। খুশির লহর মনসাতলা ছাড়িয়ে হাজার মাইল দূরে ডিব্রুগড়ে নবীন ব্যানার্জির বাড়িতে, রায়চৌধুরি ভিলাতেও বইছে। সুহাসিনীর চার বউমা, লক্ষ্মী, সবাই সুহাসিনীর ঘরে আজ একসঙ্গে বসে। যুথীর সন্তানসম্ভাবনার খবরটা আসা মাত্র রায়চৌধুরি বাড়ির নাকউঁচু বউদের সাথে লক্ষ্মীমাসিমার ব্যবধানটা এক ধাক্কায় ভেঙে দিয়েছে যেন। আদিত্যের বউ শ্রীলা বলে—'উফ্! যুথীদির খবরটা যে কী দারুণ আনন্দ নিয়ে এল সে আমি বোঝাতে পারব না মাসিমা। —এমা! যুথীদির বাচ্চা তো নন্দু-অপুর থেকেও কত ছোটো হবে! ' —বলে খিল খিল করে হেসে ফেলে শ্রীলা। সুহাসিনী বউকে শাসন করেন—'এতে হাসবার কি হল? আনন্দের খবরে আনন্দ করছ করো। হেসো না অপু-নন্দুর থেকে ছোটো হবে বলে। তবু আমার যুথীর কোলে একটা সন্তান তো আসছে বউমা!

বাবার চিঠি এসেছে শ্বশুরমশাইর কাছে, সঙ্গে ওর কাছেও লেখা কয়েক লাইন।

সাতমাসে মা সাধভক্ষণ করাবে ডিব্রুগড়ে। এবার আর ট্রেনে তিন-চারদিনের পথ পাড়ি নয়। অতুল্য আর যুথীর এরোপ্লেনে যাবার টাকা মানিঅর্ডার করেছে বাবা। যুথী এখনও স্কুলে যায় তবে অতুল্যকে নিয়ে যেতে আসতে হয়—শাশুড়ির অর্ডার। বাড়ি এসে কোনো কাজ নেই ওর, অখণ্ড অবসর। পেটের ভেতরে প্রতিক্ষণ সেই অদৃশ্য প্রাণের নড়াচড়া, অস্তিত্ব টের পায়। এক ঐশ্বরিক অনুভূতিতে আত্মার ভেতর থেকে মাতৃত্ব সুখের আওয়াজ শুনতে পায় ও। কিন্তু তারই মধ্যে একটা স্বপ্ন আবছা আবছা ভেসে ওঠে মনে। যুথী সেই স্বপ্নের অর্থ বুঝতে পারে না। কী যেন ঘটছিল দীর্ঘ একুশটা রাত ধরে। অতুল্য যেন কেমন পালটে গিয়েছিল। যুথী সব মনে করতে পারে না। রোজ রাতে হোমকুণ্ডের সামনে বসা অতুল্য আর ও। জ্যাঠামশাইর গুরুগম্ভীর সুরে অপূর্ব মন্ত্র উচ্চারণ, হোমের শেষে জ্যাঠামশাইর দেওয়া সুস্বাদু ওষধী সেবন, তারপর এত আচ্ছন্নতা, ঘুম ঘুম ভাব, অতুল্যর হঠাৎ করে সেই প্রথম দিকের মতো করা সোহাগের বানে আচ্ছন্ন যুথীর ভেসে যাওয়া—এ সবই স্বপ্নের মতো আসে যায় ওর মনে। সত্য বলে মেনে নিতে পারে না স্বপ্নগুলোকে। সত্যিই কি এসব ঘটেছিল? সেই যে জ্যাঠামশাই ওদের বাড়িতে এসেছিলেন, কবচ আর ওষুধ দিয়ে কাগজে লিখে দিয়েছিলেন কিছু সংকেত, তারপর থেকে সন্তান কামনায় ওরা সব সংকেত মেনে চলছিল ঠিকই। কিন্তু কোনো রাতেই এত ভালোলাগার ব্যাপার ঘটে নি যেমনটা তারাপীঠের আশ্রমে থাকার সময় একুশটা রাত ধরে প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় থেকেও লেগেছে। মনে যে স্বপ্নের মতো ধোঁওয়াশা ভাবটুকু আসে তাতে মনে হয় এই অতুল্য ওর এতবছরের বিবাহিত জীবনের চেনা অতুল্য নয়। ওর সোহাগের ধরন-ধারণ সব বদলে গিয়েছিল আমূল। হয়তো বা-হয়তো কেন? নিশ্চয়ই জ্যাঠামশাইয়ের দেওয়া সুমিষ্ট ওষুধের গুণেই অতুল্যর মধ্যে একধরণের শক্তি জেগে উঠেছিল, যে শক্তির পরিচয় যুথী আগে কোনোদিন পায়নি। এক এক বার ওর অতুল্যকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে—'হ্যাঁগো, তারাপীঠে গিয়ে তোমার মধ্যে এমন বলশালী পৌরুষত্ব কি করে এসেছিল?' — কিন্তু জিজ্ঞেস করতে পারে না। এ কি জিজ্ঞেস করা যায় নিজের স্বামীকে একই শয্যায় শোওয়ার পর ? তার পুরুষাত্মাভিমানে লাগবে না? যুথীকে শেষ পর্যন্ত যে স্বামী মাতৃত্বের স্বাদ এনে দিতে সক্ষম হয়েছে তাকে তো তাহলে বড়োবেশি আঘাত করা হয়ে যাবে। মনে মনে যুথী বলে—'আমি তোমার কাছে সারাজীবন কৃতজ্ঞ থাকব অতুল্য! অবশেষে তুমি তো আমার বাঁজা নামের কলঙ্কটুকু ঘোচাতে পেরেছ!'

আর অতুল্য? স্বভাব লাজুক অতুল্যডাক্তার এখন দশটা ঘোড়ার বল নিয়ে যেন টগবগ করছে। কে বলবে ভেতরে ভেতরে সে ক্ষয়রুগি? যুথী যে বন্ধ্যা নয়, সে নিজে যে বাপ হবার যোগ্যতা রাখে, সবই তো এখন প্রমাণিত সত্য। হ্যাঁ, দেরি হয়েছে, একথা সত্য। তাতে কি? দেরি তো অনেকেরই হয়, হয় না এমন তো নয়? শ্রদ্ধায়, কৃতজ্ঞতায় শুধু

জ্যাঠামশাই কালিকাবাবার কাছে নয়, অতুল্য বেশি কৃতজ্ঞ ওর নিজের মায়ের কাছে। নিজেদের পরিবারে এমন শক্তিধর এক মহাপুরুষ থাকতে বাবা কোনওদিন বলেননি ওনার কাছে যেতে। মা যদি হত্যে দিয়ে নির্জলা পড়ে না থাকত উঠোনে তাহলে আজও ওর কাশির সঙ্গে রক্ত উঠত, আজও যুথী সমাজের নজরে বন্ধ্যা হয়ে থাকত, আজও লোকে আড়ালে ওকে নির্বীর্য পুরুষ বলে হাসাহাসি করত। মা'র জন্য অসম্ভব সম্ভব হয়েছে।

আশ্রমের কাটানো একুশটা দিন তো ওর জীবনে নব অধ্যায়ের সূচনা করেছে। একটা নতুন দিগন্ত খুলে গেছে ওর সামনে। যুথীর বয়স বেশি, ও যদি নির্বিঘ্নে সন্তান প্রসব করতে পারে তাহলে অতুল্য মুখোপাধ্যায় নিজে একটা পরিবারের কর্তা হবে। ওর সন্তান ওর নাম, পরিচয় বহন করবে পরবর্তী বংশকে দিয়ে যাবার জন্য। এর জন্যই মা এত হা-হুতাশ করত যদি অতুল্যর সন্তান না হয় তাহলে অতুল্যর পরে অম্বিকাচরণের আর কোনো অস্তিত্ব থাকবে না ভেবে। নিজের জীবনে এই অত্যাশ্চর্য্য ঘটনাগুলো না ঘটলে অতুল্য কোনওদিন হয়তো এসব তন্ত্র-মন্ত্রে ওষধীতে বিশ্বাসই করত না। এখন ওর মনে হয় এসবের মধ্যে সত্যতা না থাকলে পাঁচ-ছ হাজার বছর ধরে এই গুপ্তবিদ্যা টিঁকে থাকতে পারত না। বহু আগেই বিলুপ্ত হয়ে যেত। অতুল্য ওর সন্তানকে বলে যাবে ওর জ্যাঠামশাই কালিকাবাবার অসাধারণ ক্ষমতার কথা যাতে বংশানুক্রমিক ভাবে কালিকাবাবার কথাও টিঁকে থাকে ওদের বংশে। জ্যাঠামশাইর ঋণ শোধের আর অন্য কোনও উপায় ওর জানা নেই।

সেই গুরুগম্ভীর রাতগুলোর কথা মনে পড়লে আবারও আশ্রমে যেতে ইচ্ছে করে অতুল্যর। হোমের আগুনের তাপ তার সঙ্গে জ্যাঠামশাইর দ্রুত গতিতে অপূর্ব সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ। মাঝে মাঝে ওদের দুজনকে দিয়েও মন্ত্র বলানো আর ঘৃতাহুতি দেওয়ানো—সব মিলিয়ে পরিবেশটাই যেন পবিত্রতায় ভরে যেতো। দুটো শ্বেতপাথরের গ্লাসে ঢাকা দিয়ে রাখা থাকত ওষধী শরবত। যুথীরটা ওর ডানদিকে আর অতুল্যরটা অতুল্যর ডানদিকে। এমন সুস্বাদু শরবত ওরা প্রথম পান করেছে আর হয়তো এই শরবত পান করার সুযোগ কোনদিন আসবে না জীবনে। কারণ অতুল্য বা যুথী সন্তান উৎপাদনে অক্ষম নয় এটা প্রমাণ হয়ে যাওয়ার পর আর কোনও হোমযজ্ঞের দরকার হবে না, কোন সুস্বাদু ওষধী সেবন করতেও বলবেন না জ্যাঠামশাই। যজ্ঞ শেষ হলে সঙ্গে সঙ্গে নারকোল নিংড়ানো দুধের শরবত খেয়ে ওরা দুজনে হোমাগ্নি প্রদক্ষিণ করত তারপর জ্যাঠামশাই যজ্ঞের ছাই দিয়ে ওদের কপালে তিলক করে দিয়ে বসতে বলতেন দুজনকে। অতক্ষণ আগুনের তাপে বসে থেকে সমস্ত শরীর গরম হয়ে যেত, কর্পূর, ঘি, অগুরু চন্দনের মিশ্রিত গন্ধে অতুল্যর মাথা ঝিম ঝিম করত। হোমাগ্নী যেন ওর শিরায় প্রবাহিত রক্তের সঙ্গে মিশে যেত, মনে হতো দেহের ভেতরেও আগুন জ্বলছে। এরপর যে ও কি করত সেসব মনে করতে পারে না অতুল্য তবে যুথীর ঠারে ঠোরে কথা বলা থেকে মনে হয়

স্বভাব শান্ত অতুল্য বোধহয় একটু বেশি অশান্ত হয়ে উঠে ছিল তখন। সবকিছুই জ্যাঠামশাইর জন্য!

একটি ব্যাপারই শুধু অতুল্যর বোধগম্য হয়নি আজও। যুথীর সঙ্গে হোমযজ্ঞের পরে ওদের যে মিলন হত সে কথা ওর কিছুই মনে থাকত না। সকালে ঘুম ভেঙে উঠে বিস্রস্ত যুথীকে দেখে, ওর নিজের বাহুতে, গলায় সিঁদুরের দাগ দেখে বুঝতে পারত। আর সেই সময়েই ওর মধ্যেকার পুরুষ কামনায় উদ্বেলিত হয়ে যুথীকে আবার কাছে টেনে নিত। যুথীর কোনও ওজর আপত্তিই শুনতো না তখন। যুথী অনুনয় করে বলতো—'আর কত? আমার যে খুব ক্লান্ত লাগছে, এখন থাক না!' — সকালের কথা সবই ওর মনে আছে কিন্তু রাতগুলো মনে আসে না। প্রত্যেকটা রাত যেন ওর মনের কোনও অন্ধকার গহ্বরে চিরতরে হারিয়ে গেছে। — কি ওষধী মেলাতেন জ্যাঠামশাই শরবতের সাথে যার এমন ক্ষমতা যে অতুল্যকে বাসনার চূড়ান্তে পৌঁছে দিত কিন্তু ওর স্মৃতিশক্তিকে একেবারে বিলোপ করে দিত? রাতের ভালোবাসার রেশ সকালে ঘুম ভেঙে ওঠার পর আবারও জেগে উঠত এমন করে?— যাকগে ওসব। অতুল্য মনে মনে হাসে আর ভাবে জ্যাঠামশাই যা ভেবেই এসব করে থাকুন না কেন সবই ওদের মঙ্গলের জন্যই করেছেন। ওই একুশ দিনের উত্তপ্ত স্ত্রীসঙ্গ সুখ ও ওর তেরো-চোদ্দো বছরের দাম্পত্য জীবনে আগে কখনও অনুভব করেনি। তখন তো ক্ষয় রোগে ধরেনি ওকে, বয়সটাও অনেক কম ছিল কিন্তু এমন আগ্রাসী তো তখন হতে পারেনি। তার উপর কাশির সঙ্গে রক্ত আর বের হয় না এখন। — নাহ! ওই বৃদ্ধ সন্ন্যাসী জ্যাঠামশাই কালিকাবাবার ক্ষমতা সত্যিই আছে। নিজে সন্ন্যাসী হয়ে এসব কি করে বোঝেন জ্যাঠামশাই কে জানে!

যুথী ভালোয় ভালোয় তিনটে মাস পার করে দিয়েছে। পঞ্চম মাসে মা বেশ ঘটা করে ওর পঞ্চামৃত করলো। মা'র আনন্দে উজ্জ্বল মুখখানা দেখে অতুল্যর বুকে পুকুরের নিস্তরঙ্গ শীতল জলের মতো একপুকুর শান্তি জমে থাকে। মা বলেই দিয়েছে অন্নপ্রাশনের ঘটাপটা করার আগে বাচ্চাকে নিয়ে তারাপীঠে বটঠাকুরের আশ্রমে গিয়ে প্রসাদ খাইয়ে আনবে।

আর যুথী?— আরে সে তো এখনই অতুল্যকে আর বেশি পাত্তা দেয় না। ওর এখন গর্ভের ভেতরে সন্তানের উপস্থিতি, ক্ষীণতম নড়াচড়ার দিকে বেশি মনোযোগ। অতুল্য খুব মন দিয়ে উপভোগ করে যুথীর মাতৃত্ব স্বাদে ভরা অনুভূতি গুলোর বাহ্যিক প্রকাশ। ভালো লাগে ওর।

আর অতুল্য-যুথীর এখনও অনাগত সন্তানের সৃষ্টিকর্তা সেই পুরুষটি? দুর্গম পথে হাতের লাঠিতে ভর দিয়ে অনেক চড়াই-উৎরাই পার হচ্ছেন স্বামী যোজ্ঞেশ্বরানন্দ। হিমালয়ের নানা স্থানে কত প্রাচীন তীর্থস্থান তৈরি হয়েছিল বিভিন্ন যুগে। ভ্রমণ পিপাসীরা ভ্রমণের নেশায় পার হয় এইসব দুর্গম পথ, আর তাঁর মতো সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীরা পার

হন মোক্ষলাভের অভীপ্সায়। সকলেরই আলাদা আলাদা অভীষ্ট সিদ্ধির বাসনা থাকে হৃদয়ে। গুরুজীর বংশরক্ষার দায়িত্ব প্রকৃতঅর্থে পালিত হয়েছে কিনা জানেন না যোজ্ঞেশ্বর। তিনি শুধু গুরুর আদেশে তাঁর কাজটুকু করে দিয়ে এসেছেন। সাংসারিক জীবনের কোনো বন্ধনই তাঁকে কখনও আকর্ষণ করেনি তাই সেই রমণী গর্ভবতী হয়েছে কিনা জানার কোনও বাসনা তাঁর নেই। হলেই মঙ্গল। গুরুজির বংশটিও রক্ষা পাবে আর স্বামীর দ্বিতীয়বার বিবাহের ফলে স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হবার ভয়টিও থাকবে না। শরীর, চিত্ত আর আত্মাশুদ্ধির উদ্দেশ্যে এগিয়ে যান তিনি।

॥ সাত ॥

পাঁচটা-ছটা বছর ঋতু চক্র থেকে খসে পড়া কিছু কম কথা নয়। সারা জগৎ জুড়ে কত পরিবর্তন ঘটে যায়, কত পট পালটে গিয়ে নতুন রংয়ে আঁকা পট আসে। সুনন্দার জীবনের চালচিত্র, চেহারার মানচিত্রেও স্বাভাবিক ভাবেই পরিবর্তন আসবে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চোখের নীচে সদ্য গজিয়ে ওঠা হালকা পাতলা চুলের মতো রেখাগুলো, মাথার ঘনকালো চুলের মাঝে মাঝে ঈষৎ রূপোলী এক একটা তারের ঝিলিক ওর নজরে পড়ে ঠিকই। তথাগতর কানের পাশে জুলপী দুটো সাদা-কালোয় এক অপূর্ব সমন্বয় সৃষ্টি করে ওকে আরও সুন্দর আরও বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ববান করে তুলেছে। সুনন্দার সেই খোলামেলা জীবনে ইন্দ্রাণী মুখার্জি এখন সামান্য দায়িত্বের বোঝা চাপিয়েছেন। এখন আর নন্দু যখন তখন যেখানে খুশি হুটহাট করে বেড়াতে চলে যেতে পারে না। সোসাইটি লেডী ইন্দ্রাণীর ভাষায়—'এখন থেকে তোমাকেও আমার কাজে হাত লাগাতে হবে সুনন্দা। মুখার্জি অ্যান্ড মুখার্জি ইন্টারন্যাশনালের এ. ডি. এম. তথাগত মুখার্জির স্ত্রী হয়ে থাকার দিন শেষ। এখন তোমাকে সোসাইটি লেডী সুনন্দা মুখার্জি হয়ে সমাজে নিজের স্থান করে নিতে হবে। আমার বয়স হচ্ছে, আমার ক্ষমতাগুলো তোমাকে ট্রান্সফার করে দিয়ে যেতে চাই। তোমার সময় শেষ হয়ে আসলে তুমি আবার এমনি করেই জোজোর বউকে তৈরি করবে। তাকে ক্ষমতায় বসিয়ে দিয়ে যাবে। এভাবেই এই পরিবারের বিশেষ অস্তিত্ব সমাজে চিরকাল টিকে থাকবে।' —এরপর থেকেই নন্দুর জীবনের ফাঁকফোঁকর গুলো ভরাট করে দিয়েছে নানা রকম কল্যাণমূলক সংস্থা। আগে শাশুড়িকে এত ব্যস্ত থাকতে দেখে ও ভাবতো কি এমন কাজ যে মম বাড়িতে থেকে একটু আরাম করার সময়ও পায় না? এখন শাশুড়ির সঙ্গে নিজেও জুটে গিয়ে বুঝতে পারে আলিপুরের মুখার্জি ম্যানশনের পাঁচিলের বাইরে দুনিয়াটাতে কত কষ্ট, কত দুঃখ ছড়িয়ে আছে।

এসব কাজ করতে গিয়ে ওর প্রায়ই অপুর কথা, সজলকাকু, কাজলকাকু মনা- পুটুদের কথা মনে পড়ে। নিজেকে দোষী বলেও মনে হয়। ওর নিজের জীবনে তো না পাওয়ার কষ্ট নেই, ছিল না কখনও। তখনকার মানসিকতায় ও হয়তো বুঝতেই পারেনি

মনা—পুঁটুরা একটা যা-তা সামান্য কাজ পেলেও ওদের সংসারের শূন্য ভাঁড়ারে চাল-ডালের জোগানটুকু অব্যাহত থাকত। একটু ইচ্ছে থাকলে ও হয়তো মনা-পুঁটুদের একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারত। ওদের যোগ্যতায় যেমন হয় তেমন কিছু। কিন্তু ঐ অপুর জন্যই তো শক্ত মুখে ওদের তাড়াতে হয়েছিল। কি জানি— কেমন আছে সজলকাকু, কাজল কাকুরা? অপুই বা কেমন আছে? ইচ্ছে করে জানতে কিন্তু এতসব নোংরামি জানার পর ভয় হয় আবার অপু নামের ওই পাঁকের কাছাকাছি যেতে। অপু যে শেষ পর্যন্ত নিজে থেকে মুক্তি দিয়ে গেছে সেটাই ভগবানের আশীর্বাদ। এই কোলকাতা শহরে ছড়িয়ে থাকা কত যে হাসপাতাল, থ্যালাসেমিয়া সোসাইটি, স্প্যাসটিক সোসাইটি, স্ট্রিট চিলড্রেনদের জন্য এডুকেশনাল অর্গেনাইজেশন, আরও নানা রকমের কাজে মুখার্জি অ্যান্ড মুখার্জিরা কত লক্ষ লক্ষ টাকা যে অনুদান দেয় বছরে—এসব আগে নন্দুর জানা ছিল না। এসব কোনো একটাতে মনা-পুঁটুকে দেড়-দুহাজার টাকা বেতনের কোনো কাজে ইন্দ্রাণী মুখার্জিই ঢুকিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু নন্দু তো তখন শাশুড়িকে কিছু বলেই নি। উল্টে অপকীর্তি-কলাপ যাতে ওনাদের কান পর্যন্ত না পৌঁছয় তার জন্যই ব্যস্ত থেকেছে। এখন এসব ভাবলে কষ্ট হয় ওর।

এ বাড়ির হাউসকিপার মিসেস গেমস্ কিছুদিন ধরেই ভুগছেন নানা রকম উপসর্গে। বয়সও হয়েছে। একটানা তিরিশটা বছর ইন্দ্রাণীর ঘরদুয়ার সামলেছেন গোমস। মুখার্জি বাড়িতে যারা কাজ করে তারা আজীবন থেকেই যায়। অফিসের নিয়মকানুন বাড়ির কাজের লোকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ইনক্রিমেন্ট, প্রভিডেন্ড ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, মেডিক্যাল বেনিফিট, মেডিক্যাল ইনসিওরেন্স সব সুবিধাই পায় ওরা। মিসেস গোমস না এলে হাউসকীপিং রুনার ঘাড়ে পড়ে। তাতে অবশ্য রুনা এতটুকু অখুশি হয় না। সেদিন সকালে মিসেস গোমসের ছেলে পিটারের ফোন পেয়ে ইন্দ্রাণী সঙ্গে সঙ্গে ছুটলেন এলিয়ট রোডে ওদের বাড়িতে। ব্রেকফাস্ট ও করার সময় নষ্ট করেননি। দুপুরে নন্দুকে ফোন করলেন—'সুনন্দা, খুব খারাপ খবর আছে। মিসেস গোমসের ক্যান্সার সন্দেহ করছেন ড. বাসু। আমি এখনও হসপিটালে। — হ্যাঁ, বাড়ি থেকে পিটার আর আমি এখানে নিয়ে এসেছি কারণ ব্লাড ভমিট করেছিল মারিয়া। না-না। কালকে রিপোর্টগুলো পাওয়া যাবে। তোমরা আমার জন্য অপেক্ষা করো না, আমার ফিরতে বিকেল হবে।'

সেই থেকে ইন্দ্রাণী নিয়মিত মারিয়া গোমসকে দেখতে যান। এক শুক্রবারে প্রথম নন্দুকে ডেকে বললেন—'আজ স্প্যাসটিক সোসাইটির মিটিংটাতে আমার না গেলেই নয়, তুমি কি মারিয়াকে দেখতে যেতে পারবে?'

—'অফকোর্স মম! আমি মিসেস গোমসকে দেখতে চলে যাব।'

গুড্। তাহলে আর একটা কাজও করে এস। ডাক্তার বোসের সঙ্গে দেখা করে মারিয়ার বিপোর্টগুলোর জেরক্স নিয়ে এস। কেমো তো দুটো হয়েছে, রেজাল্ট ভালো হচ্ছে

বলছিলেন ড. বোস। আশা করছেন মারিয়া সুস্থ হয়ে যাবে। পিটারটা খুব কষ্ট পাচ্ছে মনে মনে। মা ছাড়া আর তো কেউ নেই ছেলেটার! আজ আবার ও যেতে পারবে না জানিয়েছে আমাকে। ওর আজ মিউসিক রেকর্ডিং-এর ডেট পড়েছে। তুমি গেলে মারিয়ার অন্তত: একজন ভিজিটরকে পেয়েও ভালো লাগবে। আর শোনো মারিয়া 'রোজ' পছন্দ করে, ওর জন্য ফ্রেশ রোজের বোকে নিতে ভুলো না।'

—'ও. কে বাবা। কিছু ভুলব না।

মিসেস গোমস কেবিনে শুয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। বোঝাই যাচ্ছিল ভিজিটরের জন্য অপেক্ষা করছেন। ওনার ভারী চেহারাটা একেবারে শুকিয়ে গেছে। মাথার চুলগুলো জায়গায় জায়গায় যেন কেউ খামচে তুলে নিয়েছে। কেমোথেরাপীর আফটার অ্যাফেক্ট। ওই রুগ্ন শরীরেও হাতে গোলাপের তোড়া নিয়ে নন্দুকে ঢুকতে দেখে খুশির হাসিতে ভরে উঠল ওনার মুখ।

—'হাই, মিসেস গোমস্?'—নন্দু ফুলের তোড়াটা এগিয়ে দেয়।

—'হাই! ইটস্ সো নাইস অফ ইউ মিসেস মুখার্জি জুনিয়র টু কাম হিয়ার। থ্যাংকস ফর দ্যা রোজেস্!' — মিসেস গোমস্ গোলাপের পাপড়িগুলোতে আলতো আঙুল বোলাতে থাকেন। চেয়ারটা টেনে বসে নন্দু বলে —'আজ মম আসতে পারলেন না, স্প্যাসটিক সোসাইটির একটা মিটিংয়ে যেতেই হল। আজ কিন্তু পিটারও আসতে পারবে না মিসেস গোমস। ওর আজ একটা রেকর্ডিং আছে।'

—'পুওর পিটার! আমার জন্য ওর নিজেব কত যে ক্ষতি হচ্ছে! ছেলেটা সবে নাম করতে শুরু করেছিল, ওর সাধনার স্বীকৃতি পেতে শুরু করেছিল ঠিক তখনই আমার এ রোগ হল।'—

দীর্ঘশ্বাস ফেলেন মিসেস গোমস্।

মিসেস গোমসের হাতটা নিজের মুঠোয় ধরে নন্দু বলে —'আমরা তো রয়েছি মিসেস গোমস! পিটারকে আমরা কোনোমতেই থেমে থাকতে দেব না। আজ সময় বের করতে পারলে তথাগতও আপনাকে দেখতে আসতে পারে। তাছাড়া ডক্টররা তো বলছেন আপনার কেমোথেরাপী দারুণ রেসপন্স করেছে। আপনি আর কয়েকদিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে যাবেন।'

মিসেস গোমস বললেন —'থ্যাংক গড। তাই যেন হয়। পিটারের জন্যই আমার আরো কিছু দিন বেঁচে থাকা খুব দরকার। ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেই আমার কাজ শেষ! তখন মরলেও দুঃখ হবে না। একদিন তো মরতে হবেই!'

এখানে আসার পর থেকেই একজন কারও কান্নার আওয়াজ আসছিল। কখনও জোরে খানিকক্ষণ হয়ে থেমে যাচ্ছিল আবার কখনও গুমরে গুমরে কাঁদছিল। এই অচেনা দুঃখগুলোর সঙ্গে নন্দুর মানিয়ে নিতে সময় লাগে। কত সাংঘাতিক যন্ত্রণায় এভাবে কাঁদে

মানুষ! স্প্যাসটিক সোসাইটির বাচ্চাগুলোকে দেখার পর প্রথমদিন রাত্রে ও ঘুমোতে পারেনি ভালো করে। শুধু মনে হয়েছে কার অভিশাপে, কোন অপরাধে এমন সুন্দর শিশুদের ভগবান এভাবে পাঠালেন পৃথিবীতে? থ্যালাসেমিয়ার বাচ্চাগুলোকে ব্লাড ট্রান্সফিউশনের সময় ওর রাগটা ওদের বাবা -মার ওপরে গিয়ে পড়ে। কেন ওরা বাচ্চা হবার আগে নিজেদের রক্ত পরীক্ষার মতো প্রাথমিক কাজটাও করে না? ওদের দোষে তো বাচ্চাটা কষ্ট পাচ্ছে? বাচ্চার জীবনটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে? সুস্থ-নিরোগ বাচ্চা হতে পারবে না জেনেও তো অনেক বাবা-মা ডাক্তারের সাবধান বানী অগ্রাহ্য করেও একটা চান্স নিয়ে দেখতে গেছে। এরকম ঘটনার কথা মা-বাবা নিজের মুখে কেঁদে কেঁদে এখন বলছে থ্যালাসেমিয়া সোসাইটিতে এসে। —ইস্ এখানে এই ক্যানসার ওয়ার্ডে ওই রুগীটা কি বিলাপ করে কাঁদছে! নন্দু মিসেস গোমসের জন্য চিন্তিত হয় —'পাশেই জেনারেল ওয়ার্ড, এরকম কান্নার আওয়াজে আপনার ঘুমের অসুবিধা হয় না তো মিসেস গোমস? আপনি কিন্তু নিজেকে ঠিক রাখবেন। ভালো হয়ে যাবেন আপনি।'

—'একটু অসুবিধা যে হয় না তা নয়। তবে আমি ভাবি যে কাঁদে তার যন্ত্রণার মাত্রাটা কতখানি হচ্ছে! নেহাৎ আমার প্রথম দিকেই ধরা পড়ে গেছে আর কেমো-তে কাজ করেছে, তা না হলে আমাকেও তো এভাবেই যন্ত্রণায় কাঁদতে হতো। জানি না ঈশ্বর পরে আমার জন্য কি রেখেছেন। তবে এ কান্নার আওয়াজটা জেনারেল ওয়ার্ডের ভেতর থেকে আসছে না। এই পেশেন্টটা ব্রেস্ট ক্যানসারের। বেচারির দুটো ব্রেস্টই পচে গেছে। ওখানে যে কোনোদিন ব্রেস্ট ছিল সেটাও নাকি বোঝা যায় না। শুনেছি নার্সের মুখে। ও আগে ওয়ার্ডের ভেতরেই ছিল। পচাগন্ধে ওয়ার্ডের অন্য পেশেন্টরা আরো অসুস্থ হয়ে পড়বে বলে ওকে বারান্দায় বের করে দিয়েছে। কি অসহ্য কষ্ট পায় মানুষটা, আমার দেখলেও ভয় করে।'

—'কিন্তু আপনি কি করে দেখলেন ওকে?' —জিজ্ঞেস করে নন্দু।

—'কেন? ওই তো ওর বেড। দরজার দিকে তাকিয়ে দেখুন। আমি শুয়ে শুয়েই ওকে কষ্ট পেতে দেখি। কেউ ওর ধারে কাছে যেতে চায় না। আসলে গন্ধটার জন্য ইচ্ছে থাকলেও হয়তো যেতে পারে না। হাওয়ার মুখ এখন এদিকে নেই তাই গন্ধটা পাচ্ছেন না আপনি। হাওয়ার মুখ যখন এদিকে থাকে তখন কেবিনে টেঁকা যায় না। নার্স অবশ্য তখন দরজাটা বন্ধ করে রাখে।' নন্দু মুখ ঘুরিয়ে ওর পেছনে দরজার বাইরে তাকায়। রুগি এখন শীর্ণ হাত দিয়ে বুকের ওপর থেকে কিছু তাড়াচ্ছে হাওয়া করে। বোধহয় মাছি বসছে! মুখ ঘুরিয়ে নেয় ও । বল—'ইশ্, ভগবান যে মানুষকে কেন এত কষ্ট দেন জানি না।'

মিসেস গোমস বলেন—'আমিও ঠিক এই কথাটাই ভাবি। ঈশ্বর কোন পাপের শাস্তি দেন এভাবে? আমি তো জীবনে কোনো পাপ কাজ করিনি। রাস্তার কুকুর-বেড়ালকেও

দুটো খেতে দিয়েছি, ঈশ্বরে বিশ্বাস করে সৎজীবন যাপন করেছি, তবু আমারও তো হয়েছে?'

নন্দু বলে —'থাক্ এসব নিয়ে চিন্তা করবেন না। আপনি ভালো হয়ে যাবেন। —ও আবার দরজার বাইরে তাকায় তারপর বলে —'ভিজিটিং আওয়ারেও কেউ আসেনি বেচারার। আহা, একা একা মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে। ওর বোধহয় কেউ নেই তাই আসেনা কেউ।'

—'না মিসেস মুখার্জি আসে। একজন বৃদ্ধ লোক আর একটা অল্পবয়সি ছেলে আসে। আজ বোধহয় এখনও আসেনি। জানেন, ওই বৃদ্ধটি মহিলার কে আমি জানি না। বাবা হবে বোধহয়। সকালে-বিকেলে দুবেলাই আসে। আসলে আয়ারাও ওর কাজ করতে চায় না গন্ধের জন্য। ওই বৃদ্ধ এসে দুবেলা ওকে পরিষ্কার করে। খাওয়ায়। কি যত্ন যে করে। আমার বেডে শুয়ে শুয়ে আমি সব দেখি, সোজাসুজি দেখা যায় তো? আশ্চর্য কি জানেন মিসেস মুখার্জি, ওর বেডের পাশ দিয়ে যারাই যায় সবাই নাকে কাপড় চাপা দিয়ে যায়। কিন্তু ওই বৃদ্ধ খোলা নাকেই ওকে পরিষ্কার করে, বসে থাকে কাছে। এত পচা গন্ধকেও সহ্য করে নিয়েছে।'

—'একমাত্র মেয়ে হবে হয়তো। হাজার হলেও বাবা তো! তাই শেষ সময়টুকু যতটা সম্ভব যত্ন করে যাচ্ছে। —আচ্ছা মিসেস গোমস্, আমাকে একবার ডক্টরের সঙ্গে কথা বলতে হবে, মম বলে দিয়েছিল। আমি দেখা করে সময় থাকলে আবার আসব এখানে। কেমন?'— বলল সুনন্দা।

—'ঠিক আছে। আপনারা নিজের সামান্য এমপ্লয়ীজদের জন্য এত ব্যস্ততার মধ্যেও যা করেন সেটা এদেশে খুব কমই দেখা যায়। জানেন, আপনাদের হাউস হোল্ডের একজন বলে নিজেকে ভাবতে আমার ধন্য মনে হয়।' —কৃতজ্ঞতায় গলা বুজে আসে মিসেস গোমসের।

—'ওরকম বলবেন না মিসেস গোমস। আপনি তো আমাদের family-রই একজন। আচ্ছা আমি এখন আসি তাহলে।' —নন্দু কেবিন থেকে বেরিয়ে এল। এদিক ওদিক তাকিয়ে একজন সিস্টারকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করল ড. বোসের চেম্বারটা কোনদিক দিয়ে। সিস্টার বলল—'এই বারান্দা দিয়ে সোজা গেলেই ডানদিকে একটা করিডোর পড়বে, সেটা দিয়ে গিয়ে বাঁদিকে টার্ন নেবেন, সামনে পর পর চেম্বার আছে। নেমপ্লেট লাগানো আছে, দেখে নেবেন।

—'ধন্যবাদ'। —বলে নন্দু এগিয়ে চলল। বারান্দার ওই পেশেন্টটির এখনও ভিজিটর আসে নি।

দূর থেকেই গন্ধটা পাচ্ছিল নন্দু। সত্যি, মাংসপচা গন্ধ যে কি মারাত্মক হতে পারে ধারণা ছিল না আগে। নিজের শাড়ির আঁচলটা আপনা হতেই নাকে উঠে এল। তাকাবে

না ভেবেও চোখ ঠিক পড়ে গেল পেশেন্টটির উপর। একটা রংচটা সায়া শুধু পড়ানো আছে। উর্ধাঙ্গ নিরাভরণ। উফ্। কি বিভৎস। বুকের পুরোটা জুড়েই দগদগে ঘা। স্তনের কোনো চিহ্নই নেই। কোনো হিংস্র জন্তু যেন স্তন দুটি খুবলে খেয়ে কাঁচা মাংসের একটা প্রলেপ শুধু চিহ্ন হিসেবে রেখে গিয়েছিল, —যা এখন পুঁজ ভরা দগদগে ঘা। মাথার চুল একগাছিও নেই। শীর্ণ শরীরে ততোধিক শীর্ণমুখে দুটি চোখ জ্বল জ্বল করে জ্বলছে এক অন্ধকার গভীর কোটর থেকে। কি ভীষণ দৃশ্য! সহ্য করা যায় না। নন্দু এরকম অবস্থার কোনো মানুষকে কোনোদিন দেখেনি। ও তাড়াতাড়ি পা চালালো জায়গাটা পার হবার জন্য । বেড পার হয়ে যেতে যেতে শুনলো কাতর কণ্ঠে কঙ্কালসার মহিলা বিলাপ করে চলেছে—'এক ফোঁটা জল দাও, একটু জল। গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। কেউ একটু জলও দেয় না। হে ভগবান, আমায় নাও এবার। মুক্তি দাও।' —থমকে দাঁড়ায় নন্দু। আহা, একটু জলের জন্য এভাবে কাতরাচ্ছে আর কেউ একটু জলও দিচ্ছে না ওকে। কি করবে ভেবে পায় না। এদিক ওদিক তাকায় যদি হাসপাতালের কোনো আয়া বা নার্সকে দেখতে পায়। না। আশে পাশে ওরকম কেউই নেই, শুধু ভিজিটররাই আসছে যাচ্ছে। কি ভেবে নন্দু দু পা পিছিয়ে আসে। বেডের মাথার কাছে ছোটো কেবিনেটের ওপর জলের বোতল, গ্লাস আর দুটো ঠোঙা রাখা রয়েছে। প্রচন্ড গন্ধে ওর শরীর গুলিয়ে ওঠে তবু নাকে আঁচলটা ভালো করে চেপে ধরে ও একহাতেই বোতলের ছিপি খুলে গ্লাসে জল ঢালে। গ্লাসটা নিয়ে রুগিনীর পাশে এসে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করে—'এই যে জল। শুয়ে শুয়ে খেতে পারবেন তো?' —রুগিনীর জ্বল জ্বলে চোখ দুটো নন্দুর মুখে স্থির হয়ে আটকে থাকে চুম্বকের মতো। কি তীর্যক দৃষ্টি। ভয় করতে থাকে নন্দুর। একহাতে গ্লাস অন্যহাতে নাকে কাপড় চাপা দিয়ে স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে থাকে নন্দু। মহিলা কোনো কথা না বলে মুখটা হাঁ করল এবার। নন্দু ঝুঁকে একটু একটু করে জলটা খাইয়ে দিল ওকে। যতক্ষণ জল খাওয়াচ্ছিল ততক্ষণ একজোড়া চোখ ওর মুখের ওপর পলকহীন ভাবে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। নন্দু গ্লাসটা টেবিলের ওপর রেখে এবার যাওয়ার জন্য পা বাড়ালো। আর ঠিক তক্ষুনি যেন ওর মাথায় আকাশ ভেঙে ভয়ানক শব্দে বাজটা ভেঙে পড়ল। —'নন্দু!' —বেডে শোওয়া দুর্গন্ধময় রুগি নন্দুকে ডাকল। এগিয়ে যাওয়া পাটা থমকে গেল ওর। চুম্বকের মতো যেন মেঝের সঙ্গে আটকে গেল ও। কে ও? কে? ক্ষীণ গলার আওয়াজ শুনে চেনা বলে মনে হয় না। ঘুরে আবার বেডের কাছে এল নন্দু।

—'আপনি আমাকে ডাকলেন?'

—'নন্দু, আমাকে চিনতে পারিস নি তুই। কেউ আর চিনতে পারে না রে।'

—'অপু!' —নন্দু যেন আবার ব্রহ্মপুত্রের জলে ডুবে যাচ্ছে। দম বন্ধ হয়ে আসছে। নিজের শরীরের ওপর যেন কোনো কন্ট্রোলই নেই ওর। পাশে রাখা টুলটার ওপর ধপ্

করে বসে পড়ল ও। কখন যে নাক থেকে চাপা দেওয়া আঁচলটা খসে পড়েছে নিজেও জানে না। অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর মুখের কোটর থেকে দুটো পাথরের কুচির মতো চোখ স্থির হয়ে রইল নন্দুর মুখে।

—'চিনেছিস তুই? — দ্যাখ্ নন্দু, অপুর পচাগলা শরীর, অপুর ধ্বংস, পাপ সব দেখ।'

—'ওরকম করে বলিস না।' হাত দিয়ে অপুর মুখ চাপা দিল নন্দু।

কোটরের ভেতরের পাথরকুচি দুটোতেও জল ছিল। দুফোঁটা হয়ে কোটরের দু কোণ দিয়ে গড়িয়ে এল কানের দিকে। আর চিরদিনের নরম নন্দুব বড়ো বড়ো দুটো চোখে শ্রাবণ মাসের বর্ষা নেমে এলো। দুজনেই যেন সব কথা হারিয়ে ফেলেছে। অপুর হয়তো কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু নন্দু গলা দিয়ে কোনো আওয়াজও বের করতে পারল না। অপুর হাতটা ধরে বসে রইল ও, চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগল অপুর খোলা শরীরের ওপর। বুকের থক্ থকে ঘায়ে সাদা রং লক্ষ লক্ষ পোকা কিলবিল করছে। ছোটো কৃমির মতো, সারাক্ষণ নড়ছে ওরা, যেন এমন পুঁজ-রক্ত খাওয়ার উৎসবে ওরা উল্লাসে মত্ত। চোখ সরিয়ে নিল নন্দু। মনে পডল ছোটো বেলাতে কতবার ওরা একে অপরের সামনে নগ্ন হয়েছে। আজ থেকে পাঁচবছর আগেও ওদের আলিপুরের বাড়িতে এক গ্রীষ্মের দুপুরে এসেছিল ঘামে স্নান করে। এসেই ঘোষণা করেছিল—'অ্যাই, একটা সায়া, শাড়ি আর ব্লাউজ দে। চান করব এক্ষুনি। কি গরম বাইরে তুই বুঝবি কি করে? থাকিস তো এয়ার কন্ডিশনড্ ঘরে। উফ্! গলিয়ে দিয়েছে রক্ত মাংস সব।' বলেই বাথরুমের দরজা খুলে ঢুকতে ঢুকতে বলেছিল—'তুই পাতলা একটা ন্যাকড়া ন্যাকড়া মতো শাড়ি বের করে রাখ্।' বলে বাথরুমের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। স্নান সেরে নন্দুর তোয়ালেটা বুকের কাছে বেঁধে বেরিয়ে এসেছিল, হাতে ছাড়া কাপড়গুলো নিয়ে। নন্দুর সামনেই অনায়াসে তোয়ালেটা খুলে ফেলে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে সায়া-ব্লাউজ পরেছিল। নন্দুও বলেছিল —'একি! তুই আমার সামনে সব খুলে ফেললি? লজ্জা করছে না তোর?'

অবাক হয়ে নন্দুর দিকে তাকিয়েছিল অপু। বলেছিল—'আশ্চর্য্য করলি মাইরি! লজ্জা করব তোর সামনে? আরে ছোটোবেলা থেকে তোর কোথায় তিল আছে আর আমার কোথায় জড়ুল আছে আমরা জানি। তুই না, একটা যাচ্ছেতাই!' — বলতে বলতে সায়াটা মাথার ওপর দিয়ে গলিয়েছিল অপু। ওর নগ্ন উর্ধাঙ্গের দিকে বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখেছিল নন্দু, যেন কোনারকের হাজার হাজার বছর আগে মরে যাওয়া ভাস্কর অনেক যত্নে তৈরি করেছিল দুটি স্তন। এতটা বয়সেও যা কোনারকের মূর্তির মতোই অটুট রয়েছে। বড়ো হওয়ার পর অপুকে এই প্রথম নগ্ন শরীরে দেখল নন্দু। যত্নহীন, ব্যায়ামহীন শরীর যে এত সুগঠিত হতে পারে ধারণা ছিল না ওর। আর আজ? আজ চোখের সামনে মাত্র পাঁচ বছর আগের দেখা সেই অপূর্ব বক্ষদেশে কোন স্তন নেই, আছে শুধু পোকায় ভরা দগদগে ঘা।

—'নন্দু, অপু যাতে মুক্তি পায় তার জন্য একটু প্রার্থনা করবি? আর যে সহ্য করতে পারছি না আমি। যমেরও ঘেন্না হয়ে গেছে আমার ওপর। এই পচে যাওয়া শরীরটা নিতে চায় না রে। গুয়ে মুতে মাখামাখি হয়ে পড়ে থাকি, হাসপাতালের লোকরা গন্ধের জন্য কাছেও ঘেঁষে না।'

দম নেবার জন্য থামে অপু।

—'কথা বলিস না অপু। কষ্ট হচ্ছে তোর কথা বলতে।'

—'না রে। কথা বলতে কষ্ট হয় না। গলায় তো নয়! কষ্টটা ব্যথার, পোকাগুলোর মাংস কুরে কুরে খাওয়ার। পাগল হয়ে যাই আমি—এত যন্ত্রণা। শত্রুরও যেন না হয় কখনো।'

—'মুখুজ্জেমশাই কোথায় অপু? উনি আসেন না?'

—'আসে। ওই আসে। আমার গু-মুত সব পরিষ্কার করে তোর মুখুজ্জেমশাই। শেয়াল, কুকুর, শকুনও যাকে ঘেন্না করে কাছে আসে না, তার কাছে একমাত্র ওই আসে। রোজ দুবেলা। আজও আসবে। —ভেঙে ভেঙে আস্তে আস্তে বলে অপু। —'অবাক হচ্ছিস নন্দু? পৃথিবীটা যে কি খারাপ জায়গা তুই ভাবতেও পারবি না রে। আমার মতো লোকরা আছে যে এখানে! তোর মুখুজ্জেমশাইর মতো মানুষরা থাকলে পৃথিবীটাই স্বর্গ হয়ে যেত। বড়ো বেশি দেরি হয়ে গেল রে নন্দু ওকে চিনতে।' —অপুর মুখটা বিকৃত হয়ে ওঠে যন্ত্রণায়। বালিশের কোনাটা খামচে ধরে কাতরাতে থাকে ও। নন্দু অসহায়ের মতো এদিক ওদিক তাকাতে গিয়ে দেখে সেই ঘষাকাচের মতো চশমা পরা মানুষটি এগিয়ে আসছে। আরো কুঁজো, আরো বৃদ্ধ হয়ে গেছেন মানুষটি। তবু নন্দু চিনতে পারে মুখুজ্জেমশাইকে। ওনার সঙ্গে একটি যোলো-সতেরো বছরের ছেলে, ওনার একটা বাহু ধরে আছে, যেন সাহায্য করছে ওনাকে পথ দেখাতে। হুবহু অমিতের মুখ বসানো। নন্দু বুঝতে পারে অমিতের ছেলে ও। তার মানে অমিতের সঙ্গে ওর স্ত্রীর সঙ্গেও সম্পর্ক ছিল! ছেলেও ছিল ওদের। যে কথাটা অপু চেপে গিয়েছিল নন্দুর কাছে। ওরা দুজনে বেডের কাছে আসতে নন্দু উঠে পড়ল টুল থেকে। মুখুজ্জেমশাই একবার নন্দুর দিকে —একবার অপুর দিকে তাকালেন। চিনতে পারেন নি নন্দুকে। তাই নন্দুই বলল —'মুখুজ্জেমশাই, আমি নন্দু, অপুর বন্ধু। সেই যে ডিব্রুগড়ের!'

—'ও! এবার মনে পড়েছে। আপনি কি করে খবর পেলেন?'

—'খবর পাই নি। আমি অন্য একজনকে দেখতে এসেছিলাম। অপুই আমাকে চিনতে পেরে ডেকেছে।'

—'ও!' বিষণ্ণ মুখুজ্জেমশাই এবার অপুর মাথায় হাত রেখে অদ্ভুত মমতা জড়ানো গলায় জিজ্ঞেস করেন—'জল খাবে?'

—'না গো। নন্দু খাইয়েছে একটু আগে।'

—'আজ আসতে বড়ো দেরি হয়ে গেল। পথে মিছিল বেরিয়েছে, বাস আর এগোয় না। এবার তোমায় পরিষ্কার করে দেব।' —বলে চুরুটের মতো মোটা ধূপ বের করে প্রথমে জ্বাললেন। সুন্দর চন্দন গন্ধে খানিকটা চাপা পড়ল পচা দুর্গন্ধ। ছেলেটি বেডের নীচে রাখা সাদা কলাইকরা গামলাটা নিয়ে কোথাও গেল। একটু পরে গামলায় করে গরমজল নিয়ে এল। সঙ্গের ব্যাগ থেকে কি সব লিকুইড ওষুধ জাতীয় দুটো শিশি বের করে রাখল মাথার দিকের ছোটো কেবিনেটটার ওপর। ওটার ভেতর থেকে তুলোর বান্ডিল, একটা শায়া, পাউডার এসবও বের করে রাখল। মুখুজ্জেমশাই জলের গামলায় ওষুধগুলো মেশালেন। তারপর তুলো ভিজিয়ে পরম যত্নে অপুর ঘা পরিষ্কার করে দিতে থাকলেন। অনেকটা পূঁজ-রক্ত পরিষ্কার হলে, একটা টুইজার বের করলেন। তারপর সেটা দিয়ে একটা একটা করে পোকা তুলে তুলে হাতের তুলোয় রাখতে লাগলেন। কেউ কোনো কথা বলছিল না। নন্দুও নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দেখে যাচ্ছিল। অপুর যেন অনেক কষ্ট কমে গেছে মনে হল ওর, কারণ ও দুচোখ বন্ধ করে শুয়েছিল আর ছটফটানিটাও আগের মতো ছিল না। নন্দুর মনে হল অপুর মাকড়সার জালের মতো রিংকল্ড মুখে যেন একটা প্রশান্তি নেমে এসেছে। যে স্বামীকে অপু কোনোদিন স্বামীর স্বীকৃতি দেয় নি, প্রবল ঘৃণায় দূরে সরিয়ে রেখেছে, সেই বৃদ্ধ স্বামী আজ পচা গলা পুঁতিগন্ধময় অপুকে সেবা করে চলেছে! কি অদ্ভুৎ দৃশ্য! একটা দিকের পোকা তোলা শেষ হলে মুখুজ্জেমশাই মলমের টিউব খুলে অনেকটা মলম বের করে ঢেকে দিলেন ঘা টাকে। এবার অন্যদিকে পোকা তোলা শুরু হল। নন্দু নিজের রিস্টওয়াচ দেখল, ওকে এখন যেতেই হবে, তা নাহলে হয়তো ড. বোসকে পাবে না। কিন্তু নড়তে পারছে না ও। কি এক অদৃশ্য বন্ধন যেন অপুর সঙ্গে ওকে জুড়ে দিয়েছে। ও দেখল অমিতের ছেলে নোংরা তুলো আর গামলাটা নিয়ে আবার চলে গেল। এবার ও গামলায় এমনি জল নিয়ে এল। মুখুজ্জেমশাই একটা ছোটো গামছা বের করে ভিজিয়ে নিয়ে অপুর সারা গা পরিষ্কার করে মুছিয়ে দিলেন। এরপর ফ্রেশ সায়াটা পরালেন। সারা গায়ে ট্যালকম পাউডার মাখিয়ে দিয়ে এবার মুখ তুলে তাকালেন উনি। এতক্ষণ কোনদিকে তাকাননি—যেন ওখানে একমাত্র অপু ছাড়া আর কেউ উপস্থিত ছিল না। যেন নিষ্ঠাভরে যে পুজো উনি করছিলেন তাতে কোনো ব্যাঘাত না ঘটে। এতক্ষণে যেন শেষ হল পুজো।

—'আপনাকে ও খুব ভালোবাসে, তাই দেখুন ভগবানই আজ আপনাকে এখানে এনে ফেলেছেন। গত তিনবছর ধরে ভুগছে। প্রথমে তো একটা সাইডে হয়েছিল। অপারেশন করে বের করে দিয়ে ছিল ডাক্তার। তারপর কিছুদিন বেশ ভালো ছিল। বুঝতেই পারেনি যে এই ভালো থাকাটা সাময়িক। ভেতরে ভেতরে ছড়িয়ে পড়েছিল; অন্যদিকটা আর অপারেশনও করতে পারেনি। এমন পচন ধরে গেল যে দেখতে দেখতে এই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে।'

—'কতদিন ধরে হাসপাতালে আছে?'

—'তা মাসতিনেক তো হয়ে গেল। প্রথমে ওয়ার্ডের ভেতরেই ছিল। গন্ধ ছড়াতে শুরু হবার পর বাড়ি নিয়ে যেতে বলেছিল। অনেক ধরাধরি করে হাসপাতালে রেখেছে অবশ্য, কিন্তু ওয়ার্ড থেকে বারান্দায় বের করে দিল।'

—'ওকে বাড়ি নিয়ে গেলেন না কেন মুখুজ্জেমশাই? আমার তো মনে হয় এখন ওকে বাড়ি নিয়ে গেলে আপনার কষ্টও কম হবে। এই যে দুবেলা আসা যাওয়া করছেন এটা করতে হত না। এখানে তো কেউ ওকে দেখে না, বাড়িতে থাকলে তবু সারাক্ষণ আপনি কাছে থাকতেন, দেখাশুনা করতে পারতেন।'

মুখুজ্জেমশাই চুপ করে রইলেন বেশ কিছুক্ষণ। তারপর বললেন—'এখানে তো তবু হঠাৎ কোনো দরকার পড়লে ডাক্তার আসবে দেখতে। ডাক্তার রোজ একবার দেখে যায়।' নন্দু আর কিছু বলল না। ওর সেল ফোনে রিং হল। ও একটু দূরে সরে গেল ফোনটা নিয়ে।

—'হ্যালো! নন্দু! শোনো, আমি আর আসতে পারছি না মিসেস গোমস্‌কে দেখতে। খুব আটকে পড়েছি। তুমি ড. বোসের সঙ্গে পারলে দেখা করে নিও। কেমন?'—তথাগতর ফোন।

—'তথাগত, মিসেস গোমস্‌ ভালো আছেন। কিন্তু এখানে এসে আজ যে পরিস্থিতিতে পড়েছি তা স্বপ্নেও কোনোদিন ভাবি নি। অপু -----!' — কথা শেষ করতে পারে না নন্দু, কান্নায় গলা বুজে আসে ওর।

—'অ্যাই, অ্যাই নন্দু! কি হয়েছে? তুমি কাঁদছ কেন? বল আমাকে, কি হয়েছে!' —ভীষণ উদ্বিগ্ন গলায় প্রশ্ন করে তথাগত।

—'অপু মারা যাচ্ছে তথাগত। ক্যান্সারে পচে গেছে ওর শরীর। বাইরে বারান্দায় পড়ে আছে ও। আর দুঃসহ যন্ত্রণায় তিলে তিলে মরছে। আমি সহ্য করতে পারছি না তথাগত! উফ্‌! ভাবা যায় না কি বীভৎস অবস্থা ওর। অপুর এমন অবস্থা দেখতে হবে আমি কোনও দিন ভাবিনি।'

—'শোনো, নন্দু, শুনছ? তুমি এখন কোথায়?'

—'অপুর কাছে। আমি ওকে চিনতে পারিনি। ওই আমাকে চিনেছে। বাড়ি এসে সব বলব তোমাকে। মুখুজ্জেমশাই আছেন ওর কাছে'।

—'শোনো নন্দু, তুমি খুব ভেঙে পড়েছ বুঝতে পারছি। আজ বাড়ি এলে আমরা কিছু একটা ব্যবস্থা নেব ওর জন্য। অন্তত বারান্দা থেকে যাতে ভেতরে নিয়ে রাখে তার ব্যবস্থা করে দেব আমি কাল-পরশুর মধ্যে। লক্ষ্মীটি কেঁদো না তুমি। তোমার তথাগত সব করবে অপুর জন্য। তুমি শুধু ফেরার পথে গাড়িটা সাবধানে চালিও লক্ষ্মীটি। যা আপসেট হয়ে পড়েছ, আমার ভয় করছে। প্লিজ, নিজেকে একটু সামলে নাও; একটা

কিছু ভালো ব্যবস্থা করব আমি। আর টাকাপয়সা লাগলে ওর স্বামীকে দিয়ে এসো যা আছে তোমার কাছে। টাকার জন্য চিকিৎসা আটকাবে না।

—'তথাগত, ও সব চিকিৎসার বাইরে চলে গেছে। যে কোনো মুহূর্তে চলে যেতে পারে। টিক্ টিক্ করে চলছে ঘড়িটা—কখন থেমে যাবে কি জানি। ওর আর টাকার দরকার নেই।'— কাঁদতে থাকে নন্দু।

—'এত খারাপ অবস্থা? কিছুই কি করা যাবে না?'

—'তুমি না দেখলে বুঝতে পারবে না গো। আর কিছুই করার নেই।'

—'ঠিক আছে, রোববার আমি যাব দেখতে। ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলব। এখন তুমি নিজেকে একটু কন্ট্রোল করে বাড়ি ফিরে এস।

—'হ্যাঁ, আসছি। ড. বোসের সঙ্গে দেখা করে চলে আসব। যদি ওনাকে পাই তবেই অবশ্য। তুমি আমার জন্য ভেবো না। আমি সাবধানেই গাড়ি চালাব। রাখছি।'

নন্দু ফিরে এল বেডের কাছে। অপু বোধহয় একটু ঘুমিয়ে পড়েছে মনে হল ওর। মুখুজ্জেমশাইকে বলল —'আমি আজ আসি। কাল আবার আসব আমি।' —একটু দ্বিধা করে আবার বলল—'মুখুজ্জেমশাই, যদি কোনো প্রয়োজন হয়, — মানে— ----- যদি ------' কথাটা শেষ করতে পারল না ও। ওর মন বলছিল টাকাপয়সার কথা বললে উনি হয়তো রাগ করতে পারেন। হয়তো ভাবতে পারেন নন্দু অনুগ্রহ করতে চাইছে। হয়তো আত্মসম্মান বোধে আঘাত লাগতে পারে ওনার। আর কিছু না থাকলেও স্বনামধন্য একটা বংশপরিচয় আছে ওনার। যারা এককালে বহুলোককে অনুগ্রহ করেছে। কয়েকপুরুষে সেই কোষাগার শূন্য হয়ে আজ এরা সাধারণের দলে এসে ভিড়েছে। কেউ চেনে না ওদের। কিন্তু রক্তে তো আত্মসম্মানের বীজটা থেকেই যায়। তাই নন্দু থেমে যায় সুবর্ণ রায় চৌধুরিদের বংশজাত মানুষটিকে টাকার কথা বলতে।

—'আপনি আর কি সাহায্য করবেন বন্ধুকে? ও তো সব সাহায্যের ঊর্ধ্বে চলে গেছে। আর তো কিছু করার নেই এখন। শুধু সময় গোনা।

—'ও মনে হয় ঘুমিয়ে পড়েছে।' প্রসঙ্গ পালটাবার জন্য বলে নন্দু।

—'ঠিক ঘুম নয়। ঘুমোতে পারে না। তবে পোকাগুলো তুলে দিয়ে পরিষ্কার করে দিলে একটা ঘুম ঘুম আচ্ছন্নতা আসে দেখেছি। এত যন্ত্রণা যে কী করে সহ্য করে যাচ্ছে। জীবনে শুধু যন্ত্রণাই পেলো। সুখ পায়নি।'

—'থাক্, ওসব কথা। আপনিও তো সুস্থ নন মুখুজ্জেমশাই। নিজের দিকেও একটু খেয়াল রাখবেন। তবু তো অমিতের ছেলেটি আপনার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সজল কাকু, কাজলকাকুরা আসে না?' প্রশ্ন করে নন্দু।

—'অমিতের ছেলে? কই না তো! ও তো আমাদের একমাত্র ছেলে। ও আসে। অপুর দাদারা এখন আর কেউ আসে না। আর তো অপুর ওদেরকে দেবার কিছু নেই!'

* * * * *

বাড়ি ফিরে এসে নন্দু স্নান করল। মনে হচ্ছিল ওর সারা শরীরে যেন গন্ধটা লেগে

রয়েছে। যতবার অপুর কথা ভাবছিল ততবারই চোখ ভরে জল আসছিল ওর। শাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে আপনা হতেই ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল —' হে ভগবান, অপুকে একটু দয়া কর তুমি, নাও ওকে প্রভু, আর কষ্ট দিও না। এবার মুক্তি দাও।' — রাত্রে তথাগত সব শুনল নন্দুর কাছে। ইন্দ্রাণী এবং তথাগত দুজনেই নন্দুকে আশ্বস্ত করল যে একটা কেবিনের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। আর বেশি টাকার লোভ দেখিয়েও একটা আয়া রাখা হবে। সারা রাত নন্দু ঘুমোতে পারল না। কেন এমন হল অপুর জীবনটা? ও কি পেলো জীবনে? অমিত কোথায়? ওর শেষ সময়ে অমিত ওর পাশে নেই, কিন্তু অমিতের ছেলে দুহাতে সেবা করে যাচ্ছে অপুকে আর মুখুজ্জেমশাই বলছেন ওদের ছেলে। কে দেবে এ কথার উত্তর? যে দিতে পারত সে তো শেষ শ্বাস গুনছে। সকাল হলেই ও অপুর কাছে যাবে। জীবনের শুরু অপুর সাথেই হয়েছিল ওর, আজ অপুর জীবনের শেষ দিনগুলো ওকে অপুর পাশে থাকতেই হবে। শৈশবের সখ্যতার বন্ধন কেউই বোধহয় কখনও কাটিয়ে উঠতে পারে না। জীবনের মাঝখানে যে বন্ধুত্বগুলো হয় সেগুলোর চেয়ে অনেক বেশি মজবুত হয় বাল্যবন্ধুত্বের প্রাচীন ইমারতের বুনিয়াদ। দূরত্ব বা অদর্শন কখনও ভুলিয়ে দিতে পারে না বাল্যবন্ধুকে। শেষ দিনগুলো নন্দু ভরিয়ে দেবে অপুকে বহু পেছনে ফেলে আসা শৈশবের ভালোবাসা দিয়ে। অপু যেমন বলেছিল যে ও নন্দুকে হিংসেও করে আবার ভালোবাসে তেমনি নন্দুরও অপুর ব্যবহারে বিতৃষ্ণা হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু ভালোবাসাটাও মরে যায়নি এখনও।

—'এই অপু চালতা গাছের তলায় ভূত থাকে। এখানে একটা হুতোম প্যাঁচা বসে থাকে দেখিস না? ঠামা বারণ করেছে চালতা গাছের নীচে যেতে। চল না এখান থেকে।' —বেজবড়ুয়াদের পেছন বাগানে ঝাঁকড়া চালতা গাছটার থেকে অনেকটা দূরে শশার মাচার পাশে দাঁড়িয়ে নন্দু মিনতি করতে থাকে অপুকে। অপু ওর কথায় কান না দিয়ে নীচের দিকের ডালে ঝুলে থাকা হাতের নাগালের মধ্যেকার সবকটা পাকা চালতা পেড়ে মাটিতে জড়ো করেছে। এবার ওর সেই আঁকশিটা দিয়ে উঁচু ডালের চালতাগুলো পাড়ার জন্য খোঁচা মারতেই দিনকানা সেই প্যাঁচাটা ডানা ঝটপটিয়ে বেরিয়ে এসে আন্দাধুন্দ ওড়াওড়ি করতে থাকে ড্যাবড্যাবে চোখে। ওমনি অপু —'ওরে বাবারে, —বলে দৌড়ে পালাতে যায়। নন্দু তার আগেই শশাখেত ছেড়ে দৌড় লাগিয়েছিল। পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখে দিনকানা প্যাঁচাটা অপুকে ঠুকরে মাটিতে ফেলে দিল। তীক্ষ্ণ ধারালো চঞ্চু দিয়ে অপুর বুকের ওপর বসে ঠোকরাচ্ছে। —গোঁ গোঁ করতে করতে নন্দু তথাগতকে প্রবল জোরে জাপটে ধরতেই তথাগত উঠে বসে। —'অ্যাই! অ্যাই নন্দু! স্বপ্ন দেখছ নাকি? ওঠো তো! উঠে বসো।'

চোখ রগড়ে তখনও স্বপ্নের ঘোরে থাকা নন্দু বলে—'প্যাঁচাটা অপুর বুকের ওপর বসে ঠোকরাচ্ছে যে!'

—' কোথায় প্যাঁচা? কোথায় অপু? স্বপ্ন দেখছিলে তুমি। তাকাও, তাকাও তো ভালো করে। এই দেখ আমি রয়েছি তোমার সামনে, তুমি তোমার বিছানায় রয়েছ। প্যাঁচা কোত্থেকে আসবে? চলো চোখে মুখে জল দিয়ে আসবে চলো।'—ওকে টেনে নামিয়ে বাথরুমে নিয়ে যায় তথাগত। ওর কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ে। অত্যধিক মুষড়ে পড়েছে অপুকে ওই অবস্থায় দেখে। এসব তো দেখেনি ও কখনও।

সে রাতে এরপর আর ঘুম আসে না নন্দুর চোখে। ছোটোবেলাটা ফিরে এসে মনের উঠোনে এক এক করে ভিড় করে দাঁড়িয়ে পড়ে। স্বপ্নের অর্ধেকটা সত্যি কিন্তু দিনকানা প্যাঁচাটা ওড়াউড়ি করলেও অপুকে তাড়া করেনি। পোহালী বিহু (পৌষ সংক্রান্তির বিহু উৎসব) র দিন ভোরবেলা স্নান করতে হত। আগের রাতে ভেড়াভেড়ির ঘর তৈরি হত খড় দিয়ে বাঁশ বেঁধে। এদেশে শুনেছে আগে আগে গ্রামাঞ্চলে এরকম হত যাকে এরা বুড়ির ঘর বলতো। কিন্তু অসমে বিহু উৎসব আর বাঙালির দুর্গাপুজো এ দুটোই তো সবচেয়ে আনন্দের উৎসব। বোহাগ বিহু (বৈশাখী), পোহালী বিহু (পৌষালী) আর রঙ্গালী বিহু (বসন্তকালীন) সবকটা বিহুর মধ্যে পৌষ সংক্রান্তির বিহু উৎসবের মজাটাই আলাদা ছিল। ভেড়াভেড়ির ঘর ছোটোদের জন্য ছোটোমাপে আর বড়োদের জন্য বড়োমাপের তৈরি হত। এ নিয়ে গোটা শহরে আবার বেশ রেষারেষিও চলতো—কাদের ঘর সবচেয়ে বড়ো হয়েছে, কারা কত মাইক বাজিয়েছে, কারা সেই রাতে সবচেয়ে বেশী মুরগি, পাঁঠা চুরি করতে পেরেছে এসব নিয়ে। পৌষসংক্রান্তির আগের রাত্রে ছেলেরা চুরি করে পাঁঠা-মুরগি আনবে আর সেগুলোই ভেড়াভেড়ির ঘরের বাইরে উনুন পেতে রান্না করে খাবে এটাই নিয়ম ছিল। এই চুরিটা ঠিক চুরি নয়, এটা এই আনন্দ উৎসবের একটা অঙ্গ। যাদের পাঁঠা-মুরগি আছে তারা অনেকেই রাতজেগে থাকত। ছেলে-ছোকরা আর বাচ্চারা ওই শীতেও ভেড়াভেড়ির ঘরে সারারাত ফূর্তি করত। ভোর বেলা স্নান করে ভেড়াভেড়ি ঘরে আগুন দেওয়া হত। নন্দু তো গরমজলে স্নান করত তবুও ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে আগুনের সামনে গিয়ে শরীর তাপাতো। অপু কিন্তু ঠান্ডাজলে কোনো পুকুর থেকে স্নান করে আসত। আগের রাতেই চুঙ্গাপিঠের (বাঁশের চোঙ্গয়ের ভেতরে তৈরি) সরঞ্জাম বড়োরা করে দিতেন। একধরনের কচি সবুজ বাঁশ আছে অসমে। সেই বাঁশের চোঙ্গা কাটা হত একদিকের গাঁট রেখে। তারপর তার ভেতরে অসমের বিখ্যাত জোহা চাল কিংবা বিরুন চাল, (এই চাল একমাত্র অসম ছাড়া আর কোথাও উৎপন্ন হয় বলে শুনিনি) ঘন করা দুধ, কিসমিস কাজু পেস্তা এসব ভরে দিয়ে চোঙ্গের খোলা মুখটা বন্ধ করা হত। এই চোঙ্গাগুলো ভেড়াভেড়ির খড়ের ঘর জ্বলা আগুনে পুড়িয়ে নিয়ে ঠান্ডা হলে ক্রীমরোলের মতো যে পরমান্ন বের হত তাকেই স্থানীয় ভাষায় চুঙ্গাপিঠা বলত। এটা পৌষ সংক্রান্তির অন্যতম বিশেষ পিঠে। আসলে তো নতুন শস্য ঘরে তোলার উৎসব—যেমন নবান্ন, পোঙ্গল তেমনিই বিহু। তাই নতুন চালের গুঁড়ো

মেখে শুকনো পুলির ভেতরে ক্ষীর আর নারকেলের পুর ভরা পিঠেও তৈরি হত। অপু-নন্দুরা নিজেদের ভেড়াভেড়ির ঘর পুড়িয়েই ছুটতো প্রথমে বেজবড়ুয়াদের নামঘরে। (ঠাকুরঘর বা দেবমন্দির)। ছোটো ছোটো মেখলা-চাদর পরে নামঘরের সামনের উঠোনে বিহুনাচ নাচতো বড়োদের পাশেই। এই দিনটাতে নন্দুর ওপর থেকে শাসনের সব আইন তুলে নিয়ে জামিনে ছেড়ে দেওয়া হত ওকে। মা, জেঠিমারাও সবাই মুগার কাজকরা মেখলা-চাদর পরে বেজবড়ুয়া বাড়ির মহিলাদের সঙ্গে বিহু ড্যান্স করত। তারপর ওখানে নানা রকম পিঠে খেয়ে যাওয়া হত মিউনিসিপ্যালিটির বড়ো মাঠে। সেখানে সারা শহর ভেঙে অসমীয়া-বাঙালি সবাই এসে জুটত বিহুনাচের উৎসবে। কত রকমের খেলা হত। সূচে সুতো পড়িয়ে দৌড়ে প্রত্যেকবার ফার্স্ট হত অপু। সাদা রংয়ের পাটের মেখলায় আগে থেকেই সাদা সূতো পরানো একটা সূচ গেঁথে নিয়ে মাঠে নামত ও। বাঁশি বাজলে অন্যরা যখন সূচে সূতো গলাতে হিমসিম খাচ্ছে তখন অপু পৌঁছে গেছে লাল ফিতের পাশে। —সেই অপু! কি দেখে এল নন্দু কাল? নির্ঘুম রাতে অপুর অসম্ভব প্রাণবন্ত শৈশব আর কালকের কংকালকে কিছুতেই মেলাতে পারে না নন্দু।

॥ আট ॥

এই প্রথম নবীনবাবুর বাড়ির কাউকে আনতে রায়চৌধুরী বাড়ির একটা গাড়ি গেল। সাত মাসের গর্ভবতী যুথীকে মোহনবাড়ি এয়ারপোর্ট থেকে আনতে সুহাসিনী গাড়ি পাঠালেন। রওয়ানা হবার আগে কৃতজ্ঞতা জানাতে নবীনবাবু অনেকদিন পর এ বাড়িতে বউঠানের সঙ্গে দেখা করতে এলেন—'তাহলে বেরোচ্ছি বউঠান। ধন্যবাদ দিয়ে আপনাকে ছোটো করার মতো ধৃষ্টতা আমার নেই। আজ এতকাল পরে একটা কথা বলতে বড়ো ইচ্ছে হচ্ছে বউঠান, অভয় দেন তো বলব?'

সুহাসিনী হেসে বলেন—'কি ব্যাপার নবীন ঠাকুরপো? এত ধানাই-পানাই কেন? ঠিক আছে, বাবা, অভয় দিলাম। বলে ফেলুন নির্ভয়ে।'

—'যুথীর ওপর আপনার টান, স্নেহ সেই ছোটোবেলা থেকেই তো দেখে আসছি। আমি নিজেও কখনও ভাবতে পারিনি বউঠান যে আমার দশ-দশটা ছেলেমেয়ে হবে। আমি জানি দাদার আর আপনার চারছেলের পর একটি মেয়ের কত আশা ছিল, কিন্তু তা হল না। যুথীকে আদর করে সেই স্বাদ আপনি খানিকটা মিটিয়েছেন। আজ এতবছর পর মনে হয় আমি বড়ো স্বার্থপর। এবাড়ি থেকে দু-হাত পেতে শুধু নিয়েছি, কিচ্ছু দেবার কথা ভাবিনি। দেবার মতো কিছু ছিলই না একমাত্র যুথী ছাড়া। বাকিগুলো তো পোকালাগা ফলের মতো, অপদার্থ!'

—'আপনি কি বলতে চাইছেন আমি বুঝতে পারছি না ঠাকুরপো!'

—'বউঠান, সেদিন সেই ছোট্ট যুথীকে বিনা শর্তে আপনার কোলে তুলে দিতে পারলে

এ বাড়ির ঋণ হয়ত বা খানিকটা লাঘব হতো আমার। সেটা আমি করতে পারিনি, কিন্তু দেখুন আজও যুথীকে আপনি নিজের মেয়ের মতোই ভাবেন। ওর জন্য চিন্তা করেন। ও মা হতে যাচ্ছে বলে আমাদের থেকেও বোধহয় বেশি খুশি আপনি। আমার ঋণের বোঝা শুধুই বেড়ে চলেছে।'

সুহাসিনী হেসে ফেলে বলেন—'ছি ঠাকুরপো, অমন করে কেন বলছেন? যুথীকে শুধু কি আমি নাকি? এবাড়িতে সবাই ভালোবাসে। ওর একযুগ পর প্রথম সন্তান হতে যাচ্ছে, শুধু কি আনন্দ? বড়ো দুশ্চিন্তাও হচ্ছে আমার। বয়স তো অনেক বেড়ে গেল মেয়েটার, এই বয়সে প্রথম মা হওয়া? ভগবান করুন সব যেন ভালোভাবে হয়ে যায়। —আপনি আর দেরি করবেন না, দূর্গা বলে বেরিয়ে পড়ুন। আর ঋণী, ঋণী বলে অযথা আমাকে লজ্জা দেবেন না ভাই।'

যুথীর পেট দেখে সুহাসিনী ঘাবড়ে যান। সাতমাসে এতবড়ো পেট কেন? নিভৃতে লক্ষ্মীর সঙ্গে কথা হয় নিজের শোবার ঘরে বসে। লক্ষ্মীও একই কথা ভাবছেন। নিজে দশটি সন্তানের মা হয়েছেন, এমনটা তো হয়নি কখনও। শঙ্কা নিয়ে জিজ্ঞেস করেন— 'সন্তান কি খুব বেশি বড় হবে দিদি? যুথী পারবে তো জন্ম দিতে? আমার বড়ো ভয় করছে ওকে দেখে।

—'আমি আবার অন্য কথা ভাবছি লক্ষ্মী। যমজ বাচ্চা নেই তো পেটে? অবশ্য আমি জানি না যমজ বাচ্চা থাকলে পেট বড়ো হয় কিনা! দেখিনি তো কাউকে।'

—'আমিও দেখিনি দিদি। কি জানি ঠাকুরের মনে কি আছে? ভালোয় ভালোয় হয়ে গেলে যেন বাঁচি। আচ্ছা দিদি যুথীকে কি এখানে রেখে দেব? যদি এখানেই বাচ্চা হয়?'

—'না লক্ষ্মী সেটা ঠিক হবে না। অতুল্যর মা'র কথা যা জানি সে তো শোকে প্রাণত্যাগ করে ফেলবে। কম বছর তো অপেক্ষা করেনি বেচারি? কত কাঠখড় পুড়িয়েছে একটা নাতি নাতনি হবার জন্য। তাকে এই সুখটুকু থেকে বঞ্চিত করা ঠিক হবে না।— তাছাড়া হাজার হলেও ওদের বাড়ি কোলকাতা শহরের পাশেই। বিপদ-আপদ হলে ওখানে মেডিকেল কলেজ আছে। এখানে তো সেরকম কিছু নেই।'

—' সেটা ঠিক।'

—'কী রে যুথী? ওস্তাদের মার শেষ খেলায়, -- দেখিয়ে দিলি তো যা ঢাউশ হয়েছিস! কি শ্রীলা, যুথীটার পেটে তিন-চারটে নেই তো? পুরোটা একবারে পুষিয়ে নিচ্ছে হয়তো!' --আদিত্য রসিকতা করে।

শ্রীলা বলে —'তোমার মুখে কিচ্ছু আটকায় না। ভয় পাইয়ে দিলে তো যুথী দিকে?'

—'ঢাউশ পেটটার জন্য বুড়ো বয়সে আমার হাতে মার খাওয়া থেকে বেঁচে গেলি রে আদিত্য। একবার বসে পড়লে উঠতে সময় লাগে। তবে এটা তোলা রইল। শ্রীলা সাক্ষী থাকবে।'

—'আচ্ছা বাবা আর বলব না। আচ্ছা এবারে বল, এতকাল পর তুই যে কৃপা করে আমাদেরকে ভাগ্না-ভাগ্নী উপহার দিতে চলেছিস তারজন্য আমার কাছ থেকে সাধে কি নিবি বল? যা চাইবি তাই পাবি। প্রমিস।'

যুথী কিছুক্ষণ চুপ করে নিজের নখ নিরীক্ষণ করে তারপর মুখ তুলে বলে —'ভাগ্যিস সাধ ভক্ষণ করতে এসেছিলাম! তাই একেবারে দাতাকর্ণ হয়ে যা চাইব তাই দেবার প্রমিস করে বসলি। তুই যা কঞ্জুস!'

—'তোমার ছেলে হবে যুথীদি, দেখো পরে! আমি নীলরংয়ের উল কিনেছি, ব্লু ফর বয়, জানো তো? কাল থেকেই বেবি স্যুট বুনতে শুরু করব। তুমি যাওয়ার আগে হয়ে যাবে।'

যুথী আশ্চর্য হয়ে যায় শ্রীলার ওর প্রতি ভালোবাসা দেখে। শ্রীলা যদি যুথীর মন পড়তে পারত তাহলে কি এত ভালোবাসতে পারত? একটু আগেই আদিত্যর বলা কথাগুলো শুনে ওর মনে হয়েছিল আদিত্য এই যা চাইবি তাই পাবি কথাটা যদি সে-ই সময়টাতে বলতো? —নাই বা হতো কিছু তবু যুথীর মনে এটুকু সুখ তো থাকত যে ওর ভালোবাসাটা একতরফা ছিল না।

নবীনবাবুর এই বাড়িতে যুথীর সাধভক্ষণই প্রথম উৎসব। যুথী-মল্লিকার বিয়ে তো মনসাতলা গ্রামে গিয়ে দিয়েছিলেন আর মাধবী তো নিজেই কালীঘাটে সে কাজটা সমাপন করেছিল। নবীনবাবু সাধ্যাতীত আয়োজন করে ফেলেছেন। অবশ্য সুহাসিনীর পরোক্ষ সহায়তা ছিলই। এই প্রথম রায়চৌধুরি বাড়ির প্রত্যেকটি লোক ব্যানার্জি বাড়িতে দুপুরে অন্নগ্রহণ করলেন। দুপুরের খাওয়া শেষ হতে হতে বেলা তিনটে বেজে গেল। যুথীই প্রথম লক্ষ করল এতলোকের ভিড়ে অপুর অনুপস্থিতি। এদিক ওদিক দেখে মাকে জিজ্ঞেস করল —'মা, অপু কে তো দেখছি না। ও কোথায় গেল? খেয়েছিল?'

—'হ্যাঁ, প্রথম ব্যাচে বাচ্চাদের সঙ্গেই তো খেলো। আছে হয়তো পাড়ার কোথাও।' — ভাব লেশ হীন গলায় উত্তর দেন লক্ষ্মী।

—'আচ্ছা মা, অপু তো মেয়ে সন্তান, ছেলে তো নয়! তুমি কি করে এত নিশ্চিন্ত থাকো বলতো? তোমার কি কোনো চিন্তাই হয় না?'

সারাদিনের পরিশ্রমে লক্ষ্মীর এমনিতেই শরীর খারাপ লাগছিল তার ওপর বড়োমেয়ের দিনরাত অপুর খুঁত ধরা ওনার পছন্দ ছিল না। সবচেয়ে ছোটো কোলের মেয়েটির কোনো দোষই লক্ষ্মী দেখতে পান না। যুথীর অপুর ওপর কেন যে এত রাগ বুঝতে পারেন না উনি। আজ মেয়ের সাধের দিনেও ও অপুকে নিয়ে পড়েছে? সেবারে তো মারতে মারতে মেরেই ফেলেছিল প্রায়। স্বভাব শান্ত লক্ষ্মী আর সহ্য করতে পারলেন না। বাড়িতে তখনও অনেক বাইরের লোক রয়েছে ভুলে গেলেন সে কথা! ঝাঁঝিয়ে উঠে বললেন —'অপু তোর কি ক্ষতি করেছে রে যুথী? যখনই আসিস ওই বাচ্চা বোনটার

পেছনে কুড়ুল নিয়ে পড়ে যাস তুই? ছোটোমেয়ে, একটু চঞ্চল. এটা তোর চোখে লাগে? নন্দুর সঙ্গে তুলনা করিস সারাক্ষণ। নন্দু ভালো মেয়ে আর অপু খারাপ মেয়ে। নন্দুও কিছু কম নয় বুঝলি? পরের বাড়ির মেয়ের প্রশংসা ধরে না তোর মুখে আর নিজের বোনের দোষ খুঁজে খুঁজে বেড়াস! তোকে অত ভাবতে হবে না ওকে নিয়ে। খারাপ হলেও আমার মেয়ে ভালো হলেও আমারই মেয়ে। তুই তোর বাচ্চাকে পারলে নন্দুর মতো করে তৈরি করিস।' —রাগে লক্ষ্মীর গোল চাপাটির মতো মুখটা, নাকের পাটা দুটো লাল হয়ে উঠেছে।

যুথী স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে থাকে নিজের মায়ের দিকে। মুখে কোনো কথা ফোটে না ওর। চোখের সামনে একটা একটা করে ছেলেমেয়ে নষ্ট হতে থাকল এই মানুষটার আদেখলা প্রশ্রয়ে, ভবিষ্যতে দামড়া ভাইগুলো নিজেদের পেট কি করে চালাবে ভেবে যুথীর মন চঞ্চল হয় কিন্তু মা হয়ে এই মেয়েমানুষটা একবারও ভাবে না বাবা যদি না থাকে তাহলে যে পথে নামতে হবে ওদের নিয়ে। যুথী যে প্রথম সন্তান! যুথী যে কিছুটা লেখাপড়া শিখেছিল! যুথীর যে বাবাকে দেখলে কষ্ট হয়! নিজের ভুলে তৈরি করা এই বিশাল পরিবারের বোঝা বয়ে বয়ে বাবার পিঠ যে ভেঙে যাচ্ছে! বাবার অর্থসম্পদ না থাকলেও মানসম্মানের সম্পদটুকুই যে শেষ সম্বল! সুশাসনের অভাবে নিজের ছেলেমেয়েরা যেদিন সেই শেষ সম্বলটা ধ্বংস করে দেবে সেদিন বাবা যে আর বাঁচবে না! —উদ্গত কান্না চেপে যুথী ছুটে মার চোখের সামনে থেকে সরে যায়।

সেদিন সন্ধে পর্যন্ত অপুর দেখা পাওয়া গেল না। ভেতরে ভেতরে ছটফট করতে থাকলেও যুথী আর একবারও জিজ্ঞেস করল না কাউকে অপুর কথা। উৎসব বাড়ির অতিথিরা অনেকক্ষণ চলে গেছে, রাস্তায়, ঘরে ঘরে আলো জ্বলে উঠেছে তখন এল অপু। আট পূর্ণ হয়ে মাত্র নয় বছরে পড়া মেয়ের বিধ্বস্ত চেহারা দেখে লক্ষ্মীও ভয় পেলেন। নবীনবাবু সব কাজ মিটে যেতে চলে গিয়েছিলেন দোকান খোলার জন্য। ছেলেরাও সান্ধ্য চড়ে বেড়ানোতে বেরিয়েছে। বাড়িতে শুধু মেয়েদের নিয়ে লক্ষ্মী আর জামাই অতুল্য। অপুর ফর্সা মুখ রক্তশূন্য ফ্যাকাশে, গালে হাতে লাল হয়ে ওঠা রক্তজমাট বাঁধা দাগ—যেন কিছুতে গাল চুষে রক্ত জমিয়ে দিয়েছে। একটা রিক্সা করে এসে বাড়ির সামনে নেমে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাড়ি ঢুকলো ও। চোখে মুখে ভয়ের ছাপ দেখে লক্ষ্মী জিজ্ঞেস করেন—'কি রে কি হয়েছে? কোথায় ছিলি তুই দুপুর থেকে? খোঁড়াচ্ছিস কেন? দেখি এদিকে আয়! গালে কিসে কামড়েছে?'

ভয়ার্ত দৃষ্টিতে অপু মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে দুই উরুচেপে কাঁচির মতো দুপা জোড়া করে দাঁড়িয়ে। মুখে কোনো কথা নেই দুর্দান্ত মেয়েটার। লক্ষ্মী এবার ঝাঁকাতে থাকেন ওকে গলার স্বরও চড়ে যায়—'কথা বলছিস না কেন? কি হয়েছে বলবি তো? কোথায় ছিলি তুই?' অপু তবু নীরব। লক্ষ্মীর চেঁচামেচিতে সবাই ছুটে এসেছে ততক্ষণে।

যুথী ছাড়া। অতুল্য অপুর পাশে বসে পড়ে সস্নেহে জিজ্ঞেস করে—'অপু, আমাকে বল। আমি তো বকি না তোকে। বল তো কোথায় গিয়েছিলি দুপুরে?' মা আপনারা যান তো।'

এতক্ষণে অতুল্যর স্নেহমাখা চোখের দিকে তাকিয়ে অপু একটু ভরসা পায়, বলে—'দুপুরে লীলাবতী হলে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম।'

—'সিনেমা দেখিস বুঝি তুই?'

—'হ্যাঁ দেখি তো সব সিনেমা, ওই লীলাবতীতেই দেখি।'

--'টিকিট কাটার টাকা কোথায় পাস? কে দেয় তোকে টাকা?'

অপু আমতা আমতা করে বলে —'টাকা নেয় না তো। ম্যাটিনীতে দুপুরবেলা এমনিই দেখতে দেয়।'

—'কে দেখতে দেয়?'— জিজ্ঞেস করে অতুল্য।

—'ওই যে, যে লোকটা টর্চ জ্বালিয়ে সবাইকে বসায়—ও।'

—'তুই কতদিন ধরে সিনেমা দেখছিস অপু?'

—'অনেকদিন ধরেই তো দেখি। যত সিনেমা আসে সবই দেখি। কোনোটা তো দুবারও দেখেছি।'

—'তুই একাই যাস দুপুরে সিনেমা দেখতে? না-কি আর কেউ যায়? তোর কোনো বন্ধু?

—'না-না। একাই তো যাই। নন্দু তো যেতে চায়ই না। ওকে সিনেমা দেখলে ওর মা বকবে বলে।'

—'আজ কি হয়েছিল রে? লোকটা তোকে ঢুকতে দেয়নি? মারধোর করেছে?'

—'না না । ঢুকতে তো দিয়েছে। সিনেমাটা তো দেখেছি শেষ অব্দি। মারেও নি। তবে ----

--'তবে কি?' —অপু আবার চুপ করে থাকে। একবার অতুল্যর দিকে তাকায় একবার নিজের পায়ের দিকে তাকাতে থাকে। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে অতুল্য দেখে অপুর পা গড়িয়ে সরু একটা রক্তের ধারা নেমে আসছে ফ্রকের তলা দিয়ে ভেতরের উরুর দিক দিয়ে। এক ঝটকায় ফ্রকটা তুলতেই দেখে অপু নীচের ইজের পড়ে নেই। আর রক্ত ওই স্থান থেকেই গড়াচ্ছে। ভয়ে অতুল্যর গলা দিয়ে এক অপার্থিব আওয়াজ বের হয়--যূ--থী!'

জেরায় জেরায় সব কথা বেরিয়ে আসে। ন'বছরে পা রাখা অপু সিনেমা দেখার লোভে ধর্ষিতা হয়ে এসেছে। লক্ষ্মী ডাক ছেড়ে কাঁদতে শুরু করতেই যুথী মার মুখ চেপে ধরে। কঠিন গলায় বলে—'কেউ জানবে না একথা। খবরদার!' —অতুল্যর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে —'তোমাদের ডাক্তারী শাস্ত্রে কিছু উপায় আছে? থাকলে এক্ষুনি দাও।'

অতুল্য ইতস্তত করে বলে—'দেখ যুথী ওর ভেতরকার ক্ষত কতটা গভীর তা তো জানা যাবে না এ্যালোপ্যাথির সাহায্য ছাড়া। আমার ওষুধে কাজ হয়তো হবে তবে অনেক সময় লাগবে। আমার মতে তো ওকে এক্ষুনি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার।'

—'কিন্তু তাতে তো লোক জানাজানি হবে। বাবার মুখটা থাকবে বলতে পার?' — ও মার দিকে কটমট্ করে তাকায়। লক্ষ্মী মাথা নীচু করেন বড়োমেয়ের দৃষ্টির সামনে। অতুল্য আবার বলে—'যুথী, কে আর এমন চেনে ওইটুকু মেয়েকে বলতো? এ পাড়ার লোকে না জানলেই হল। ক'টা বাঙালি আছে এ শহরে? কিন্তু হাসপাতালে না দেখালে যদি মেয়েটার ভবিষ্যত নষ্ট হয়ে যায় তখন?'

—'আমার মা নিজেই মেয়ের ভবিষ্যত চিবিয়ে খেয়ে ছিবড়ে বানিয়ে রেখেছে। নতুন করে আর নষ্ট হবার কিছু রইল কি?। তবে বাবা হাসপাতালে যাবে না একবারও। আর কোনো রকম পুলিশ কেসও করব না আমরা।। এ মেয়ে জন্ম থেকেই নষ্ট মেয়ে হয়ে জন্মেছিল। কই আর কেউ তো ওর মতো পাজি বদমাশ হল না? তুমিই ওষুধ দেবে তাতে বাঁচে বাঁচবে মরে মরবে। ওর মতো মেয়ে বেঁচে থাকলে আমাদের সকলের কপালে আরও দুঃখ আছে একথা আমি মার সামনেই বলছি। বাবার মাথা আর হেঁট হতে দেব না আমি।'

—'আহ! যুথী! রেগে গেলে তোমার জ্ঞান থাকে না। এখন যাও ওকে ভালো করে সাবান দিয়ে পরিষ্কার করে স্নান করিয়ে নিয়ে এস। কয়েকটা ওষুধ আমি কিনে নিয়ে আসছি।'

—'আমি কিচ্ছু করাতে পারব না ওকে। সামান্য সিনেমা দেখার জন্য এইটুকু বয়সে ও শরীর দান করতে শিখেছে? ছি। ঘেন্না করছে আমার ওকে।' — যুথী ভারী পেট নিয়ে চলে যায় ওখান থেকে। লক্ষ্মীই অপুকে নিয়ে যান স্নান করাতে।

ব্যানার্জি বাড়ির বাতাসও সেদিন চোখ-নাক বন্ধ করে রেখেছিল। একটিও প্রাণী এ ব্যাপার নিয়ে কথা বাড়ালো না আর। তাই পাঁচিল টপকে কথাটা কারও কানে গেল না। অপুকে লক্ষ্মী এবার মর্মে মর্মে বুঝিয়ে দিলেন কতবড়ো সর্বনাশ ও করে ফেলেছে। এখন বাড়ির বাইরে এক পা বের করতে পারবে না ও। তাহলেই এতবড়ো নিন্দনীয় কথাটা সবাই জেনে যাবে। এমনকী ভালো হবার পর যখন নন্দুর সঙ্গে খেলতে যাবে তখন নন্দুকেও বলতে পারবে না। একথা জানাজানি হলে পুলিশ আসবে বাড়িতে, ওই লোকটাকে আর অপুকে দুজনকেই জেলে পুরে দেবে। অপু আর কোনোদিন জেল থেকে ছাড়া পাবে না। মাকে দেখতে পাবে না অপুর বিয়ে হবে না।

এই প্রথম অপু বোধহয় বুঝতে পারল যে ওর সব কীর্তিকলাপই ফাঁস হয়ে গেছে বাড়ির লোকেদের কাছে। ওর সর্বনাশ হয়েছে, ওর বিয়ে হবে না, লোকনিন্দে হবে, এসব নিয়ে ওর কোনো মাথাব্যথা নেই। ও শুধু এটা ভালোই বুঝতে পেরেছে যে এখন কিছুদিন

ওকে বাড়িতেই থাকতে হবে, রাস্তাঘাটে যেতে পারবে না। এমনিতেও পারবে না, কারণ ওই হীরামন সৈকিয়া যে কাজটা ওর সঙ্গে করেছিল তাতে খুব ব্যথা লেগেছে ওর। হাঁটতেই তো পারছে না। সিনেমাহলের ছাদের ঘরটাতে বসে ছিল ও। ব্যথা আর ব্যথা। ও কত বারণ করল হীরামন ককাই (দাদা) আমার লাগছে, ছেড়ে দাও আমাকে কিন্তু হীরামন ককাই ছাড়ে নি। কেটেকুটে রক্তারক্তি করে দিয়েছে। আজকে ব্যথা দিলে কি হবে হীরামন ককাই খুব ভালো লোক। সিনেমা দেখায়, গরম জিলিপি, রসগোল্লা খাওয়ায়। বলেছে অন্য সিনেমা হলগুলোতে ওকে অন্য সিনেমাগুলো দেখাতে নিয়ে যাবে। সেখানে টিকিট কেটে ঢুকতে হবে। সব সিনেমা তো আব লীলাবতীতে আসে না। কদিন যাক্, একটু ভালো হলেই ও যাবে। বড়দিটাকে ও দুচোখে দেখতে পারে না। বড়দি চলে গেলেই ও আবার যাবে।

সে যাত্রায় অতুল্যর হোমিওপ্যাথি ওষুধেই ভরসা রেখে চলতে বাধ্য হতে হল নবীনবাবুর পরিবারকে। অপুকে কেউ কদিন দেখল না এমনকি নন্দুও না। দুজনের দুপুরের পান খাওয়ার আসরে লক্ষ্মী দুদিন অনুপস্থিত থাকলেন। যুথীও একবার করে এসে নিয়মরক্ষার দেখা করে গেল কয়েক দিন। সুহাসিনী একদিন জিজ্ঞেসও করলেন ওকে—'কি রে শরীর ঠিক চলছে তো? ঘনঘন আসছিস না? তোর মা ও দুদিন আসেনি, অপুও আসছে না। কি হয়েছে?'

—'কিছু বিশেষ তেমন নয় গো মাসিমা। আমার শরীরটা এত ভারী লাগে যে এখন তো উঠতে বসতেই কষ্ট হয়। আর মা এখন জামাই আর অপুর সেবাযত্নে ব্যস্ত। আসবে মা, একটু ফাঁক পেলেই আসবে।'

—'অপুর সেবাযত্ন মানে? ওর জ্বর হয়েছে নাকি?' —জিজ্ঞেস করেন সুহাসিনী।

—'হ্যাঁ। পরশু, আমার সাধের দিন রাত্তির থেকে জ্বর। পরদিন তো গায়ে ঘামাচির মতো লাল লাল কি বেরিয়েছে। তোমার জামাই দেখে বলল হাম হয়েছে। আমাকেও অপুর ধারে কাছে যেতে বারণ করেছে। নন্দু যেন এখন অপুর কাছাকাছি না যায় খেয়াল রেখো। অপুকে তো বিশ্বাস নেই, হয়ত ওইসব নিয়েই চলে আসবে এবাড়িতে খেলতে।'

—'না-না। নন্দুর কাছে ঘেঁষতেই দেব না আমি। নন্দু তো যায় না বিশেষ, অপুই আসে এবাড়িতে সারাক্ষণ। তুই চিন্তা করিস না। তবে তুই কিন্তু জামাইয়ের কথাটা মেনে চলিস রে!'

যুথী সহজে মিথ্যেকথা বলতে পারে না। ওর ভাবতে অবাকই লাগছিল কত সাবলীল ভাবে ও আজ মিথ্যেকথা বলল। তাও কিনা যে মানুষটাকে ও সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে সেই মানুষটার কাছেই। নিজেকে কত যে ছোটো, নিচু করে ফেলল আজ ও তার ইয়ত্তা নেই। বুক ফেটে কান্না আসতে চায় ওর। অপুকে ও কোনও দিন ক্ষমা করতে পারবে না। অপুর জন্য আজ ওকে মাসিমার কাছে মিথ্যে বলতে বাধ্য হতে হল।

একটা অপরাধ, লজ্জা ঢাকতে ওকে লজ্জাজনক একটা অপরাধ করতে হল। ছি যুথী ছি। অপুর ভবিষ্যত নিয়ে ও আর ভাবে না, ভেবে কোনও লাভ নেই। মেয়েটা নিজেই ওর ভবিষ্যত চোখে আঙুল দিয়ে সবাইকে দেখিয়ে দিচ্ছে। যুথী তো কদিন পর চলে যাবে ফিরে, কিন্তু যারা এখানে থাকবে, যাদের কলঙ্ক ঢাকতে, সম্মান বাঁচাতে দেবির মতো মাসিমার কাছে ওকে গুছিয়ে মিথ্যে বলতে হল তাদের হুঁশ যে এতর পরেও হবে না সে ব্যাপারে ও নিশ্চিন্ত। বিশেষ করে ওর মা। স্নেহ অতি বিষম বস্তু—কথাটা পাঠ্যপুস্তকে পড়েছিল এখন নিজের বাবা-মার আদিখ্যেতা দেখে কথাটার মানে মর্মে মর্মে বুঝতে পারছে। অতুল্যর নজরে যুথীদের পরিবার কত নীচু হয়ে গেল। এ জীবনে আর কোনোদিন বাপের বাড়ির কথা কি উঁচু গলায় বলতে পারবে ও? যুথীর স্থির বিশ্বাস ওই হীরামন সৈকিয়া একদিনে অপুকে অধঃপথে নামিয়ে নিয়ে যায়নি। একটু একটু করে দীর্ঘদিন ধরে যৌনশোষণ চালিয়ে ছিপে গেঁথে তুলেছে। হঠাৎ করে ঘটেনি ঘটনাটা। তাহলে অপু চিৎকার করত তাতে লোক জড়ো হত। অপু সে সব কিচ্ছু করেনি। তারমানে অপু ধর্ষিতা হয়নি মোটেই। ঘটনার পরেও ও অনেকক্ষণ ওখানে বসে থেকেছে, বাড়ি ফিরতে ভয় পেয়েছে। অন্যান্য ক্ষেত্রে কোনো মেয়েই বাড়ি ফিরতে ভয় পাবে না, কিংবা চোরের মতো পা টিপেটিপে বাড়ি আসবে না সেই লোকটারই দেওয়া পয়সায় রিক্সা ভাড়া করে। —হ্যাঁ যুথী খুব ভালো বুঝতে পারছে এখন ওই ন'বছরে পড়া মেয়েটা নিজে কতখানি জড়িত ঘটনার সঙ্গে। বিনে পয়সায় সিনেমা দেখার লোভে ও একটু একটু করে হীরামন সৈকিয়ার কাছে অপূর্ণ শরীরটাকেই বিক্রি করেছে, ওর মনের মধ্যে হীরামন যৌনতার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে আর তারপর অপুর সম্মতিতেই ঘটনাটা ঘটেছে মাত্র ন'বছরে? কেউ কি একথা বিশ্বাস করবে কখনও? সকলেই শিশু ভেবে অপুর স্বপক্ষে রায় দেবে, একা হীরামনকে ধর্ষণকারী বলে দোষ দেবে। বাবা, মা, ভাই- বোনেরা , সারা দুনিয়া যদি যুথীকে বোঝাতে আসে যে অপু নিরপরাধ তবু পারবে না বোঝাতে। আসল ব্যাপারটা যুথীর কাছে স্ফটিকের মতো পরিষ্কার। অপু নষ্ট, নষ্ট, একেবারে নষ্ট একটা মেয়ে।

ডিব্রুগড় থেকে চলে আসার আগে অতুল্যর মনের অন্য ভাবনা চিন্তা কি ছিল সে কেউ জানে না, অতুল্যও বলেনি কাউকে কিছুই এমনকি স্ত্রীকেও নয়। তবে আজ ওর মনে এক মহাসুখের অনুভব নিয়ে ও ফিরে যাচ্ছে। ও হোমিওপ্যাথি যা শিখেছিল তার সবটুকু উদার হাতে উজাড় করে দিয়েছিল অপুর জন্য। এলোপ্যাথীর দরকার পড়েনি। ওর হোমিওপ্যাথির ওষুধে, বাবা অম্বিকাচরণের পরামর্শ ছাড়া, ওর একার প্রচেষ্টাতে অপুকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে রেখে যেতে পারছে। এর মতো বড়ো সাকসেস ওর জীবনে খুব বেশি আসেনি আগে। আত্মতৃপ্তির আনন্দ ভরা মন নিয়ে রায়চৌধুরি বাড়ির গাড়িতে চড়ে ওরা বিমানবন্দরে আসে।

* * * * * *

রবিবার দিনটা নন্দুর আর কাটতে চায় না। বারান্দা থেকে ইতি উতি তাকিয়ে থাকে, ওর চোখ অপুকে খোঁজে। অ্যালিস কড়া নজরে ধরে রাখে নন্দুর প্রতিটি পদক্ষেপ। ঠামা আর মা ও সারাক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে ওর ওপর। অপুর নাকি হাম হয়েছে, ভীষণ ছোঁয়াচে রোগ। এখন যদি নন্দু ওর সঙ্গে খেলতে যায় তাহলে ওরও হবে — বলেছে ঠামা। খুব জ্বর হবে, সারা শরীরে খুব ব্যথা হবে, গায়ে লাল লাল দানা বের হবে। নন্দুকেও তাহলে বার্লি খেতে হবে আর অনেকদিন শুয়ে থাকতে হবে বিছানায়। শুনেই নন্দু ভয় পেয়েছে। অপুকে দেখতে পেলে তবু একটু কথা বলতে পারত—দেখতেই পাচ্ছে না যে। রবিবার সারাদিন একা একা কাটাতে হয়। ভাল লাগে না ওর। যুথীপিসিও চলে গেছে। লক্ষ্মীদিদাও বেশি আসে না ঠামার ঘরে। যুথীপিসি ওকে খুব ভালোবাসে জানে নন্দু। কত কি নিয়ে আসে কোলকাতা থেকে । এবারও এনেছে আমসত্ত্ব, নানা রকম আচার, কি সুন্দর আলপনার মতো বড়ি। নাকি গয়না বড়ি বলে এগুলোকে। জেঠিমা একদিন ডাল বাটিয়ে নিয়ে ওইরকম বড়ি দিতে চেষ্টা করেছিল ছাদের ওপর কাপড়ে তেল মাখিয়ে পেতে। সবগুলো থেবড়ে গিয়েছিল। নন্দুর খুব হাসি পেয়েছিল জেঠিমার মুখটা দেখে। জেঠিমা আবার বলেছিল—'এ মা! এগুলো তো সব চিতই পিঠের মতো হয়ে গেল রে!' — তাই শুনে নন্দুর হাসি পেয়ে গেল আর জেঠিমা বকুনি লাগালো ওকে— 'হাসছে দেখ! সব পরিশ্রম নষ্ট হয়ে গেল আমার আর তুই হাসছিস? যা, বেরো এখান থেকে! মারব এক চাঁটি!'

দেখা হল দুজনে আরও দুদিন পর। নন্দু স্কুল থেকে গাড়িতে ফিরছিল, সেদিন এ্যালি আম্মা যায়নি ওকে আনতে। গাড়ি গেটের কাছে আসতেই অপু এসে দাঁড়ালো। ওকে দেখে নন্দু উৎসাহিত হয়ে জিজ্ঞেস করে —'এই, তোর হাম সেরে গেছে? এবার খেলবি তো?'

অপু মুখ ভেংচে বলল—' তোর সঙ্গে আমার খেলা বারণ। বড়দি মাকে বলে গেছে আমি যেন তোর সঙ্গে না খেলি। আর ওই খালি হাম্মা তো বলেছে মেরে ফেলবে আমায়। না বাবা থাকগে। তুই একাই খেলিস এখন থেকে। আমার তো মাস্টার পাড়ায়, শান্তি পাড়ায় আরও বন্ধু আছে, ওদের ওখানে গিয়ে খেলব।'

নন্দুর মুখ শুকিয়ে যায়। অপুর সত্যিই ওই দূরের পাড়াগুলোতেও বন্ধু আছে। নন্দুরই কেউ নেই অপু ছাড়া। ও তাহলে কার সাথে খেলবে? নন্দু তাই বলে ফেলে —' শোন না, আমি লুকিয়ে বেরিয়ে আসব দুপুরে, পেছনে ফলের বাগানে রান্নাঘর রান্নাঘর খেলব কেমন? যুথীপিসি একটা রান্নাবাড়ির সেট দিয়েছে আমাকে এবার, সেটা বের করিনি এখনও। ওটা বের করব তাহলে। খেলবি তো?'

অপু বুঝতে পারে নন্দুর ওকে ততটাই দরকার যতটা ওর নন্দুকে। কুটিল অপু মুখের ভাবে সেটা প্রকাশ করে না, বলে —' দেখি! তোর জন্য সেদিন এত মার খেলাম!'

—'আমার জন্য? মিথ্যে কথা! তুই সিগারেট খাচ্ছিলি বলে অ্যালি আম্মা আর যুথীপিসি তোকে মেরেছিল। আমাকেও শেখাতে গিয়েছিলি—তাই। অ্যালি আম্মা দেখে না ফেললে কিছুই হত না। আমি তো আর বলে দিতাম না? বলেছি আজ অবধি কোনও কথা-বল?'

—'ঠিক আছে। তাহলে কাল বিকেলে ওটা বের করে নিয়ে ফলবাগানে আসিস। আমি থাকব ওখানে। বড়দি তো চলে গেছে। বাঁচিয়েছে। তোকে অনেক কথা বলব।'

পরদিন দুপুরে স্কুল থেকে ফিরে খেয়ে দেয়ে নন্দু রান্নাবাড়ির সেটটা বের করে লুকোনো জায়গায় রেখে দেয় বিকেলে ওটা নিয়ে পেছনদিকে যাবার সময় যাতে কেউ দেখতে না পায় তাই ভেবে । ঘুম হয় না ওর, ভান করে পড়ে থাকে বিছানায়। অ্যালি আম্মার রুমে মা আর অ্যালি আম্মা সেলাই মেশিন নিয়ে পড়েছে। মা অ্যালি আম্মার কাছে ছাঁট-কাট, মেশিনে সেলাই করা শেখে। মাঝে মাঝেই দুজনে মগ্ন হয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা মেশিন নিয়ে, পেটিকোট, ব্লাউজ নিয়ে পড়ে থাকে। আজ সেই সুযোগে রান্নাবাড়ির সেটটা নিয়ে নন্দু চলে গেল বাগানে। অপু আগে থেকেই ওখানে বসে দাঁত দিয়ে আখ ছাড়িয়ে চিবোচ্ছিল বসে বসে। নন্দুকে দেখে বলল—'খাবি?'

—'দে।'

আখ ছাড়াতে ছাড়াতে অপু বলল—'কাউকে বলবি না তো কথাটা?'

দাঁত দিয়ে টেনে আখ ছাড়িয়ে নন্দু জিজ্ঞেস করে—'কোন কথাটা? আমি তো জানিনা।'

—'আমার হাম টাম কিচ্ছু হয়নি। ওসব বড়দি সবাইকে বলতে বলেছিল। মিথ্যে কথা।'

অবাক নন্দু চোখ বড়ো বড়ো করে বলে—'হাম হয়নি? তবে যে ঠামাও আমাকে বলল এখন অপুর সঙ্গে খেলিস না। খুব ছোঁওয়াচে রোগ, তোরও হবে? খুব ব্যথা হবে?'

—'সবই বড়দি আর মা বানিয়ে বানিয়ে বলেছে ঠামাকে। ঠামার কোনো দোষ নেই।'

—'লক্ষ্মীদিদা আর যুথীপিসি কেন বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যে কথা বলল রে অপু?'

—'কারণ আমার অন্য একটা জিনিষ হয়েছিল। ওটা জানতে পারলে আমাদের খুব বদনাম হবে, বাবা আর শহরে মুখ দেখাতে পারবে না। মা বলেছে তাহলে আমার নাকি বিয়ে হবে না । সেজন্যই বানিয়ে বানিয়ে হাম হয়েছে বলেছে।'

—'তোর তাহলে কি অসুখ করেছিল রে?' —আশ্চর্য নন্দু অপুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

—'সেটা তুই বুঝবি না। তুই তো ছোটো রয়েছিস এখনও।'

—'মাত্র তো ছমাসের ছোটো। বল না আমাকে!'

অপু বিজ্ঞের মতো হেসে বলল—'দূর! মাত্র ছমাসের ছোটো হলে কি হবে তুই

এখনও তো অনেক কিছু জানিসই না। এসব বড়োরা শুধু জানে। আমি অবশ্য জেনে গেছি তাই তোর থেকে এখন আমি অনেক বড়ো হয়ে গেছি—বুঝলি?'

নন্দু এদিক ওদিক মাথা দুলিয়ে অসহায় মুখ করে জানায়—'না তো? বুঝতে পারছি না তো! তুই এখন অনেক বড়ো হয়ে গেছিস? মা, যুথীপিসিদের মতো বড়ো না আমার দাদাদের মতো বড়ো?'

—'তুই একটা বোকা-হাঁদা। তোর দাদাদের মতো কেন হব, আমি কি ছেলে? আমি এখন বড়োদির মতো বড়ো হয়ে গেছি।'

—'অ্যাই বল না ভাই কী করে অতবড়ো হলি? কিন্তু শাড়ি তো পরিসনি? ফ্রক পরেই আছিস তো? বল না রে!'

—'চল, এখন রান্নাবাড়ি খেলি। ওসব এখন নয়, তুই আর একটু বড়ো হলে বলব। তুই চাইলে তখন তোকেও বড়ো করে দেব। এখন সেটটা বের কর।' —অপু প্রসঙ্গে ইতি টেনে নন্দুকে হতাশ করে ঘাসের ওপর নুড়ি পাথর দিয়ে উনুন বানাতে ব্যস্ত হয়। —'একটা কথা, যা বললাম কাউকে বলবি না কিন্তু, ঠামাকেও না। তাহলে বড়ো হওয়ার মজাটা তোকে শেখাব না। তবে খুব ব্যথা লাগে কিন্তু বড়ো হতে গেলে এই বলে রাখলুম। আয় খেলি।

নানা অজানা প্রশ্নের দোলাচলে দুলতে দুলতে নন্দু রান্নাবাড়ির সেট খুলে খেলতে বসে। সেদিন সন্ধের সময় পড়তে বসে, তারপর দিন, তারপর দিন, এমনি করে অনেকদিন অবধি ওর কচি মনে অপুর বড়ো হওয়ার ব্যাপারটা জমাট বাঁধা অন্ধকার হয়ে বিরাজ করতে থাকে। অপুর কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকায় কাউকে জিজ্ঞেসও করতে পারে না ও। অপুও কিছুতেই আর এর বেশি বলতে রাজি হয় না। —তারপর সময়ের প্রলেপে একদিন ঢেকে দেয় সবকিছু।

যুথীর যমজ সন্তান হয়েছে। টেলিগ্রাম এসেছে। একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। সুহাসিনীর কাছে দৌড়ে আসেন নবীন আর লক্ষ্মী হাতে টেলিগ্রাম নিয়ে। ও বাড়িতে টগর শাঁখে ফু দিতে থাকে পুরোদমে। খুশির আলোয় উদ্ভাসিত মুখে নবীন এসেই লম্বা হয়ে সটান অচ্যুতনারায়ণের পায়ে পড়ে যান —'দাদা আপনাদের সকলের আশীর্বাদে এমন অসম্ভব সম্ভব হল। মা আর বাচ্চা দুটোও ভালো আছে লিখেছে অতুল্য টেলিগ্রামে, এই দেখুন।'

অচ্যুতনারায়ণকে বাড়িতে পাওয়া আর অমাবস্যায় চাঁদ দেখা একই ব্যাপার। শরীরটা ভালো যাচ্ছে না বলে এখন ক'দিন বাড়িতে বিশ্রামে আছেন। টেলিগ্রাম পড়ে খুশি মুখে বললেন —'বুধবার ব্রাহ্মমুহূর্তে ভোর চারটে দশ মিনিটে হয়েছে। বাহ! খুব আনন্দের সংবাদ। ভগবান যখন দেন তখন দুহাত ভরে দেন বুঝলে হে? যুথীর সন্তানই হচ্ছিল না আর এখন দেখ একসাথে ছেলে-মেয়ে দিয়ে মনের সব সাধ পূর্ণ করে দিলেন ভগবান।

সুহাসিনী নিজের হাতের তৈরি ক্ষীরের নাড়ু নিয়ে বেরিয়ে এলেন একটা থালায় করে। প্রথমেই নবীনবাবুর মুখে একটা গুঁজে দিয়ে রসিকতাও করলেন একটু —'এই হা পিত্যেশ দাদুকেই আগে মুখমিষ্টি করাই তারপর অন্যদের হবে।'—

হিমালয়ের পাদদেশে এক গুহার ভেতর এমন ঠান্ডাতেও শুধুমাত্র রক্তলাল কৌপীন আর তেমনি রক্তবর্ণ উত্তরীয় গায়ে যোজ্ঞেশ্বর ধুনী জ্বালিয়ে আত্মশুদ্ধির তপস্যায় মগ্ন হয়ে ছিলেন। গুহার ভেতরে ধুনীর আগুনের আলোটুকু ছাড়া বাইরের পৃথিবী এখনও অন্ধকার। পূবের আকাশের বলয়রেখায় সুতোর মতো একফালি লাল রং ধরেছে শুধু। যোজ্ঞেশ্বর এখন আর শুধু যোজ্ঞেশ্বরানন্দ নন, এখন উনি স্বামী যোগেশ্বরানন্দ মহারাজ। সেই যে তারাপীঠে গুরুজির আশ্রমে গুরুর আজ্ঞা পালনে একুশদিন ধরে এক আলোহীন অন্ধকার ঘরে না চেনা, না জানা, মুখটুকুও না দেখা রমণীকে উপজনন করার ব্রত নিয়ে নিজেকে অশুদ্ধ বলে মনে করেছিলেন তারই জন্য এই গুহায় আত্মশুদ্ধির তপস্যা করে যাচ্ছেন উনি। গুরুজির বংশের পুত্র-পুত্রবধূ আশ্রম ছেড়ে চলে গেছেন সংবাদ পাবার পর নিজের গুপ্ত আবাস ছেড়ে গুরুজির কাছে গিয়েছিলেন যোজ্ঞেশ্বর। গুরুজির নির্দেশ ছিল সেই রমণী এবং তার স্বামীকে যোজ্ঞেশ্বরানন্দ যেন চাক্ষুস না করেন এবং ওরা যেন ওনাকে চাক্ষুস না দেখেন। তাই একমাত্র রাত্রের অন্ধকারে, অমাবস্যার চেয়েও বেশি অন্ধকার কুঠুরীটিতে হাতড়ে হাতড়ে অচৈতন্য প্রায় রমণীটিকে একুশ দিন ধরে প্রতিরাতে তাঁকে সম্ভোগ করতে হয়েছে জীবনে তৃতীয় এবং শেষবারের মতো। আরোপিত উপজনন প্রথা থেকে মুক্ত এখন তিনি।

গুরুকে পাদপ্রণাম করে যোজ্ঞেশ্বরানন্দ বলেন—'আমার কাজ আমি সম্পূর্ণ করেছি, এবার তাহলে আমাকে পরিক্রমা সম্পূর্ণ করার জন্য যাবার আজ্ঞা দিন গুরুজি।'

—'আমি অত্যন্ত প্রীত হয়েছি যোজ্ঞেশ্বরানন্দ। তোমার কর্ম তুমি সমাপন করেছ কিন্তু আমার একটি কর্ম যে এখনও বাকি আছে। শুক্লা পঞ্চমী তিথির শুভক্ষণে আমার পর এই মন্দির, আশ্রম আর মাবেটির ভার নেবার জন্য তোমার অভিষেক করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। অভিষেক হলেই তুমি স্বামী যোজ্ঞেশ্বরানন্দ মহারাজ হবে আর আমার মৃত্যুর পর সব ভার নেবে।

একুশদিনের বেশি তো হয়েই গেল, আর দুচারটে দিন তোমাকে ধরে রাখব। অভিষেক হলে পর তুমি চলে যেও। —গুরুজির বাসনা পূর্ণ করেই স্বামী যোজ্ঞেশ্বরানন্দ আবার বেরিয়ে পড়েছিলেন। আজ ব্রাহ্মমুহূর্তে ধুনীর অগ্নির সামনে বসা যোজ্ঞেশ্বরানন্দ। আচমকা ধ্যান ভেঙে সচেতন হয়ে উঠলেন। মনে হল আত্মার ভেতরে যেন নবজাতক শিশুর কান্নার ধ্বনি শুনতে পেলেন। গুহার বাইরে বেরিয়ে এলেন তিনি। পূর্বাকাশ রক্তিম হতে শুরু করেছে দিকচক্রবালের কাছে। স্মিত হাসিতে প্রসন্ন হয়ে উঠল যোজ্ঞেশ্বরানন্দর মুখ। বললেন, 'জয় গুরুজি।' —গুরুজির বংশরক্ষা হয়েছে এই মুহূর্তে, তাই ধ্যানের মধ্যে

আত্মার ভেতর থেকে আওয়াজ এসে পৌঁছেছে তাঁর কাছে। যোজ্ঞেশ্বরানন্দ আবার গুহার ভেতরে প্রবেশ করেন। ধুনীর আগুনে কাঠ গুঁজে দিয়ে ভাবেন —যে পালন করে সেই পিতা আর যে লালন করে সেই মাতা। মা-বাবা শুধু জন্ম দেওয়ার কারণটা ঘটিয়ে ফেললেই পিতা-মাতা হয় না। শান্ত মনে আবার ধ্যানে বসেন যোজ্ঞেশ্বর মহারাজ।

* * * * *

রিভারসাইড রোডের রায়চৌধুরি ভিলায় এপ্রজন্মের ছেলেমেয়েরা শুধু আনন্দ উৎসবই দেখেছে। শোক-দুঃখের সঙ্গে ওদের প্রায় পরিচয়ই নেই। এই প্রথম ওদের শোকের সঙ্গে পরিচয় হল। মাত্র কয়েকদিন সামান্য ভুগে অচ্যুতনারায়ণ চলে গেলেন। ছেলেরা যে যেখানে ছিল চলে এল। নন্দু তখন দার্জিলিংয়ে লরেটো স্কুলের বোর্ডিংয়ে। দাদুর মৃত্যুর থেকেও বেশি নাড়িয়ে দিল ঠামার সিঁদুর-গয়নাপরা দেবীপ্রতিমার মতো চেহারাটাতে রংবিহীন সাদা থানের বিবর্ণতা। পাগলামী করতে লাগল—'আমার ঠামাকে কে সাদা থান পরিয়েছে? কেন ঠামার একহাত ভরা সোনার চুড়িগুলো খুলে নেওয়া হয়েছে? ঠামা পাড়ছাড়া কাপড় পরবে না। ঠামার হাত-গলা, কান গহনাশূন্য থাকবে না কিছুতেই।'

তখনকার শোকের পাগলামী অবশ্য কাটিয়ে দিয়েছিল সবাই বুঝিয়ে সুঝিয়ে। কিন্তু তারপরও অনেকদিন অবধি নন্দু মেনে নিতে পারত না অনেক কিছুই। ঠামা কেন আর ওদের সঙ্গে এক টেবিলে বসে খায় না, কেন জেঠিমা রোজ সকালে উঠে স্নান করে ঠামার জন্য খাবার জল নিজের হাতে তুলে নিরামিষ রান্নাঘরটাতে রেখে আসে, কেন ঠামার রান্না ওই রান্নাঘরটাতে হয় তাও মা-জেঠিমারা ছাড়া অন্য কারও হাতে ঠামা খায় না কেন, রোজরাতে এখন ঠামা শুধু দুধ-খই খায় কেন? ভাত কেন খায় না রাতে? নন্দুকে নিয়ে বাড়িতে মহা সমস্যা —সে তার প্রিয় ঠামাকে এবেশে মেনে নিতে পারছে না।। অনেকদিন লেগেছিল নন্দুর ঠামার বৈধব্য বুঝতে, বৈধব্যরকালে হিন্দুনারীর আচার বিচার বুঝতে। আর আশ্চর্য ব্যাপার, যে কথাগুলো বাড়িতে ঠামা, মা-জেঠিমা, এমন কি লক্ষ্মী দিদাও চেষ্টা করে বোঝাতে পারেনি ওকে সেই কথাগুলো কত সহজ ভাষায় বিধর্মী খ্রিস্টান, জাতে স্কট, ওর হিস্ট্রিটিচার সিস্টার রোজমেরি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন বোর্ডিংয়ে বসে। স্বামীকে ভালোবেসে তার প্রতি শ্রদ্ধায় হিন্দুনারীরা স্বামীর মৃত্যু হলে নিজের সমস্ত সাজসজ্জা ত্যাগ করে। অন্য কোনোও ধর্মে নারীর এমন ত্যাগ স্বীকারের নজির নেই —বলেছিলেন সিস্টার রোজমেরি। নন্দুর মনে ঠামার প্রতি এতকাল যে প্রচণ্ড ভালোবাসা ছিল সেই ভালোবাসার সাথে প্রবল শ্রদ্ধার যুগলবন্দি হয়ে এক আশ্চর্য বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠল। বোর্ডিংয়ে যাবার পর থেকে অপুর সঙ্গে বাঁধা গাঁটছড়ার বাঁধন একটু একটু করে আলগা তো হচ্ছিলই, ঠামার সঙ্গে বন্ধুত্ব বাড়ছিল। এরপর অপুরা এদেশ ছেড়ে চলে যাবার পরও বাইরের বন্ধুদের নন্দু, বাইরেই রেখেছে, নিজের হৃদয়ের

কাছাকাছি থাকলেও হৃদয়ের ভেতরে ঘর বানাতে দেয়নি কাউকে। শুধু ঠামাই ওর হৃদয়েব গভীরতম অন্তস্থলে বাসা বেঁধে থাকা একমাত্র বন্ধু হয়ে থেকেছে এবং আজও আছে।

পরিবর্তনের নামই তো জীবন। নিত্য ক্ষণে ক্ষণে পালটাতে থাকে জীবনের প্রবাহ আর তাই জীবনের প্রতি মানুষের এত আকর্ষণ। যেনতেনপ্রকারে হলেও বেঁচে থাকার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। নবীন ব্যানার্জির মৃত্যুর পর লক্ষ্মীর অবস্থাটাও সেরকমই হয়েছিল। প্রথমে জমানো টাকা শেষ হল, সুহাসিনীর সাহায্যের হাত গুটিয়ে গেল, ছেলেরা দোকান চালানো তো দূরের কথা, দোকানের মাল বেচে নিজেদের হাত খরচ চালাতে লাগল। সাতটা মুখে দুবেলা অন্ন জোগাবার দায় কারও নয়, শুধু লক্ষ্মীর। বাধ্য হতে হল অপদার্থ ছ'টা দামড়াকে নিয়ে চোখের জলে কোলকাতাগামী ট্রেনে চাপতে । মনসাতলায় নবীনের ভিটেয় এসে উঠলেন নিঃস্ব অবস্থায়। প্রথম দুদিন জ্ঞাতিরা আপ্যায়ন করলেন, তিনদিনের দিন মুখ ঘুরিয়ে নিতে হল তাদেরও। সাত-সাতটা পেটের খোরাক চার বেলা জোগাবার মতো অবস্থা তাদের নেই। তবু দুদিন অসহায় বিধবার সঙ্গে কুটুম্বিতা তো করেছেন! যুথী চাকরি করে এখনও, শাশুড়ি যমজ নাতি-নাতনি সামলায় আনন্দে। কিন্তু শ্বশুরবাড়িতে থেকে শাশুড়ির নজর এড়িয়ে যেটুকু গোপনে করা সম্ভব তার বেশি যুথীও করতে পারে না। দু-বেলা মোটা চাল-ডালের ব্যবস্থাটুকুই ও করতে পেরেছে। মাধুর অবস্থাও তথৈবচ, তার হাঁকরা মুখ হাঁ হয়েই আছে। অভাবে জীর্ণ সেই হাঁ মুখ এজীবনে বন্ধ হবে না আর। মল্লিকার নিজের সংসার চলে যায় কোনোমতে, ধার দেনা না করেই। কিন্তু ওপর থেকে মায়ের এতবড়ো সংসারে একটি পয়সা দেবার ক্ষমতা ওরও নেই। তাছাড়া মল্লিকার বর সুবল শাশুড়ির পঙ্গপাল নিয়ে আসতেও খুশি নয়। শ্বশুর শাশুড়ি ওকে কখনও জামাই আদর করেননি যা জামাই আদর পাবার সবটাই একা বড়দি আর মুখুজ্জেমশাই পেয়েছেন। বছর বছর শ্বশুরবাড়ি গেছেন মুখুজ্জেমশাই। কই সুবলকে তো কখনও ডিব্রুগড়ে যেতে বলেননি তেমন করে? সুবল বউকে সোজা বলে দিল—'ও বাড়িতে বেশি যাওয়া আসা করো না। সব খুইয়ে এসেছেন এখানে, এখন ওদের সারাক্ষণই চাই-চাই হবে। পারবে তুমি ওদের দাবি মেটাতে? তাছাড়া তুমি-আমি কি পেয়েছি গো তোমার বাবা-মার কাছ থেকে? যিনি পেয়েছেন তিনিই করুন না!'

মল্লিকারও মনে যথেষ্ট রাগ জমে আছে। বড়দি ওকে নিজের কাছে এনে বিয়ে দিয়েছিল সে কথা ঠিক, কিন্তু তাই বলে বড়দিকে সাধ ভক্ষণ করানোর জন্য বাবা একেবারে প্লেনে করে নিয়ে গিয়ে এত ঘটা-পটা করল এটা ওর সহ্য হয়নি। ওর তো বাপের বাড়ির সাধ হলই না। শাশুড়ি নমো নমো করে নিজে সাতরকম রান্না করে একদিন খাইয়ে দিয়েছিল। ব্যস্। —'সে সব তোমাকে বলতে হবে না। চাই-চাই করলেই আমি কোথা থেকে দেব? বাবা আমার জন্য কি করেছে? মাধুকেও তো টাকা পাঠাতো সংসার চলে না বলে। আমাকে তো নামকেবাস্তে ওঁ নমঃ করে বিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছিল। বড়দির

প্রতি বাবা-মার চিরকাল একচোখামি ছিল। এখন বড়দিই দেখুক ওদের। সাত-সাতটা লোকের খাবার জোগানো কি আমার সাধ্যে আছে? আর সাধ্যে থাকলেও করতাম না আমি। মা আমাকে সাধ ভক্ষণটাও করায়নি! ভুলে গেছি নাকি আমি?' — মল্লিকার ক্ষোভ কথাতেই ফুটে বেরোয়।

নিদারুণ অনটনে লক্ষ্মীর মাথা খারাপ হবার মতো অবস্থা। কর্তা বেঁচে থাকতে ডিব্রুগড়ে সুখের জীবন কাটানো লক্ষ্মীর প্রাচুর্য্য না থাকলেও এমন অর্থাভাব ছিল না যে এবেলা খেলে ওবেলার খাবারের চিন্তা করতে হবে। তার ওপর ওখানে পাকা দালান বাড়িতে থেকেছেন, কল খুললে ঝরঝর করে জল পেয়েছেন, মাথার ওপর পাখা ঘুরেছে, এখানে মাটির ঘর-দাওয়া গোবরে নিকোতে হয়, পুকুরঘাটে স্নান, কাপড়কাচা, বাসনমাজা-মায় যাবতীয় জলের প্রয়োজনেই পুকুর ঘাটে যেতে হয়। এত খাটুনি বেড়েছে যে আধপেট খাওয়া লক্ষ্মীর একেবারে জেরবার অবস্থা। ছেলেগুলো এখন খেতে না পেয়ে কাজের খোঁজে ঘুরে মরছে। বাপের পয়সায় ফুটুনি শেষ। কিন্তু ঘুরে মরাই সার, কাজ আর জোটে না। যুথী মুখ খুলে কথা শুনিয়ে যায়—'যা না, স্কুল ছেড়ে, লেখাপড়ায় ইতি টেনে মাঠে মাঠে বল নিয়ে খেলগে যা। পেট ভরবে তাতেই। ভরলো পেট? থাক্ এখন একবেলা আধপেট খেয়ে। বোঝো কতধানে কত চাল।'

লক্ষ্মী যুথীকে দোষ দিতে পারেন না আর, এখন ভাগ্যকে দোষ দেন কিন্তু আজও নিজের দোষটা মনের কোণে উঁকিও মারে না ওনার। একবারও মনে হয় না বাদল যখন মদ খেয়ে বাড়ি ফিরত তখন তাড়াতাড়ি ওকে ঘরে এনে শুইয়ে দিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিতেন। নবীন খেতে বসে বাদলের কথা জিজ্ঞেস করলে বলতেন—ও তো কখন এসে খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। সজল, কাজলের বেলাও তাই। বাদল হয়তো নষ্ট মেয়েদের পাড়ায় থাকা শুরু করত না যদি নবীনবাবু সময়মতো জানতে পারতেন। বাদলের তাহলে খারাপ রোগে মৃত্যুও হত না। অপুকেও এভাবেই আড়াল করে রেখে রেখে ন'বছর বয়সে ধর্ষিতা হবার দিকে লক্ষ্মীই ঠেলে দিয়েছিলেন। আর এখানে আসার পরও যুথীর কাছ থেকে অপুকে আড়াল করার চেষ্টার কোনও ত্রুটি নেই লক্ষ্মীর—এতবড়ো ঘটনা অপুর জীবনে ঘটে যাবার পরও। অপু যে এখন ষোলো বছরের মেয়ে, এটা যে ডিব্রুগড় শহর নয়, নিজের শ্বশুরবাড়ির গ্রাম, এখানে ব্যানার্জির পরিবারের অর্থকৌলিন্য না থাকলেও মানসম্মান আছে গ্রামের লোকের কাছে, সবাই চেনে এক ডাকে, এসব নিয়ে লক্ষ্মীর মনে কোনও চৈতন্য উদয় হয় না।

টগর, বেলি, কেয়ারা ডিব্রুগড়েও ঘর থেকে বের হত না, এখানেও বের হয় না ওই পুকুরঘাট ছাড়া। পাঠশালার দ্বিতীয় ভাগ-তৃতীয় ভাগ অব্দি পড়াশুনোর বিদ্যে নিয়ে ওদের তেমন সাহস নেই বহির্জগতে মেলামেশা করার। এই মনসাতলার মতো গ্রামেও ওদের থেকে অনেক ছোটো মেয়েরা স্কুলে-কলেজে পড়তে বাড়ুজ্জের হাট, বাটানগর,

নঙ্গীতে যায় দেখছে ওরা এসে থেকেই। নিজেদের হীনম্মন্যতা নিয়ে এই তিনটে মেয়ে তাই পর্দানসীন হয়ে থাকতেই পছন্দ করে। কিন্তু অপুকে কে সামলায়? ইতিমধ্যেই অপুর স্বল্পদৈর্ঘের শরীর আধপেট খেয়েও পুরুষ্টু হয়ে উঠেছে। সকাল থেকে সে বাড়ির বাইরেই কাটায়, দুপুরে খাবার সময় এসে ঢোকে। আর বিকেল হতে না হতেই কাজল চোখে টেনে, কপালে কুমকুমের টিপ লাগিয়ে সেজেগুজে বৈকালিক ভ্রমণে যায়। গ্রাম্য সমাজের চোখ সব লক্ষ করে। যুথীর কানেও পৌঁছয় কথাবার্তা। যুথীর মেয়ে বড়ো হচ্ছে, এখনই কৌতুহলের বয়স তাই অপুর ধারে কাছে ঘেঁষতে দেয়না যুথী মেয়েকে।

—'মা, রোজ বিকেলে সেজেগুজে অপু কোথায় যায় তুমি জিজ্ঞেস করেছ কখনও?' রুক্ষ গলায় প্রশ্ন করে যুথী।

লক্ষ্মী ঘাবড়ে যান। যুথী এখন ওনার একমাত্র ভরসা, ও বিগড়োলে না খেয়ে মরতে হবে সবাইকে। বুঝতে পারেন কোলের মেয়ে অপুর দিক টেনে কথা বললে এখন আর চলবে না। বলেন— 'আমি জানি না বাপু, আমায় আর জিজ্ঞেস করো না। বিয়ে দিয়ে দাও, গঙ্গায় গলায় কলসি বেঁধে ফেলে দাও, —যা ইচ্ছে হয় করো। ওদেশে কেউ আমাদের চিনত না। এখানে মুখে কালি মাখালে তো গলায় দড়ি দিতে হবে।'

কঠিন মুখে যুথী বলে—'টগরের জন্য একটা সম্বন্ধ এসেছে। বয়স ছত্রিশ। ওখানেই অপুকে দেব।'

লক্ষ্মী চমকে ওঠেন—'সেকি রে? অপুর যে মাত্র ষোলো বছর বয়স? কুড়ি বছরের বড়ো একটা লোকের সঙ্গে রাগ করে বোনটার বিয়ে দিয়ে দিবি? টগরের সঙ্গেই তো মানাতো ভালো। ওর তো বয়সটা বেড়েই যাচ্ছে, সাতাশ হয়ে গেল?'

—'তোমার ষোলো বছরের সোহাগী মেয়ে এখানে এসেও কুকীর্তি করে চলেছে মা। তুমি কোনো খবর রাখ না। রোজ বিকেলে ছেলেদের সঙ্গে গ্রামের বাইরে চড়তে যায়। ন'বছর বয়সে পেট হয়নি, এবার কিন্তু পেট বাঁধিয়ে আসবে ওই নোংরা মেয়েটা। গলায় দেবার দড়ি দুগাছা জোগাড় করে রেখো, একটা তোমার আর একটা আমার জন্য।' লক্ষ্মী তবুও যুক্তি খাড়া করেন—'কিন্তু বিয়ে বললেই তো আর বিয়ে হয় না, টাকা লাগে। সেটার জোগাড় কোথা থেকে হবে শুনি? এখানে তো ভাঁড়ে মা ভবানী! তুই দিতে পারবি অত টাকা?'

—'ছত্রিশ বছরের পাত্রপক্ষ গরিবঘরের ষোলো বছরের মেয়েকে নিজেরাই খরচা করে কিনে নিয়ে যায় মা। ওরা দাবি করে না। ওই ছেলের সঙ্গে টগরের বিয়ে দিতে গেলেই দাবির কথা পাড়বে। ষোলো বছরের অপুর জন্য কুড়ি-বাইশ বছরের ছেলেরা তো আর বিয়ের পিঁড়িতে বসবে না! তাদের বাপেরা বিনেপয়সায় নেবেও না। আর অপুকে যদি এখনই বাঁধা না যায় তাহলে তোমার আদুরে মেয়ে এবার কানাগলিতে সন্ধ্যেবেলা ঠোঁটে রং মেখে দাঁড়াবে। ওই যেসব মেয়েদের কাছে তোমার আদুরে বড়োছেলে চলে গিয়েছিল বাড়ি ছেড়ে—তাদের মতো। পারবে তো সহ্য করতে?'

লক্ষ্মী থমকে যান। অপু এত নীচে নামতে পারে একথা বিশ্বাস করতে মন চায় না। যুথীকে ওনার এখন কেমন অচেনা মনে হয়। কত স্নেহময়ী ছিল এই বড়োমেয়ে! কেন যে অপুর ওপর ওর এত খার বুঝতে পারেন না উনি। বাপের বয়সি লোকের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে হলেও যুথী অপুকে তাড়াতে চাইছে? — গলা নামিয়ে মিনমিনে সুরে বলেন—'অপুকে একবার বলা তো দরকার!'

—'না। তাহলে তোমার মেয়ে কোনো রিক্সাওলা, ট্যাক্সি ড্রাইভার, যার তার সঙ্গে পালিয়ে যাবে। মাধু পালিয়ে বিয়ে করেছিল, ওরা গরিব কিন্তু ভদ্রলোক। অপু ভদ্র-অভদ্রের মাত্রা জানে না মা। ও একেবারে পেছল পথে পা বাড়িয়ে আছাড় খেয়ে পড়বে। ওর উপযুক্ত বয়সের, খেতে পরতে দিতে পারবে এমন ছেলে পেতে গেলে যে টাকা লাগবে সেটা আমাদের দেবার মতো ক্ষমতা নেই। তুমি একটু বোঝার চেষ্টা করো মা, টগরের জন্য যে সম্বন্ধটা এসেছে ওরা তোমাদের পালটি ঘর—মুখুজ্জে বামুন। নিজেদের দুখানা বাড়ি আছে। একটা দেশের বাড়ি সরিষাতে আর একটা খোদ কোলকাতায় একেবারে হেদুয়ার মতো জায়গায়। দুটো ভাই, এক বোন। বড়ো ভাইয়ের ছেলেপুলে নেই, বোনের' বিয়ে হয়ে গেছে, ওর এক ছেলে। শিক্ষিত পরিবার। পাত্র নিজে আই. এ পাস। ভালো চাকরি করে। অপু তো না লেখাপড়া জানে না কোনো কাজ। ওর কি গুণ আছে যে কোনো শিক্ষিত, কমবয়সি ভালো চাকুরে জামাই তুমি আশা করবে? ভেবে দেখ মা, এই পাত্রের সব আছে শুধু বয়সটা ছাড়া। টগরের বয়স হয়েছে মানছি। কিন্তু জানো, বয়স্ক ছেলে পেতে কষ্ট হয় না। টগরের বর জুটে যাবে দেখো! — মা, আমাদের মানসম্মান বাঁচাও মা। অপু আর কদিনের মধ্যেই হয়তো মুখে কালি মেখে এসে আমাদের মরার রাস্তা করে দেবে। তোমাকে তাহলে বলেই ফেলি, তোমার বড়ো জামাই, সেদিন বাটানগর গিয়েছিল রুগি দেখতে। ও নিজের চোখে অপুকে দেখেছে একটা বেহারি ট্যাক্সিওলার সঙ্গে প্রথমে গায়ে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে গল্প করছিল ট্যাক্সির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। ট্যাক্সিওলা একহাত দিয়ে অপুর কাঁধ ধরে দাঁড়িয়ে হেসে হেসে কথা বলছিল। তারপর অপুকে ট্যাক্সিতে সামনের সিটে বসিয়ে কোলকাতার দিকে বেরিয়ে গেল।'

মূক-বধির হয়ে বসে রইলেন লক্ষ্মী অনেকক্ষণ। যুথীও চুপ করে রইল। ও বুঝতে পারছিল মা মনে মনে আবার নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করছে। করুক, তবু বুঝুক যে অপু কতটা বিপদজনক হয়ে উঠেছে। অনেকক্ষণ পর লক্ষ্মী কলের পুতুলের মতো নীরস গলায় বললেন--'যুথী!'

—'কি? -- বল মা, কি বলবে?'

--'যুথী আমি রাজি। তুই ঠিকই বলেছিস। অপুকে বাঁচাবার জন্যই এক্ষুনি ওকে বিয়ে দিয়ে দিতেই হবে। হোকগে ছেলের বয়স বেশি, তবু বিয়ের বাঁধনে বাঁধা পড়লে মেয়েটা

ভয়ংকর অন্ধকার ভবিষ্যত থেকে তো বেঁচে যাবে? তুই ওদের সঙ্গে কথা বল যূথী। আমি আর একটুও দেরি করবার মতো ভরসা পাচ্ছি না রে! কি কুলাঙ্গার সন্তানই না ধরেছিলাম পেটে! নিজেকেই নিজের ঘেন্না হয় এখন! আর বিয়ের আগে কোনওমতেই যেন অপুর কানে না যায় কথাটা। কারোও কানেই যাবার দরকার নেই — শুধু তুই আর আমি ছাড়া।'

—'বেশ। তাই হবে। তবে কথাবার্তা এগোলে পরে যেন তুমি পিছিয়ে যেও না মা।'

—'না রে, আর পিছিয়ে আসার পথ নেই। অপু নিজেই সব পথ বন্ধ করে দিয়েছে।'

॥ নয় ॥

আজ সকাল এগারোটার আগেই ইন্দ্রাণীর চেষ্টায় একটা কেবিনের ব্যবস্থা হল। আয়া নয়, ইন্দ্রাণী দুবেলা দুজন নার্সের বন্দোবস্তও করে দিলেন। মিসেস ইন্দ্রাণী মুখার্জির নামের গুণেই হাসপাতালের লোকরা নড়ে চড়ে বসলো। নন্দু যখন এসে পৌঁছলো হাসপাতালে তার অনেক আগেই অপু শিফট্ হয়ে গেছে কেবিনে। একজন নার্স বসে আছে ওর পাশে। আজ অপু সকালবেলায়ই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। শুধু আধময়লা সায়াটা ছাড়া। নন্দু ব্যাগ খুলে নতুন পেটিকোট, সামনের দিকে খোলা নাইটি, দামি ধূপ, রুম স্প্রে, বডি স্প্রে সব বের করে রাখল টেবিলে। অনেক রজনীগন্ধা এনেছে আর এনেছে একটা ফুলদানি। নিজের হাতে ফুলগুলো সাজালো ও। আজ দেখল বুকের ক্ষতটা অলরেডি মলমে ঢাকা হয়েছে। অপু জেগে গেল আচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়ে। নন্দুকে দেখে কোটরের ভেতরের পাথরকুচির মতো চোখ দুটোতে হিরের দ্যুতির ঝলকানি এল যেন।

—'তুই এসেছিস নন্দু? আমার জন্য এসব তুই করেছিস? কেন করতে গেলি বল তো? আমার প্রায়শ্চিত্ত শেষ হল না যে!'

—'একটা কথাও বলবি না। তাহলে আমি এক্ষুনি চলে যাব। তুই একটু ঘুমো।' নার্সকে বলল সায়াটা পালটে দিয়ে ওপরে নাইটিটা পরিয়ে দিতে। নার্স চেঞ্জও করে দিল। নাইটিটা স্লিভলেস আর সামনের দিকে খোলা থাকায় বুকের জায়গাটা খোলা রাখা গেল। সঙ্গে করে কোল্ড ফ্লাস্কে বেদানার তাজা রস এনেছিল সেটা ফিডিং কাপে ঢেলে নিজের হাতে খাওয়াতে লাগল অপুকে।

—'মুখুজ্জেমশাই আসেননি এখনও? অবশ্য আসার সময়ও হয়নি। আমি তো আগেই এসে পড়েছি।'

—'আর পারে না রে। এই বয়সে এত ধকল নিচ্ছে মানুষটা। জানিস নন্দু, আমি ওর প্রতি কত অন্যায় করেছি রে! তুই কিছু জানিস, সবটা জানিস না।' হাঁফাতে থাকে অপু। কথা বলার শক্তিটুকুও ওর নেই। তবু কথা বলতে চায় সব সময়। যেন কথা বললে

যন্ত্রণাটা খানিকক্ষণ ভুলে থাকতে পারবে। বিশ্রাম নিয়ে আবার বলে —'সব বলে যাব তোকে যাবার আগে। জীবনে আর আমার বন্ধু কেউ হয়নি রে। তুই-ই প্রথম আর তুই-ই শেষ বন্ধু। বাকি যাদের বন্ধু বলতাম তারা তো শুধু গল্প করে সময় কাটাবার সঙ্গী ছিল। এমন বন্ধু কেউ হয়নি আর, যার কাছে নিজের পাপ, নিজের সবচেয়ে গোপন কথা বলা যায়। তোকে সব বলে যাব।'

আবার হাঁফাতে থাকে। —নন্দু বলে —'তোকে কথা বলতে হবে না অপু, তোর কষ্ট বাড়বে কথা বললে। আর পাপ-পাপ করবি না একদম। বাঁচার ইচ্ছেকে পাপ বলে না। চুপ কর।'

—'না রে, কথা বললে কষ্ট বাড়ে না। কষ্ট তো ব্যথার, আর সেটা বুকে। কথা বললে হাঁফিয়ে যাই বড়ো দুর্বল বলে। তুই বেদানার রস খাওয়াবি রোজ, দেখবি আমার দুর্বলতা কেটে যাবে। বাঁচাতে পারবি না, দিনক্ষণ ঠিক হয়ে গেছে। এবার যাবো। শুধু তোকে বলার আছে অনেক কথা, —সেটুকু বলে যেতে হবে।' —'যদি এতই ভালোবাসিস তবে প্রথমেই কেন জানালি না অপু? আমি তোকে বম্বে, ভেলোর, সব জায়গায় নিয়ে যেতাম! অন্তত চেষ্টা তো করতাম বাঁচাবার।' কাঁদতে কাঁদতে বলে নন্দু।

—'কাঁদিস না।' নন্দুর হাতটা কংকাল হাতের সরু সরু শীর্ণ আঙ্গুলগুলো দিয়ে ধরে অপু। বলে

—'তোর মুখুজ্জেমশাই সব করেছে। বম্বে, ভেলোর সব। কেন যে ও আমাকে বাঁচাবার জন্য পণ করে বসল জানি না। কিছু বাকি রাখে নি। ধার দেনায় ডুবে গিয়ে নিঃস্ব হয়ে গেল। আজ দুটো আঙুর কেনার পয়সাও নেই ওর। নিজে খায় কি করে বলে না। বোধহয় ঘটি-বাটি বেচে চালাচ্ছে। তবু আমার মতো নোংরা কলংকিনী স্ত্রীকে ছেড়ে যায়নি। আর আমি? সাতপাকের বাঁধনটাকে তো ছাদনা তলাতেই ছিঁড়ে ফেলেছিলাম। বুড়ো, রুগ্ন, কুৎসিৎ! কি-না বলেছি। আজ দ্যাখ্ ভগবানের বিচার!। আমাকে দেখলে নব্বই বছরের বুড়ি মনে হয়। শরীর পচে গলে পোকায় খাচ্ছে। বড্ড শরীরের আর ষোলো বছরের উঠতি যৌবনের অহংকার ছিল রে আমার!' —অপুর ঘা শুদ্ধ বুকটা জোরে জোরে ওঠানামা করতে থাকে। নন্দু বলে —'চুপ কর অপু, সিস্টার শুনতে পাবে যে।'

—'শুনুক। সবাই শুনুক। জানুক কেন আমার এমন হল। আমার পাপের কথা সবাই জানুক, আর আরও ঘেন্না করুক আমাকে। এটাই আমার প্রাপ্য।'

সিস্টার শুনতে পাবে ভেবে নন্দু উঠে যায় দরজার কাছে যেখানে সিস্টার অন্য একজন নার্সের সঙ্গে দাঁড়িয়ে গল্প করছিল। —'সিস্টার, আপনি এসময় একটু চা টা খেয়ে আসুন গিয়ে। এখন তো আমি রয়েছি।'

—'আচ্ছা।' বলে খুশিমুখে চলে গেল মহিলা বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে।

নন্দু ফিরে এসে বসলো। অপুর শীর্ণ আঙ্গুলগুলোতে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল—'কি দরকার অপু আজ আর এসব পুরোনো কথা বলার? থাক্ না ওসব। আমি ছাড়া বাইরের লোকে তো জানে না ওসব। শুধু শুধু সবাইকে জানিয়ে লাভ তো কিছু হবে না।

—'তুই সবটা জানিস না। সেই যে শেষ তোর বাড়ি গিয়েছিলাম। মনে আছে তোর? অমিতের কথা বলেছিলাম তোকে?

—'হ্যাঁ, মনে আছে। কাল অমিতের ছেলে এসেছিল। তুই তখন ঘুমিয়ে পড়েছিলি। কি যত্ন করছিল ওইটুকু ছেলেটা। হুবহু অমিতের মতো দেখতে। আমি তো কথা বলিনি, বলার মতো মন ছিল না কাল। অমিত কোথায় অপু? ছেলে এল দেখে আশা করেছিলাম ও নিজেও আসবে। আর মুখুজ্জেমশাই কেন বললেন ও তোদের ছেলে? ওতো অমিতের ফটোকপি একেবারে?'

—'ঘুমোই নি। একটা ঘুম ঘুম ভাব হয়। জানি আমি। তুই বলেওছিলি তোর মুখুজ্জেমশাইকে—'অমিতের মতো দেখতে হয়েছে অমিতের ছেলেকে? তাই না?

—'হ্যাঁ, তুই বুঝতে পারছিলি অপু, মুখুজ্জেমশাই কত সেবা করছিলেন তোব?'

—'রোজ দুবেলা করে। বারণ করি দুবেলা আসতে তবু আসে। ওকে আমি মরতে বসেও চিনলাম না। ও কেন করে আমার জন্য এতো সব? কি পায় ও? কি পেয়েছে আমার কাছ থেকে? তুই তো নিজের চোখে দেখেছিস ওর সঙ্গে কিরকম রাস্তার কুকুরের মতো ব্যবহার করেছি আমি? ওরই বাড়িতে ওকে অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে রান্নাঘরের পাশে এইটুকু একটা বন্ধ প্যাসেজে ঠাঁই দিয়েছি। আর ওর চোখের সামনে দিন-রাত ওরই ভাগ্নেকে নিয়ে শোবার ঘরে পড়ে থেকেছি।' — জোরে জোরে হাঁফাতে থাকে অপু। নন্দু বার বার বারণ করে —'অপু থাক্। উত্তেজিত হয়ে পড়ছিস। চুপ কর প্লিজ।।

—'না! সময় বেশি নেই। তুই থামাস না আমাকে। বলতে দে। প্রাণটা হালকা করে যেতে দে নন্দু।' —আবার হাঁফায় অপু। —'সূর্য শুধু অমিতের নয়, ও আমার আর অমিতেব ছেলে।' চমকে ওঠে নন্দু। মুখটা হাঁ হয় কিছু বলার জন্য —কিন্তু কথা ফোটে না।

—'ওর বয়স সতেরো। জন্মের পর আমি আর অমিত ওকে ব্যারাকপুরের একটা অনাথ আশ্রমে দিয়ে এসেছিলাম।' — নিঃশব্দে দুচোখের কোনা দিয়ে জল গড়ায় ওর। হতবাক নন্দু দেখতে থাকে।

—'আজ সূর্যর যে বয়স, সেই সতেরো বছর বয়সে আমি অমিতকে নষ্ট করেছিলাম। আমার শরীরে অসম্ভব খিদে ছিল রে। বিয়ে হল তবু শরীরটার খিদে তো মিটল না। জীবনে তো মাত্র একদিনই তোর মুখুজ্জেমশাই আমাকে পেয়েছিল—তাও জোর কবে

রীতিমতো রেপ করেছিল, বলেছিলাম না তোকে? সরিষা তো তখন গ্রাম, শহর হয়নি তখনও। তালপুকুরে ঘটি না ডুবলেও বংশের নিয়মকানুন খুব মেনে চলা হত। বাড়ির মেয়ে বউরা বাইরে যাবে না। বাইরে যাবার অনুমতি থাকলে হয়তো অমিতের জায়গায় বাইরের কেউ আসত আমার জীবনে।' —একটানা এত কথা বলার মতো শরীরের অবস্থা ওর নয় বোঝে নন্দু। কিন্তু এও জানে অপুকে থামানো যাবে না। ও উঠে চিকেন স্যুপটা বের করে। বলে —'পরে বলবি, আগে এটুকু খেয়ে নে তো।'

—'না না। তুই বাধা দিস না। বলতে দে আমাকে।'

—'তাহলে আমি এক্ষুনি চলে যাব। আগে খাবি তারপর আমি শুনব সব, —কথা দিচ্ছি।'

এবার আর আপত্তি করে না অপু। কৃতজ্ঞ চোখের পাথরকুচি দুটো নন্দুর মুখের দিকে পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। কুঞ্চিত মুখ হাঁ করে এক চামচ একচামচ করে পুরো স্যুপটাই খেয়ে নেয়। নন্দু বোঝে এতদিন ধরে এসব খাদ্য ওর জোটে নি। তাই একেবারে জীবনীশক্তি হীন হয়ে পড়েছে। একটু জল খাইয়ে যত্ন করে মুখটা মুছিয়ে দেয়। এই সময় নার্সটি এসে ঢোকে ঘরে। অপু নিজেই বলে—'তুমি যাও। এখন দরকার নেই। পরে এসো।' — নার্স একটু অবাক হয় বটে তবে প্রকাশ করে না মুখে। নন্দুর দিকে তাকিয়ে বলে

—'আমি একেবারে ডানদিকের কোণার ঘরটাতে আছি। দরকার হলে ডেকে নেবেন আমায়।'

—'মুখুজ্জেমশাই তো এখনও এলেন না। ' আপন মনেই নন্দু বলল।

—'আসবে, আসবে । তুই ভাবিস না। এযুগে সবকিছু বদলে গেছে। আগেকার দিনে স্বামীরা রক্ষিতা রাখত, বেশ্যাবাড়ি যেত আর স্ত্রীরা সেই স্বামীকেই ভগবান জ্ঞানে পুজো করত। স্বামীর পাপের ভাগ নিত। এখন দেখ্, আমি একটা খারাপ মেয়েমানুষ, স্বামীকে ফিরেও দেখিনি কোনোদিন, বুড়ো বলে রুগ্ন বলে। সেই রুগ্ন-বুড়োটা আমার পাপের ভার বহন করে চলেছে। চোখে ভালো দেখে না, চলতে পারে না, তবু আসে দুবেলা। ও ঠিক আসবে। তুই শোন্ আমার কাহিনি। কেন বার বার বাধা দিস? শেষ করতে পারব না যে!'

—'তুই এত ক্লান্ত হয়ে যাস একটু কথা বলেই, আমার ভয় হয় অপু। যদি হঠাৎ শরীর বেশী খারাপ হয়ে যায় তখন কি হবে? তাই তো বারণ করি। কি দরকার এসব আর ভেবে?'

—'তোর কোনো কথা আমি শুনেছি কখনও? আজও শুনব না। আমাকে বলতেই হবে তোর কাছে। তোকে জানতেই হবে অপুর অধঃপতনের কথা। তুই বাধা না দিলে তো এতক্ষণে শেষ হয়ে যেত বলা। বার বার থামিয়ে দিচ্ছিস। আর বাধা দিবি না। আমার দিব্যি।'

—'আচ্ছা, নে বল। তাতে যদি তুই শান্তি পাস।'

—'আমার তো ওই একটাই ননদ। ভাশুরের পর ননদ, তারপর ও। বাড়িতে ছেলেপুলে নেই কারও। ননদের ছেলে অমিত তাই সব ছুটিতেই মামার বাড়ি আসত। ও আমার থেকে দুবছরের ছোটো।' —থামে অপু।

—'সেবার গরমের ছুটিতে একমাসের জন্য সরিষার বাড়িতে এসেছে। ১২ ক্লাসে উঠেছে তখন। সদ্য যুবক, দেখতে সুন্দর, স্মার্ট। সাঁতার কাটত পুকুরে। একদিন আমি বললাম—'চলো দেখি, বাজি ধরে কে আগে পার হয় এপার ওপার।' —ও বলল—'কি বাজি রাখছ আগে সেটা বল।' — 'সিনেমা দেখাব, তুমি জিতে গেলে।' —আর যদি তুমি জিতে যাও তবে আমাকে কি দিতে হবে?' — এখন আর কি দেবে? সে পরে ভেবে বলবোখোন।' —বললাম আমি। বাড়িতে কেউ কিছু ভাবে নি আমরা একসঙ্গে সাঁতার কাটছি দেখে। সকলেই ভেবেছে মামি-ভাগ্নে, প্রায় সমবয়সি। বন্ধুত্ব তো হতেই পারে।' — থামল অপু। কথা বলার ক্লান্তিটুকু কাটিয়ে উঠে আবার শুরু করল। — 'আমার মনে তো পাপ চিন্তাটা ছিলই। তাই ওপারে আমিই আগে পৌঁছে গেলাম। ফেরার পথে মাঝপুকুরে ডুবে যাওয়ার ভান করলাম। চিৎকার করে অমিতকে ডাকলাম—'বাঁচাও, বাঁচাও! অমিত, আমার পায়ে শাড়ি জড়িয়ে গেছে, ডুবে যাচ্ছি, বাঁচাও! নিজেই ইচ্ছে করে ডুবতে আর ভাসতে শুরু করলাম, অনেকটা জল খেয়ে নিলাম, নাক দিয়েও জল ঢুকিয়ে নিলাম। অমিত পাকা সাঁতারু, ছোটোবেলা থেকে বালিগঞ্জ লেকে সাঁতার শিখেছে। ননদ তো যাদবপুরে থাকে জানিস তো? লেকে যেত সাঁতার শিখতে। তো, অমিত মাছের মতো সাঁতরে এসে আমাকে চুলের বেনীটা ধরে। আমি ডুবে যাওয়া মানুষ যা করে সে রকম অভিনয় কবলাম। ওকে জড়িয়ে ধরলাম সপাটে। ওকে শুদ্ধু নিয়ে জলেরতলায়। আবার ভেসে উঠলাম। অমিত তখন আমাকে বলছে—'মামি, তুমি আমাকে ছাড়ো. তানাহলে দুজনেই ডুবে যাব। তুমি আমার পিঠের ওপর শরীরটা ছেড়ে দাও, আমি তোমাকে নিয়ে ঠিক পাড়ে চলে যাব।' মনে মনে হাসলাম। আমি তো বালিগঞ্জ লেকের শান্ত জলে সাঁতাব শিখিনি। দুরন্ত ব্রহ্মপুত্রে শিখেছি, তাও একা একা। সাঁতারের সব নিয়মকানুন অমিতের থেকে আমি কিছু কম জানি না। এতো তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেব? বলিষ্ঠ শরীরের সঙ্গে শরীরের লেপটে থাকার সুখটুকু যে তাহলে নিমেষে শেষ হয়ে যাবে। ছাড়লাম না ওকে। আবার ডুবলাম, ভাসলাম, ডুবলাম, ভাসলাম। ততক্ষণে অমিতই প্রায় আধমরা হয়ে এসেছে। শেষমুহূর্তে ওকে ছাড়লাম। ছেড়ে ওর পিঠের ওপর হালকা হয়ে শুয়ে রইলাম। কোনোরকমে পাড়ে এনে তুলল ও আমাকে।' —আবার থেমে হাঁফাতে থাকে অপু। একটু পরে আবার শুরু করে। — 'পাড়ে তুলে ও বুঝতে পারে আমি অনেক জল খেয়ে নিয়েছি। মড়ার মতো হাত পা ছেড়ে অজ্ঞান হবার ভান করে পড়েছিলাম। অমিত তখন আমাকে উপুড় করে পিঠে চাপ দিতে থাকে। জল বের হয়ে যায় মুখ দিয়ে।

কিন্তু সম্পূর্ণ সজ্ঞানে অজ্ঞান হবার ভান করে পড়ে থাকি। মনে মনে ভগবানকে ডাকতে থাকি ও যেন মুখে মুখ দিয়ে শ্বাস ঢোকাবার চেষ্টা করে আমার ফুসফুসে।'— নন্দু, কি খারাপ মেয়েছিলাম রে আমি! তোর শুনে ঘেন্না করছে না? কর কর, একটু ঘেন্না কর। বন্ধু বলে ছেড়ে দিস না, ঘেন্না করিস। তাতে যদি প্রায়শ্চিত্ত হয় আমার।

—'তারপর?' —নন্দু এবার নিজেই জানতে চায়। কৌতূহল এমন জিনিষ যা খুব সভ্য মানুষকে স্বভাব বিরুদ্ধ নানা আকর্ষণে আকৃষ্ট করে ফেলে।

—'অমিত আমাকে চিৎ করে শোওয়ায়। নাকের কাছে হাত আনে, অমনি শ্বাস বন্ধ করে রাখি আমি। ও এবার বুকে হাত দেয়। কোনো ওঠাপড়া নেই। মরামানুষের মতো আমি মুখ ফাঁক করে, চোখটা চুলচেরা খুলে রেখে পড়ে রইলাম। দেখি অমিতের চোখে মুখে ভয়। ও মনে করেছে মরে গেছে ওর মামি। গ্রামের বাড়ি, পুকুরটা একেবারে পেছন দিকে। আশে পাশে কেউ নেই। আমাকে ফেলে ও যেতেও পারছে না কাউকে ডাকতে।' —আবার যতি পড়ে কথায়।

—'আমি শুধু অপেক্ষা করে আছি জলে ডোবা মানুষের শ্বাস ফেরানোর, দ্বিতীয় রাস্তাটার জন্য। সেটা কি অমিত জানে না? তা কি করে হবে? একটা সাঁতারের ক্লাবে সাঁতার শিখেছে, প্রাথমিক শুশ্রূষার নিয়মগুলো তো জানতেই হবে। চোখের চেরা ফাঁকটুকু দিয়ে দেখি, অমিত বুকের ওপর কান পেতে হৃদপিণ্ডের শব্দ শুনতে চেষ্টা করছে। তার পর মুহূর্তেই ও আমার হাঁ করা মুখটাকে গাল চেপে ধরে আরো একটু হাঁ করিয়ে নিজের মুখ নামিয়ে আনে শ্বাস দেবার জন্য। ইচ্ছে করে দাঁত বেশি ফাঁক করি না —যাতে ওকেই নিজের ঠোঁট-দাঁত দিয়ে চেপে আমার মুখ ফাঁক করতে হয়। ঠিক তাই ঘটে। ও ঠোঁট দিয়ে, দাঁত দিয়ে জোর করে আমার মুখ ফাঁক করে নিজের ঠোঁট শুদ্ধু মুখটা আমার মুখের ভেতরে ঢুকিয়ে শ্বাস ভরে দিতে থাকে আমার ফুসফুসে। আঃ! কি সুখ! আমার উনিশ বছরের রক্তে আগুন ধরে যায়। কিন্তু এখন নয়। নিজেই নিজেকে শান্ত করি। ধীরে, অপু, ধীরে। —এভাবে খানিকক্ষণ শ্বাস দেবার পর যেন এই জ্ঞান ফিরল, ওমনি অভিনয় করে জেগে ওঠার ভান করি। অমিত আমার জ্ঞান ফিরেছে দেখে যেন হাতে প্রাণ ফিরে পায়। বলে—'উঃ! মামি, যা ভয় দেখিয়ে দিয়েছিলে তুমি। আমি তো ভেবেছি তুমি আর নেই। কি ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম যে তোমাকে বোঝাতে পারব না। খুব জোর বেঁচে গেছ। শাড়ি পরে সাঁতার কাটতে নেই। জানো না তুমি? —নাও এবারে উঠে বসো।' ও ধরে বসায় আমাকে। শাড়ি জামা ভিজে এদিক ওদিক হয়ে গেছে। এতক্ষণ আমাকে খেয়াল করেনি অমিত। প্রাণ বাঁচাতেই ব্যস্ত ছিল। এবার ওর নজর আমার ভিজে যাওয়া বুকের ওপর পড়ে, দেখলাম আমি। একমুহূর্ত থমকে যায় ওর দৃষ্টি, তারপরেই চোখ সরিয়ে নেয়। আমি তখন ওকে বললাম —'অমিত, আমি যে ডুবে যাচ্ছিলাম একথা

কিন্তু বাড়িতে কাউকে বলো না। তাহলে আর কখনও সাঁতার কাটতে দেবে না। অথচ আমি এত ভালোবাসি সাঁতার কাটতে! শাড়িটা যে কী করে পায়ে এমন জড়িয়ে গেল বুঝতে পারছি না। আমি তো শাড়ি পরে অনেক সাঁতার কেটেছি। আগে কখনও এমনটা হয়নি তো?'

—'দুর্ঘটনা রোজ রোজ ঘটে না মামি। তবে একা একা কখনও শাড়ি পড়ে পুকুরে আর নেমো না তুমি। আজ নেহাৎ আমি ছিলাম তাই বেঁচে গেছ। আর একটা কথা, যে তোমাকে বাঁচাতে আসবে তাকে কখনও জলের মধ্যে জাপটে ধরতে নেই। তাতে দুজনেই মরে যাবে। চুল ধরে বা একটা হাত ধরে ভাসিয়ে ভাসিয়ে বের করে আনতে হয়—এগুলো আমাদের ক্লাবে শৈলেশদা শিখিয়েছে।'

'এরপর চট্ করে আর কিছু করলাম না। তাতে ওর সন্দেহ হতে পারে। জানিস নন্দু, ওই অবোধ, ভালো ছেলেটাকে একটু একটু করে খেলিয়ে খেলিয়ে তুলেছিলাম আমি। এত নোংরামি করেছি ওকে পাবার জন্য যে শুনলে তুই থুথু দিবি।'— ঠিক এমনি সময় দরজার সামনে কেউ যেন কাউকে জিজ্ঞেস করল— 'এ ঘরে?' —নন্দু পেছন ফিরে দেখে ঘষাকাচের মতো চশমা পরা কেউ পর্দাটা ফাঁক করে ভেতরে উঁকি মারছে। ও উঠে গিয়ে বলল—'আসুন মুখুজ্জেমশাই, অপু এই কেবিনেই আছে।'

—'আমি তো বেশ খানিকক্ষণ হয় এসেছি। এসে দেখি বেড খালি। কিছু বুঝতে পারছিলাম না। ভয় হচ্ছিল। তারপর এদিক ওদিক খোঁজাখুঁজি করলাম — শেষে একজন বলল কেবিনে নিয়ে গেছে। বিশ্বাস করতে পারলাম না তার কথা। কেবিনে কি করে যাবে? ফ্রি বেডে বারান্দায় ছিল এতদিন, কেবিনে গেছে আজ, কথাটা কেমন অবিশ্বাস্য মনে হল। শেষে মেট্রনকে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে উনি বললেন যে কেউ একজন নাকি কেবিনের আর দু-বেলা দু-জন ট্রেইন্ড নার্সের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। —তারমানে আপনি এসব করেছেন? -- কিন্তু ভাই এতসব খরচ তো আমার সাধ্যের বাইরে। কি করে দেব আমি এত টাকা?'

—'মুখুজ্জেমশাই, অপু আপনার যেমন স্ত্রী, আমারও কিছু হয়! সে সম্পর্কটা এতই গভীর আর এতই আপন যে এটুকু করার অধিকার আমার আছে অপুর জন্য।'

—' সেটা আমি আর অস্বীকার করি কী করে? আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ছোটো করব না আমি। কিন্তু এতটা করলেন অথচ হাসপাতালের কেউ জানে না কে করেছে। মেট্রন তো বলল কেউ একজন করেছে - নাম ধাম জানি না। এটা কেন করলেন? নাম দিলেন না কেন? তাতে তো আপনারই সুনাম হত। মেট্রন বলল কাগজে কলমে আমার নাম ঠিকানাই রয়েছে।'

—'সুনাম পাবার জন্য করিনি যে! আমার বন্ধু, আমার বোন বারান্দায় পড়ে কষ্ট পাচ্ছে এটা সহ্য করতে পারিনি। সারারাত ঘুমুইনি কাল। শুধু কেঁদেছি। আজ সকালবেলাই

সব ব্যবস্থা করে ফেলেছি। প্লিজ রাগ করবেন না! কাগজে তো আগে থেকেই আপনার নামই ছিল।

—'রাগ করব? এত বড়ো পাষন্ড কিন্তু আমি নই!'

—'জানি। পাষন্ড তো দূরের কথা, আপনার মতো সত্যিকারের মানুষ কজন হয় জানি না।' —মুখুজ্জেমশাই আর কিছু বললেন না। অপুর দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন তারপর বললেন —'স্থান মাহাত্ম্য একেই বলে। কয়েকঘণ্টার মধ্যে যেন কতদিন পর তোমাকে একটু ভালো মনে হচ্ছে।'

—'হ্যাঁ গো। সিস্টার সব পরিষ্কার করে দিয়ে ওসুধ লাগিয়ে দিয়েছে। সকালেই স্নান করিয়ে দিয়েছে। এই দেখো, নন্দু এই বুকখোলা নাইটিটা এনেছে। শরীরটাও আর খোলা নেই এখন। আর ও কত কিছু এনেছে নন্দু। বেদানার রস, মুরগির স্টু। ও নিজের হাতে খাইয়ে দিয়েছে আমায়।'

—'এখন থেকে আপনি আর দু-বেলা আসবেন না মুখুজ্জেমশাই। শুধু বিকেলে আসবেন। সকালে আমি বেশিরভাগ দিনই আসব আশা করছি। তাছাড়া ট্রেইন্ড নার্স আছে, ও সব করবে। আমাদের থেকেও ভালো করবে। রোজ সকালে না এলেও চলবে।' — একটু থেমে বলল — 'এবার আমি যাব, অনেকক্ষণ হল এসেছি। মিসেস গোমস্‌কেও একবার দেখে যেতে হবে। অপু, কাল রোববার তো, তাই তথাগত আসবে।'

—'না-না! আর্তনাদের মতো চেঁচিয়ে ওঠে অপু। ওকে আনিস না। এই কুৎসিত রূপ তোর বরকে দেখাস না নন্দু। ওর মনে অপুর আগের চেহারাটাই থাক।'

অপুর মনের অবস্থাটা বোঝে নন্দু। দেখতে তো ওকে রূপসী না হলেও সুন্দরীই ছিল। ক্যান্সারের কামড়ে কদর্য হয়ে গেছে। তাই চায় না এই কদর্যতা, দুর্গন্ধ যুক্ত চেহারাটা আর কেউ দেখুক।

সকালে ব্রেকফাস্ট টেবিলে সবাই একসঙ্গে বসেছিলেন মুখার্জি পরিবার। মিসেস গোমস্‌কে আজ রিলিজ করে দেবে। ইন্দ্রাণীকে বেশ খুশি দেখাল। মিসেস গোমস্ এবাড়ির হাউসকিপিং আজ থেকে করছেন না। ওনাকে ছাড়া ইন্দ্রাণী নিজেকে অসহায় মনে করেন। নিজের ব্যস্ত জীবনে ঘরকন্না দেখার মতো সময় ওনার নেই। ড. বসু বলেছেন অল্পদিনের মধ্যেই মিসেস গোমস্ কাজ শুরু করতে পারবেন । ইন্দ্রাণী সুনন্দাকে অপুর কথা জিজ্ঞেস করলেন

—'তোমার বন্ধু কেমন আছে সুনন্দা?'

—'ভালো নেই মম্। ওর তো হাতে গোনা কটা দিন। তবে বারান্দা থেকে কেবিনে গিয়ে যেন একটু আরাম পেয়েছে, at least পরিষ্কার থাকতে পারছে তো?'

—'চলো আজ ছুটির দিন আছে, আজ আমি একবার যাই তোমার সঙ্গে, দেখেই আসি মহিলাকে।' —বলে তথাগত।

—'না, তোমার যাবার দরকার নেই। একটাই ছুটির দিন, তুমি রিল্যাক্স করো। আমিই যাব।

—'না-না। একবার গিয়ে দেখে আসাটা উচিত। After all তোমার ছোটোবেলার বন্ধু। আমার একবার যাওয়া দরকার।'

—'না তথাগত। আসলে অপু কাল আমাকে বারণ করে দিয়েছে তোমাকে যেন নিয়ে না যাই। বলছে ও ওর এই কদর্য চেহারাটা কাউকে দেখাতে চায় না।'

মি. মুখার্জি বললেন—'আসলে এই সময়টাতে পেশেন্ট একটা সাইকোলজিক্যাল প্রবলেমও ফেস্ করে সুনন্দা। একেবারে কাছের লোক ছাড়া কারো সামনেই ওরা নিজেকে দেখাতে চায় না। চেহারাটা খুব খারাপ হয়ে যায় তো?'— না, তুমি একাই যাও। তথাগত গেলে ও আরো ডিপ্রেসড্ হয়ে যাবে।'

—'ড্যাড্, তুমি ঠিক বুঝেছ। অপু একেবারেই চায় না যে ওর এই কদর্য চেহারাটা অন্য কেউ দেখুক।' বলে নন্দু।

নন্দু কেবিনে ঢোকার মুখেই গোঙানির আওয়াজ পেলো। কাছে এগিয়ে যেতে সিস্টার বলল—'ওনার ব্যথাটা আজ সকাল থেকে বেড়েছে খুব।'

—'ডক্টরকে বলেছেন?'

—'হ্যাঁ বলব, এখনও তো আসেননি। তবে duty doctor একটা পেইনকিলার দিয়েছেন। সেটা ইনজেক্ট করেছি। এখন ব্যথাটা আগের চেয়ে কম। ভোরে খুব বেশি ছিল।'

সুনন্দা অপুর পাশে বসে ওর মাথায় হাত রাখল। চুলহীন মাথাা একটা অদ্ভুত অনুভূতির সৃষ্টি করল ওর হাতে।

—'নন্দু, বড়ো ব্যথা রে। আর পারছি না সহ্য করতে। কবে যে ভগবান আমাকে মুক্তি দেবেন!'

—'ব্যথা কমে যাবে অপু, ইনজেকশন তো দিয়েছে। একটু পরে তোর ডাক্তারও এসে পড়বেন। উনি এসে নিশ্চয়ই কিছু দেবেন তোকে যাতে একটু আরাম পাস।'

—'সবই, সাময়িক। আবার ব্যথা হবে। মরতে আমি ভয় পাচ্ছি না রে! শুধু ব্যথাটা না থাকত!'

—'কথা বলিস না তাতে আরো কষ্ট হবে।'

—'আচ্ছা।'— বলে কথা বন্ধ করে অপু। কিন্তু যন্ত্রণার জন্য আস্তে আস্তে কোঁকানোর শব্দটা হতেই থাকে। একটু পরে অপুকে যিনি দেখছেন সেই ড. চক্রবর্তী এসে গেলেন। ওকে দেখে সিস্টারকে কিছু নির্দেশ দিলেন। তারপর অপুর দিকে তাকিয়ে বললেন—'ব্যথা কমে যাবে, ভয় পাবার কিছু নেই। আগের থেকে অনেক ভালো আছেন আপনি। মনে

জোর রাখুন, তবে তো ওষুধ কাজ করবে। এত ভেঙে পড়লে কি করে হবে, ভালো হয়ে বাড়ি যেতে হবে তো, নাকি?' —ড. সিস্টারকে আবার কিছু বলে বাইরে আসতে নন্দুও বাইরে এল। জিজ্ঞেস করল—'ড., আপনি যা বললেন সেটা কি ঠিক? ও ভালো হয়ে যাবে?' —'না মিসেস মুখার্জি। ওর দিন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আর বড়োজোর মাসখানেক। তাহলে ব্যথাটা যাতে ভুলে যায় সে জন্য ভরসা দেওয়া। একটা ইনজেকশন দিতে বলেছি তাতে জায়গাটা সাময়িক প্যারালাইজড করে দেবে, ব্যথাটা টের পাবে না। ওর জন্য আর কিছু করার নেই মিসেস মুখার্জী। এখন শুধু এভাবেই ব্যথাটা বুঝতে পারবে না।' ড. চক্রবর্তী চলে গেলেন। নন্দু ভেতরে এসে দেখল সিস্টারও নেই। বোধহয় ইনজেকশনটা আনতে গেছে। একটু পরে সিস্টার এসে ইনজেকশনটা দিল। আর সত্যিই পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে অপুর গোঙানি বন্ধ হয়ে গেল। মুখের কোঁচকানো রেখাময় চামড়ায় একটা শান্তির ভাব ফিরে এল। নিজেই বলল—'ব্যথাটা কমে গেছে রে। বারান্দার ফ্রি বেডে তো এসব দিত না, কত যে কষ্ট পেয়েছি নন্দু তুই জানিস না। ভগবান তোকে পাঠিয়েছে রে। তুই এসেছিলি বলে কেবিনে আনলি, দামি দামি ইনজেকশন দিয়ে ব্যথা কমিয়ে দিচ্ছে। তোর অনেক খরচ করে দিচ্ছি আমি। এ ঋণ তো এজীবনে শোধ করতে পারব না, আগামী জন্মে শোধ করব।'

—'তুই যদি এসব বলা বন্ধ না করিস তাহলে আমি কিন্তু সত্যিই আর আসব না অপু।'

—'না, বলব না। তুই রাগ করিস না লক্ষ্মীটি।'— 'আসলে ফ্রি বেডে এসব দামিওষুধ দামি চিকিৎসা তো করতে পারি নি। দামি ওষুধপত্রগুলো বাইরে থেকে কিনতে হয়। তোর মুখুজ্জেমশাই তো কিনতে পারত না। আমিও কষ্ট পেতাম আর আমার কষ্ট দেখে ও নিজেও কষ্ট পেত। চিরটাকাল মানুষটা শুধু অক্ষমতার কষ্ট ভোগ করে এল।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে অপু। তারপর আবার বলে—'তখনও আমায় ধরে রাখতে পারেনি, এখনও পারবে না। —তুই তো ছোটোবেলা থেকে দেখেছিস আমাকে। সবাই দস্যু বলত। শক্তপোক্ত মজবুত মেয়ে ছিলাম আমি। খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল, জানিস, সেই ছোটোবেলায় তোকে হিংসে করতুম, আবার পরে তোর সুখের জীবন দেখেও করেছি। তোর জায়গায় নিজেকে কল্পনা করতুম। যেন আমি সুনন্দা রায়চৌধুরি। —হাসল অপু, একটা তেতো হাসি। বলল—ওই রায়চৌধুরি ভিলা, তোদের ঐশ্বর্য, তোদের চালচলন— সবকিছুর ওপর প্রচন্ড লোভ ছিল আমার। আমি ওসব সব পেতে চাইতাম—কিন্তু পেতাম না। আমি তো নবীন ব্যানার্জির মেয়ে — রায়চৌধুরি বাড়ির নই, ছোটোবেলায় একথাটা মানতে কষ্ট হতো খুব। কত মিথ্যে কথাই না বলেছিরে সবাইকে। এমনকি তোর মুখুজ্জেমশাইকে, অমিতকে, সবাইকে। —কি বলেছি জানিস? ওদের বলেছি আমরা খুব বড়োলোক ছিলাম. এতোগুলো চা বাগান ছিল, নানারকম বিজনেস ছিল। রাজার মতো ধনী ছিল আমার

বাবা। বাবা মারা গেল আর আমরা সব হারিয়ে ফেললাম। দাদারা কিছু রাখতে পারল না। —আবার তিক্ত হাসে অপু, বলে —কেউ বিশ্বাস করত না, তবু আমার মধ্যে যেন একটা অসুখের মতো, এই ক্যান্সারের মতো কিছু হত। যখনই আমি ভাবতাম তোর কথা, তোদের বাড়ির কথা, তোর গাড়ি চড়ে ইস্কুলে যাওয়ার কথা, দামি দামি ফ্রক জুতো পরে যেন ডলপুতুলের মতো সেজে থাকা তোর চেহারাটা আমাকে যেন তাড়া করে বেড়াতো, আর অনর্গল গুল মেরে যেতাম। দ্যাখ্ গুলমারাই সার হলো। অপরাজিতা ব্যানার্জি যেভাবে জন্মেছিল, যেভাবে বড়ো হয়েছিল, সেইভাবেই এখন মরছে দারিদ্র্যের মধ্যে। সেই তুই এলি, আমার স্বপ্নের রাজকন্যার মতো, এসে ফুটপাথের আস্তাকুঁড় থেকে এই দামী কেবিনের রাজপ্রাসাদে তুলে নিয়ে এলি। তুই এত ভালোছিলিস নন্দু তবু আমি কেন খারাপ হলাম রে? তোর সঙ্গে থেকেও আমি ভালোমেয়ে হতে পারিনি। কিন্তু আমার সঙ্গে থেকে তুই তো খারাপ মেয়ে হোস নি?'

সুনন্দা কোনো উত্তর দেয় না। শুনে যেতে থাকে অপুর অবসেশনের কথা। কী বিচিত্র চরিত্র! শুধু গল্প উপন্যাসেই এমন চরিত্র পড়েছে ও। অপুর মধ্যে যে এরকম একটা চরিত্র লুকিয়েছিল সে কথা অপুর মুখ থেকে না শুনলে হয়তো বিশ্বাস হত না ওর।

—'তোর মুখুজ্জেমশাইকে আমি কোনোদিনই ভালোবাসতে পারিনি। আজও নয়। হ্যাঁ, এখন ওকে দেখলে মায়া হয়, শ্রদ্ধা হয়। আমার মতো স্ত্রীকেও মানুষটা স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে চিকিৎসা করিয়েছে, সেবা-যত্নে ভরিয়ে দিয়েছে শেষের দিনগুলো, তবু ভালোবাসা হয়নি। যাকে সত্যিই ভালোবাসলাম, আজও বাসি, সে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। তবু ওকেই এখনও ভালোবেসে যাচ্ছি। রোজ অপেক্ষা করি হয়তো একবার, শেষ দেখা দেখতে আসবে ও। কিন্তু আসে না।' —আবার থামে অপু। ব্যথাটা একেবারেই নেই বোঝা যায়। ঘায়ের জায়গাটা পুরোপুরি অসাড় হয়ে গেছে। তাই ব্যথার অনুভূতি আর নেই। নার্স ঘায়ের ওপর মলম দিয়ে ঢেকেও রেখেছে, তাই দগদগে ঘা-টা দেখাও যাচ্ছে না। গন্ধটাও অনেক কমে গেছে নিয়মিত পরিষ্কার রাখার জন্য। যেটুকু গন্ধ এখনও আছে তার সঙ্গে নন্দু এখন অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। অপুর কোনো কথার উত্তরই ওর জানা নেই, তাই নীরব শ্রোতার মতোই বসে থাকে নন্দু। অপুর আশা-আকাঙ্ক্ষা, ওর প্রেম, প্রেম হারানোর আক্ষেপ, সব শোনে।

—'জানিস, অমিতকে পুরোপুরি পেতে আমাকে অনেকদিন অপেক্ষা করতে হয়েছে অনেক ছলা-কলা করেও ওর মধ্যেকার সংস্কার, মামি-ভাগ্নের সম্পর্কের বাধা ভাঙতে পারছিলাম না। আসলে তখন ও তো ছেলেমানুষ। ভয় ছিল পাপ পথে নামার। ওর সামনে কতবার জামাকাপড় ছেড়েছি, শরীরটার টোপ ফেলেছি। ওর চোখে কামনার আগুনও দেখেছি, কিন্তু ও চোখ সরিয়ে নিত। নিজেকে খুব কষ্ট করে ধরে রাখত অমিত।' —আবার বিরাম দেয় অপু। একটু হাঁফায়। —'শেষ পর্যন্ত জিৎ আমারই হল।

উচ্চমাধ্যমিক দিয়ে সরিষায় এল ও বেশ কিছুদিন থাকবে বলে। তখন ও উনিশে চলছে আর আমার একুশ। সেদিন বাড়িতে শুধু আমি, বুড়ো শ্বশুর আর অমিত। শাশুড়ি, বড়োজা আর কাজের মাসি গেছে দক্ষিণেশ্বরে। আদ্যাপিঠে দুপুরে ভোগ খাবে। ফিরবে সন্ধ্যারতি দেখে সেই রাত্রে। এমন সুযোগ হাতছাড়া করা অসম্ভব। ও এলে আমি ওর পেছন পেছনই থাকতাম সব সময়। এটা ওটা খেতে দেওয়া, ওর যাতে মামার বাড়ির আদর যত্নে কোনো ত্রুটি না হয় তার খেয়াল রাখা এসব করতাম। শাশুড়ি-ননদ খুব খুশি —বুঝলি? বলতো ছোটো বউ কত যত্নআত্তি করে, কত আপন করে নিয়েছে ননদ-নন্দাই-ভাগ্নেকে। —হাসে অপু। তারপর বলে — যদি ঘুণাক্ষরেও ওরা জানতে পারত আমার মনের কথা তাহলে জীবনটা অন্যদিকে মোড় নিত। কেউ কিছু বুঝতেই পারেনি। উলটে পরম বিশ্বাসে অমিতকে আমার স্নেহছায়ায় ছেড়ে দিয়েছিল। —সেদিন শ্বশুরকে খাইয়ে দিয়ে অমিতকে জানাই—চলো, আজ সাঁতার কাটি। ও রাজি হয়ে গেল। পুকুরে এলাম দুজনে। বকবক করি—আজ আর শাড়ি পরে জলে নামব না। গেলবারে সেই ডুবে যাওয়ার ছুতোটা করার পর ওর সঙ্গে আর সাঁতার কাটিনি আমি। অমিত জিজ্ঞেস করল—তোমার তো কস্টিউম নেই, তবে কি পরে সাঁতার কাটবে?

আমি হাসলাম —কে বললে কস্টিউম নেই। বাঙালির আদিঅনন্ত কালের সাঁতার কাটার কস্টিউম আছে আমার। বলে গামছাটা দেখালাম। অমিত খুব হাসতে লাগল। বলল

—'এ মা, তুমি গামছা পরে সাঁতার কাটবে? কেউ দেখলে কি বলবে?'

—' কে দেখবে, পাঁচিল দেওয়া বাড়ি। আশেপাশে কোনো বাড়িই নেই! দেখবেটা কে? এক তুমি দেখবে। তোমার যদি তাতে মান যায় তবে থাক্ সাঁতার কেটে কাজ নেই। আমি চলে যাই। কলঘরেই স্নান করে নেবখোন।' — অভিমানী গলায় বললাম আমি। অমিত অপ্রস্তুত হয়ে বলেছিল—'না, না, ঠিক আছে। নেমে পড়ো গামছা পরেই।'

গামছাটা হাতে নিয়ে কোমর জলে দাঁড়িয়ে শাড়ি জামা কাপড় খুলে ঘাটের সিঁড়িতে রাখলাম। খোলা বুকেই দাঁড়িয়ে গামছাটা বুকের কাছে বেঁধে নিচ্ছিলাম। তাকিয়ে দেখলাম অমিতের চোখ আমার বুকের দিকে। আজ আর ও চোখ সরাতে পারল না। একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে দেখছিল ও আমাকে। যেন কিছুই হয়নি এমনি একটা ভাব করে ওকে বললাম —'চলো আজ আবার কম্পিটিশন হয়ে যাক এপার-ওপার কে আগে শেষ করতে পারে। বলে আরো গভীর জলে নেমে এলাম। অমিত সেই কোমর জলেই দাঁড়িয়ে রইল যেন পা আটকে গেছে ওর। ফিরে এলাম ওর কাছে, হাত ধরে টেনে বললাম—'কি হল দাঁড়িয়ে আছ যে? চলো?'— ও তেমনি অদ্ভুতভাবে আমার ভিজে গামছা লেপটে থাকা বুকের দিকে তাকালো আর বশীকরণ হওয়ার মতো নেমে এল জলে। আমার সামনে গলা জলে দাঁড়িয়ে অমিত আমাকেই দেখে যাচ্ছে।' —আবার থামে অপু। নন্দুও চুপ। ঘরে যেন কোনো শব্দ নেই, বাইরের সমস্ত শব্দরা এঘরে ঢুকতে ভয় পাচ্ছে অথবা নন্দুর সমস্ত চেতনা বাইরের জগতের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই কেবিনে বন্দি হয়ে পড়েছে।

—'ওর চোখের দিকে স্থির তাকিয়ে রইলাম কোনো কথা না বলে। তারপর জলের তলায় ওর হাতটা ধরে নিজের বুকের ওপর রাখলাম। জানিস নন্দু, অমিত থরথর করে কেঁপে উঠেছিল জলের তলায় দাঁড়িয়ে, আমার শরীরের ঘনিষ্ঠ স্পর্শে। নারী দেহের সঙ্গে ওর প্রথম পরিচয়, প্রথম স্পর্শ ওকে একেবারে খড়কুটোর মতো ভাসিয়ে নিয়ে গেল। আমার সঙ্গে অমিতের প্রথম মিলন হল জলের তলায়। অনেক দেরিতে পুকুর থেকে উঠে এসেছিলাম। সেদিন শাশুড়িরা ফিরে না আসা পর্যন্ত খালি বাড়িতে বার বার অমিতের সঙ্গে আমার দৈহিক মিলন হল। এতদিনের জমানো আকাঙ্ক্ষা যেন তৃপ্ত হতে চাইছিল না। সেই থেকে শুরু। প্রায় পুরো জীবনটাই ও আমার আঁচলে বাঁধা থাকল শক্ত গিঁটে। তারপর—তারপর তো ও বি.কম পাস করেছে, চাকরি পেয়েছে কাস্টম্‌সে। আমাদের সম্পর্ক নিয়ে কেউ তখনও সন্দেহ করেনি—সবটাই গোপনে চলছিল। সরিষার বাড়িতে, সবাই বাড়িতে থাকাকালীনও চট্‌ করে আমরা মিলিত হয়েছি, দুজনেরই দুরন্ত তাগিদে। কেউ বুঝতে পারে নি।' — দু-বার এবর্সন করিয়েছি দেড়মাসের মধ্যেই। প্রথমবার তো অমিতের সঙ্গে প্রথম দিনের ঘটনার পরই মাস দেড়েক পরে বুঝতে পেরেছিলাম পেটে বাচ্চা এসে গেছে। তুই একবার ভাব নন্দু, অমিত তখন সবে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে আর ওর বাচ্চা ওর মামির পেটে!'—বলে হাসল অপু, যেন কৌতুকের ব্যাপারটা বন্ধুর কাছে বর্ণনা করছে।

নন্দুর সারা শরীর দিয়ে বরফগলা জল নামতে থাকে। ও ভেবে পায় না ওর কি করা উচিত, হাসবে? নাকি খুব রাগ দেখাবে! কিছুই করে না নন্দু বরং ওর মনে হয় শেষটুকু অব্দি শোনাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। অপুর জীবনকাহিনি ওকে যেন হাফলংয়ের আগুনে ঝাঁপিয়ে মরা আশ্চর্য পাখিদের মতো আকর্ষণ করছে। যত খুলছে ঘটনার ধারাবিবরণী ততই আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে ও। নিজের সযত্নে পালিশ করে রাখা মার্জিত মনটার মধ্যে এক নোংরা কাহিনি শোনার আগ্রহ বাড়তে থাকে। —'মাস দেড়েকে মধ্যেই বাচ্চা খসিয়ে চলে এলাম ঝাড়া হাত পা। অমিতকেও কিছু বলিনি। বললে ও চলে যেত আমার জীবন থেকে। তুই-ই বল? চলে যেত কি-না? —সাক্ষী মানে নন্দুকে। —'ওইটুকু ছেলে, ভয়ে আর এমুখো হত না। কিন্তু আমার তো ওকে ছাড়া চলবে না। তাই ওকে কিছু জানাই নি। দ্বিতীয়বার প্রেগনেন্ট হলাম অমিতের বি. কম. পাস করার পর। এবার ওকে বললাম, তবে ভরসা দিয়েই বললাম যে ভয় পাবার কিছু নেই, এবর্সন করে নেব। কেউ জানতেই পারবে না। জানিস, ততদিনে অমিতেরও আমাকে ছাড়া চলে না। আর আমি তো ওকেই আমার জীবন-মরণ হিসেবেই নিয়ে নিয়েছিলাম। ওকে এত ভালোবেসে ফেলেছি যে সত্যিসত্যিই ওর সন্তানের মা হতে চাইতাম আমি। কিন্তু সেটা তখন সম্ভব ছিল না। তাই এবর্সন করতেই হল।' —সিস্টার এসে ঢুকল ঘরে, নন্দুর আনা চিকেন স্যুপটা খাওয়াতে এসেছে। খাওয়ানো হলে অপুকে দুটো পিল খাইয়ে দিল। বেড প্যান

নেবে কি না জিজ্ঞেস করল। অধৈর্য্য অপুর এখন কিছুর দরকার নেই। দরকার হলে ডাকবে। সিস্টার চলে যেতেই — বুঝতে পারছিস না তুই, জানিস না নন্দু, আমার যে কি তাড়া তোকে সব বলে যাবার। খালি ভয় হয় যদি পুরোটা না শেষ করতে পারি? যদি তার আগেই মরে যাই? তাহলে যে আমার পাপের কথা অজানাই থেকে যাবে প্রায়শ্চিত্ত করব কি করে? এসব খাওয়া দাওয়ার জন্য সময় নষ্ট হয় বড্ড। রাগ হয়ে যায়। আমাকে যে আমার কথা শেষ করে মরতে হবে নন্দু!'

—'তাই বলে কি খাওয়াবে না? ওষুধ খাবি না? ওরকম পাগলামী করলে চলে?'

—'না রে! তুই বুঝিস না। ব্যথা শুরু হলে আর কথা বলতে পারি না। এখন ব্যথাটা নেই, এবেলা যতটা বলার বলে নিতে চাই রে। ডাক্তার সান্ত্বনা দিয়ে বলে ভালো হয়ে বাড়ি যাবেন, আর তুই বুঝি বিশ্বাস করে ফেললি? হাসল অপু, বলল —বাড়ি ফিরে আর কোনোদিন যাব না রে, আমি। যাবার ইচ্ছেও নেই। এখন প্রতিমুহূর্ত তাড়াতাড়ি মরণ আসুক এই প্রার্থনাই করি। আর সেজন্যই তাড়া আমার। অন্তত তোর কাছে বলে যাব সব কথা। কিছু লুকোবো না। সেই ছোটোবেলা থেকে কখনও তোকে কিছু লুকিয়েছি? বল তুই?'

এভাবেই চলছিল। শ্বশুর মরে গেল। সরিষার বাড়ি ভাশুরের নামে ছিল। আর হেদোর এই ছোটো অংশটা যেটা শ্বশুর পেয়েছিল উত্তরাধিকারসূত্রে সেটা তোর মুখুজ্জেমশাই পেলো। তোকে বলেছি কি-না মনে নেই, আমার ভাশুরও নিঃসন্তান। আর আমার তো স্বামীর সঙ্গে কোনো সম্পর্কই ছিল না। বংশে বাতি দেবার কেউ থাকবে না। একথা ভাবতে ভাবতে শাশুড়ি মরে গেল শ্বশুরের মৃত্যুর চার মাস পর। আমরা হেদোর বাড়িতে চলে এলাম। এখানে আসার পর তো যেটুকুও বা ভয় ছিল কেউ দেখে ফেলার, জেনে ফেলার, সেটুকুও আর থাকল না। অমিত তখন এখানেই থাকতে লাগল। নিজের বাড়িতেও থাকত তবে এখানেই বেশি থাকত। ওর বাবা-মা কে বলতো দমদমে এয়ারপোর্টে ডিউটি করে বেশি রাত্রে ছোটো মামারবাড়িতে ফিরে আসাটা ওর পক্ষে সুবিধেজনক। ওরাও বিশ্বাস করত।' —কী যেন ভাবে অপু। নন্দু অপেক্ষা করে থাকে পরবর্তী অধ্যায়ের জন্য।

—'একদিন কি হয়েছে জানিস? দুপুরবেলা, হঠাৎ অমিত এসে হাজির। এসেই আমাকে তুলে নিয়েছে দরজার সামনে থেকেই, নিয়ে সোজা বিছানায়। কোনো ভূমিকার দরকার হত না আমাদের। দুজনেই সারাক্ষণ দুজনের জন্য তৈরিই থাকতাম আমরা। সদর দরজাটা বন্ধ করার কথাও আমাদের মনে হয়নি। দুটো শরীর যখন একটা শরীর হয়ে গেছে, ঠিক সেইসময় তোর মুখুজ্জেমশাই ঘরে ঢুকলো।'

আপনা হতেই নন্দুর মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় আঁক্ করে একটা শব্দ। তারপর বলে —'ইশ্! ছি ছি!'

—'ইশ্ করার মতো কিছু নেই । ও দেখল আর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অক্ষম, কাপুরুষ মানুষটা প্রতিবাদও করল না। আমাকে বকলো না, ভাগ্নেকে চড় মারল না,— শুধু বেরিয়ে গেল। দ্যাখ্ নন্দু, ও আমার থেকে বয়সে অনেক বড়ো মানলাম, ও অসুস্থ, নানা রোগে জীর্ণ সেটাও মানলাম, ওকে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিলাম ষোলো বছর বয়সে সেটাও মানলাম। কিন্তু ও তো ইমপোটেন্ট ছিল না। কারণ ও একদিন তো জোর করে আমাকে রেপ্ করেছিল? তাহলে? তাহলে ও কেন নিজের স্ত্রীর প্রতি ওর স্বামীত্বের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করতে কোনো চেষ্টাই করল না দ্বিতীয়বার? আমাকে ছুঁলে আমি ওকে খুন করে ফেলব বলেছিলাম, সেই ভয়ে? না কি ওর মধ্যেও একটা অপরাধবোধ ছিল যে মেয়ের বয়সি একটা মেয়েকে বিয়ে করে জীবনটা নষ্ট করে দিয়েছে মেয়েটার—সেজন্য? ওকে পরে আমি জিজ্ঞেস করেছি —'এতবড়ো একটা ঘটনা ঘটতে দেখলে নিজের চোখে, কিছু বললে না তো?'

'কি বললেন মুখুজ্জেমশাই'—? নন্দু উদগ্রীব হয়ে প্রশ্ন করে।

—'বলল, ও নাকি বুঝতো সব। সেদিন শুধু সামনা-সামনি চোখে দেখে ফেলেছে। আমি ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যদি বুঝতই তাহলে বাধা দেয়নি কেন, কেন আমাকে বলেনি যে ও জানে কিছু একটা চলছে। ও বলেছিল —কি লাভ হত বলে? জানাজানি হত, পরিবারের বদনাম হত। তাছাড়া আমার তো কিছু বলার অধিকার ছিল না। —জানিস নন্দু, আমার মুখ ও বন্ধ করে দিয়েছিল ওই একটা কথায়। সত্যিই তো ওর কোনো অধিকার ছিল না আমার ওপর।'

—'তুই যা করেছিলি তার জন্য কি তোর মনে তখন অনুশোচনা হয়েছিল অপু? তা না হলে তুই কেন চাইছিলি যে মুখুজ্জেমশাই তোকে বকুক, মারুক?' —জিজ্ঞেস না করে পারে না নন্দু।

—'জানিস নন্দু ধরা পড়ে না গেলে এসব নিয়ে ভাবতামই না। আসলে হাতে নাতে ধরা পড়ে গিয়ে আমি বোধহয় নিজের সপক্ষে সাফাই খাড়া করতে চাইছিলাম। যেন, ও বারণ করলে এরকম ঘটনা কখনও ঘটত না। যেন, এ ঘটনা ঘটাবার জন্য আমি দায়ী নই, ও ই দায়ী।'

—'তারপর কি হল?' —প্রশ্ন করল নন্দু।

—'ও আমাকে বলেছিল অমিতের সঙ্গে কেন এই অবৈধ সম্পর্কটা তৈরি করলাম। যদি অমিতের জায়গায় বাইরের কোনো পুরুষ হত তাহলে তো আমি তাকে বিয়ে করে সুখী হতে পারতাম। সমাজে স্থান হত আমার। কিন্তু অমিতের সঙ্গে তো বিয়ে হবে না আমার। বলেছিল অমিতকে ছেড়ে দিতে। তাহলে ও আমাকে ডিভোর্স দিয়ে দেবে এবং অন্য কাউকে বিয়ে করতে চাইলে সাহায্যও করবে। —আমি তো অমিতকে ছাড়া বাঁচব না, কি করে ওকে ছেড়ে দেব? আর ডিভোর্সও তো চাই না আমি। কোথায় যাব ও

ডিভোর্স করে দিলে? অমিতের সঙ্গে পাকাপাকি থাকতে চাইলে অমিত যদি রাজি না হয়? তাহলে তো ওকে হারাবো আমি। একটু ভেবে আবার বলতে থাকে অপু — আমি অমিতকে কোনোভাবেই হারাতে চাইনি রে, যে কোনো মূল্যে ওকে শুধু আমার করে ধরে রাখতে চেয়েছি। তাছাড়া সে সময় আমি তৃতীয়বার প্রেগন্যান্ট হয়েছিলাম। আর, এবার আমি আর কিছুতেই এবর্সন করব না ঠিক করে নিয়েছিলাম। আমার একটা সন্তান চাই, অমিতের সন্তান। আমি মা হবার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিলাম। তোর মুখুজ্জেমশাইকে বাজাবার জন্য তাই জিজ্ঞেস করেছিলাম—তুমি তো ইচ্ছে করলে এখনই আমায় তাড়িয়ে দিতে পারো। দিচ্ছ না কেন? তোমাকে স্বামী বলে মানলাম না কোনোদিন, তোমার ভাগ্নের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক আছে আমার, তুমি জানো যে আমরা একে অন্যকে ভালোবাসি—এতর পর তোমার তো দ্বিচারিনী স্ত্রীকে তাড়িয়ে দেবার অধিকার আছে। তবে কেন দিচ্ছ না।?

ও বলেছিল —'আমি শুধু শারীরিক ভাবে দুর্বল নই অপু, মানসিক ভাবেও দুর্বল। আমি পরিবার, সমাজ, শাস্ত্র, পাপ-পুণ্য, সব কিছুতে বিশ্বাস করি। তাই আমি এত দুর্বল। তুমি আমাকে স্বামীত্বের অধিকার না দিলেও, সামাজিক ভাবে, শাস্ত্রসম্মত, আইনসম্মতভাবে আমি তোমার স্বামী। তুমি ভুল পথে চললে তোমাকে শোধরাবার চেষ্টা করা আমারই দায়িত্ব। আমি তো এ যুগের মানুষ নই, তাই এ যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারি না। পুরোনো ধ্যান ধারণায় বিশ্বাস করি, সম্পর্কে বিশ্বাস করি। নাই বা থাকল তোমার সাথে আমার ভালোবাসার সম্পর্ক, তবুও একটা সম্পর্ক আছে যা তুমি অস্বীকার করলেও আমি পারি না করতে যে আমাদের বিয়ে হয়েছিল, তুমি আমার স্ত্রী। বিয়ের আগে আমি যদি জানতে পারতাম যে, তোমাকে আমার ছবি দেখানো হয়নি, আমার বয়স, ভাঙা স্বাস্থ্য, সামান্য চাকরি এসব ব্যাপারে কিছুই বলা হয়নি তাহলে, বিশ্বাস করো আমি এ বিয়ে করতাম না। ফুলশয্যার দিন তুমি পালিয়ে যেতে আমার মনে হয়েছিল তোমার আমাকে পছন্দ হয়নি। পরে ভেবেছিলাম ষোলো বছবের মেয়ে হয়তো ভয় পাচ্ছে, জোর করে স্বামীত্বের অধিকার স্থাপন করে নিলে সব ঠিক হয়ে যাবে। —সেটা আমার একটা ভুল ছিল। সেদিন বুঝেছিলাম তুমি কতটা ঘেন্না করেছ আমাকে। বুঝেছিলাম এ জীবনে কোনোদিনই তুমি আমার হবে না। তাই আর কোনোদিন তোমার কাছে যাই নি আমি। আমার জন্য একটা ষোলো বছরের মেয়ের জীবন নষ্ট হয়ে গেল, এ অপরাধবোধ আমার ছিল না। কারণ বিয়েটার জন্য আমি তো দায়ী নই? অপমান কুঁকড়ে দিয়েছিল আমাকে। তাই পালিয়ে যেতাম তোমার সামনে থেকে। তবে একটা কথা আজ বলব তোমায়; তোমার জীবন, তোমার স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ার জন্য শুধু আমার পরিবার দায়ী নয় অপু। আমার থেকেও বড়ো অপরাধী তোমার বড়দি। যিনি এই বিয়েটা দিয়েছিলেন। -- আমি তোমাকে কখনো এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলতে পারি না অপু; সেটা আমার আর

একটা ভুল হবে। তুমি তাহলে হারিয়ে যাবে। যে ভুল তুমি করছিলে সেটা শোধরাবার ক্ষমতা আমার ছিল না। অমিতের সঙ্গে যে সম্পর্ক তুমি তৈরি করেছ এধরনের সম্পর্ক চিরস্থায়ী হয় না, আজ একথা বুঝবে না তুমি।' অপু এতদূর অব্দি একটানা বলে একেবারে নেতিয়ে পড়েছে। নন্দু তাড়াতাড়ি উঠে জল খাওয়ালো ওকে। বলল—'থাক্ না অপু। আজ না হয় আর না-ই বা বললি! অন্য একদিন বলিস।' অপু হঠাৎ কেমন রেগে গেল। কর্কশ গলায় বলল—'বার বার এককথা কেন বলছিস বল তো? তোর শুনতে ভালো লাগছে না, তাই না? তোর মতো নাক উঁচু পরিবারের মেয়ে, উঁচু ঘরের বউ, শিক্ষিত, রুচিবান মানুষের কেন ভালো লাগবে একটা গরিব ঘরের অতিসাধারণ, নামি না-দামি না—কেউ চেনে না —এমন একটা মেয়ের নোংরা নোংরা কথা শুনতে? তোদের জীবনে তো এসব ঘটে না — একেবারে রাজযোটক বিয়ে হয়, সুখের বিয়ে। যা, যা, ঘুরে দেখে আয়, সারা কোলকাতা শহরে তোর মতো কজন আছে আর আমার মতো কজন? তুই কি করে বুঝবি? —বারণ, খালি বারণ! আমার প্রদীপের তেল ফুরিয়ে আসছে সেটা বুঝতে চাইছে না!' —নন্দু অপুর ফ্রাস্ট্রেশন বোঝে, তাই কোনো প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায় না ওর মধ্যে। উলটে হেসেই বলে ওর হাতে হাত রেখে —'আচ্ছা বাবা, খুব অন্যায় হয়েছে। এই কান মুলছি, আর করব না। নে বল, তারপর মুখুজ্জেমশাই কি বললেন?' —আগ্রহ দেখায় নন্দু।

—'ও আর কিছু বলেনি। উঠে চলে গেল। জানিস নন্দু, তোর মুখুজ্জেমশাই জীবনে একবারই মনসাতলায় আমাদের বাড়ি গিয়েছিল,— বিয়ে করতে। আর কোনোদিন যায়নি। আমাদের বাড়ির কারো সঙ্গে কথা বলত না! আমার যেমন ওর ওপর ঘৃণা ছিল, বিদ্বেষ ছিল, ঠিক তেমনি ওরও আমার বাপের বাড়ির ওপর রাগ ছিল। কিন্তু সেদিন ওর কথায় বুঝেছিলাম আমার প্রতি ওর করুণা ছিল, রাগ ছিল না। বরং আমি যা করেছি সেটাকেও ওর অন্যায় বলে মনে হয়নি—যেন এটাই হওয়া খুব স্বাভাবিক ছিল। ওর শুধু একটাই আপত্তি ছিল—অমিত কেন? জানিস, সে দিন প্রথম আমি ওই প্রায় প্রৌঢ় মানুষটাকে চিনতে পেরেছিলাম। ওইদিনের আগে তো কখনও আমরা একসঙ্গে বসে এত কথা বলিনি, কখনও আমি ওকে জানবার চেষ্টাই করিনি। একসাথে একবাড়িতে বাস করেও আমরা যেন একটা বিশাল চওড়া রাস্তার দুটো ফুটপাথ ধরে হেঁটেছি —দুজন অচেনা মানুষের মতো। তোর কাছে বলতে তো কোনো বাধা নেই, জানিস সেদিন প্রথম ওর প্রতি আমার শ্রদ্ধা জেগেছিল মনে। নিজেকে ওর সামনে অত্যন্ত নীচু, অতি কদর্য মনে হয়েছিল। কিন্তু আমার তো ওর কাছে ফিরে যাবার কোনো পথ খোলা ছিল না; আমি নিজেই সে সব পথ বন্ধ করে দিয়েছি। ওর প্রতি শ্রদ্ধা এলেও ভালোবাসা তো অমিতের জন্যই ছিল। অমিতের সন্তান আমার পেটে।'

—'এই কি সূর্য? —জিজ্ঞেস করে নন্দু। ও আর কোনো কথাতেই অবাক হয় না।

—'হ্যাঁ, ওই সূর্য। আমি প্রেগনেন্ট সে কথা কিন্তু ওকে আমি বলিনি কখনও। তবে এবার অমিতকে বললাম আর আমি এবর্সন করব না। অমিত খুব রেগে গিয়েছিল। একে তখন ওর বাবা-মা ওর বিয়ে ঠিক করে ফেলেছে। ওদিক থেকে ওর ওপর চাপ আসছে আবার এদিকে আমি জেদ ধরেছি এ বাচ্চাটা আমি রাখব বলে। তাঁতের মাকুর মতো অমিত আমার আর ওর মা-বাবার চাপের মধ্যে পিষে যাচ্ছিল। শেষঅব্দি ওকে রাজি হতে হয়েছিল কারণ আমার পাঁচ মাসের গর্ভপাত করাতে কোন ডাক্তারই রাজি হয়নি। অমিত আপ্রাণ চেষ্টা করে গোয়ায় বদলি হল। প্রেগন্যান্ট হয়ে আমি বেশ মোটা হয়ে গিয়েছি তখন। ৬/৭ মাস পর্যন্ত পেট দেখে কেউ বুঝতেও পারেনি। মোটা হয়ে ভুঁড়ি হচ্ছে ভেবেছে হয়তো। তাছাড়া আমাদের বাড়িতে আমার ভাই-বোনরা ছাড়া আর তো কেউ বিশেষ আসত না। কেউ হয়তো ভাবতেও পারেনি এতদূর যেতে পারি আমি। সাতমাসের সময় আমি বেড়াতে যাব বলে গোয়ায় চলে গেলাম। সেখানেই জন্ম হল সূর্যর।

—'তুই যে গোয়ায় অমিতের কাছে এতদিনের জন্য গেলি সে কথা মুখুজ্জেমশাই বা তোর ননদ-নন্দাই জানতে পারে নি? —নন্দু প্রশ্ন করে অপুকে।

—'ও জানত। কারণ ওকে বলেছিলাম আমি গোয়া দেখিনি, গোয়া কেন, কিছুই তো আমি দেখিনি। বলেছিলাম, আমি অমিতের কাছে গোয়া বেড়াতে যাব।'

—'উনি কিছু বলেন নি?'

—'না। বলেছিল তোমার যা ইচ্ছে হয় করো। আমাকে জিজ্ঞেস করে তো কখনও কিছু করোনি? আজ কেন?

—'আর তোর ননদ?

—'যখন গেলাম তখন তো ওরা জানতোই না । ও তো কোনোদিন কারো কাছে কিছু বলেনি, বলত না। কথাই তো বলত না মানুষটা। আমার ননদ অনেক পরে জানতে পেরেছিল। ননদের মনে সন্দেহ বোধহয় আগেই হয়েছিল, কিন্তু হাতে নাতে প্রমাণ না পেলে এতবড়ো একটা কথা আর কি করে বলবে বল? ননদ আমার গোয়াতে তিন-চার মাস থাকাটাকেই প্রমাণ হিসেবে পেলো। সূর্য তখন হয়ে গেছে। সূর্যর কথা ওরা কেউ জানত না। আজও জানে না। তবে ওদের না জানিয়ে এতগুলো মাস ওদের ছেলের কাছে কেন থেকে এলাম এব্যাপারটা নিয়ে তুমুল ঝড় উঠেছিল। বিশেষ করে অমিতও জানায়নি ওদের আমার যাওয়ার কথা ; এটাই ওদের সন্দেহটাকে একে বারে প্রমাণে দাঁড় করিয়ে দিল।'

—'সূর্য কোথায় ছিল যখন তুই কোলকাতা ফিরলি?'

—'গোয়ার একটা ক্রিশ্চান অনাথ আশ্রমে। অমিত বুঝিয়েছিল এ ছাড়া আর উপায় নেই। অনাথ আশ্রমে একুশদিনের সূর্যকে দিয়ে এসেছিলাম আমি আর অমিত মিলে।

সেদিন অনেক কেঁদেছিলাম, মুখে খাবার তুলি নি। সূর্য আমাদের ভালোবাসা থেকে জন্ম নিয়ে এ পৃথিবীতে এসেছিল। ওকে আমি কখনও পাপের ফসল ভাবিনি; আমার বড়ো দুর্ভাগ্য যে পরিস্থিতির জন্য আমি সমাজের সামনে ওকে আমাদের বলে স্বীকার করে নিতে পারিনি। আমি প্রায় পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলাম যখন আমার চলে আসার সময় হল। মা হবার সাধ ছিল, মা হলাম ঠিকই, কিন্তু সূর্যকে নিজের কাছে রাখতে পারলাম না। অনাথ আশ্রমের ফাদারের কাছে সব কথা খুলে বলেছিলাম আমরা। উনি বলেছিলেন 'তোমরা খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়ে বিয়ে করে নাও।' কিন্তু এতে অমিত রাজি নয়। আর আমি তো কোনো কূলে গিয়ে নোঙ্গর ফেলব বলে নৌকো ভাসাই নি, শুধু ভেসে যাব, ভাসতে ভাসতে যেদিন ডুবে যাব সেদিনই শেষ হবে আমার অবিন্যস্ত নিরুদ্দেশ যাত্রা। চলে আসার পর অমিত জানাতো ও যায় সূর্যকে দেখতে। আমি ওর চিঠি পড়ে আরো পাগল হতাম। বাপ-মা থেকেও সূর্য অনাথ। বুক ভেঙে যেত ভাবতে। সব সহ্য করেছি নন্দু!'

—'তাহলে ব্যারাকপুরের অনাথ আশ্রমে এল কী করে?

—'ননদ-নন্দাই অমিতের বিয়ে ঠিক করে ফেলল। অমিত বলতো ওর কোনো আপত্তি ধোপে টিঁকছে না। একরকম জোর করেই আমার আপত্তি, কান্নাকাটি নস্যাৎ করে ও বিয়ে করে ফেলল। উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলাম আমি। নন্দু এত দিন অমিতকে হারাবার ভয় শুধু আমার ছিল, এখন তো সূর্যও ওর বাবাকে হারিয়ে ফেলল। —অমিত আমাকে বিট্রে করল বুঝলাম। তবু সান্ত্বনা আমি যেমন তোর মুখুজ্জেমশাইকে কখনোই কোনো কথা জানাইনি অমিত কিন্তু ওর মাকে এবার পরিষ্কার জানিয়েছিল, যে আমার সঙ্গে ওর অবৈধ সম্পর্কটার জন্য ছোটোমামি একা দায়ী নয়। ও নিজেও যথেষ্ট দায়ী ছিল। অপরাধ দুজনে মিলেই করেছে। —এবার আমাদের সম্পর্কটা চারিদিকে চাউর হয়ে গেল। মানে ননদ আমার ভাশুর-জাকে জানালো। ও কে জানালো, বড়দিকে গিয়ে বলে এল। নতুন বউ-এর কথা ভেবে এরা সকলেই চেপে যাও, চেপে যাও, করে হজমের বড়ির মতো ব্যাপারটা হজম করে চেপে দিল। ও তো নীরব চিরকালই ছিল, সব জানতো ও। তাই নীরবই থাকল। ভাশুরই ননদকে বুদ্ধি দিয়েছিল একেবারে চেপে যেতে। আজকালকার দিন, কেস, কাছারি হবে, কেলেংকারির সীমা থাকবে না যদি নতুন বউ আর ওর ধনী পরিবারের লোকরা জেনে যায়। —অপু খিক্ খিক্ করে শব্দ করে হাসল এবার। —ওরাই শক্ত যাঁতাকলে পড়ে গেল। কিল খেয়ে কিল হজম করে নেওয়া ছাড়া আর উপায় ছিল না ওদের।--আবার যেন ব্যথাটা শুরু হচ্ছে!' — অপুর খিক খিক হাসিটাতে নন্দুর মনে হয় যেন একটা হায়েনা হাসছে। ও ওঠে সিস্টারকে ডাকার জন্য। অপু বাধা দেয়। বলে— 'ডাকিস না। আমি বলব যদি দরকার হয় তো। কথা দিলাম তোকে। আজ আমাকে শেষ করতে দে আমার কথা। বোস্ তুই।' —বসে পড়ে নন্দু। বাধা দিতেও ভয় পায়। একটু আগেই একবার বাধা দেবার ফল দেখেছে ও। যদি আবার উত্তেজিত হয়ে ওঠে?

—'বিয়ের পর প্রায় দশদিন অমিত ছিল কোলকাতায়। মাত্র দুদিন এসেছিল হেদোর বাড়িতে। একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিলাম ওর মধ্যে। আমাকে ছুঁতো না। আমি ওকে ছুঁতে গেলে বাধা দিত। আমি কেঁদেকেটে অস্থির হয়ে বলেছিলাম —'বিয়ে হতে না হতেই ভুলে গেলে আমাকে? ছুঁতেও দিচ্ছ না? এত পর হয়ে গেলাম এই ক'দিনের মধ্যেই?' — ও বলেছিল —'পর কেন হয়ে যাবে? তবে আমি বোধহয় দুজনের সঙ্গে একরকম সম্পর্ক করতে পারব না। আমার ভেতরের মনটা বাধা দিচ্ছে অপু। — তুমি ঠিক বুঝবে না, উলটে আমাকেই ভুল বুঝবে। তার চেয়ে থাক, সময়ের হাতে ছেড়ে দাও। আমারও নিজের মনটাকে গুছিয়ে নেবার জন্য সময় চাই অপু। তাছাড়া আমার আবার বদলি হবার সময়ও হয়ে গেছে, শুনেছি এবার পোর্টব্লেয়ারে বদলি হতে পারি।'

নন্দু হাতঘড়ি দেখে বলে—'আজ এই অব্দি থাক অপু। কাল এসে শুনব। অনেক দেরি হয়ে গেল রে। শোন, নার্সকে বলে যাচ্ছি, ওর কথাশুনে ওষুধ পথ্যগুলো খাস কিন্তু। কাল আসব—কেমন?'

—'ঠিক আছে। যা তুই। তোর সংসার ফেলে রোজ যে আসিস সেটাই আমার কত ভাগ্য। যা ভাই।'

* * * * *

আজ চায়ের টেবিলে শুধু ইন্দ্রাণী আর নন্দু। আজই প্রথম ইন্দ্রাণী অপুদের পরিবার সম্বন্ধে কৌতুহল প্রকাশ করলেন নন্দুর কাছে অথবা বলা যায় খোঁজখবর নিতে চাইলেন —'আচ্ছা সুনন্দা, এই অপুরা তো ডিব্রুগড় থেকেই তোমাদের পরিচিত তাই না? তুমি বলেছিলে অল্প বয়সেই বিয়ে হয়ে গিয়েছিল ওর। ওর শ্বশুরবাড়ি বা বাপের বাড়ির দিকে কি বিশেষ কেউ নেই ওকে দেখাশুনো করার মত? ছেলে-মেয়ে কটি ওর? ওরা দেখে না মাকে? রোজ দুবেলা তোমাকে যেতে হয় বলে বলছি।

শাশুড়ির কাছে অপুকাহিনি বলাটা ঠিক হবে কী না ভাবে নন্দু। তারপর ভাবে এই মহিলা তো সমাজের অবহেলিত মানুষদের নিয়েই কাজ করে চলেছেন তাহলে ওঁর কাছে অপুর সব কথা না হলেও কিছুটা তো বলাই যায়। অপুর জন্যও তো ইনিই কেবিনের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এতগুলো বছর ধরে চেপে না রেখে আগেই বলা উচিত ছিল ওর। অপুরা ওদের বাড়ির একপাশে থাকত, ছোটোবেলায় একসাথে খেলা করে বড়ো হয়েছে ওরা। সেই টান এখনও অনুভব করে দুজনেই —ব্যস এটুকুই তো বলার মতো কথা। অপুর জীবনের অধঃপতন, পাপ, পুণ্য (যদি একটুও করে থাকে) এসবের সঙ্গে তো ওর কোনও যোগ নেই। তাহলে না বলার কি আছে? বিশেষ করে ইন্দ্রাণীর মতো মানুষকে যাঁর স্টকে অপুর চেয়েও অনেক বেশি অধঃপতিত জীবনকাহিনি গোপনে রাখা আছে?

নন্দু মুখ থেকে চায়েব কাপটা নামিয়ে বলে —'অপুর কথা বলতে গেলে এককথায়

বলা যাবে না মম। ও একটা ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট। সেই ছোটোবেলা থেকেই ও অন্যরকম। তুমি শুনবে ওর কথা?'

ইন্দ্রাণী না বলেন না বরং বলে বসেন—'সকালটা তো আজ ফ্রী আছি, শুনতে বাধা নেই। তবে তোমাকেও তো ওর কাছে যেতে হবে সময়মতো। সেটা কিন্তু খেয়াল রেখো। একেবারে লাস্ট স্টেজ তো, এসব পেশেন্টের এই সময়টা খুব ভাইটাল। যে কোনও সময় চলে যেতে পারে সুনন্দা। মনটাকে শক্ত করে রেখো।'

এক এক করে যতটুকু সম্ভব ছোটোবেলার কথা দিয়ে শুরু করে গতকাল অবধি অপুর মুখে শোনা ওর অর্ধসমাপ্ত আত্মজীবনী বলে যায় নন্দু। অপুর গোয়াতে অমিতের কাছে চলে যাওয়া পর্যন্ত বলার পর বলে—'গতকাল এই অব্দি বলেছে মম। আজ আবার খানিকটা বলবে জানি। শুধু জানি না ও আমার কাছে কেন সব বলে যাবার জন্য এত ব্যস্ত হয়ে থাকে।'

—'কেন সুনন্দা? এটা না বোঝার তো কোনও কারণ নেই। ঘটনাচক্রে তোমার সঙ্গে দেখা না হলে আমার মনে হয় ও অন্য আর কাউকেই ওর ইতিহাস এমন সবিস্তারে বলতো না। বাইরে থেকে অন্যরা ওর সম্বন্ধে যেটুকু জানে —ব্যাস। ও নিজে থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খ আত্মবিশ্লেষণ করে এসব কথা আর কাউকে কখখনও বলতো বলে আমার মনে হয় না। ও তোমাকে কতটা ভালোবাসে, তুমি নিজেও বোঝোনি। যতটুকু হিংসে তোমাকে করত তার সহস্রগুণ বেশি ভালোবাসতো তোমাকে। কেন বলতো?'

অসহায় মুখ করে নন্দু বলে—'জানি না মম। ও নিজেও বলছে ঠিক এই কথাটাই। হিংসেও করত আবার খুব ভালোওবাসত নাকি। ছোটোবেলার বন্ধুদের তো একটা ভালোবাসার টান থাকেই কিন্তু ও যেভাবে বলে তাতে মনে হয় অনেক বেশি বিশ্বাস করে, অনেক বেশী ভালোবাসে আমাকে।

—'হ্যাঁ সুনন্দা, ঠিক তাই করে ও তোমাকে। কারণ, সেই ছোটোবেলা থেকেই ও নিজেকে তুমি বলে মনে মনে কল্পনা করেছে। তোমাকে অসম্ভব ভালোবেসেছে নিজেকে ভালোবাসছে ভেবে। নিজেকে যতটা বিশ্বাস করে ঠিক ততটা বিশ্বাসই তোমাকেও করে কারণ ওর সাবকনসাস মাইন্ডের গভীরে ও সুনন্দা হয়েই রয়ে গেছে। ও মনপ্রাণ দিয়ে তুমি হতে চাইত, যখন হতে পারত না তখন হিংসে হতো ওর মনে। পরে আবার ভুলে গিয়ে নতুন করে তুমি হবার চেষ্টা করত। সুনন্দা, তুমি তোমার অজ্ঞাতেই অপুর শিশুমনে তোমার ছাপ চিরতরে গেঁথে দিয়েছিলে যার ভেতর থেকে ও আর বেরিয়ে আসতে পারে নি। হয়তো পারত যদি তোমাকে ভুলে যেতে পারত। কিন্তু সেটা ঘটেনি। তুমি কিন্তু অন্য আর সকলের মতই ওকে প্রায় ভুলেই গিয়েছিলে। অপু কিন্তু অন্য আর সকলের মতো নয়। আমি তো সায়কিয়াট্রিস্ট নই, তাই ঠিক বলতে পারব না এটাকেই স্প্লিট পারসোনালিটি বা কনফিউজড আইডেনটিটি বলে কিনা, তবে মনে হয় যে অপুর মনে তোমার মতো পোশাক, তোমার মতো গাড়ি করে এখানে-সেখানে যাওয়া, —মানে

তোমার লাইফস্টাইল খুব ছোটোবেলা থেকেই প্রচন্ড রেখাপাত করেছে, ওর নরম মনে এমন প্রভাব ফেলেছে যে বড়ো হয়েও সেটা মুছে ফেলা আর সম্ভব হয়নি। তাই ও মিথ্যে করে বানিয়ে বানিয়ে বাপের বাড়ির গল্প শুনিয়েছে সবাইকে। আর সেইসব স্বাচ্ছন্দ্য পাবার আশাতে অনেক ভুলও করে বসেছে। —মেয়েটার জন্য আমার খুব কষ্ট হচ্ছে সুনন্দা। সময়মত ওর রাশ টেনে ধরতে পারলে, অন্তত অত ছোটোবেলায় বাংলা-হিন্দি সিনেমার চটক থেকে ওকে দূরে রাখতে পারলেও হয়ত বা আলেয়ার পেছনে ছোটা বন্ধ করা যেত।'

—'সে সব তো লক্ষ্মীদিদা করেইনি মম। অপুর জীবন নষ্ট হবার জন্য লক্ষ্মীদিদাই দায়ী। ওদের পরিবারটাকেই লক্ষ্মীদিদা খারাপ করে দিয়েছে। তুমি জানো, অপুর ভাইরা কেউ লেখাপড়া শেখেনি। নবীনদাদু স্কুলের মাইনে দিয়ে যেতেন আর ওরা স্কুলে না গিয়ে সেই টাকায় যা-তা করত। একদিন এসেছিল মনে নেই? কেন এসেছিল জানো? চাকরি চাইতে। খেতে পাচ্ছে না, অভাব-অনটনে জেরবার অবস্থা। তাই দলবেঁধে নন্দুর কাছে চাকরি চাইতে এসেছে। আমি ভাগিয়ে দিয়েছি। কি চাকরি করবে ওরা? কোনও যোগ্যতাই তো নেই ওদের!'

ইন্দ্রাণী নন্দুর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলেন—'একটা কথা বললে রাগ করবে না তো সুনন্দা?'

নন্দু একটু আশ্চর্য হয়ে বলে —'রাগ করব? কেন মম?'

ইন্দ্রাণী বলেন—'আজ যেমন অপুর শেষ অবস্থা দেখে ঝাঁপিয়ে পড়েছ সেদিনও ভাগিয়ে না দিয়ে হাতটা এগিয়ে দিলে হয়তো একটা পরিবারের একটু সাশ্রয় হত। আমরা, বিশেষ করে বাঙালিরা উপায় থাকলেও সহজে কাউকে সাহায্য করতে চাই না। সেদিন যদি আমাকে জানাতে তাহলে ওদের শিক্ষাগত যোগ্যতার উপযুক্ত কোনো কাজে লাগিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারতাম। মাসে সামান্য দু-আড়াইহাজার টাকার বন্দোবস্ত হলেই ওদের সংসারে হাসি ফুটত। হয়তো ছেলেমেয়েগুলো আবার পড়ার সুযোগ পেত।'

নন্দুর খুব লজ্জা হয়। কোনও মতে বলে—'আমি এসব ব্যাপারে তোমাদের জড়াতে চাইনি মম। তাছাড়া ওরা একবার প্রশ্রয় পেলে বারবার আরও পাবার আশায় এসে এসে বিরক্ত করত। আমি ওদের চিনি। ভবিষ্যতে অনেক ঝঞ্ঝাট এড়ানোর জন্য আমি প্রথমদিনই না বলেছিলাম। তথাগতও আমাকে সাবধান করে দিয়েছিল মম। বলেছিল বেশি প্রশ্রয় দিও না। এদের হাঁ করা মুখে ঢেলে ঢেলে তুমি ক্লান্ত হযে যাবে। কিন্তু ওদের হাঁ-মুখ বন্ধ হবে না কখনও। নিজের প্রচেষ্টায় এরা কিছু করতে চায় না অন্যের দয়ায় বেঁচে থাকতে চায় এই শ্রেণির মানুষরা।'

—'বান্টুদের ওই রকমই কথা। একবার সাহায্য করলে দোষের কি হয়? যখন দেখব সাহায্য পাবার পরেও তারমধ্যে কোনও উদ্যম নেই কিছু করে দেখাবার তখন তাকে পরিষ্কার বলা যায় যে তোমাকে তো আমি স্কোপ দিয়েছিলাম, তুমি সেটা কাজে লাগাতে

পারনি। বারবার তো স্কোপ আসে না জীবনে। প্রথমবার আছাড় খেয়ে পড়লে তাকে হাতধরে তুলে বলে দিতে — দেখেশুনে হেঁটো। বারবার আছাড় খেলে তো আমি বারবার তোমাকে তুলতে আসব না। সেই প্রথমবারটাই অনেকের জীবনে মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। বান্টুরা যে কি? এটুকুও করতে চায় না একজন মানুষ হয়ে আর একজন মানুষের জন্য।'

নন্দু তাড়াতাড়ি তথাগতকে ডিফেন্ড করতে চেষ্টা করে—'ওরও দোষ নেই মম। অপু আর অমিতের সম্পর্কটা জানার পর আমি নিজেই ক্ষমা করতে পারছিলাম না অপুকে। এখানে ওর আসাও বন্ধ করেছিলাম। তথাগত বরং বলেছিল—হাজার হলেও বন্ধু, এভাবে ফিরে যায় এসে এসে এটা ঠিক নয়। আসতে চায় মাঝে মাঝে তো আসুক না। তুমি সাবধানে থাকলেই তো হল। ওর নোংরামিতে তুমি তো আর নিজেকে ইনভলভ করছ না। —আমিই সরে এসেছিলাম অপুর সংশ্রব থেকে। আর সেজন্যই যাতে কোনও ভাবেই অপু বা ওর পরিবারের কারও সাথে যোগাযোগ না হয় সেটাও আর একটা কারণ ছিল সজলকাকু, কাজলকাকুদের ছেলেদের চাকরি-ফাকরি দিতে পারব না বলে দেওয়ার পেছনে।' ইন্দ্রাণী নন্দুর চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে বলেন—'অমিতের সঙ্গে অপুর সম্পর্কটা তোমাদের এত খারাপ কেন লেগেছে সুনন্দা? একবারও কেন মনে হয়নি যে ষোলো সতেরো বছরের একটা তাজা মেয়ে একজন তাজা পুরুষকেই সাথী করে পেতে চাইতে পারে? জোর করে এত বয়সের ব্যবধানে একজন রুগ্ন মানুষের সঙ্গে বিয়ে দিলে সে বিয়ে তো কখনই সুখের হবে না। বিদেশে দেখেছি ভালোবেসে এরকম বিয়ে হয়, তারা বেশ সুখে থাকেও। সেটা তো যার যার নিজস্ব মানসিকতা। আমার কিন্তু অপু-অমিতের সম্পর্কটা অস্বাভাবিক লাগেনি, বরং এটাই ঘটার সম্ভাবনা ছিল বলে মনে হয়েছে। অপুকে কেউ ঠিকমতো কোনও সামাজিক শিক্ষা দেয়নি যার ফলে ছোটোবেলায় নানা ভুলভ্রান্তি করেছে। কিন্তু যে বয়সে একটি মেয়ে তার জীবনসাথী কেমন হবে এ নিয়ে কল্পনায় বিভোর থাকে ঠিক সেই সময় যার সঙ্গে ওর বিয়ে দেওয়া হল সেই পুরুষটি ওর কল্পনার ধারে কাছেও আসে না। মাই গড্! ষোলোর সঙ্গে এক ছত্রিশ বছরের, অস্বাস্থ্যবান পুরুষের বিয়ে? ভাবতেও পারছি না। — না সুনন্দা, আমি তোমার বন্ধুকে কোনও ভাবেই কনডেম করতে পারছি না, ও যা করেছে সেটাই স্বাভাবিক। ও সুন্দরভাবে বাঁচতে চেয়েছিল, ওর সামনে বাঁচার জন্য অন্য কোনও রাস্তা সে সময় খোলা ছিল না। তাছাড়া, ও শুধুই শরীর সর্বস্ব মেয়ে ছিল না। অমিতই একজন পুরুষ ওর জীবনে যাকে ও ভালোবেসেছে। তুমি তো বলছ ও বলেছে মৃত্যু শয্যায় শুয়েও এখনও অমিতের একবারটি আসার অপেক্ষা করে ও। তাহলেই ভাবো কতটা ভালোবাসা ওর আছে অমিতের জন্য।

নন্দু চুপ করে শোনে। ইন্দ্রাণীকে ও জানত, চিনত। কিন্তু আজকের চেনা ইন্দ্রাণীকে

ও আগে চিনতো না। ইন্দ্রাণী নন্দুদের মতো সাধারণ চিন্তাধারার মানুষের চেয়ে ঊর্ধ্বে শুধু নন, অনেক অনেক ঊর্ধ্বে। যাঁর নাগাল পাওয়া মুশকিল।—

—'শোন সুনন্দা, অপুকে নিয়ে যে কাজটা তুমি শুরু করেছ এটাকে আরও অনেকের জন্য ছড়িয়ে দিও আগামী দিনে। দেখবে নিজেকে কত পবিত্র মনে হবে। জপ-তপ না করেও ঈশ্বরকে এদের মধ্যেই খুঁজে পাবে।'

ইন্দ্রাণী উঠে চলে যান মর্নিংগ্লোরির টেবিল ছেড়ে। নন্দুর কানে গুনগুন করে বাজতে থাকে ওঁর বলা কথাগুলো। মনে মনে বলে — আমি কি ঠিক তোমার মতো কখনও হতে পারব মম? আমিও যে একেবারে সাধারণ একটা মেয়েই । ভাগ্যক্রমে ধনী পরিবারে জন্ম হয়েছিল বলে উচ্চশিক্ষা পেয়েছি, লোকে দেখে যাদের 'মানুষ হয়েছে' বলে সেটুকুই হতে পেরেছি। কিন্তু তোমার মতো সত্যিকারের মনুষ্যত্ব আমার কতটুকু আছে? নিন্দে আর সমালোচনা করার ওপরেই উঠতে পারলাম না এখনও। তবে চেষ্টা করব মম তোমার কথা রাখার।

* * * * *

কিচেনের কাজ তাড়াতাড়ি সেরে অপুর জন্য খাবার দাবার গুছিয়ে নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছতে একটু দেরিই হয়ে গেল আজ। কেবিনে ঢুকে দেখে আজ অপুর ভিজিটার এসেছে। রোগা, ফর্সা, একজন বয়স্ক বিধবা মহিলা বসে কাঁদছেন আর পাশে দাঁড়িয়ে অপুর দাদা সেই কাজলকাকু। নন্দুও যেমন ওদের দেখে থমকে দাঁড়িয়েছে ওরাও তেমনি নন্দুকে দেখে থমকে গেছে। নন্দু নিজেই কাজলকে বলে—'কাজলকাকু না?' নিজেকে সামলে কাজল বলে—'তুই ভুলিসনি নন্দু? এই দ্যাখো বড়দি এই নন্দু। আদিত্যদার মেয়ে।' নন্দু বিস্মিত হয়ে সেই সুন্দর যুথীপিসির ধ্বংসাবশেষ দেখে। প্রণাম করার কথাও মনে পড়ে না ওর। অস্ফুট স্বরে বলে —'যুথীপিসি, তুমি?'

একটা পা খোঁড়া যুথী উঠে দাঁড়িয়ে এক পা এগিয়ে আসে—'নন্দু আয়, আমার কাছে আয়। তোকে দুহাত ভরে আশীর্বাদ করি। অপুর মুখে সব শুনলাম।'

নন্দু ওসব কথার ধার দিয়েও গেল না। ওর দেখা যুথীপিসির সঙ্গে সামনে দাঁড়ানো মানুষটার অমিল দেখছিল ও। শরীর, মন সবকিছু ভেঙে যাওয়ার ছাপমারা চেহারায় এ কোন যুথীপিসি? কই ওর বাবা তো এমন বুড়োটে হয়ে যায়নি! চেনাই দুঃসাধ্য হত কেউ না বলে দিলে। সামলে নিয়ে এতক্ষণে নিচু হয়ে প্রণাম করল ও। মুখে বললো—'তোমরা কতক্ষণ এসেছ? আমার আজ দেরি হয়ে গেছে আসতে।'

যুথী আঁচলে চোখ মুছে বলল---'গতকাল জামালপুর থেকে এসেছি কাজলের ফোন পেয়ে। আজ এই একটু আগেই এসেছি। কোমর, পা ভেঙে তো খোঁড়া হয়ে আছি, ইচ্ছে হলেও যখন তখন আর আসতে পারি না। এসে যে অপুকে এই অবস্থায় দেখব--- বলে আবার কেঁদে ফেলে যুথীপিসি।

অপু এতক্ষণ কোনও কথা বলেনি, এবার ফোড়ন কাটল —'ভালোই করেছ বড়দি আগে না এসে। তাহলে পচা গন্ধে ওই বারান্দা থেকে চলে যেতে। কি রে কাজলদা, মাস খানেক আগে তুই একদিন দেখতে এসে টিকতে না পেরে 'কাজ আছে' বলে পালিয়ে ছিলি মনে আছে? তার পর আজ এলি বড়দিকে নিয়ে। নন্দু কিন্তু ওই গন্ধের মধ্যেই বসেছিল, জল খাইয়েছিল। আর দু-চারদিন সবুর কর। অপুকে আর দেখতে পাবি না।

—'আহ অপু। এসব কি হচ্ছে?' —নন্দু থামিয়ে দেয়। অপুও বাধ্য মেয়ের মতো চুপ করে থাকে এবার। আর যুথীপিসি, কাজলকাকু—দুজনেই নন্দুকে সাক্ষী রেখে যার যার আসতে না পারার কারণ ব্যাখ্যা করতে ব্যস্ত হয়। নন্দু বুঝতে পারে কাজলকাকুকে ডিউটির পরেও ওভারটাইম করতে হয় দুটো বেশি পয়সা আয়ের জন্য। মাসে কয়েকবার করে মনসাতলা থেকে এতদূরে আসা সম্ভব হয় না ওর। যুথীপিসি লাঠি ভর দিয়ে চলে। জামালপুর থেকে ওর পক্ষেও হুটহাট চলে আসার অসুবিধে আছে কারণ নিয়ে আসার লোক নেই। মেয়ের জামাইয়েরও ক্যান্সার, মেয়ে চাকরি করতে যায়। কে নিয়ে আসবে? নন্দু বোঝে কিন্তু অপু বোঝে না। অভিমান চোখের জল হয়ে কোটরের ভেতরের পাথরকুচি চোখ দুটো থেকে নিঃশব্দে গড়িয়ে আসে কানের লতিতে।

যুথীপিসির কান্না, হা-হুতাশ আর কাজলকাকুর দুঃখী করুণ মুখ করে বসে বসে সবচেয়ে ছোটো বোনের সবচেয়ে আগে চলে যাওয়ার বেদনাবোধ যে নকল নয় বোঝে নন্দু। এরই ফাঁকে ফাঁকে টুকরো কথায় দুই ভাই-বোনের আক্ষেপ-অনুশোচনাও প্রকাশ হয়ে পড়ছিল। কেবিনের ভেতরের পরিবেশটাই যেন শোকগ্রস্থ হয়ে উঠেছে। অপু তো এখনও বেঁচে আছে, ও মারা যাবার আগেই ওর সামনে বসে এত কান্নাকাটি করে শোকপ্রকাশ করা নন্দুর একটুও ভালো লাগছিল না। নার্সটাও নেই ঘরে যে ইশারায় এদের বাইরে নিয়ে যেতে বলবে! হঠাৎ ইন্দ্রাণীর কথা মনে পড়ে যায়। কাজলকাকুর ছেলেটার চাকরি হয়েছে কোথাও? যদি না হয়ে থাকে এখনও? এতবছর কি আর বেকার রয়েছে? তবুও একবার জিজ্ঞেস করেই দেখি না।

—'কাজলকাকু, একটু বাইরে আসবে?'

—'হ্যাঁ হ্যাঁ। চল।' —কাজল আর নন্দু কেবিন থেকে বারান্দায় বেরিয়ে আসে। বারান্দা দিয়ে লোক যাতায়াত করছে অনবরত। কেউ জেনারেল ওয়ার্ডে পেশেন্ট দেখতে ঢুকছে হাতে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগে ফল নিয়ে আবার কেউ কেউ ভিজিট শেষ করে শুকনো মুখে বেরিয়ে যাচ্ছে। নন্দু ভাবে এই ক্যান্সার ওয়ার্ডে কেউই বোধহয় আজ অবধি হাসি নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে নি। নিশ্চিন্ত মৃত্যুর মুখে প্রিয়জনকে রেখে বাড়ি ফিরে গিয়েও কি আর শান্তিতে থাকে? দুশ্চিন্তা, অনিদ্রা, পরদিন আবার ছুটে আসার চিন্তা, সারাক্ষণই তো একটা কী হয় কী হয় ভয় তাড়া করতে থাকে পরিবারের অন্য মানুষগুলোকে।

যার রোগটা হয় সেও মরে আর মরবার জন্যে রেখে যায় মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোকে। চিকিৎসার খরচের যাঁতাকলে পিষে অযথা জেনেও কেউই তো বিনা চিকিৎসায় মরতেও দিতে পারে না আপনজনকে।

—'আয় নন্দু এখানটায় দাঁড়াই।' — কাজলকাকু রেলিংয়ের ধারে একটা ফাঁকা জায়গা পেয়েছে।

—'কাজলকাকু, ডাক্তাররা কিন্তু শেষ কথা জানিয়ে দিয়েছে। আর বেশি সময় নেই ওর হাতে। আমি জানি কত অসুবিধা হবে হয়তো তোমাদের এখানে রোজ রোজ আসতে তবুও বলছি, এই শেষ সময়টা তোমরা ওর কাছে এলে ওর মনে শান্তি আসবে। ও খুব অভিমানী জানোই তো!'

কাজলের চোখ সজল হয়ে আসে। বলে —'একমাস আগে এসেছিলাম মাইনে পেয়ে হরলিকস, ফল, ও যেসব মিষ্টি খেতে ভালোবাসে সেসব নিয়ে। তখনও এত তাড়াতাড়ি ওর পচন বেড়ে যাবে ভাবতেও পারিনি। গন্ধ বের হচ্ছিল, কিন্তু এত খারাপ অবস্থা ছিল না। আবার মাইনে পেয়ে ওর জন্য কিছু নিয়ে আসব ভেবে আসিনি। মেজদা, মনা ওরা একবার করে এসে দেখে গেছে তবে রোজ আসতে পারে না কেউই । প্রায় সাড়ে তিনমাস হল হাসপাতালে। আর তো অপু বাড়ি ফিরে যেতে পারবে না কোনোদিন।' পকেট থেকে আধময়লা রুমাল বের করে কাজল চোখ মোছে তারপর আবার বলে — 'ও আমাদের সকলের জন্য ভাবতো, আমাদের দুর্দিনে সাহায্য করত। ঝাড়া হাত-পা ছিল তাই যতটা সম্ভব করেছে। কিন্তু আমরাই কিছু করতে পারিনি ওর জন্য। ওর বর মেজদা যেদিন এসেছিল সেদিন শুনিয়ে দিয়েছে—এখন আর আপনারা আসবেন কেন? অপুর তো আপনাদের দেবার মতো আর কিছু নেই। —জানিস নন্দু মেজদা সেদিন বাড়ি গিয়ে কেঁদেছিল, নিজেদের অক্ষমতাকে গালাগাল করেছিল। শশধরবাবু এটুকুও বুঝলেন না যে অপু আমাদের দশ ভাইবোনের মধ্যে সবচেয়ে ছোটো। ও কত আদরের ছিল আমাদের কাছে! মনসাতলা থেকে এখানে যাওয়া-আসা করতে একজনের প্রায় তিরিশ টাকার কাছাকাছি খরচ হয়। রোজ এটা করা কি আমাদের পক্ষে সম্ভব? তাছাড়া, বিগত তিন-চার বছর অপু আমাদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখতে চায়নি। আসা -যাওয়াই বন্ধ করে দিয়েছিল। আমরা ওর খবর কিছুই জানতাম না।

শশধরবাবু এত রেগে আছেন আমাদের ওপর যে একটা খবরও দেন নি। আমরা অন্য লোকের কাছে শুনে যখন এখানে এলাম তখন থেকেই তো অপুর এই অবস্থা। আর প্রথমে জানতে পারলেই বা কি হত বল? এ রোগের খরচ সামলাবার মতো ক্ষমতা আছে আমাদের?'

অবাক হয়ে নন্দু জিজ্ঞেস করে —'কেন কাজলকাকু, মনা-পুটুরা তো নিশ্চয়ই এতদিনে দাঁড়িয়ে গেছে। তুমিও এখন চাকরি করছ তাও এত অভাব কেন?'

কাজল মাথা নাড়ে —'না রে, নন্দু। মনা-পুটু যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়েছে। এদিকে সামনের ফেব্রুয়ারিতে আমিও রিটায়ার করব। আর আমি এখন ওসব নিয়ে ভাবি না। —যা হবার হবে।'

—'কাজলকাকু, মনা আর পুঁটুকে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবে? আজ তো শুক্রবার, সামনের সোমবার সকাল সাড়ে দশটায় এই কার্ড-এ লেখা অফিসে যেন আসে।' — নন্দু ওর পার্স ঘেঁটে কার্ড বের করতে করতে বলে।

কার্ডটা হাতে নিয়ে কাজল বোধহয় আর একবার কেঁদে ফেলবে বলে মনে হয় প্রথমে। অবিশ্বাস্য চোখে কার্ডটাকে দু-তিনবার পড়ে আর চোখ তুলে তাকায় নন্দুর দিকে বার বার। অবশেষে মুখে কথা ফোটে —'নন্দু ! তুই -তুই তাহলে সত্যিই ওদের চাকরি দিবি? এখানে দেখা করতে যখন বলেছিস নিজে থেকে তারমানে তো মনা-পুঁটু দুজনেরই চাকরি হবে! একসাথে ওদের দুজনের পারমানেন্ট চাকরি!—আ-আমি ভাবতে পারছি না রে।' —'কৃতজ্ঞ মুখটাতে খুশির আলো ফুটে ওঠে। স্মিত হাসিতে ভরে যায় মুখখানা।

কাজল কাকুর হাসিমুখটা দেখে নন্দু ওর একটু আগে বারান্দায় বেরিয়ে এসে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, দুঃখী দুঃখী ভিজিটরদেরকে দেখে যে ভাবনা ভেবেছিল মনে মনে সেই ভাবনাটা থেকে মুক্তি পায় যেন। আজ অন্ততঃ একজন মানুষ এই ক্যান্সার ওয়ার্ড থেকে মুখে হাসি নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারবে। যে যাবার সে তো চলে যাবে, অপুকে তো আমরা রাখতে পারব না। কিন্তু অনেকদিন আগে করা ওর একটা অনুরোধ কিছু দেরিতে হলেও আজ রাখতে পেরে যারা বেঁচে আছে আধমরার মতো তাদের অন্তত সুস্থভাবে বেঁচে থাকার একটা উপায় হল। একটা পরিবারের মুখে হাসি ফোটানো গেল। একটা অপরাধের বোঝা হালকা হল। নন্দুর নিজের মনটাই কেমন অনানুভূত আনন্দে ভরে যায় একটু উপকার করতে পেরে।

—'নন্দু, চল ভেতরে। অপুকে আর বড়দিকে গিয়ে বলি। এই অপুই তো তোর বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল মনা-পুঁটুদের যদি একটা পিওনের চাকরিও দিস সেই আশায়। জানিস, সেদিন ও একেবারে স্থির নিশ্চিত হয়ে নিয়ে গিয়েছিল আমাদের। —যাকগে যাক, ওসব কথা। চল এখন ওকে গিয়ে বলি তুই ওর বিশ্বাসের মর্যাদা দিয়েছিস। মরেও শান্তি পাবে অপুটা। ওর যে তোর প্রতি কি মোহ, কি আস্থা ছিল সারাজীবন তুই সেসব জানিস না নন্দু।'

আজ ওর আর অপুর আত্মকাহিনি শোনা হলো না সকালে । বিকেলেও মুখুজ্জেমশাই আসবেন। সূর্য এখন আসে না। একদিনই দেখেছিল। কেন কি জানি। হয়তো নার্স অপুর কাজগুলো করে দিচ্ছে বলে সূর্যকে আর আনেন না মুখুজ্যেমশাই। কিংবা এও হতে পারে যে নন্দু সূর্যকে অমিতের ছেলে বলে ফেলাতে মুখুজ্জেমশাই সূর্যর আইডেন্টিটি ফাঁস হয়ে যাবার ভয়ে আর ওকে নিয়ে আসছেন না। তবে কি সূর্যকে অপুর বাপের বাড়ির লোকরাও দেখেনি নাকি?— ফিরে আসার পথে এসব প্রশ্নগুলো খোঁচাতে থাকে ওর মনকে। কেমন যেন একটা রহস্যময় নাটকীয়তা ঘিরে আছে অপুর জীবনে। আর যে নন্দু আগে এসব শুনতে চাইত না সেইএখন পুরোটা শোনার জন্যই উদগ্রীব হয়ে থাকে।

যুথীপিসি যে এখনও নন্দুকে ভালোবাসে, রায়চৌধুরি বাড়ির প্রতি এখনও যে কতটা আনগত্য আছে সেটা আজও কথাবার্তায় প্রকাশ পেয়েছে। নন্দু এটাও আজ বুঝতে পেরেছে যে অপু যতই বড়দির দোষ দেখুক না কেন যুথীপিসি অনন্যোপায় হয়েই অপুকে শশধর মুখার্জির সঙ্গে বিয়ে দিয়ে খোঁয়াড়ে বেঁধে রাখার চেষ্টা করেছিল। অপুর প্রতি ভালোবাসা নেই একথাটা ঠিক নয়। বেলা এগারোটার পর নন্দু এসে থেকে দেখেছে দুপুর সাড়ে বারোটা পর্যন্ত যুথীপিসির চোখের জল বাধা মানেনি। কাজলকাকুর সঙ্গে বারান্দা থেকে কেবিনে এসে ঢোকার সময় নন্দু শুনেছিল যুথীপিসি অপুর মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলছে—'তুই চিরকাল আমাকে দায়ী করেছিস অপু। ভেবেছিস তোকে আমি ভালোবাসি না । মা-ও এরকমই ভাবতো। না রে অপু। ভালোবাসতাম বলেই তোকে বাঁচাবার চেষ্টা ছিল আমাব। তুই যেভাবে গড়গড়িয়ে নীচের দিকে পড়ছিলি সেটাই আটকাতে চেষ্টা করতাম আমি। সেটা যদি আমার দোষ হয় তাহলে ক্ষমা করে দিস অপু।' — আর ঠিক সেই সময়ই কাজলকাকু বলে উঠেছিল —'দ্যাখ অপু, নন্দু তোর কথা ফেলতে পারেনি। মনা আর পুঁটুকে চাকরি দেবে বলে সোমবার ওদের অফিসে ডেকেছে। ও ভেবেছিল এতদিনে মনাদের চাকরি হয়ে গেছে, আমাদের অবস্থা ফিরেছে, কিছুটা। আমাদের কথা জিজ্ঞেস করতেই বাইরে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। যখন শুনল আমাদের অবস্থা যথা পূর্বং সঙ্গে সঙ্গে নিজে থেকেই বলল। এই দ্যাখ কার্ড।'

অপুর দুটো চোখ নন্দুর দিকে স্থির হয়ে তাকিয়ে নিঃশব্দে অনেক কথা বলে চলল, যে কথাগুলো কেউ শুনল না, কেউ বুঝতে পারল না। ওরা শুধু এটুকুই বুঝল যে অপুর দুচোখে অনেক কৃতজ্ঞতা ঝরে পড়ছে। যুথীপিসি হঠাৎ করে হাউমাউ করে কেঁদে উঠে বলল—'নন্দু, আমি মনপ্রাণ দিয়ে চেয়েছিলুম অপু যেন তোর সঙ্গে ছোটোবেলা থেকে তোর মত, তোদের বাড়ির মতো হয়। আমার সে চাওয়া পূর্ণ হয়নি। সবাই ভেবেছে আমিই অপুর সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছি। এখন তো আমারই চলে যাবার সময় হয়েছে। কিন্তু অপু চলে যাবে এ যে আমি ভাবতে পারছি না আর!'

—'এখন আর ওসব বলে কি করবি বড়দি? আমি তো চলে যাচ্ছি অসময়ে। আর কাঁদিস না। তুই তো আর আমার ব্রেস্ট ক্যান্সারের জন্য দায়ী নোস। আমি নন্দুর মতো হতে না পারলেও দ্যাখ নন্দু আমাকে কখনও ঠকায়নি। আমার ব্যবহারে তখন রেগে গিয়েছিল ঠিকই কিন্তু এখন মরে যাচ্ছি দেখে ও যা করল আর তোদের ছোটোজামাই যা করল সেগুলোই আমার সারাজীবনের সবচেয়ে মূল্যবান পাওনা। অথচ দ্যাখ, নন্দুকে আমি হিংসে করতুম আর শশধর মুখুজ্জেকে ঘেন্না করতুম। আজ কিনা আমার শেষ সময়ে ওরা দুজনেই উজাড় করে সব দিয়ে শান্তিতে মরতে দিচ্ছে। যা কাজলদা, তোদেরও হিল্লে হয়ে গেল রে। —তবে, আমার মতো বোকামি করে ওর বাড়িতে আত্মীয়তা পাতাতে চলে যাস না যেন। দাতা আর গ্রহীতার সম্পর্কটা এক হয় না রে। এই ভুলটাই আমি বার বার করেছি জীবনে, তোরা আর করিস না।

সবাই চুপ। বেশি লেখাপড়া না জানা অপু যে এমন গুছিয়ে কথা বলতেও পারে সেটা জানা ছিল না নন্দুর। ওর মুখে সবসময় অমার্জিত শব্দরাই বেশি এসেছে আগে আগে। তবে কি মৃত্যুশয্যায় শুয়ে নিদারুণ যন্ত্রণার ভেতর থেকে জ্ঞানের বিকাশ ঘটছে ওর চেতনায়? আজ নন্দু নিজেও ওর সঙ্গে বেশি কথা বলতে পারেনি, যুথীপিসিই ওকে আগলে বসে আছে। অপু যুথীপিসি কে সহ্য করতে পারে না জানে নন্দু, কিন্তু আজ ও ওর স্বভাব বিরুদ্ধ নীরবতা অবলম্বন করে এতক্ষণ ধৈর্য্য ধরে যুথীপিসির আক্ষেপ, কান্না সব শুনেছে। —নন্দুর মনে হয এই প্রথম, একেবারে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অপু বদলে যাচ্ছে।

বিকেলে একটু তাড়াতাড়িই এল নন্দু কারণ আগামীকাল সকালে ও আসতে পারবে না। এসে দেখে সূর্য এসেছে একা, মুখুজ্জেমশাই আসেননি। ওকে দেখে সূর্য এই প্রথম ওর সঙ্গে কথা বলল —'বাবার আজ হাঁটুতে ব্যথা হয়েছে মাসি তাই আসতে পারেনি। তুমি এসে গেছ এবার আমি চলে যাব। অনেকক্ষণ আগেই এসেছি।'

নন্দু টুলে বসে বলল—'হ্যাঁ সূর্য, তুমি যাও। আমি এখন থাকব ছ'টা অব্দি। আর কেউ আসে নি?'

—'আর কেউ? কই না তো! আমি আর বাবাই তো আসি। আমাদের তো আর কেউ নেই মাসি, তুমি জানো না? বাবা তো আমাকেও আসতে দিতে চায় না। একাই আসতো আগে। বলে, হাসপাতালের পরিবেশে তোকে যেতে হবে না। বাবার শরীর খারাপ থাকলে আমি জোর করে সঙ্গে আসি। আজ একাই এসেছি ভিজিটিং আওয়ারের অনেক আগে। বাবা বলেই দিয়েছিল আগে আগে যাবি, দেখবি, ভিজিটিং আওয়ার শুরু হবার আগে বেরিয়ে আসবি। নন্দুমাসি ঠিক এসে যাবে।— তাহলে যাই?'

নন্দু আর এখন এদের কোনো কিছুতেই অবাক হয় না। ও হাসিমুখেই বলে —'হ্যাঁ। তুমি যাও।'

সূর্য চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অপু বলে ওঠে—'আজ আর বাপের বাড়ি থেকে কেউ না এলেই বাঁচি। সকালবেলাটা বড়দি এসে মড়াকান্না জুড়ে দিয়ে একেবারে নষ্ট করে দিয়ে গেল। আমার কথা শেষ করার জন্য ব্যাকুল হয়ে রয়েছি, তা তোর সঙ্গে একটা কথাও বলতে পারলাম না। — শোন, সূর্যর কথা বাপেরবাড়ি, শ্বশুরবাড়ির কেউ জানে না। বড়দি জানে শুধু। সেজন্যই তোর মুখুজ্জেমশাই ওকে এখানে আনতে চায় না। আমিও চাই না।'

—'আচ্ছা অপু সূর্যকে বড়ো করলি কি করে এমন লুকিয়ে লুকিয়ে?'

অপু করুণ হাসে। বলে—'জন্মের একুশদিন পর গোয়ার অনাথআশ্রমে তারপর অমিত কায়দা করে আমাকে ছেড়ে দেবার চেষ্টা করতে চাইল তখন অনেক কষ্টে ব্যারাকপুরের কাছে একটা অনাথ আশ্রমে নিয়ে এসেছিলাম আমি। মুখুজ্জেমশাইও জানত

না। —অমিতের বিয়ে ঠিক হয়ে গেল বর্ধমানে। মেয়ে এম. এ পাস, দেখতে সুন্দর, পয়সাওলা বাপ-বুঝলি?' —অপু কিভাবে চুপ করে। নন্দুও নীরবে অপেক্ষা করে থাকে।

পাখার ব্লেডগুলো মনযোগ দিয়ে নিরীক্ষণ করতে করতে বলে —'কোনও কুলে গিয়ে নোঙ্গর ফেলব বলে তো নৌকো ভাসাইনি। উচ্ছৃঙ্খল আনন্দে শুধু ভেসে যাবো বলে ভেসেছি। তখন বুঝিনি একদিন ঝড় উঠবে, ডুবে যেতে হবে। আর সেদিনই আমার অবিন্যস্ত জীবনের যাত্রা শেষ হবে। — বিয়ে হবার আগে থেকেই অমিত আমাকে আর ছুঁতো না। বোধহয় আত্মশুদ্ধি করছিল বউকে ছোঁবার জন্য। হেদুয়ার বাড়িতেও আসা বন্ধ করে দিল প্রায়। অপু আবার কিছুক্ষণ নীরব হয়ে থাকে। পুরোনো কথা ঘেঁটে বের করে দুঃখটাকেই বাড়ায় তবু বলে —'বিয়ে করে চলে যাবার আগে দুদিন এসেছিল হেদোয়। সে ও মামা যখন বাড়ি থাকে সেই সময়টা বেছে। আমিই সুযোগ খুঁজে কেঁদেকেটে বলেছিলাম—'বিয়ে হতে না হতেই এত পর করে দিলে আমাকে?'

গম্ভীর হয়ে বলেছিল —'পর তো তুমি নও, আমার মামি হও সম্পর্কে। পর কেন হবে? তবে আমাদের দুজনের মধ্যে যে গোপন সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল সেটা বজায় রাখা আমার দিক দিয়ে সম্ভব হবে না। ঝুমা আমার স্ত্রী। ওর অধিকার থেকে ওকে বঞ্চিত করার কোনও ইচ্ছে আমার নেই। একজনকে তো ত্যাগ করতেই হবে কারণ দু-জনের সঙ্গে একই সম্পর্ক করার মতো সাহস বা মানসিকতা আমার অন্তত নেই। ঝুমাকে গোয়ায় নিয়ে যাবার কথা হচ্ছে, এদিকে আমাকে পোর্টব্লেয়ারে বদলি হয়ে চলে যেতে হবে, ঝুমাও সঙ্গে যাবে পোর্টব্লেয়ারে। তোমাকে সিচুয়েশনটা বুঝতে হবে অপু।'

আমি বুঝতে চাইলাম না। ছোটো একটা অবুঝ মেয়ের হাত থেকে তার প্রিয় খেলনাটা কেড়ে নিলে যে ভাবে কাঁদে সেভাবেই কাঁদতে লাগলাম। অমিত চুপ করে বসে বসে আমার অস্থিরতা দেখতে লাগল। শেষে বলল—'আমি জানতাম তুমি আমার অবস্থাটা বুঝতে চাইবে না। আমাদের এখন সূর্যকে নিয়ে ভাবতে হবে অপু, কাঁদবার সময় নয় এটা।'

—'সূর্যর কথা?'

—'হ্যাঁ। সূর্যকে আর ওখানে রাখা যাবে না, এখানে নিয়ে আসতে হবে। ব্যারাকপুরে একটা ভালো আশ্রম আছে। সরকারি আশ্রমের মতো খারাপ নয়। বেশ ভালো ব্যবস্থা। আমি দেখে এসেছি, কথাও বলেছি। সূর্যকে ওখানেই রাখতে হবে।'

—'কিন্তু কেন ওকে নিয়ে আসতে হবে সেটাই বুঝতে পারছি না। তুমি কি সূর্যকেও অস্বীকার করতে চাইছ? ওর কোনো দায় তোমার নেই?'

—'না অপু? অস্বীকার করছি না, তুমি সেটা জানো। তবে ওকে তো আমরা সমাজের সামনে স্বীকারও করতে পারব না কখনও, এটাও তো সত্যি। ঝুমাকে মা আমার সঙ্গে গোয়া পাঠাতে চাইছে। এক্ষুনি সঙ্গে করে না নিয়ে গেলেও বাবা, মা ওকে আমার কাছে

পাঠাবেই। —জানি আমি। ঝুমা আর ওর বাবা-মাও সেটাই চাইবে। পানাজী একটা ছোটো শহর, একদিন না একদিন ঝুমা ঠিক ধরে ফেলবে। আমি সেই জন্যই সূর্যকে এখানে নিয়ে আসতে চাইছি। তুমি তাহলে প্রায়ই গিয়ে দেখে আসতে পারবে ওকে।' —'আমি সবই বুঝতে পারছি অমিত! ঝুমার মতো এম. এ. পাস শিক্ষিত মেয়ে না হলেও জীবনের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি আমি, তাই তোমার সমস্যাগুলো এবার বুঝতে পারছি আস্তে আস্তে। ঠিক আছে, তুমি যা চাইবে তাই হবে। কারণ এ পথে আমিই তোমাকে জোর করে নামিয়েছিলাম। তোমার কোনো দোষ ছিল না। তুমি ভালো শিক্ষা দীক্ষা পেয়েছিলে, ভালো ছেলে ছিলে, পবিত্র ছিলে। আমি তোমাকে কিশোর বয়সে ফুসলিয়ে নষ্ট করেছিলাম। কিন্তু তখন সেটা শুধুই কামনা ছিল আজ সেটা সত্যিকারের ভালোবাসা হয়ে গেছে, অমিত। মিথ্যে বলছি না। এত ভালোবাসা, যে তোমার সন্তানের মা হবার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিলাম। পরে কি ঘটবে কিচ্ছু ভাবিনি আমি। লেখাপড়া তো বেশি শিখিনি। তাই অংক কষে চলতে পারিনি। শুধু আবেগের বশে চলেছি। রাগ আর জেদকে প্রশ্রয় দিয়েছি শুধু। আর এসব করতে গিয়ে কতগুলো জীবন নিয়ে জুয়ো খেলে ফেলেছি। জীবনগুলো নষ্ট করে দিয়েছি। তোমার ছোটো মামা, তুমি, সূর্য, সবাই আমার ভুলের মাশুল গুনবে এ আর না হলেই ভালো হয়। তুমি বল কি ভাবে সূর্যকে এখানে আনতে হবে। তুমি যেভাবে বলবে সেভাবেই করব আমি। তুমি ঝুমাকে গ্রহণ করে ভালোই করেছ। অধিকার থেকে ওকে বঞ্চিত করো নি। আমি তো তোমার জীবনে অনধিকার প্রবেশ করেছিলাম, আমাকেই বেরিয়ে যেতে হবে। শুধু আমাকে ভুলে যেও না অমিত, আমাকে মনে রেখো এটুকুই আমার মিনতি। তা নাহলে আমি বাঁচব না।'

—'তারপর?'

—'আমি তো নির্লজ্জ, বেহায়া। তাই লজ্জাহীনা মেয়ের মতো উঠে এসে অমিতকে বুকে জড়িয়ে ধরে থাকলাম। চোখের জলে ওর বুকটা ভিজিয়ে দিয়েছিলাম আমি। ও চুপ করে বসে থাকল আমাকে না ছুঁয়ে। আর কোনো কথাও বলল না। বুঝলাম, ওর পথ আলাদা হয়েছে। এতগুলো বছরের সম্পর্ক কত সহজে ভেঙে গেল। অমিত নিরুপায়। বুকের নীচেটায় হাত রেখে থেমে থাকে অপু।

—'কি রে? ব্যথা হচ্ছে?' —জিজ্ঞেস করল নন্দু।

—'না। ব্যথা নয়, চিন চিন করছে। এটা কিছুই নয়—অনেক ব্যথা আমি সহ্য করেছি। শোন, তারপর। সেদিন আমরা ঠিক করলাম সূর্যকে ব্যারাকপুরে নিয়ে আসব। আমি যাব সাত দিনের জন্য কাউকে কিছু না বলে। মানে গোয়ায় নয়, অন্য কোথাও যাচ্ছি বলব মুখুজ্জেমশাইকে। অমিত ও এ যাত্রায় ঝুমাকে নিয়ে যাওয়াটা যেমন করেই হোক বন্ধ রাখবে।

এভাবেই সূর্যকে ব্যারাকপুরে আনলাম। কেউ কিছু জানল না। সূর্যের জন্য অনাথ আশ্রমে টাকা পাঠানোটা তখনও বন্ধ করেনি অমিত। সাত-আটমাস পর টাকা আসা বন্ধ।

আমি আর কখনও আমার জীবনে সূর্যের বাবা হিসেবেও পাইনি ওকে। যে সম্পর্কটা শুধু শরীরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল, বড়ো হয়ে উঠেছিল সযত্নে, সেটা শরীরের আকর্ষণ ছাড়িয়ে সত্যিই যেন আত্মার সম্পর্ক হয়ে পড়েছিল আমার কাছে। অমিত নিপুণ ভাবে মামি-ভাগ্নের দূরত্ব মেনে চলত তখন থেকে। হিংসে করিনি কখনও ঝুমাকে, তোকে ছুঁয়ে বলছি নন্দু। ওদের প্রথমে ছেলে হল। অমিত দুবছর পর আবার কলকাতায় বদলি হয়ে চলে এসেছিল। এখানেই ছেলে হল। এর কয়েকবছর পর মেয়ে হল। অমিত আবার আগের মতোই সবসময় আসত হেদোর বাড়িতে। বহুযুগ পরে যেন ও একটা দূষিত সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে সুস্থ জীবন ফিরে পেয়েছিল। ঠিক যে ভাবে মামা-মামির সাথে কথা বলতে হয়, মিশতে হয় সেভাবেই মিশত। তোর মুখুজ্জেমশাই যেন সবচেয়ে স্বস্তি পেয়েছিল অমিত ওর বউ-ছেলে-মেয়ে নিয়ে সুস্থ-সুন্দর বিবাহিত জীবন কাটাচ্ছে দেখে। আমার সঙ্গে যে ওর আর কোনো ভালোবাসার সম্পর্ক নেই সেটা আমি তোর মুখুজ্জেমশাইকে জানিয়েছিলাম। বলেছিলাম —'তোমাকে তো কখনও কিছু দিইনি আমি। আজ তোমার কথা রেখে অমিতকে ফিরিয়ে দিলাম। —তোর মুখুজ্জেমশাই আমার মাথায় হাত রেখেছিল জীবনে প্রথমবার আশীর্বাদের মতো। বলেছিল—'তুমি যে শেষপর্যন্ত অমিত আর ঝুমার জীবনটা বাঁচিয়ে দিয়েছ তার জন্য সারা জীবন আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে থাকব অপু। অমিত আমাদের তিন ভাইবোনের মধ্যে একমাত্র ছেলে। আমাদের বংশে অমিত ছাড়া আর তো কোনো সন্তান নেই মুখে আগুন দেবার জন্যও। জন্মের পর থেকে ওকে নিজের ছেলের দৃষ্টিতেই দেখেছি। ওকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছি, ও আমাদের সকলের বড়ো আদরের। তুমি যে শেষ পর্যন্ত ওকে মুক্তি দিয়েছ সে কথা আমি সারাজীবন মনে রাখব।'

—কিন্তু মনে মনে তো ওকেই ভালবাসি আমি। তার জন্য কিছু বলবে না' জিজ্ঞেস করলাম ছোবল মেরে। মনের তো দেখা পাওয়া যায় না অপু। কেউ কেউ সারাজীবন ধরে মনে মনে একজনকে ভালোবেসে যায়। কিন্তু যাকে ভালোবাসে সে জানতেও পারে না। মনের ওপর কারও কোনও জোর নেই। তাছাড়া কাউকে ভালোবাসাটা তো অন্যায় বা অপরাধ নয়। কিন্তু জোর খাটিয়ে সম্পর্কের বেড়া ভেঙে কাউকে শুধু সম্ভোগের জন্য ব্যবহার করাকে ভালোবাসা বলে না, সেটা ব্যভিচার। তুমি যা করেছ সেটা ভালোবাসা নয়, ব্যাভিচার। কতগুলো মানুষের জীবন নিয়ে তুমি ছেলেখেলা করেছ, নিরপরাধ কতগুলো সুন্দর জীবন তোমার বিষাক্ত সংস্পর্শে এসে নষ্ট হয়ে গেল। এ তো মারাত্মক অপরাধ অপু। আমি তোমার মনের মানুষ হতে পারিনি সেটা আমার অপরাধ নয়। তোমাকে জোর করে উঠিয়ে আনিনি আমি। আমাকে দেখেশুনে তোমার গার্জেনরা তোমাকে বিয়ে দিয়ে আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। আমার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিলে বলে ভয়ে তোমার ধারে কাছে ঘেঁষি না, তোমার এই ধারণাটা ভুল। আমার বয়স বেশি হতে পারে, স্বাস্থ্য তেমন ভালো নয় —সব সত্যি। কিন্তু আত্মমর্যাদা নেই তা কি কবে

ভাবলে তুমি? তোমাকে তোমার বাবা মা কোনো সুশিক্ষা দেননি। যে শিক্ষায় তুমি শিক্ষিত সেটাকে কু-শিক্ষা বলে। তার প্রমাণ তুমি পদে পদে দিয়েছ এবং দিচ্ছ। আমি আমার বউকে ইচ্ছে করলে জোর করেই বৈবাহিক সম্পর্কটা চালিয়ে যেতে পারতাম কিন্তু আমার মর্যাদাতে আঘাত লাগিয়ে কোনো কিছু পাওয়ার মতো লোভী নই আমি। তাই নিজের আত্মসম্মান নষ্ট করে তোমার মতো কু-শিক্ষিত মেয়ের কাছে মাথা নত করিনি। অমিত আমার সন্তানের মতো—সেই সুকুমার কিশোর বয়সে আমার ছেলের মতো ভাগ্নেটাকে তুমি টেনে পাঁকের মধ্যে নামিয়েছিলে তোমার যৌনকামনা পূর্ণ করার জন্য। —আসলে কি জানো? তোমার মতো মেয়েরা নিজেকে ছাড়া আর কাউকে কখনও ভালোবাসে না, বাসতে পারে না। তুমিও অমিতকে ভালোবাস না অপু। মনে মনে কল্পনা করো ভালোবাসো বলে, আর আত্মতৃপ্তি লাভ করো। লাভ-লোকসানের হিসেবটা তুমি অত্যন্ত ভালো বোঝো। — শোনো, তোমার প্রতি কোনো রকম আবেগ আমার নেই, যেটা আছে সেটা আমার দুর্ভাগ্যজনক পরিচয় —তোমার স্বামী। তোমার প্রতি আমার দায়িত্বপালনে কোনও ত্রুটি হবে না কখনও। জীবনের যে কোনও দুর্দশায় আর কেউ না থাকলেও আমি থাকব তোমার পাশে—ভয় নেই।'

—'নন্দু জানিস, অমিতকে আমি কিন্তু সত্যিই ভালোবাসতাম। আমার চরিত্র যারা কাছে থেকে দেখেছে তারা কেউ বিশ্বাস করবে না যদিও। তুই হয়তো তোর মুখুজ্জেমশাইর মতো ভাবছিস অপু কাউকে ভালোবাসতে পারে না। বাবা একটা সমকৃত কথা বলত ছেলেরা নাকি মামার মতো হয়। আমি

—'সমকৃত নয়, সংস্কৃত। নরানাং মাতুলক্রম।' — শুধরে দেয় নন্দু।

—'হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক এইকথাটাই বলত বাবা। অমিত ওর মামার মতোই ছিল। কখনও মিথ্যে কথা বলত না। কোনো ছল্-চাতুরি করতে পারত না। মিথ্যেকথা, ছলনা করা এগুলো ও খুব ঘেন্না করত। ইচ্ছে করলে ও কিন্তু ওর বাবা-মার কাছে আমাদের সম্পর্ক অস্বীকার করতে পারত। ওর বিয়ের পরও আমার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কটাকে জীইয়ে রাখতে পারত। আমি তো সেটাই চেয়েছিলাম। কিন্তু করেনি। ঠিক যেমন করে ওর বাবা-মার কাছে আমার কথা স্বীকার করেছিল —তেমনি করেই স্পষ্ট ভাষায় আমাকে বলেছিল বিয়ের পর একসঙ্গে দুজনের বিছানায় শোওয়া ওর পক্ষে অসম্ভব। বিয়ে যখন হয়েছে তখন ঝুমার সঙ্গেই ওকে থাকতে হবে, ওর প্রতি কোন অবহেলা, অন্যায় ও করবে না। তাতে আমি যত কষ্টই পাই না কেন?'

অপু জানালার দিকে তাকিয়ে উদাস হয়ে যায়। কি যেন একটা দেখছে গভীর মনোযোগ দিয়ে। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে নন্দু দেখে পাশের কার্নিশে দুটো পায়রা সঙ্গমলিপ্ত হয়েছে। ও মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে অপুকে বলে —'এরপর কি হল বল!'

—'আচ্ছা, এই পায়রা দুটো একে অন্যকে চেনে? ওরা কি ভালোবাসা বোঝে রে?

ভালোবেসে করছে নাকি ভালোবাসা ছাড়াই আমি যেমন হীরামন সৈকিয়ার সঙ্গে খেলার মতো করে করতাম সে রকম করছে?'

—'পায়রা নিয়ে আমি রিসার্চ করিনি অপু। তবে মনে হয় ওরা একে অন্যকে চেনে, ভালোওবাসে।

—'জানিস আমি কত খারাপ মেয়ে ছিলাম? সেই যে বড়দির সাধের দিন ওই ঘটনাটা ঘটেছিল তারপর মা আমাকে অনেক বুঝিয়েছিল, ভয় দেখিয়েছিল বিয়ে হবে না বলে, তবু যেমনি বড়দিরা চলে গেল ওমনি আমি আবার হীরামনের কাছে যেতাম। ওই কাজটা অবশ্য আর করেনি ও, ধরা পড়ার ভয়ে সিঁটিয়ে থাকত। তবে অন্য সবই করত। আমাদের চোদ্দো-পনেরো বছর বয়সে তুই যখন দার্জিলিং থেকে আসতিস তখন আমি তোর বুক দেখতাম। তোর তখন একটু একটু উঠেছে-পাতি লেবুর মতো আর আমার? হীরামনের নিত্যপ্রতিদিন টেপাটেপির চোটে কমলা লেবু হয়ে গেছে। মা টাইট টাইট সেমিজ বানিয়ে পরাতো আমাকে। তবু আটকে ছোটো করতে পারত না।' —হাসে অপু নিজের মনে। নন্দুর মুখে রক্তিমাভা জাগে ওর বর্ণনা শুনে। এ প্রসঙ্গ থামাবার জন্য বলে — 'তুই কোথা থেকে কোথায় চলে গেলি! বলছিলি অমিতের কথা—ও মিথ্যে কথা বলত না—এসব!'

—'না ওই পায়রা দুটোকে সবসময় দেখি শুয়ে শুয়ে। ওরা ছাড়া আমার তো সারাদিন আর সঙ্গী নেই কেউ। তুই আর ও আসলে কথা বলে বাঁচি। পায়রা দুটো সারাক্ষণ বকম-বকম করে আর ওই কর্ম করে, আর যেন কোনও কাজ নেই ওদের। এই দুটোকেই দেখি জানিস? তিন নম্বর বা অন্য আর একটার সঙ্গে ভালোবাসা করতে দেখি না। ওরা পশু-পক্ষী হয়েও কত সৎ দ্যাখ, আর আমি? আমার মতো অসৎ, দুঃশ্চরিত্র কটা আছে? অমিত মিথ্যে কথা বলত না, তোর মুখুজ্জেমশাই মিথ্যেকথা বলত না, বড়দি একেবারে ঠেকায় না পড়লে মিথ্যে বলত না, তুই মিথ্যে সহজে বলিস না —কিন্তু আমি কবে যে সত্য কথা বলেছি একমাত্র তোর কাছে ছাড়া জানিই না। ছোটোবেলা থেকে মিথ্যেকথা বলতে বলতে এমন রপ্ত করেছিলাম যে নিজের কাছেই নিজের মিথ্যেগুলো সত্যি বলে মনে হত। ঈর্ষা, লোভ, বড়োলোক হবার স্বপ্ন, চালিয়াতি—কোন বদগুণটা আমার ছিল না। তোর কাছেও কত মিছে কথা বলেছি এই ক'বছর আগেও বল?

অমিত ঝুমার কাছে মাঝে মাঝে যায়, বেশিরভাগ রাতেই আমার কাছে থাকে, অনেক পরে ওদের ছেলেপুলে হয়েছে, সিঁথির ফ্ল্যাটটা আমার জন্য কিনেছে —কত মিথ্যে! ওটা অমিত ঝুমার জন্য কিনেছে।' —অপুর কোঁচকানো গালে হালকা হাসির ভাঁজ ফুটলো।

—'তোদের নেমন্তন্ন করে ফাঁপরে পড়েছিলাম, হেদোর বাড়িতে বসতে দেবারও কিছু নেই। অমিতের পায়েই পড়তে হল। তোরা আসবি শুনে চাবির ডুপ্লিকেট দিয়ে দিল। ঝুমা সে সময় বর্ধমানে বাপের বাড়ি গিয়েছিল। আমার স্বভাব যাবে কোথায়? ঝুমার ফ্ল্যাটকে তোদের কাছে নিজের বলে চালাবার লোভটা সামলাতে পারলাম না। তুই শুনলে

বিশ্বাস করতে পারবি না—আমি সকলের কাছে নিজেকে সুনন্দা রায়চৌধুরি সাজিয়ে, আমার বাবাকে তোর দাদু অচ্যুতনারায়ণ সাজিয়ে গল্প ফেঁদে বসতাম। তোদের অগাধ ঐশ্বর্য্য, তোদের খাওয়া দাওয়া, চালচলন—সবকিছুর ওপর আমার আকর্ষণ ছিল, মারাত্মক লোভ ছিল। অমিতের কাছে গল্প করতাম আমার বাবার এতগুলো চা-বাগান ছিল —সিনেমা হল ছিল। মানে তোদের যতসব ছিল সবই আমার বাবার ছিল আর কি! আর তোরা ছিলি আমাদের ভাড়াটে। খুব গরিব ছিলি তোরা। বলতাম আমার বাবা মারা যাওয়ার পর দাদারা সব উড়িয়ে দিয়ে পথের ভিখিরি করেদিল তাই নিঃস্ব হয়ে আমাদেরকে মনসাতলায় আসতে হল। ডিব্রুগড়ে আমাদের বিশাল বাড়ির নাম ছিল ব্যানার্জি ভিলা। তুই আমাদের বাড়িতে আসতেই ভয় পেতিস। তোর সঙ্গে খেলতাম বলে বাড়িতে খুব বকত, বলত এতে আমার বাবার মান নষ্ট হয়। —নন্দু, আরও অনেক অনেক বাজে কথা যা শুনলে তুই সহ্য করতে পারবি না। নিজেকে রূপকথার রাজকন্যা বানাবার তীব্র আশা আমাকে বাধ্য করত এসব বলতে। আমি তো তখন স্বপ্নেও ভাবিনি যে আমাকে আবার ডিব্রুগড়ে যেতে হবে আর আমার সাধের বেড়াল বস্তা থেকে বেরিয়ে পড়ে ম্যাঁও করবে? একটু জল খাওয়াবি নন্দু?'

—'জানিস, ঝুমা আজও কিচ্ছু জানে না। ওদের বিয়ে হতে না হতেই তো অমিতের সঙ্গে সম্পর্ক চুকে গেল। দেখা প্রায় হতোই না। আমার পেছনেই অমিত ওর রোজগারের টাকা খরচ করে ফেলতো। আগে তো কিছুই ছিল না, ওর টাকাতেই শাড়ি-গয়না বানিয়েছি। আমার তো সবকিছুর ওপরেই লোভ লোভ আর লোভ ছিল। তোর শুনে বমি পাবে শাড়ি-গয়নার লোভে অমিত সরে যাবার পর অন্য পুরুষের সঙ্গ করেছি আমি। পুলিশের এক বড়ো কর্তা আর এক এম. পি-র সাথে কি করে যোগাযোগ হল সেসব আর বিশদে বলব না। যতদিন শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো ভালো ছিল এদের দুজনকে দুইয়ে-দুইয়ে খুব ভালো চলল। গাড়ি চড়া, প্লেনে চেপে দিল্লি যাওয়া, ভালো হোটেলে রানির মতো থাকা এসব হল। তবে খুব বেশিদিন নয়। আমিই ওদের কাছে পুরোনো হলাম—ছুঁড়ে ফেলে দিল। বড়োলোক হবার স্বপ্ন দেখতে দেখতে আমি সাপলুডোর সিঁড়ি ধরে শুধু নিচের দিকে নেমেছি। তুই আমাকে বেশ্যা বলতে পারিস, ভুল বলবি না' —নন্দু অবাক হয়ে ভাবে এ কাকে দেখছে ও? সত্যিই এ নবীনদাদুর মেয়ে?

—'জানিস, আমার ননদ আমাকে দুচোখে দেখতে পারত না। তবে ঘাঁটাতে সাহস পেত না পাছে ঝুমার সামনে অমিত আর আমার কথা ফাঁস টাস করে দিই! ননদ আমাকে এড়িয়ে চলত। ঝুমা আমার সঙ্গে মিশুক সেটা পছন্দ করত না । বেচারি ঝুমা! কিছু জানে না বলে আমাকে একেবারে মামিশাশুড়ির সম্মান দিত। ঝুমা আমার বাধ্য শ্রোতা ছিল। ওর কাছে ডিব্রুগড়ে বাবার রাজপাটের গল্প ফেঁদে নিজে বেশ উঁচু হয়ে থাকতাম ওর নজরে। ও সব বিশ্বাস করত। ওদিকে সেই এম. পি. আর পুলিশকর্তাকে বেশ ভালো করেই দুইয়েছিলাম বললাম তো। সূর্যের জন্য অমিতের কাছে দয়া চাইতে হয় না। ব্যাংকে

আমার নামে জমানো টাকা দিয়ে সূর্যর খরচ চলে যায়। ইদানীং ভান দেখাতাম অমিতের সামনে ওকে যেন আমার আর কোনো দরকার নেই। আমি ওর মামার সংসার ভালো স্ত্রীর মতো করছি। একদিন ডিব্রুগড়ের গল্প করতেই অমিত বলে উঠল—'যাবে ওখানে? চলো ঝুমা। দেখি ডিব্রুগড়ে ছোটমামার শ্বশুরবাড়ি, রাজপ্রাসাদ, চা-বাগান। কেউ না গেলেও আমি শালা যাবই যাব রূপকথা মেলাতে। ছোটোমামার শ্বশুরবাড়ির একটি লোকের গায়েও তো বাবা আভিজাত্যের গন্ধ পাইনি।

—'ওমা, আমি কি করে যাব এখন? ওদের পরীক্ষা শুরু হবে। তুমি ছোটমামির সঙ্গে যাও না! কতকাল তো যায়নি মামি। বলে দিল ঝুমা! অমিত তখন ওর মাকে ধরলো। —'মা তুমি চলো। তোমরা তো কেউ কখনও ছোটো মামার আসল শ্বশুরবাড়ি দেখলেই না। চলো এবার যাই। দেখে আসি মামির বাবার রাজত্বটা।'

—'তোর ছোটোমামার আসল শ্বশুরবাড়ি মনসাতলায়, আর সে আমাদের সকলেরই দেখা। ডিব্রুগড়ের রূপকথার গল্পগুলো তোর ছোটোমামি ছাড়া ওদের বাড়ির আর কারও কাছে তো কোনোদিন শুনিনি। ওদের শিক্ষাদীক্ষা বা ঐশ্বর্য্যের ছাপ তো কোনোদিন দেখলাম না ও বাড়ির লোকেদের মধ্যে। তোর ইচ্ছে হয়, তুই যা। আমাকে আর কেন?' —ননদ উঠে চলে গেল। সুযোগ পেয়ে দু-কথা শোনাতে ছাড়ল না আমাকে। অমিত ও বুঝিয়ে দিচ্ছে একই কথা। —'ঠিক আছে, কেউ না যাক্, আমি একলাই যাব' —রেগে গিয়ে বললো অমিত। —'মার সব কিছুতেই সন্দেহ। এরকমই তো হয়-ই। আজকের রাজা কালকের ফকির। মা এমন ভাব করল তুমি যেন সব বানিয়ে বানিয়ে গল্প করেছ। কি সত্যিই সব আছে তো?' —কটাক্ষ করে ও আমাকে।

—'তুমি একা কি করে যাবে? তোমাকে তো কেউ চেনেই না ওখানে।' — ঝুমা বলল —তাছাড়া ওখানে তো অসমীয়া ভাষায় কথা বলে সবাই। হ্যাঁগো ছোটোমামি, তুমি পারো ওই ভাষায় কথা বলতে।

—'আগে তো ওই ভাষাই মাতৃভাষার মত ছিল রে ঝুমা। এখন এক বর্ণও মনে নেই।' — বললাম আমি। ভয়ে গলা শুকিয়ে গেছে। সত্যি যদি যায় তাহলে কি হবে? ও কি জানে আমি মিথ্যে বলেছি?

—'আসাম খুব সুন্দর জায়গা শুনেছি। আর শিলং তো রূপে-গুণে একসময় মুসৌরীর সঙ্গে টেক্কা দিত —জানো? রবীন্দ্রনাথ ওঁর শেষের কবিতা শিলংয়ে বসে শিলংকে নিয়ে লিখেছিলেন। ইশ্, এদের পরীক্ষাগুলো না থাকলে আমি ঠিক যেতাম। তুমি ছোটোমামিকে নিয়ে যাও না, ঘুরে এসো। ছোটোমামির জন্মস্থান, ওখানেই বড়ো হয়েছে। তোমার খুব যেতে ইচ্ছে করে তাই না ছোটমামি? ঠিক আমার যেমন বর্ধমান যেতে ইচ্ছে করে।'

—'ও, এই সুযোগে বলে দিল যে বর্ধমান যাবে?'— অমিত বেশ হাসিমুখেই রসিকতা করে। আমি ওদের দুজনের মুখের সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম। তখন তো অনেকদিন পাব

হয়ে গেছে, অমিতআমার জীবন থেকে ছেঁটে গিয়ে ঝুমার জীবনের সঙ্গে জুড়ে গিয়েছে, তাই ওসব আর গায়ে লাগত না। শেষ পর্যন্ত আমাদের যাওয়া ঠিক হল, শুধু অমিত আর আমি। ডিব্রুগড়ে আবার কোনোদিন যাব স্বপ্নেও ভাবিনি। পঁচিশ বছর পর যাচ্ছি, কত পরিবর্তন হয়ে গেছে। ব্রহ্মপুত্র লঞ্চে পার হবার দিন শেষ। হুস্ হুস্ করে বিরাট ব্রিজের ওপর দিয়ে গৌহাটি পৌঁছে গেলাম। কামাখ্যার পাহাড় আলোয় আলো। আমাদের সময়কার অন্ধকার পাহাড় আর নেই রে। পরদিন সকালে ডিব্রুগড়ে পৌঁছে স্টেশনটা একরকমই প্রায় রয়েছে দেখলাম। আমরা রিক্সা করে সেই পুরনো অন্নপূর্ণা হোটেলে উঠেছিলাম। ডিব্রুগড়ে পৌঁছনোর পর থেকে জানিস, খুব ভয় করছিল। যদি আমার বলা মিথ্যে কথাগুলো অমিত জেনে যায়?। তাহলে ও কিছুতেই আমায় আর ক্ষমা করবে না। ওকে তো আমি চিনি। আমার দারিদ্র্য, আমার লেখাপড়া না জানা, মাঝে মাঝে নিজেকে জাহির করার জন্য একটু বেশি বেশি করে ফেলা, —এগুলো তবু ও মেনে নিয়েছিল। কিন্তু ওর আমার মাঝখানে আমি যে একটা মিথ্যের পাহাড় তৈরি করেছি এতগুলো বছর ধরে, —এটা ও মানবে না। মনে মনে শুধু ভগবানকে ডাকছিলাম পঁচিশ বছর আগের কথা যেন ওর সামনে কেউ না তোলে। ঠামাকে আমি ঠিক ম্যানেজ করে নেব। কিন্তু তোর মা, জেঠিমাদের কি বলব? ওনারা তো আমাকে পছন্দই করতেন না। অপু আবার জিরোয়।

—'সকালে পৌঁছে স্নানটান করে গেলাম রিভারসাইডয়ে। কতকটা বদলে গেছে, কিন্তু বেশিরভাগ বাড়িগুলো আগের মতোই রয়েছে। —ও হো, তোকে কি সব বলে চলেছি তখন থেকে? পাগল আমি। মার কাছে মামাবাড়ির গল্প করছি। তুই তো প্রায় যাস ওখানে।' — অপু থেমে কিছু ভাবতে থাকে আর হাঁফাতে থাকে।

—'তোদের বাড়ি একরকমই আছে। ঠামা তো দেখেই চিনে ফেলেছে আমাকে। বললো আমার মুখটা নাকি একটুও বদলায়নি । কি অবাক যে হয়েছিল ঠামা! ভাবতেই পারিনি জীবনে আবার কখনও ডিব্রুগড়ে যেতে পারি। খুব আদর করেছে রে, খুব! হোটেলে উঠেছি শুনে রাগ করল। গাড়ি করে হোটেল থেকে আমাদের নিয়ে চলে এলো বাড়িতে। জানিস, ওখানে গিয়ে মনে হচ্ছিল আবার সেই ছোটো অপু হয়ে গেছি। সারাক্ষণ ঘুরে বেড়াতাম আমাদের সেই সব পুরোনো জায়গাগুলোতে। বেজবড়ুয়াদের বাড়িতেও গিয়েছি। জানিস নন্দু, খুব আপশোশ হচ্ছিল ভেবে যে কেন আমরা কোলকাতা ফিরে গিয়েছিলাম! আমরা যে বাড়িটাতে থাকতাম সেখানে গিয়ে খুব কেঁদেছিলাম একা একা। বাবাকে, দাদাকে এবাড়িতে থাকতেই হারিয়েছি। বাবার লাগানো হিমসাগর আমের গাছটা বুড়ো হয়ে গেছে।' —অপু যেন কোথায় হারিয়ে গেছে এমনি অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। নন্দু অপেক্ষা করতে লাগল বসে। অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে, ওকে যেতে হবে। অথচ অপুকে সে কথা বললেই খেপে যাবে। ও আজই শেষ করবে ওর কাহিনি—জেদ

ধরে বসেছে। এতক্ষণ ধরে মাঝে মাঝে অল্প সময়ের জন্য থেমে থেমে বললেও ওকে বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছে। তবু ও বলবেই। এরকমই ছিল ছোটোবেলা থেকেই।

—'তোদের বাড়িতে পনেরো দিন ছিলাম। অমিতকে চা বাগানও ঘুরিয়ে দেখালাম। নদীর ধারের সেই জায়গাটাতে নিয়ে গিয়েছিলাম যেখানে তুই ডুবে যাচ্ছিলি। ও বাড়িতে তোর মা-বাবা, জেঠু-জেঠিমারা কিন্তু আমাদের বেশি আমলই দিল না। শুধু ঠামাই আপ্যায়ন করতো। খাবার টেবিলেও যখন আমরা খেতাম তখন তোর মা একবার একটু দেখা দিয়েই চলে যেত। জেঠুরা তো —'কি কেমন আছো'—র বেশি কথাই বলেনি। চলে আসার দিন দুপুরে ঘটে গেল ঘটনাটা। ঠামা আমাদের খাওয়াতে বসে হড় হড় করে বলে ফেলল সব কথা। ঠামার আর দোষ কি? ঠামা তো জানে না আমি অমিতদের সকলের কাছে গুছিয়ে মিথ্যে কাহিনি বানিয়ে বানিয়ে রচনা করে রেখেছি? আমার বাবার ডিব্রুগড়ে আসা থেকে আমাদের কোলকাতা ফিরে যাওয়া অব্দি সব ইতিহাস বলে চললো ঠামা। বেচারি ঠামা সরল মনে অপুর ভাগ্নের কাছে বলল, কাঁদল, কত দুঃখ করল মা'র জন্য। ফিরে আসার সময় অমিত সারাক্ষণ থমথমে মুখেই কাটালো পুরো দুদিনের জার্নিটা। কথা বলল না, আমার কথার উত্তর এড়িয়ে গেল। একটা মস্তবড়ো ঝড় উঠবে বুঝে ফেললাম। ভেতরে ভেতরে মরে যাচ্ছি ভয়ে, অমিত তো আমার কাছ থেকে অনেক দূরে সরেই গিয়েছিল, এবার কি একেবারে চলে যাবে? ওর বিয়ের পর থেকে আমাকে একদিনের জন্যও ছোঁয় নি ও। তবু আসা যাওয়া ছিল, কথাটুকু বলতো- ঠিক যেমন করে মামি-ভাগ্নে কথা বলে তেমনি করে। আমার মনে হতো ও যেন জোর করে মুছে ফেলতে চাইছিল আমাদের দুজনের ফেলে আসা সম্পর্কের সমস্ত স্মৃতি। হাওড়ায় পৌঁছে ও একটা ট্যাক্সি ডেকে আমাকে ওঠালো। হাতে কিছু টাকা ধরিয়ে দিয়ে বলল —' ভাড়া দিয়ে দিও।' — আলাদা ট্যাক্সি নিয়ে চলে গেল। যাবার রাস্তা একই, আমাকে নামিয়ে দিয়ে যেতে পারাটাই স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু সেটা করল না। বুঝিয়ে দিয়ে গেল পথ আলাদা হয়ে গেছে সারা জীবনের মতো।

—'ডিব্রুগড় থেকে ফিরে আসার পর এসেছিল তোর বাড়িতে?'—নন্দু জিজ্ঞেস করে।

—'আমি ফিরে এসেই বড়দির পা ভাঙা নিয়ে, বড়দির জামাইয়ের ভেলোর যাওয়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে রইলাম। ভেলোর থেকে ফিরে আসার পর একদিন দেখলাম এল। আমার সঙ্গে কথা বলল না। এমনকি তাকালো না পর্যন্ত। ওর ছোটোমামার সঙ্গেই কথা বলল। আমি চা-বানিয়ে সামনে দিলাম। চা অমনি পড়ে রইল, খায়নি। তারপরও দু'তিনবার এসেছে, কিন্তু ওই একই রকম ব্যবহার। একটা জিনিষ লক্ষ করেছিলাম যে আগে যেমন মুখুজ্জেমশাই যখন বাড়ি থাকত না, তখন আসতো, এখন ঠিক তার উলটো। ওকে একা একা পাচ্ছিলামই না যে ক্ষমা চাইব, বোঝাবো, বলব ভুল করেছি। আসলে ওকে হারাবার কথা ভাবতে গেলেই আমার মাথা খারাপ হবার জোগাড় হত। আমি বেহায়ার

মতো ও এলে যত্ন আত্তি করতে যেতাম। আর ও সে সব অগ্রাহ্য করে মামার সঙ্গে গল্প করে চলে যেত।'

আবার বিরাম দেয় ও।

—'তারপর তো তোর বাড়ি গেলাম— দেখলাম তোকে। তোদের আসতে বললাম। নিজের দীনতা তোদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়বে এটাও সহ্য করতে পারছিলাম না। শেষ পর্যন্ত জোর করেই কথা বলাতে বাধ্য করেছিলাম। তোর গল্প এত শুনেছে, ডিব্রুগড়ে গিয়েও সব দেখেশুনে এসেছে, তোকে দেখার একটা কৌতুহল ওর মধ্যে ছিল। এটাকেই কাজে লাগালাম। একদিন সকালে এসেছে। আমি সোজা গিয়ে বললাম—'নন্দু আর ওর বরকে নেমন্তন্ন করেছি। ওরা আসবে। এ বাড়িতে কি ওদের বসতে দেবার মতোও কিছু আছে? মাদুর পেতে বসতে দিতে তো পারব না। ডিব্রুগড়ে তো দেখে এসেছ ও কী বাড়ির মেয়ে! আর ওর আলিপুরের বাড়ি নিয়ে যাব একদিন দেখে এসো, ওদের ক'টা খাবার ঘর আছে। ওরা এলে মাটিতে বসে খেয়ে যাবে এখানে — তাতে তোমার ও মান বাড়বে না। ঠামার কাছে অনেক যত্ন পেয়ে এসেছ। দয়া করে তোমার বাড়ির একটা চাবি আমাকে দিও। যাতে ওরা এলে ওদের ও বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বসতে দিতে পারি। আর সেদিন এস নন্দুর সঙ্গে দেখা করতে। '—বলে চলে এলাম গট্ গট্ করে । পরদিন চাবি ফেলে দিয়ে গেল আর অন্যদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে যেন দেওয়ালকে শোনাচ্ছে এমনি করে বলল —'ঝুমা কিন্তু নেই, ওরা বর্ধমান গেছে একমাসের জন্য।' —খুশি হলাম ঝুমা নেই শুনে। তোর কাছে ফ্ল্যাটটা আমার বলে কত মিথ্যে কথা বলেছি রে!'

—'আমার তো সোনায় সোহাগা ভাব হল। ঝুমা থাকলে বরং একটু অসুবিধেই হত। মনের মতো করে তোদের আপ্যায়ন করতে পারতাম না! তোরা এলি। তারপর তো তোর সামনেই সব ঘটল। তোর কাছে সেই মিথ্যে কথা বললাম আবার । ওটা আমার বাড়ি। সত্যি রে নন্দু, এটা একটা রোগই ছিল আমার। যাক গে, তারপর কি হল শোন্। তোদের গাড়িতে তুলে দিয়ে ওপরে এসেই ও একটা বাঘের মতো আক্রমণ করল আমাকে। যে হাত এই শরীরটাকে শুধু আদর করেছে বহুদিন ধরে, সেই হাত অস্ত্র হয়ে আঘাত করতে লাগল আমাকে। সঙ্গে অশ্রাব্য গালাগাল। —'বদমাশ মেয়েছেলে, আমার বাড়িতে বসে মদ খাওয়া? এত বড়ো স্পর্দ্ধা! ঝুমা এ বাড়িকে মন্দির করে রেখেছে, আর সেই মন্দিরকে তোমার মতো একটা নোংরা মেয়েছেলের জন্য আজ অপবিত্র হতে হলো। ছি ছি ছি! আমি ভাবতে পারছি না—নন্দু আর তথাগত কি ভেবে গেল আমাকে আজ! আমার মানসম্মান সব নষ্ট করে দিয়েছ তুমি। এত নীচ, এত নোংরা তুমি! তোমার আসল স্থান কোথায় জানো? বেশ্যালয়ে। যাও সোনাগাছিতে গিয়ে ঘর নাও। ওদের ও বোধহয় কিছুটা ইজ্জৎ জ্ঞান থাকে। তোমার তাও নেই।'—বলছে আর মারছে আমাকে,

আবার কখনও নিজের চুল ছিঁড়ছে। একেবারে বদ্ধ পাগলের মতোই করছিল ও। ভয় করছিল আমার, এরকম রূপ তো কোনোদিন দেখিনি আমি। তারপর বলল—'সেই ছোটোবেলায় তুমি আমাকে নষ্ট করেছ, শরীর খুলে ধরতে তুমি আমার সামনে। পাঁকের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়েছ, হাজার চেষ্টা করেও বেরিয়ে আসতে পারছিলাম না আমি। কি করেছিলে তুমি? কোথাকার তুক্-তাক্ দিয়ে বশ করে রেখেছিলে আমাকে? ইশ্! আমার মা-কে বাবাকে কত দুঃখ দিয়েছি আমি এই তোমার জন্য! একটা মাত্র ছেলে আমি, তুমি ওদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলে আমাকে, আমার মাথাটা চিবিয়ে খেয়ে ফেলেছিলে সেই উনিশ বছর বয়সেই। বয়স হবার পর শুধু মনে হতো এই নোংরা জীবন থেকে মুক্তি পেতে চাই আমি। তোমার খপ্পর থেকে বেরিয়ে গিয়ে সুস্থ জীবনযাপন করতে চাই। কিন্তু তুমি ছাড়বে কেন? বিয়ে পর্যন্ত করতে দিতে চাওনি তুমি। পাছে তোমার হাতছাড়া হয়ে যাই। ইতর, নোংরা, খারাপ মেয়ে। আমি ছাড়াও অন্য পুরুষ সঙ্গ করতেও তুমি দ্বিধা করনি। বেশ্যার মতো টাকাপয়সা, গয়নাগাঁটি, নিয়েছ। তুমি কি মনে করেছিলে আমি তোমার খবর রাখতাম না? তুমি সল্টলেকে, দিল্লিতে অন্য পুরুষ সঙ্গ করতে আমি জানতাম। কুলটা মেয়েছেলে। আমাকে বেঁধে রাখার জন্য একমাত্র ওই শরীরটা ছাড়া আর কি ছিল তোমার? স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কি সে তুমি বুঝবে কি করে? তোমার তো স্বামীর দরকার নেই। শক্ত শরীরের যুবক বা কিশোর বয়সি ছেলে দরকার। আর দরকার টাকা। আমার রোজগারের বেশির ভাগটাই তো তোমার সংসার চালাতে খরচা করেছি। শরীর বিক্রি করে টাকা নিয়েছ তুমি আমার কাছ থেকে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক তাই করেছ। পাঁচমাস প্রেগন্যান্ট থাকার পর জানিয়ে ছিলে আমাকে, যাতে আমাকে পাকাপাকি ভাবে তোমার গোলাম বানিয়ে রাখতে পারো। যাতে ভবিষ্যতে ব্ল্যাকমেল করতে পার। —উঃ! অন্ধ করে রেখে দিয়েছিলে, একেবারে অন্ধ! আমি কিচ্ছু দেখতে পেতাম না, শুধু অন্ধকার ছাড়া। —আজ আমার চোখ খুলে গেছে। তোমার নাগপাশ কেটে বেরিয়ে এসেছি। জেনে রাখো আমি নিজের মুখে ঝুমাকে সব বলব, সূর্যর কথাও। যাতে তুমি ব্ল্যাকমেল করতে না পারো। হ্যাঁ বলব, সবাইকে বলে দেব তোমার সমস্ত কীর্তি-কাহিনি। আর কোনো ছেলের যেন সর্বনাশ করতে না পারো তুমি। উফ্। নোংরা নোংরা, কুৎসিত কুষ্ঠরোগী তুমি। যাও-যাও। বেরিয়ে যাও এখান থেকে। তুমি গেলে আমাকে এবাড়ি ধুতে হবে, পরিষ্কার করতে হবে। তুমি চলে যাও আমাকে মুক্তি দিয়ে। আমি সুস্থ সুন্দর পরিষ্কার জীবন চাই। যে জীবনে তোমার ছায়াও থাকবে না।' —উত্তেজিত হয়ে পড়েছে অপু।

—'জানিস, একেবারে পাগলের মতো করছিল ও। বের করে দিল বাড়ি থেকে ঘাড় ধরে ধাক্কা মেরে মেরে। ভীষণ একা, ভীষণ অসহায় মনে হতে লাগল। ওর বলা কথাগুলো পেরেকের মতো খোঁচাতে লাগল দিনরাত। ওর টাকার ওপর আমার কোনো অধিকার ছিল না? আমি শরীরের বদলে টাকা নিয়েছি? আমি যে ওকেই আমার স্বামী মনে করতাম

এ কথা ও জানে না? তাও এভাবে আমাকে কুকুরের মতো দূর দূর করে তাড়িয়ে দিল? —জানিস, প্রথমে ভেবেছিলাম প্রতিশোধ নেব। অমিত ঝুমাকে কিছুই বলবে না। ও এত বোকা নয়। আমিই ঝুমাকে বলে দেব সব। নষ্ট করে দেব ওদের সুখের সংসার। আমিই যদি সুখী হতে পারলাম না তবে ওদের কেন সুখী হতে দেব? ওর ছেলে-মেয়ের কাছে বলে দেব। যাতে জীবনে কোনোদিন আর ছেলেমেয়ের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে ও। আমি নোংরা, ইতর, কুলটা? —আবার মনে হল, ও যা যা বলেছে সবই তো অপ্রিয় সত্যি। ওর মতো একটা অত্যন্ত ভালো ছেলেকে কি ছলনা করেই না আমি বেঁধে ফেলেছিলাম! নোংরামির চূড়ান্ত করে, লালসার আগুনে সেঁকেছি আমি ওকে। ওর সুস্থ সুন্দর একটা জীবন হতে পারতো। আমি তা হতে দিইনি। নিজের স্বার্থের জন্য বিয়ে হোক এটাও চাইনি। সূর্যকে পৃথিবীতে আনার পেছনেও আমারই মাতৃত্ব লাভের স্বার্থ ছিল, অনেক নোংরামি ছিল বৈকি —ও যাতে বাঁধা থাকে আমার আঁচলে। আমার মত জীবন যারা বেছে নেয় তাদের তো এরকমই পরিণতি হবে—এটাই তো স্বাভাবিক। এখন ওর চোখ খুলেছে, সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চোখের আলোয় সব দেখছে বলে, আমার আঁচলের গিঁট খুলে চলে যাচ্ছে বলে ওকে শাস্তি দেবার কি কোনো অধিকার আমার আছে? ওকে যে ভালোবাসি আমি। যাকে ভালোবাসা যায় তাঁকে কি কষ্ট দেওয়া যায়? সেই দিনের পর থেকে গুম হয়ে থাকতে লাগলাম আমি। অনুশোচনার আগুনে ঝলসে যেতে থাকল আমার বুক। ঘর থেকে বের হতাম না, ভয় হত এই বোধহয় লোকে আঙুল তুলে বলবে—ওই যে যাচ্ছে একটা নোংরা, কুলটা মেয়েছেলে। মনে হত অমিত আমাকে কোনোদিনও ভালোবাসেনি, মোহের কাজল পরিয়ে রেখেছিলাম ওকে। কাজল ধুয়ে যেতেই ও আমার আসল রূপটা ধরে ফেলেছে। বুকের মধ্যে সারাক্ষণ একটা যন্ত্রণা হত ও আমাকে ঘেন্না করে, পতিতা ভাবে, সোনাগাছির মেয়ের সঙ্গে তুলনা করে এসব ভেবে ভেবে। জানতেও পারিনি কখন ক্যান্সারের বীজ ডালপালা ছড়িয়ে দিয়েছে আমার ক্ষতবিক্ষত বুকের ভেতর। যখন ধরা পড়ল তখন তো লাস্ট স্টেজ। তবু তোর মুখুজ্জেমশাই ভেলোরে নিয়ে গেল। একটা কেটে বাদ দিল ওরা। জানিস নন্দু, যেদিন আমার অপারেশন হল সেদিন একটুও দুঃখ হয়নি আমার। যাক্ চলে, কেটে ফেলুক এদুটোকে। এই সুন্দর শরীরের টোপ ফেলে আমি একটা নিষ্পাপ ছেলেকে পাপের পথে নামিয়ে ছিলাম। এ দুটোর ওপর ওর অসম্ভব আকর্ষণ ছিল। এত ভালো বুক থাকা সত্ত্বেও আমার সন্তানের কাজে আসেনি এগুলো। সূর্যকে দুধ খাওয়াতে পারিনি প্রাণভরে। একুশ দিন বয়সেই অনাথ আশ্রমে রেখে আসতে বাধ্য হয়েছিলাম। মনে হল —চলে যাক এদুটো মাংসপিন্ড। কি দাম আর আছে এগুলোর? শুধু সম্ভোগের কাজেই তো লেগেছে! স্তন্যদায়ী তো হতে পারে নি।'

—'তারপর?'— অপু এ প্রশ্নের জবাব দেয় না চট করে। কি যেন ভাবতে থাকে পাথরকুচি চোখদুটো দেওয়ালে রেখে।

—'তারপর কয়েকমাস পর অন্যটাতেও হল। আসলে ভেতরে ভেতরে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। মুখুজ্জেমশাই বোম্বেতেও নিয়ে গেল। ফেরত পাঠাল ওরা। আর কিছু করার ছিল না রে। মাংস পচতে শুরু করেছে তখন, পোকা হচ্ছে। বুঝলাম দিন শেষ হয়ে আসছে। সূর্যর চিন্তায় অস্থির হয়ে থাকতাম, ওকে কোথায় রেখে যাচ্ছি আমি? কে থাকবে ওর? আমাকে ছাড়া আর অন্য কাউকে তো ও চেনে না। একদিন তোর মুখুজ্জেমশাইকে হাত দুটো ধরে বলে ফেললাম। জীবনের সব পাপ, সব অপরাধ স্বীকার করলাম ওর কাছে। বললাম কি করে অমিতকে নষ্ট করেছিলাম। বললাম সূর্যর কথা। ও চুপ করে সব শুনে উঠে গেল বাইরে। কোনো কথা বলেনি, কোনো প্রশ্ন করেনি। সেদিন রাত্রে প্রথম চামড়া ফেটে প্রচুর রক্ত বেরোলো। তক্ষুণি অ্যাম্বুলেন্স ডেকে ভর্তি করে দিল এখানে। প্রথমে ওয়ার্ডে—তারপর বারান্দায় আবার কেবিনে তোর দয়ায়। হাসপাতালে আসার কয়েকদিন পর ব্যথায় চিৎকার করছিলাম। সে সময় তোর মুখুজ্জেমশাই এল। যন্ত্রণার মধ্যেই তাকিয়ে দেখি—যা দেখলাম বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। চোখে ভুল দেখছি না তো? চোখ রগড়ে রগড়ে আবার দেখলাম—সূর্য! মুখুজ্জেমশাইর পাশে দাঁড়িয়ে সূর্য!

সূর্য আমার অবস্থা দেখে কেঁদে ভাসাচ্ছিল। বলল—'কেন আমাকে জানাও নি তোমার অসুখের কথা? কেন বলোনি বাবা আছে আমার? এভাবে বাবা একা একা এতদিন ধরে তোমাকে নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করছে! সেবা করে যাচ্ছে আর আমাকে তোমরা কিছুই জানালে না?'

অবাক হয়ে তোর মুখুজ্জেমশাইর দিকে তাকিয়েছিলাম। —জানিস নন্দু এতগুলো বছর এক বাড়িতে থেকেছি। কোনো দিন ওকে হাসতে দেখিনি। হাসলে ওকে কেমন দেখায় সেটাই ধারণা ছিল না। সেদিন প্রথম ওর মুখে হাসি দেখলাম। স্বর্গের মতো সুন্দর পবিত্র হাসি। আমার জীবনের সমস্ত পাপের মধ্যে অজান্তেই হয়তো কোনো পূণ্য করে ফেলেছিলাম তাই অমন স্বর্গীয় হাসি দেখতে পেলাম ওই বৃদ্ধ মানুষটার ভাঙাচোরা মুখে।'

—'তার মানে সূর্য মুখুজ্জেমশাইকেই ওর বাবা বলে জানলো?' —থাকতে পারেনা নন্দু প্রশ্ন না করে।

—'হ্যাঁ। তোর মুখুজ্জেমশাই গিয়ে সূর্যের কাছে নিজেকেই ওর বাবা বলে পরিচয় দিয়েছে।'

—'সূর্য তোকে জিজ্ঞেস করেনি কেন বাবা মা থাকতেও ওকে অনাথ আশ্রমে রাখা হয়েছিল?'

—'আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করেনি। আমাকে তো ও ছোটোবেলা থেকেই চেনে ওর মা বলে। আগে যখন একটু জ্ঞান বুদ্ধি হয়েছে তখন জিজ্ঞেস করত। আমি ওকে এটুকুই বলেছিলাম যে ওর বাবা আছে। কিন্তু আমার এমন কিছু সমস্যা আছে যে আমি ওকে আশ্রমে রেখে পড়াতে বাধ্য হচ্ছি। বড়ো হলে সব বলব ওকে। ও প্রায়ই ওর বাবার

কথা জিজ্ঞেস করত তখন। বাবা কেন আসে না ওর সঙ্গে দেখা করতে, ওকে কেন আমি বাড়ি নিয়ে আসি না, —এসব সব প্রশ্নই করত। চালাকি করে রেখে ঢেকে উত্তর দিয়ে ভুলিয়ে রাখতাম ওকে। তবে ওকে আনতে গিয়ে তোব মুখুজ্জেমশাই ওকে বলেছে সূর্যর এত দিন ধরে অনাথ আশ্রমে পড়ে থাকার জন্য মুখুজ্জেমশাই দায়ী। সূর্য যেন ওর বাবাকে ক্ষমা করে দেয় ওর বাবা এতকাল ধরে ওকে কোনোদিন দেখতেও আসেনি বলে। সূর্য নাকি জিজ্ঞেস করেছিল কি রহস্য আছে যে ওর বাবা থাকা স্বত্ত্বেও ওকে অনাথ আশ্রমে থাকতে হল? মুখুজ্জেমশাই বলেছে নাকি এসব কথা বলার সময় নয়। এখন মা মৃত্যুশয্যায়। পরে সময়মতো একদিন বলবে কি, কারণে ওকে বাড়িতে রেখে মানুষ করতে পারেনি। তবে যা কিছু ঘটেছে তার জন্য মা দায়ী নয়।'

—'এসব কথা তোকে কে বলল? সূর্য?

—'না। আমি পরে মুখুজ্জেমশাইকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তখন ওই বলেছে। আমি বলেছিলাম সূর্যকে তো দেখতে হুবহু অমিতের মতো হয়েছে। ও যদি কখনও অমিতকে দেখে ফেলে তাহলে তো বুঝে ফেলবে সব। তখন কি হবে?' —তোর মুখুজ্জেমশাই বলেছিল — এজীবনে সূর্য আর অমিতের যাতে কখনও দেখা না হয় সে ব্যবস্থা আমি করব.। —নন্দু, আমার কাহিনি এখানেই শেষ। এখন শুধু মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করে চলেছি। আর শেষ বারের মতো একটিবার অমিতকে শুধু দেখতে চেয়েছি, কিন্তু ওকে আর দেখব না জানি আমি। সূর্যর মধ্যেই ওকে দেখি।' —অপু হাতটা তুলে এনে নন্দুর হাতে রাখে। বলে,—'খুব ঘেন্না করিস নন্দু, সবাইকে বলিস অপুর অধঃপতনের কথা। আমি চাই সবাই আমায় ঘেন্না করুক বিশেষ করে মুখুজ্জেমশাই। কিন্তু এই মানুষটার কাছেই আমি সব চেয়ে বেশি হেরে গেলাম। জীবনের মূল্যবান সময়টাতে ওকে হারতে দেখে খুব আত্মপ্রসাদ লাভ করতাম আমি। আর আজ জীবনের সবচেয়ে অসময়ে ওই মানুষটা আমার সারাজীবনের অহংকার চূর্ণ করে দিয়ে জিতে গেল। আমিই হেরেছি রে সব সময়, খুব জিতছি বলে যখন গর্ব করতাম তখনও কিন্তু হারছিলাম আমি। শুধু বুঝতে পারিনি নিজের হার কে। অমিতের কাছে, মুখুজ্জেমশাইর কাছে, জীবনের কাছে অপরাজিতার পরাজয় হল। —এবার যাবার পালা।'

পরদিন নন্দু হাসপাতালে গেল না। তারপর দিন সকালেও যেতে পারল না। ইন্দ্রাণী দিল্লি গেছেন। মিসেস গোমস্‌ও নেই। রুনার মার শরীর খাবাপ বলে রুনা দুদিনের ছুটি নিয়েছে। বাড়ি ছেড়ে বেরোতে পারল না ও। দ্বিতীয়দিন বিকেলের ভিজিটিং আওয়ারে অল্পসময় থাকবে ভেবে আসা ঠিক করল ও। একবার গিয়ে অন্তত দেখে আসা দরকার কিছুর প্রয়োজন আছে কি-না। হাসপাতালে এসে অপুর কেবিনে ঢুকে দেখে বেড খালি। কোথায় গেল? কেবিনেট টাও খালি। শুধু নন্দুর আনা ফুলদানিটা ফুলহীন অবস্থায় পড়ে আছে কেবিনেটের ওপর। ও বেরিয়ে কোনার দিকে নার্সদের রুমে এলো।

ন'নম্বর কেবিনের পেশেন্ট কোথায় জিজ্ঞেস করল ওদের।

—'ন' নম্বর কেবিনের পেশেন্ট? ওই যার ব্রেস্ট ক্যান্সার ছিল? ও তো পরশু রাতে মারা গেছে।'

—'মারা গেছে? পরশু রাতে?' —'আমি তো পরশুদিন প্রায় একটা অব্দি ছিলাম দুপুরে। তখন তো কিছু বুঝিনি?' —বিশ্বাস করে না নন্দু।

—'ম্যাডাম, ওর তো সময় হয়েই এসেছিল। পরশু রাতে খুব ব্লিডিং শুরু হ'ল, তারপর মারা গেল। ডেডবডি তো কাল নিয়ে গেছে সকালবেলা।' —কেঁপে ওঠে নন্দু। সত্যিই চলে গেল?

—'ড. চক্রবর্তীকে এখন পাওয়া যাবে?' জিজ্ঞেস করল নন্দু।

—'সন্ধ্যে সাড়ে ছ'টায় আসবেন উনি, তখন পাবেন।

নন্দু আর কিছু না বলে বেরিয়ে এল বাইরে। গাড়ি স্টার্ট দিয়ে হেদোয় অপুর বাড়ির দিকে রওয়ানা হলো। অপু যেন কাউকে কিছু না বলে বিনা নোটিশে চলে গেল। তবে কি অপু বুঝতে পেরেছিল যে সেটাই ওর শেষদিন? তাই কি এত তাড়া ছিল ওর, ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল ওর কাহিনি শেষ করার জন্য? সেদিন একটানা প্রায় দু-ঘন্টা কথা বলেছিল ও। যতই থেমে থেমে বিশ্রাম নিয়ে বলুক তবু জীবনীশক্তি হীন ওই শরীরে একটানা এত ধকল নেওয়ার জন্যই কি শেষ তেলের ফোঁটাটুকুও প্রদীপ শুষে নিয়েছিল? মাত্র দুটো দিন আসতে পারেনি নন্দু আর সেই ফাঁকে চলে গেল অপু? —কতটা ভালোবাসা থাকলে নিজের জীবনের সমস্ত গোপন কথা, সমস্ত নোংরা কাজ অসংকোচে একজনের কাছে স্বীকার করা যায় আগে কি কখনও জানত নন্দু? আশ্চর্য! এ— তো ভালোবাসতো অপু ওকে? অপুর কাহিনি শুনতে শুনতেও তো কত ঘেন্না করেছে নন্দু ওকে, কতবার মনে হয়েছে অপু সত্যিই পতিতার শ্রেণিতে পড়ে! কতদিন ফিরে যাবার পথে ভাবতে ভাবতে গেছে —কাল থেকে আর আসব না এসব নোংরামির গল্প শুনতে! ব্যবস্থা তো করে দিয়েছি সব রকম, আরামেই আছে এখন। থাকুক না ওর মত করে? আমার রুচিশীল পরিশীলিত জীবনে ওর ছায়াটুকুও না থাকাই ভাল। তবুও পরদিন আবার না এসে পারেনি। অপুর বিচিত্র জীবনযাত্রা আর ততোধিক বিচিত্র দুর্ভেদ্য চরিত্র বার বার ওকে বিভ্রান্ত করেছে, বিপর্যয়েও ফেলেছে তবু কেন ও ই বা পারেনি নিজেকে একেবারে সরিয়ে নিতে? ওর প্রতি অপুর মনোভাবের সঙ্গা কি? — না, জানে না নন্দু। একই সঙ্গে প্রবল হিংসা আবার অসাধারণ বিশ্বাস আর ভালবাসা —একে কি ভাবে বিশ্লেষণ করা যায়? হয়ত মনোবিজ্ঞানীরাই পারবে এই জট খুলতে, নন্দুর কর্ম নয় এটা। ভালোবাসা কি ওর নিজেরও ছিল না? তা না হলে কেন প্রশ্রয় দিত, কেন শেষদিনগুলো রোজ এসেছে ও বন্ধুর কাছে? চোখ কেন বারবার ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে? বার বার ব্রেকে পা রাখতে হচ্ছে? হৃদয়ের কোন্ গভীরে এতদিন ধরে বাইরের অবজ্ঞার আস্তরণ দিয়ে ঢেকে লুকিয়ে রেখেছিল ও অপুর প্রতি ওর ভালোবাসাকে? এতসব শোনার জানার পরও কেন

ঘেন্না করতে পারছে না ও অপুকে? অপু তো বার বার বলতো — খুব ঘেন্না করিস নন্দু, সবাইকে জনে জনে বলিস অপুর নোংরা পতিতার মতো জীবনের কথা। তবেই আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে। তবু কেন নন্দু ওর প্রাণাধিক প্রিয় স্বামী তথাগতর কাছেও এসব কাহিনি চেপে রেখেছে? পারেনি অপুকে ছোটো করতে? আর কোনোদিন বিরক্ত করতে আসবে না অপু। নানা বায়না নিয়ে নন্দুর মুখের তুখোড় জবাব শুনতে আসবে না। পাঁচ বছর আগে নন্দু বড়ো বেশিই খারাপ ব্যবহার করেছিল ওর সঙ্গে, অপু সে সুযোগ আর দেবে না। কেন করেছিল এত দুর্ব্যবহার? না হয় একটু সহ্য করেই নিত? অপু যে ওরকমই জানত তো নন্দু! তবুও নন্দু সুযোগ পেয়ে ছোটোবেলা থেকে পুষে রাখা জ্বালা খানিকটা মিটিয়ে নিয়েছে। আর অপু? সব হিংসে ভুলে শেষবেলায় প্রিয়বন্ধুকে পরম বিশ্বাসে নিজের পাপের কথা বলে চলে গেল। —সুনন্দা মুখোপাধ্যায়, তুমি জীবনে প্রথম ওই সামান্য, নগণ্য মেয়েটার কাছে নীচু হয়ে গেলে! — আঁচল তুলে একহাতে চোখের জল মোছে নন্দু। তারপর এক্সিলেটারে চাপ দিয়ে গাড়ির গতি বাড়ায়।

শশধর মুখোপাধ্যায়ের কাছে যেতে হবে ওকে, এক্ষুনি। সেই ছানিপড়া চোখের রোগা মানুষটার কাছে। যার কাছে অপুর সূর্য আছে ছেলের পরিচয়ে। মুখুজ্জেমশাই কে সাহায্য করতে হবে ওকে, ওনার পাশে দাঁড়াতে হবে সূর্যর জন্য। অপু বলেছিল ওকে —কি খায় কি জানি? ঘটি-বাটি বেচে বোধহয় চালাচ্ছে।— দুটো আঙুর কেনবার পয়সাও নেই রে ওর! আমার জন্য সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে। — না, নন্দু কিছুতেই মুখুজ্জেমশাইকে আর সূর্যকে অনাহারে থাকতে দেবে না। অপু সারাজীবনেও ওই মানুষটাকে চিনতে পারেনি, বলেছিল—বড়ো দেরি হয়ে গেছে রে ওকে চিনতে। নন্দু প্রথম দিন হাসপাতালের বারান্দার বেডে শুয়ে থাকা অপুর বুক থেকে একটা একটা করে পোকা খুঁটে তোলা দেখেই চিনেছিল—ওই বয়স্ক, শীর্ণ, দীন মানুষটির ভেতর কতবড় মাপের এক পুরুষ বাস করে! দীন উনি নন। অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা আর খারাপ স্বাস্থ্য চেহারার মধ্যে দৈন্যের ছাপ ফেলেছে বটে কিন্তু অন্তরে উনি এক মহাশক্তিমান পুরুষ। কতটা শক্তি থাকলে একজন পুরুষ সারা জীবন স্ত্রীর কাছে প্রতারিত হবার পরও স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য সর্বস্বান্ত হতে পারে? কতখানি পৌরুষত্ব থাকলে স্ত্রীর অবৈধ সন্তানকে অনাথ আশ্রমে গিয়ে বলতে পারে—আমিই তোর বাবা। তোর অনাথ আশ্রমে থাকার জন্য মা দায়ী নয়রে, দায়ী আমি!

হেদুয়ায় পৌঁছে কাঠের বন্ধ সদর দরজার পাশে লাগানো বেল বাজায় নন্দু। একটু পরে মোটাসোটা গিন্নিমতো একজন দরজা খোলেন। নন্দু তো একে দেখেনি? ইনি কে? ও মহিলার দিকে তাকিয়ে থাকে। আর মহিলাও এবার নন্দুর আপাদমস্তক আর একবার একেবারে ফুটপাথ ঘেঁষে বাড়ির গায়ে দাঁড়ানো গাড়িটা দেখতে থাকেন। তারপর জিজ্ঞেস করেন—'কাকে চাই?'

—'অপু, — মা-মানে অপুর স্বামী শশধর মুখোপাধ্যায় এ বাড়িতেই থাকেন তো? আমি ওনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। আমার নাম সুনন্দা মুখার্জি।'

মহিলা নন্দুর দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখেন তারপর নন্দুর পেছনদিকে দুপুরের নির্জন রাস্তার দিকে ইতি-উতি তাকিয়ে বলেন—'সঙ্গে কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। তুমি কি নিজে গাড়ি চালিয়ে এলে?'

—'হ্যাঁ। আপনাকে চিনতে পারলাম না, আপনি কি অপুর বড়োজা?

—'না। কেঁদে কেঁদে তো চোখ-নাক লাল করে ফেলেছ। এসো, ভেতরে। এভাবে কাঁদতে কাঁদতে অতটা পথ একা গাড়ি চালিয়ে এলে? এটা ঠিক করনি।'

ওনার পেছন পেছন নন্দু এসে সেই ঘরটাতে ঢোকে। একি? ঘরটার চেহারা ছবি সবই তো বদলে গেছে? সেই পালঙ্কখাট, ছোটো ফ্রিজ, টি.ভি. কিছুই নেই। আজকালকার নীচু জোড়া খাটে পাতা বিছানা দেখিয়ে উনি বললেন—'বসো। আগে একটু জল খাও। শশধর বাবুর স্ত্রী অপুর বন্ধু তো তুমি? খবরটা কি আজকে পেলে?' — কাচের গ্লাসে জল এগিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন মহিলা।

জল পিপাসায় গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। ঢকঢক করে পুরো জলটা খেয়ে গ্লাস্ ওনার হাতে দিয়ে নন্দু বলল—'হ্যাঁ। আমি মাত্র দুদিন যেতে পারিনি হাসপাতালে। তাই আজ সকালবেলাতেই গিয়ে—

—'বুঝেছি। হাসপাতাল থেকেই সোজা এখানে এসেছ। পরশু রাতেই মারা গেছে। গতকাল সকালে দাহ-সৎকার করেছেন শশধর বাবু।'

—'উনি কোথায়? মানে—মুখুজ্জেমশাই কোথায়? কোথাও বেরিয়েছেন?'

—'শশধরবাবু তো এখানে থাকেন না। ওনার স্ত্রীর ক্যান্সারের খরচ জোগাতে বছর দেড়েক আগে এ বাড়িটা আমাদেরকে বিক্রি করে দিয়েছিলেন। আমার স্বামীর সঙ্গে খুব ভালো পরিচয় ছিল ওনার। স্ত্রী মারা যেতে ওনাকেই প্রথম ফোন করে খবরটা দিয়েছিলেন শশধরবাবু। অত রাতেও উনি ট্যাক্সি নিয়ে হাসপাতালে গিয়েছিলেন। শশধরবাবুর তো আর কেউ ছিল না সাহায্য করার মতো। শ্মশানে বসে কত্তার কাছে এই প্রথম তোমার কথা বলেছিলেন। তুমি কত সাহায্য করেছ, রোজ বন্ধুকে দেখতে যেতে হাসপাতালে। তোমার কান্নাভেজা চোখ-মুখ দেখেই আমি বুঝেছি তুমি অপুর সেই বন্ধু।'

—'মুখুজ্জেমশাই তাহলে কোথায় থাকেন এখন? আমাকে যে ওনার কাছে যেতেই হবে। প্রায় ছ'বছর আগে মাত্র একবারই এসেছিলাম এ বাড়িতে, তারপর আজ এলাম।

—'শশধরবাবু এবাড়ি বিক্রি করার পরও এখানেই ছিলেন। ওইরকম অসুস্থ স্ত্রীকে নিয়ে কোথায় যাবেন বল? তাই কত্তা নিজেই বলেছিলেন থাকতে। তার পর যখন রক্তপড়া শুরু হল তখন তো সেই যে হাসপাতালে গেল আর ফিরবে না বলেই দিল ডাক্তার। তখন শশধরবাবু কত্তাকে বললেন উনি বাড়ি ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র চলে যাচ্ছেন। আমরা দু'মাস আগে এ বাড়িতে এসেছি। কিন্তু জানো, কত্তাকে পর্যন্ত জানালেন না ভদ্রলোক উনি য়ে কোথায় বাড়িভাড়া নিয়েছেন।'

—'সেকি? তার মানে মুখুজ্জেমশাই-এর বর্তমান ঠিকানা আপনারাও জানেন না?'

—'না। কাউকে জানাননি। এবাড়ি ছেড়ে দেবার পর সেদিন রাতেই শুধু ফোন করেছিলেন কত্তার কাছে। কত্তা শ্মশানঘাটে নাকি জিজ্ঞেসও করেছিলেন এখন কোথায় আছেন? ক্রিয়া কর্ম করার সময় কত্তা যাবেন ভেবেছিলেন। শশধরবাবু নাকি বলেছেন—কোথায় যাবেন? আমি তো এখন ভবঘুরে। অপুর জন্যই আটকে ছিলাম এখানে। একটামাত্র ছেলে আমার! বাপ-বেটাতে একেবারে গয়ায় চলে যাব শ্রাদ্ধ করতে। সেখান থেকে কোন্ ঘাটে গিয়ে ঠেকব তাতো নিজেই জানি না।'

নন্দু হতাশ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে মায়ের মতো মানুষটির দিকে। বুঝতে পারে এরাও ভালো লোক। তা না হলে শুধু ভালো পরিচয় বা বন্ধুত্বের খাতিরে এখন আর কেউ বাড়ি কেনার পর অতদিন থাকতে দিত না। —'ইশ্! আমি মুখুজ্জেমশাইর সঙ্গে দেখার করার জন্য পাগলের মতো ছুটে এলাম! আর কোনোদিন দেখা হবে না!'

—'একটা কথা জিজ্ঞেস করব কিছু মনে করবে না তো?'

—'বলুন না!'

শশধরবাবু তো কত্তারই বয়সি কিন্তু অপু তো অনেক ছোটো, তোমার বয়সিই হবে? তাহলে এদের বিয়ে কি করে হল? উনি কি দোজবর?'

—'না-না। দোজবর নন। ঠিক জানিনা এত তফাতে কেন বিয়ে হল। যার যেখানে লেখা থাকে? —আচ্ছা, আজ তাহলে উঠি।'

—'সাবধানে যেও, মনটা তো তোমার ভালো নেই! তোমাকে তো খবরটা দেওয়া উচিত ছিল ওনার। তুমি তো শুনেছি যা করেছ ওমনটা কেউ করে না।'

—'কেন করবে না? আপনারাই তো করেছেন। বাড়ি কেনার পরও অপুর কথা ভেবে অতদিন থাকতে দিয়েছেন। কজন দেয় বলুন তো? আসলে মুখুজ্জেমশাই মানুষটাই যে অনেক বড়োমাপের! ওনার জন্য অনেকেই করবে। কিন্তু এখন আর ওকে পাবে কোথায়?'

মহিলা খুশি হলেন স্বীকৃতিটুকু পেয়ে। বললেন—'অপু যেমন তোমার বন্ধু ছিল তেমনি শশধরবাবুও কত্তার বন্ধু ছিলেন তো? শুধু যদি জানিয়ে দিতেন কোথায় থাকেন আর কবে গয়ায় যাবেন তাহলে ভালো করতেন। স্ত্রীর জন্য সর্বস্বান্ত হয়ে গেলেন একেবারে। ওনার মায়ের দেওয়া সেগুনকাঠের পালঙ্কটাও বিক্রি করতে হল জানো? কত স্মৃতি ছিল বলতো? বাবা-মা শুতেন তারপর শশধরবাবু আর ওনার স্ত্রী শুতেন। কত পুরোনো খাঁটি জিনিষ। বিক্রি করলে কী আর সে দাম পাওয়া যায়—বল?'

নন্দু একথার আর উত্তর দেয় না। বলে —'আচ্ছা, চলি তাহলে?'

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে হেদুয়া থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে ও ভাবে বাঁচবে না জেনেও মুখুজ্জেমশাই অপুর চিকিৎসার জন্য মাথার ওপরের ছাদটুকুও বিক্রি করেছেন। নিজের

বাবা-মায়ের বিয়ের পালঙ্ক যা কিনা মা ওনাকে দিয়েছিলেন বউকে নিয়ে শোবার জন্য—সেই মূল্যবান খাটখানাও বিক্রি করতে দ্বিধা করেন নি। ওই খাটে নিজের বউকে নিয়ে উনি কোনোদিন শোননি। ওনার চোখের সামনে অপু ওনার পুত্রসম ভাগ্নে অমিতকে নিয়ে শুতো।— মুখুজ্জেমশাই আপনি কি? মানুষ? অতিমানুষ না অন্যকিছু? আপনি কি দেবতা হতে চেয়েছিলেন? মানুষ কি কখনও দেবতা হতে পারে মুখুজ্জেমশাই? দেবতার কাছাকাছি পৌঁছুতে পারে কিন্তু নিজে দেবতা হতে পারে না। কোথায় খুঁজব আমি আপনাকে? আমি জানি কেন আপনি অজ্ঞাতবাসে চলে গেলেন সূর্যকে নিয়ে। সূর্যের মুখে যে অবিকল অমিতের মুখ বসানো! অপুকে কথা দিয়েছিলেন সূর্যের সাথে অমিতের যাতে কখনও দেখা না হয় সে ব্যবস্থা আপনি করবেন। তাই পালালেন! সূর্যকে নিজের পরিচয়ে জগতে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে এছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না আপনার। আপনি আর কতজনকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে করতে নিজেকে ক্ষয় করতে থাকবেন মুখুজ্জেমশাই? অপুকে বাঁচাতে চাইলেন, অমিতকে-ঝুমাকে বাঁচালেন, এখন সূর্যকে বাঁচাবার দায় নিয়ে চলে গেলেন নিরুদ্দেশ যাত্রায়?

অপু মৃত্যুর আগের মুহূর্তে চিনতে পেরেছিল আপনাকে। সারাজীবন পাশে থেকেও কজন মানুষ আর পাশের মানুষটিকে পুরোপুরি চেনে? অনেকে ভুল চেনে অনেকে চেনবার চেষ্টাই করে না। যেমনটা অপু করেছিল। —নন্দুর বুকের ভেতর থেকে একটা অসহ্য কষ্ট উঠে আসছিল গলায়। দুপুরে কিছুটা ফাঁকা রাস্তার পাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে স্টিয়ারিংয়ে মাথাটা রাখে ও। গলার কাছের দলা পাকানো কষ্টটা ধীরে ধীরে অশ্রু হয়ে ঝরতে লাগল স্টিয়ারিংয়ের ওপর। এই অশ্রু অপুর জন্য নয় জানে ও। এই অশ্রু সেই ঘষাকাচের মতো চশমা পরা, শুকনো-শীর্ণ অকাল বার্দ্ধক্যে জীর্ণ মানুষটির জন্য। স্টিয়ারিংয়ের ওপরেই যেন রাখা আছে ফাটা ফাটা খড়ি ওটা পা দুখানা। যাঁর সঙ্গে আর কোনও দিন দেখা হবে না সেই অদৃশ্য মানুষটির প্রতি সুনন্দা মুখার্জির শ্রদ্ধার অর্ঘ্য।

—'মা, ফোনটা ঠামাকে দাও। কথা আছে।'

—' কেন রে?'—উৎকণ্ঠিত গলায় প্রশ্ন করে শ্রীলা—কি হয়েছে বলবি তো?'

—'বলব মা, সব বলব। কিছু হয়নি তোমার চিন্তা হবার মতো। ঠামাকে দাও না!'

—'হ্যালো নন্দরানী! কি হয়েছে, ঠামার তলব পড়ল?'

—'ঠামা, আমি ডিব্রুগড়ে আসছি পরশু সকালে।'

—'সেকি নন্দরানী! ঠামার এত ভাগ্য না চাইতেই জল? সূর্য কোন দিকে উঠলো?'

—'সূর্য উঠেছে ঠামা। আকাশ, জগৎ-সংসার সব আলো করে একটা নতুন সূর্য উঠেছে?'

—'ও বাবা! এ যে কাব্যি করছিস? এটা কোন কাব্য রে?'

—'হ্যাঁ ঠামা, ঠিক বলেছ এটা একটা মহাকাব্য। অনেকটা তোমার রামায়ণ-মহাভারতেব

মতো। সেটা শোনাতেই আসছি পরশু। তুমি আর আমি ছাড়া এ কাব্য যে আর কেউ বুঝবে না ঠামা!'

ফোন নামিয়ে রাখে নন্দু।

॥ দশ ॥

কোলকাতা শহরটা হুড়মুড় করে বদলে গেল। এখন কেমন অচেনা লাগে শহরটাকে। শান্ত নিরিবিলি ওল্ড আলিপুরও আর নিরিবিলি নয়। পথে নামতেই এখন ভয় করে নন্দুর। নিজে গাড়ি চালানোও ছেড়ে দিয়েছে। এত যানবাহন, এত মানুষ, ফুটপাথ জুড়ে হকারদের দোকান। কোথায় মানুষ চলাচলের পথ? আর কোথায়ই বা নিশ্চিন্তে আগের মতো গাড়ী চালানোর সুবিধা? ওর ব্যক্তিগত জীবনটাও তো হঠাৎই হুড়মুড় করে বদলিয়েছে। গার্হস্থ্য জীবনের হালের সঙ্গে নিজেকে জুতে রাখা নন্দুকে অনেক আগেই ইন্দ্রাণী বের করে এনেছিলেন সমাজসেবার নামে। সেগুলো আছেই তার সঙ্গে এসে জুটেছে মুখার্জি অ্যান্ড মুখার্জির অফিসে বসা। শ্বশুরের প্রথম হার্ট অ্যাটাকের পর আবার ইন্দ্রাণীর জোর জবরদস্তীতেই অনভিজ্ঞ সুনন্দা মুখোপাধ্যায়কে অফিসমুখী হতেও বাধ্য করেছে। নামেই ওয়ান অফ দ্যা ডাইরেক্টার ছিল আগে, কাজ তো ছিল শুধু নিজের নাম স্বাক্ষর করা। ডাইরেক্টার বোর্ড মিটিংয়ে চুপচাপ বিরক্তিকর উপস্থিত থাকা। এসব ব্যাপারে কোনও আগ্রহই ছিল না ওর তবু মাঝ বয়সে ওকে ওই কাজ শিখতে হল। ইন্দ্রাণী বলেছিলেন —'ভয় পাবার কিছুই নেই সুনন্দা। আগেকার দিনে যে সব ব্যক্তিরা বিজনেস এ্যাম্পায়ার তৈরী করে রেখে গেছেন তাদের কারোও বিজনেস ম্যানেজমেন্ট ডিগ্রি ছিল বলে শুনিনি। অসাধারণ একাডেমিক রেজাল্ট ছিল বলেও শুনি না। তারা শুধুমাত্র নিজেদের বুদ্ধির জোরে বড়ো বড়ো বিজনেস হাউস তৈরি করে গেছেন। —এখনই বান্টুর পাশে দাঁড়ানোর সময় তোমার। আমার কি কোনও ম্যানেজমেন্ট ডিগ্রি ছিল? আমি যদি পেরেছি তাহলে তুমি পারবে না কেন?'

তথাগতও প্রবল উৎসাহ দিয়েছে। — বলেছে — ' জোজোকে আমেরিকা থেকে ফিরে আসতে দাও তখন তোমাকে ছুটি দিয়ে দেব। বিজনেসের অবস্থা কিন্তু আগের মতো নেই সুনন্দা। আমাদের এখন খারাপ সময় চলছে। এরই মধ্যে ড্যাডির অ্যাটাকটা মস্তবড়ো সেটব্যাক। সত্যি তো, মম্ যদি এত সাকসেসফুলি করতে পেরেছে কাজটা তাহলে তুমি কেন পারবে না? আমি আর মম তো আছি তোমাকে শেখানোর জন্য! এত বয়সেও মমের কোনও ক্লান্তি নেই। তোমার মনে হয় না একবারও যে অনেক আগেই তোমার নিজের তরফ থেকে ইন্টারেস্ট দেখানো উচিত ছিল? উচিত ছিল মম্‌কে রেস্ট দেওয়ার কথা ভাবা? শুধু হাউস ওয়াইফ হয়ে আর কতকাল কাটাবে?'

বিরক্ত হয়ে নন্দু বলেছিল—'সবাই সবকিছু করার ক্ষমতা নিয়ে জন্মায় না তথাগত।

মমের কথায় ওঁর সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারের কাজগুলো অনেক আগেই আমি কাঁধে তুলেছি বিনা দ্বিধা। কোনও দিন ভাবিইনি যে তোমাদের এতবড়ো বিজনেসের ভারও কিছুটা তোমরা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দেবে। বিজনেস ওম্যান হবার স্বপ্ন আমার ছিল না কোনও দিন। হাউস ওয়াইফ হয়ে থাকতেই চেয়েছি।' তথাগত বলে —'সবই মানলাম। আগে প্রয়োজন হয়নি তোমাকে তাই আমরাও বলিনি। কিন্তু এখন যে প্রয়োজন সুনন্দা। মাইনে দিয়ে যাদের বড়ো বড়ো পোস্টে পুষে রাখা হয়েছে তারা সবাই কি মুখার্জি অ্যান্ড মুখার্জি ইন্টারন্যাশনালের প্রতি খুব লয়েল বলে মনে করো তুমি? কে যে সূচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরোবার চেষ্টা করছে বুঝতেই পারবে না। —তুমি জানো ড্যাডির অ্যাটাক হওয়ার পর আমি বা মম্ ঠিকমতো নজর রাখতে পারিনি বলে নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে ডীলটা ক্যান্সেল হয়ে গেছে? কত কোটিটাকার লোকসান কল্পনা করতে পারবে না ঘরে বসে বসে। ওদের কোম্পানি ইনস্পেকশনে এসে প্রোডাক্টে ফল্ট খুঁজে পেয়েছে। সমস্ত প্রোডাক্ট পড়ে রয়েছে। এরকম ধাক্কা আরও কয়েকটা খেলে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে বদনামি হয়ে ধপ করে মুখ থুবড়ে পড়তে হবে। হাউস ওয়াইফ হয়ে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে জীবনের অর্ধেক কাটিয়েছ সুনন্দা, এখন এসে আমাদের সঙ্গে হাত লাগাও।'

সেই থেকে শুরু। জীবনের মাঝপথ অবধি সোজা রাস্তায় এসে হঠাৎ একটা শার্প টার্ন। প্রথম প্রথম খুব অসুবিধে হত, বোকা বোকা লাগত। মনে হত সুনন্দা মুখার্জি, এম. এ. ইন ইংলিশকে অফিসে দেখে কর্মচারিরাও বোধহয় আড়ালে হাসছে। ভাবছে —এই মহিলার তো স্কুলে বা কলেজে মাস্টারি করার কথা। ইনি এখানে কি করতে এসেছেন? আর আশ্চর্যের ব্যাপার, — এই নেগেটিভ ভাবনাটাই ওকে পজিটিভ হতে মরিয়া করে তুলেছিল। বছর খানেকের মধ্যে সুনন্দা মুখোপাধ্যায় একজন যোগ্য বিজনেস ওম্যান হয়ে উঠেছিল। ইন্দ্রাণীকে কোনওদিন সংসার সামলাতে হয়নি। কিন্তু নন্দু একাধারে সংসার, অফিস এবং সোশ্যাল ওয়ার্ক, তিনটে সামলে প্রমাণ করে দিল যে ইচ্ছে করলে সত্যিই মানুষ সব কাজ করতে পারে। আগে ইচ্ছেটাই ছিল না আর পরে ওই জোর করে ঘাড়ে চাপানো কর্মটিই নেশা হয়ে দাঁড়াল। এমনই নেশা যে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্রী ডোনা ছুটিতে বাড়ি এলে ধমকে-ধামকে তাকেও নিয়ে যেতে হত অফিসে। বলত—'এখন থেকেই শুরু করো, পরে তাহলে কষ্ট হবে না। এসব জোজোর একার নয় তোমারও দায়িত্ব। ও বিদেশ থেকে ফিরে এসে খাটবে আর তুমি গাছের তলায় বসে ফলগুলো খাবে সে হবার নয়।'

আশ্চর্য যুগের প্রভাব। ডোনারা মোটেই সুনন্দাদের মতো নয়। ডোনা প্রথম থেকেই ক্যারিয়ার ওরিয়েন্টেড। ডোনার বয়সে সুনন্দা রায়চৌধুরি মন দিয়ে পড়াশুনো করে ইংরেজীতে এম. এ. পাস করেছে কোনও লক্ষ ছাড়াই। আর জোজো — ডোনারা আগে নিজেদের লক্ষ স্থির করে ধনুষ-বান হাতে তুলেছে। ডোনা ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসে

অবলীলায় দাদু-ঠাম্মি, ড্যাড-মাম্মীর কাছে মনিপালে ওর সাউথইন্ডিয়ান বয় ফ্রেন্ডের গল্প শোনাতে পারে। নিজের রুমে বেডসাইড টেবিলে ফ্রেমে বাঁধানো বয়ফ্রেন্ডের ছবি রাখতে পারে। নন্দু ভেতরে ভেতরে মর্মাহত হয়, লজ্জা পায় মেয়ের নির্লজ্জতা দেখে। কিন্তু কিচ্ছু বলার নেই। বলতে গেলেই বিপদ বাড়বে জানে নন্দু। ওরও রূপ-গুণমুগ্ধ ছিল অনেকেই কিন্তু সীমানা ছাড়িয়ে এক পা এগোবারও সাহস হয়নি কখনও। ওর মনের মাটিতে ঠামা আর মা মিলে যে সব বিধিনিষেধের বীজ পুঁতে দিয়েছিল সেটা তখন মস্তবড়ো বৃক্ষ হয়ে গেছে।

ইউনিভার্সিটিতে ওর বন্ধুদের অনেককেই ক্লাসের ছেলেদের সঙ্গে প্রেম করতে দেখেছে। ক্লাস পালিয়ে কফি হাউসে, ওয়াই এম. সি. এর নীচের পর্দাঢাকা রেস্টুরেন্টে, সিনেমায় যেতে দেখেছে নন্দু। সেই সব প্রেম কতটা যে বাস্তবে সফল দাম্পত্যে পরিণত হয়েছে জানে না ও । বালিগঞ্জ থেকে বাড়ির গাড়ি ওকে নামিয়ে দিত রোজ আবার যথাসময়ে নিয়ে যাবার জন্য এসে অপেক্ষা করত। প্রাক বিবাহ প্রেমের কোনও অভিজ্ঞতা ওর নেই। ওর জীবনের প্রেম-প্রণয় সব কিছুই বিয়ের পর তথাগতর সাথে। নন্দু জানে এই সাউথইন্ডিয়ান ছেলেটার ছবি কিছুদিন পরে আর থাকবে না ডোনার বেডসাইড টেবিলে। অন্য কোনও ছেলে হাসিমুখে তাকিয়ে থাকবে। এই নিয়ে তিনবার ছবি বদলাল। ভালোবাসা আর ভালো লাগার প্রভেদটুকু ডোনা এখনও বুঝতে পারে না। তাই সম্পর্কগুলো দানা বাঁধবার আগেই ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। মেয়েকে নিয়ে নন্দুর চিন্তাই বাড়ে শুধু, বাড়ির অন্য কারও চিন্তা নেই। এমনকী মেয়ের বাপকে বললে সে তো মাছি তাড়ানোর মতো উড়িয়ে দেয়—'দূর! এ আবার একটা বিষয় নাকি মাথাঘামানোর মতো? এ বয়সে এসব হয়। প্রেমফেম নয় ওসব ইনফেচুয়েশন। তুমি যে কেন সময়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে পারো না বুঝি না। ওরা এযুগের ছেলে মেয়ে সুনন্দা। ওদের সাথে ওদের মত করে সমঝোতা করে চলতে শেখো তানাহলে তোমার সঙ্গে ওদের বনিবনা হবে না। নিজের ক্যারিয়ার বরবাদ করে তো কিছু করছে না। সেটা ঠিক থাকলেই হলো।'

নন্দু চুপ করে থাকে। ভাবে সব সমঝোতাই আমি করব? জোজো সেবারে আগাম সংবাদ না দিয়েই ওর গার্লফ্রেন্ডকে সঙ্গে নিয়ে চলে এল। বলল—'সারপ্রাইজ দেব বলে জানাই নি। আমরা দুজন এখন কিছুকাল ধরে স্টেডি যাচ্ছি তাই দেখাতে নিয়ে এলাম। ওকে তোমার কেমন লাগল মাম্মী?'

নন্দু বলেছিল --'ভালোই তো।'। — ও জানত ভালো নয়। স্টেডি সম্পর্ক আনস্টেডি হতে বেশিদিন লাগবে না তবু সমঝোতা রক্ষা করার জন্যই বলেছিল ভালোই তো। ছেলে-মেয়ের অতি আধুনিক জীবনযাত্রার সঙ্গে নিজেকে মানাতে না পারার অক্ষমতা ও কাউকে বলতে পারে না। এসব সময় ওর শুধু ঠামার কথা মনে হয়। ঠামা বেঁচে থাকলে ও ডিব্রুগড়ে পালিয়ে গিয়ে ঠামার কাছে প্রাণখুলে সব বলে শান্তি পেত। নিজেব পুরনোপন্থী হওয়ার সমস্যাটা থেকে বাঁচতো তাহলে।

ঠামা অনেকদিন বেঁচেছিল। দীর্ঘায়ু যাকে বলে। শেষদিকে চোখে ভালো দেখতে পেতো না কানে তো শুনতই না প্রায়। তবু ঠামা যে আছে সেটাই নন্দুর কাছে অনেক কিছু মনে হত। ঊন-নব্বই বছরেও বুদ্ধি বিভ্রম ঘটেনি এতটুকুও। জোরে জোরে চেঁচিয়ে কথা বললে শুনতেও পেত কিছু কথা আর তখন নিজেও দন্তহীন মুখে জোরে জোরে চেঁচিয়ে কিছু উত্তর দিত। ঠামার জীবনের শেষ কটা বছর নন্দু ঘনঘন ডিব্রুগড়ে গেছে। মাত্র দু-দিনও থেকেছে কখনও কখনও কারণ ঠিক সেই সময়টাতেই ইন্দ্রাণী ওকে সমাজসেবার কাজে লাগিয়ে দিয়েছিলেন। বড়ো জেঠু বলত—'আমাদের মা শতায়ু হলে সারা ডিব্রুগড় জুড়ে অনেক উৎসব করব মায়ের নামে।' —সেটা আর হয়নি অবশ্য। ঊন-নব্বই বছর বয়সে ঠামা মারা যাবার দিনটাতেই নন্দু কাছে ছিল না। কাছে কেন, নন্দু অনেক দূরে সাতসমুদ্র তেরো নদীর ওপারে জার্মানিতে ছিল তথাগতর সঙ্গে। খবর পেয়ে ও একা ফিরে এসেছিল দেশে। তথাগত তখন আসতে পারেনি কাজ শেষ না করে। বলেছিল— 'তুমি তো একটা ইম্পর্টেন্ট কাজে এসেছ। কাজটা শেষ না করে ছুটে গিয়ে ঠামাকে তো আর দেখতে পাবে না। তাছাড়া নব্বই বছরে মৃত্যু হয়েছে ঠামার। এমন কিছু শোকের ব্যাপারও নয় এই মৃত্যুটা যে জার্মানি থেকে তোমাকে দৌড়ে যেতে হবে। ফিরে গিয়ে যেয়ো।'

ঠামার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে নন্দু কাঁদেনি কিন্তু তথাগতর কথা শুনে কেঁদে ফেলেছিল। নন্দুর জীবনে ঠামার স্থানটা কোথায় তথাগত জানে। ঠামার চলে যাওয়াটা অন্য সকলের কাছে শোকাবহ না হলেও নন্দুর কাছে যে কতটা মর্মান্তিক একথা ওর অর্ধেক জীবনের সাথী তথাগত বুঝতে চায়নি সেদিন। সেদিন মনে হয়েছিল তথাগত বিবেকহীন। এই তথাগতকে ও চেনে না। ঠামাই যে ওর আবাল্যের সবচেয়ে কাছের মানুষ ছিল। ওর একমাত্র অসমবয়সী বন্ধু! — সব জানে তথাগত। জেনেশুনেও নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থে ওকে আটকে রাখতে চাইছে।

নিজের জেদে অবিচল থেকে জীবনে প্রথম তুমুল কথা কাটাকাটি, প্রথম বিদ্রোহ, প্রথম নিজে সিদ্ধান্ত নেওয়া, প্রথম তথাগতকে ফেলে রেখে একা একা চলে আসা। এক কথায় প্রবল দাম্পত্য কলহ জার্মানির মাটিতে বসে। কাজে সফল হয়ে তথাগত ফিরে এলে পরে সব মিটে গিয়েছিল ঠিকই কিন্তু মুখার্জি পরিবার বুঝে ফেলেছিল সুনন্দা প্রয়োজনে বশ্যতা ভাঙতে শিখে ফেলেছে। কোনও বিশেষ ব্যাপারে বিদ্রোহ প্রয়োজন হলে করতে পারে ও।

জোজোর স্টেডি চলা সম্পর্কটা কেটে যেতে সত্যিই বেশি সময় লাগেনি। ক্যারলকে নিয়ে কোলকাতায় যেদিন পৌঁছেছিল সেদিন নন্দু ক্যারলের জন্য একনম্বর গেস্টরুমে গোছগাছ করাচ্ছিল নিজে দাঁড়িয়ে। মিসেস গোমস তো কবেই মারা গেছেন, রুনা তখন সব দায়িত্ব পেয়েছে। রুনা, ওর হেল্পার আর নন্দু তিনজনেই একনম্বর গেস্টরুমে উপস্থিত

ছিল যখন জোজো সেখানে এসে হাজির হল —'হাই মামা! গেস্টরুমে ঢুকে কি করছ? ক্যারলকে সঙ্গ দেবে না? চলো-চলো।'

মনে মনে জোজোর ব্যাপারটা মেনে নিতে না পারলেও মুখে হাসি টেনেই বলেছিল—'ওর সঙ্গীর অভাব আছে নাকি? বাড়িশুদ্ধ সবাই তো সঙ্গ দিচ্ছে তার ওপর তুই তো আছিসই। দাঁড়া আগে ওর থাকার রুমটাকে তো গুছিয়ে দিই তারপর আসছি।'

—'ক্যারলের থাকার জন্য তুমি এই গেস্টরুমটাকে গোছাচ্ছো?' — হো হো করে হেসে উঠেছিল জোজো।

—'এতে হাসির কি হল? গোছাব না? অতদূর দেশ থেকে গেস্ট এসেছে তাকে তো সবরকম সুবিধাগুলো দিতে হবে থাকার মতো—নাকি?

—'ও হো! তুমি অযথাই এসব করছ মা। ক্যারল গেস্টরুমে থাকবে কেন?' — অবাক প্রশ্ন করেছিল জোজো। ততোধিক অবাক হয়ে নন্দু বলেছিল —'তাহলে কোথায় থাকবে?'

—' কেন, আমার সঙ্গে আমার বেডরুমে! ওখানে তো আমরা একসঙ্গেই থাকি মামা।'

রুনা আর ওর হেল্পারের সামনে মাথাটা যেন হাতে করে কেটে ফেলেছিল জোজো। নন্দুর মুখ দিয়ে কিছুক্ষণ কোনও কথাই বের হয়নি। তারপরই সামলে নিয়ে ঠান্ডা গলায় বলেছিল —'তুমি এখন এখান থেকে যাও জোজো। এ ব্যাপারে কথা বলার জন্য আমি একটু পরে তোমাকে ডাকব।'

জোজোর বলা বে-আক্কেলে কথাতে রুনারা যতটা না চমকে উঠেছিল তার চেয়ে অনেক বেশি চমকে ওরা ম্যামের দিকে তাকিয়ে ছিল হাতের কাজ থামিয়ে। এবাড়িতে চাকরি করে করে রুনার মাথার চুলগুলোও সাদা হয়েছে বহুলাংশে। জোজোকে ছোটোবাচ্চা বেলা থেকে দেখছে আর জোজোর মা'র সঙ্গে ওর সম্পর্কটা কখনই মালিক-কর্মচারির ছিল না। দীর্ঘসময়ের পরিচিত এই মহিলার মুখে কোনওদিন এমন শীতল আওয়াজ বের হতে শোনেনি ও। এমন ভয়ংকর রেখা ফুটে উঠতে দেখেনি ওই সুন্দর মুখে। জোজোও মা'র এই রূপের সঙ্গে পরিচিত ছিল না। ও আর কথা না বাড়িয়ে — ও. কে. বলে ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

ঘন্টাখানেক পরে ক্যারলকে প্রথমে আলাদা করে ডেকে এনে বুঝিয়ে দিয়েছিল এটা আমেরিকা নয়, ইন্ডিয়া। এদেশের কারও বাড়িতে বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে চলে আসার আগে ক্যারলের উচিত ছিল দেশটা সম্বন্ধে, এদেশের রীতি-রেওয়াজের সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞান সঞ্চয় করে আসা। জোজো সব জেনেও ওকে এদেশের নিয়ম কানুন না জানিয়ে নিয়ে এসেছে বলে নন্দু নিজেই দুঃখিত। ক্যারল যেন এই কটা দিন গেষ্টরুমে শুয়ে এই বাড়ির সার্ভেন্টদের সামনে অন্তত কোনও সিনক্রিয়েট করার সুযোগ না দেয় জোজোকে—এটা

একজন ওম্যান এবং জোজোর মা হিসেবে ক্যারলের কাছে নন্দুর অনুরোধ। এদেশে অবিবাহিত ছেলেমেয়েরা তো নয়ই, বিবাহিতরাও কারও সামনে একে অন্যের কাছাকাছি আসে না — ইত্যাদি, ইত্যাদি। — নন্দুর গম্ভীর মুখ এবং গাম্ভীর্য্যপূর্ণ কথাগুলো শুনে ক্যারল কি ভেবেছে তা নিয়ে নন্দুর কোনও মাথাব্যথা হয়নি সেদিন। ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে বাড়াবাড়ি এবাড়ির ভেতরে ও করতে দেবে না ঠিক করে নিয়েছিল। পরে জোজোকে ডেকে একইরকম শীতলতায় জানিয়ে দিয়েছিল মুখার্জি ম্যানশনের চারদেওয়ালের ভেতরে আমেরিকান ব্যাভিচার ও সহ্য করবে না। এখানে সবাই চিরকাল পারিবারিক নিয়ম মেনে চলেছে—আজও সেভাবেই চলতে হবে। জোজোর যদি এতে আপত্তি থাকে তাহলে কোলকাতা শহরে হোটেলের অভাব নেই, ও কোনও হোটেলে চলে যেতে পারে ক্যারলকে নিয়ে।

জোজো তর্ক করার চেষ্টা করতে যেতেই নন্দু ডান হাত তুলে ইঙ্গিতে ওকে থামিয়ে দিয়ে বলেছিল—'আর কোনও কথা নয়। তোমার ধৃষ্টতা আমি দেখেছি এবং অপশনও দিয়ে দিয়েছি। এখন তুমি কোনটা নেবে ঠিক করে নাও।—যাও।'

একমাস থাকবে বলে এসে দশ-বারোদিন পরই জোজো ঘোষণা করল ওরা ফিরে যাচ্ছে। দাদু, ঠাম্মী, ড্যাড, ডোনা সকলেই অবাক হঠাৎ জোজোর ফেরত যাওয়ার কথা শুনে। একমাত্র নন্দু ছাড়া সকলেই বার বার বোঝাতে লাগল পুরো ছুটিটা কাটিয়ে যাওয়ার জন্য। দিল্লি, আগ্রা ক্যারলকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসার জন্য। নন্দু মুখে তালা মেরে একবারেরও জন্যও বলল না—'কেন চলে যাচ্ছিস জোজো? পুরো ছুটিটা কাটিয়েই যা না।'

চলে গেল ওরা। ছেলে যে কদিন ছিল সে কদিন মা-ছেলের মধ্যে বিশেষ কথাবার্তা, অন্তরঙ্গতা আর হয়ে ওঠেনি। একধরনের শীতপ্রবাহ চলেছে, যা বাড়ির অন্য কেউ বুঝতে পারেনি রুনা ছাড়া। ফিরে যাওয়ার তিনমাস পরেই জোজোর ফোন এসেছিল মায়ের কাছে। অনুতপ্ত ছেলে জানিয়েছিল ও নিজের ধৃষ্টতার জন্য লজ্জিত এবং দুঃখিত। ক্যারলের সঙ্গে ওর সম্পর্কটা কেটে গেছে। ক্যারলকে ও চিনতে ভুল করেছিল। —'আমি ওকে সত্যিই ভালোবেসেছিলাম মাম্মা। কিন্তু এই আমেরিকান মেয়েরা যে ঠিক কি চায় বুঝতে পারি না। ওদের সঙ্গে আমাদের অনেক অমিল মা। এরকম ভুল আর হবে না— তুমি দেখো।'

নন্দু মুখে আর কোনও জ্ঞান দেয়নি ছেলেকে আমেরিকান মেয়েদের বিরোধিতা করে। বরং বলেছিল —'এগুলো পার্টস অফ লাইফ জোজো, জীবনে এরকম দু-একবার ঘটে। এসব নিয়ে ব্রুড করিস না। তোকে বোঝার মতো কেউ না কেউ একদিন তোর জীবনে আসবে রে জোজো।'—মনে মনে বলেছিল—তোমাকে কোলকাতায় ফিরে এসে মুখার্জি ইন্টারন্যাশনালের ভার নিতে হবে জোজো। এই কোলকাতাতেই থাকতে হবে কোনও ভারতীয় মেয়েকে বিয়ে করে। যেভাবে তোমার ঠাকুর্মা ইন্দ্রাণী মুখার্জি থেকেছেন ইংল্যান্ড

থেকে এদেশে এসে। যেভাবে তোমার ড্যাড তথাগত মুখার্জি বিদেশের পড়াশুনো শেষ করে দেশে ফিরে আমাকে নিয়ে সারাজীবন কাটাচ্ছে তোমাকেও ঠিক তাই করতে হবে। যুগের হাওয়ায় খড়কুটোর মতো যেখানে সেখানে উড়ে গিয়ে তোমার জীবন নষ্ট হতে দিতে পারব না আমি। বাধা দেব, চেষ্টা করব ফিরিয়ে আনার। তুমি আর ডোনা হয়তো অনেকবার ভুল করবে। বার বার আমি তোমাদের ভুল সংশোধন করতে সাহায্য করব। পরিবার, সম্পর্ক, পারিবারিক ট্র্যাডিশন এগুলো শেখার সময় কোথায় পেল জোজো? সেই ছোটোবেলায় দার্জিলিং-এর বোর্ডিং-এর চলে গেছে। শীতের লম্বাছুটিতে বাড়ি এসে সকলের কাছ থেকে সারা বছরের জমানো আদর আর প্রশ্রয়ই শুধু পেয়েছে। তারপরও হোস্টেলেই কেটেছে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সময়। ছাত্র হিসেবে বরাবরই ভালো, এ বিষয়ে অভিযোগ করা যাবে না। ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেই আমেরিকায় পাড়ি দিয়েছে ছেলেটা আর একবছরের বসবাসের মধ্যেই ক্যারলের সঙ্গে পরিচয় এবং থাকাথাকি। খুব জোর ধাক্কা খেয়েছে বাবু। ভাল হয়েছে। বুঝুক এবার মা ঠিককথা বলে কিনা!— সময় মতো তোকে আমি বুঝিয়ে দেব জোজো পরিবারের কাছে প্রত্যেক ছেলেমেয়ের কিছু ঋণ থাকে, সেটা শোধ করতে হয়। স্বার্থপরের মতো শুধু নিয়ে যাবি আর কিছুই ফেরত দিবি না, সে হবে না।

নন্দু ভাবে ডোনাকে নিয়েও একদিন বসতে হবে পরের বার ছুটিতে এলে। ডোনা এবাড়িতেই সাবালিকা হয়েছে। স্বাধীন তো এই সবে হল। সেই ছোটোবেলায় দার্জিলিং-এ পড়তে গিয়ে কান্নাকাটি করে ফেরত এসে কোলকাতায়ই পড়াশুনো করেছে। তারপর ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে মনিপালে গেছে এখন। বড়ো হবার সাথে সাথে ডোনা ধীরে ধীরে আমার কাছ থেকে দূরে থাকতে চেয়েছে —আমি বুঝতাম। দাদু, ঠাম্মী, ড্যাডদের নজর তো আমার মতো তীক্ষ্ণ হয়ে ওর ওপরে বিরাজ করত না সর্বক্ষণ তাই ওদের আশেপাশেই থাকতে বেশি পছন্দ করে। তাছাড়া, ড্যাডের কাছে তো মেয়ের সাতখুন মাফ। কুড়িবছর বয়সের মেয়ে ছেলেবন্ধুর ছবি এনে বেডসাইড টেবিলে রাখলেও ক্ষতি নেই। ওসব সাময়িক ইনফ্যাচুয়েশন, আর একটু বড়ো হলেই কেটে যাবে।

না। এসব কেটে যাবে না। দিনে দিনে আরও বাড়তে থাকবে প্রশ্রয় পেলে। শাসন বিহীন উচ্ছৃঙ্খলতার নজির আমি দেখেছি। অপুকে ভুলে যাইনি আমি। আমি লক্ষ্মী দিদা নই। আমার পরিবারে আর একটা অপুর সৃষ্টি হতে দিতে পারব না আমি। যুগের হাওয়া-ফাওয়া বাজে কথা। এ যুগেও সব মেয়েরা এরকম স্বাধীনচেতা হয় না। আমাদের যুগে তো এখনকার মতো এমন উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতার হাওয়া বইত না! রক্ষণশীল ছিল সমাজ। তবুও তো অপু নষ্ট হয়েছিল! কেন? কারণ বাড়িতে শাসন ছিল না। কেউ বোঝায় নি কোনটা করা উচিত আর কোনটা অনুচিত। তাই অপুর অধঃপতন হয়েছিল। আমাদের বাড়িতে ঠামা, মা-জেঠিমারা বা এলিস সবসময় বোঝাতো, বা বলতো এটা কোরো না ওটা কোরো না লোকে নিন্দে করবে। আমার মনে খারাপ জিনিষগুলোর প্রতি ভয় ঢুকিয়ে

দেওয়া হয়েছিল। আর তাই অপু অনেক চেষ্টাতেও আমাকে ওর মনের মতো করে নিতে পারেনি কখনও। আমি নিজেই বাধা দিয়েছি। এখন ভয় বস্তুটাই নেই। কেউ ছেলেমেয়েদের জুজুর ভয় দেখায় না যে!

ডোনাকে আমি ক্লাস সিক্স থেকেই উচিত—অনুচিতের পাঠ যথেষ্ট ভাবে পড়িয়েছিলাম। এখানে থাকতে তাই ছেলেবন্ধুর বালাই ছিল না ওর জীবনে। খাঁচা ছেড়ে বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে পাখায় জোর এসেছে। ডানা ভেঙে কাটাঘুড়ির মতো লাট্টু খেয়ে পড়ার আগেই সাবধান করতে হবে, কঠিন হতে হবে। জানি এসব বলতে গেলেই আমি খারাপ হব ওর কাছে, তবুও বলতে তো হবেই। কারণ আমি যে মা! আমি যে অপুকে ধ্বংস হতে দেখেছি চোখের সামনে! —ওরা আমাকে ব্যাকডেটেড বলে ভাবে, এমনকি তথাগতও আমাকে জমানার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পরামর্শ দেয়। ছেলে-মেয়ের বেলায় মুখার্জি অ্যান্ড মুখার্জি ইন্টার ন্যাশনালের বর্তমান প্রেসিডেন্ট পরম পরাক্রমশালী তথাগত মুখার্জি একেবারে ভিজে ন্যাকড়া!-অফিস যাওয়ার প্রস্তুতি করার ফাঁকে মনে মনে এসব চিন্তা করে পরিকল্পনা করে রাখে পুরনোতে বিশ্বাসী, অনেকটাই পুরনোপন্থী সুনন্দা মুখার্জি। তথাগতদের পথে প্রশ্রয় আর আদর দিয়ে ও মেয়েকে নষ্ট হতে দেবে না। 'ফিয়ার ইজ দ্য কী'! ভয় দেখাতে হবে। সমাজের ভয়, জীবন নষ্ট হবার ভয়, মানুষের অনুকম্পার ভয়। ভয় না থাকলে পিছল জায়গায় পা রাখার আগে চিন্তাই করতে পারবে না।

* * * * *

বি. টি. রোডের ওপরে পানিহাটিতে ওদের একটা ফ্যাক্টরিতে নানা দাবিদাওয়া নিয়ে ম্যানেজমেন্টের বিরুদ্ধে শ্রমিক আন্দোলন চলছে। সেটা নিয়েই আলোচনা চলছিল ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসে । বিরক্তি জ্যাবজেবে তথাগত অসহিষ্ণু গলায় বলে —'এসব ন্যক্কারজনক পরিস্থিতি চলতে থাকলে এরাজ্যে আব শিল্পপতিরা কেউ থাকবে না । পাততাড়ি গুটিয়ে কর্ণাটক, গুজরাট কিংবা মহারাষ্ট্রে যেতে বাধ্য হবে। এটা তো এখন ট্রেডইউনিয়নবাজির আখড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে — রোজ দাবি, রোজ হরতাল করে টুল ডাউন করা—যাচ্ছেতাই!

বাইপাশ সার্জারির পর থেকে সিদ্ধার্থ ধীরে ধীরে অফিসিয়েল কাজকর্ম কমাচ্ছিলেন বর্তমানে প্রায় রিটায়ার করেছেন বলা চলে। উপযুক্ত পুত্র এবং উপযুক্ত স্ত্রীর হাতে বাগডোর ছেড়ে দিয়ে সংকটকালীল অ্যাডভাইসার হয়ে বসে আছেন। ইন্দ্রাণী কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ সচল। এত বয়সেও উনি বয়সের কাছে হার মানেননি। এখনও সাপ্তাহিক সাঁতার বজায় রেখেছেন সুনন্দার সঙ্গে। এখনও পারলার রুমে ম্যাসাজ, রূপচর্চায় সমপরিমাণ মনোযোগী যতটা মনোযোগ দিয়ে মুখার্জি ইন্টারন্যাশনালের অফিসের চেম্বারে বসে কাজ করেন।

মুখের সামনে থেকে খবরের কাগজটা সরিয়ে সিদ্ধার্থ জিজ্ঞেস করেন —' কেন, ইউনিয়ন লিডারদের সঙ্গে ম্যানেজমেন্টের যে মিটিং হল পরশু তার রেজাল্ট কি বেরোলো?

—বিগ জিরো ড্যাড! চোরাপথে যে আনস্কীলড লেবারগুলোকে ঢুকিয়েছিল তাদের ছাঁটাই করা চলবে না। ৫৫ থেকে ৫৮ বছরের ওয়ার্কারগুলোকে ভি. আর. এস. দেওয়া চলবে না। ওদের সিক্সপয়েন্ট দাবির কাছে ম্যানেজমেন্টকে মাথানত করে থাকতে হবে। চার-পাঁচ বছর বেশি কাজ করে ৬০ বছরে রিটায়ার করলে যে বেনিফিট পাবে সেটা তো আমরা ভি. আর. এস. এই দিচ্ছি। আমৃত্যু চাকরি করবে নাকি? তোমার বা দাদুর আমলে স্কীলড লেবার পাওয়া যেত না। তোমরা এদের দিয়েই কাজ চালিয়েছ। কিন্তু ড্যাড, বর্তমান অত্যাধুনিক কম্পিউটারাইজড টেকনোলজির ক্ষেত্রে এরা একেবারেই জিরো। এদের তাড়াতে হবেই। আধুনিক মেশিন সম্বন্ধে এরা কি বোঝে বল? এখনকার শ্লোগানই হল অল্পসংখ্যক লোক দিয়ে বেশি কাজ তোলা আর সে জন্যই আমরা পুরনো ইউনিটগুলো বন্ধ করে নতুন নতুন মেশিন বসিয়ে নতুন নতুন ইউনিট খুলেছি। বাধ সাধছে ইউনিয়ন। সরকারের পোষা কুকুরের দল তো মাথায় উঠেই আছে। নামায় কার সাধ্য!'

ইন্দ্রাণী বললেন —'এ ব্যাপারে বান্টুর সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত। স্টেট গভর্নমেন্ট যে আসলে কি চায় বোঝা যায় না। পশ্চিমবঙ্গ তো অন্যান্য অনেক স্টেটের থেকে ইন্ডাস্ট্রিয়েলি পিছিয়েই পড়েছে। সরকার মুখে মুখে শিল্পোন্নয়নের কথা বলে কিন্তু দুহাজার সালে পৌঁছেও ট্রেড ইউনিয়ন পলিসিটা একটুও বদলাবার চেষ্টা করল না। এভাবে তো কারখানা চালানো সম্ভব নয়। সফটওয়ারের যুগে কি বিহার-বাংলার অঙ্গুঠাছাপ লেবারার্স দিয়ে চলে? সরকারের বেকার সমস্যা মেটাবার দায় নিয়ে বসে থাকলে তো আধুনিক শিল্প মাথা তুলতেই পারবে না।'

—'লেবার মিনিস্টার সমীরন পতিতুন্ডুর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলি বান্টু?' — সিদ্ধার্থ জিজ্ঞেস করেন।

—'না ড্যাড। সে অবস্থায় এখনও পৌঁছয়নি। আসছে বুধবার ম্যানেজমেন্ট আবার একটা মিটিং করবে ওদের সাথে। হয়তো কোনও সলিউশন বেরিয়ে আসতেও পারে। দেখা যাক আর কটা দিন। তবে এবার টাকা দিয়ে ইউনিয়ন লিডারদের কিনবো না। মাথানতও করব না। দেখি ওরা কতদুর যেতে পারে কতগুলো অনায্য দাবি নিয়ে।'

সিদ্ধার্থ বান্টুর কথার সমর্থনে মাথা নেড়ে বলেন—'সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিস। দরকার পড়লে লক আউট করে বসে থাকবি। তবু যা তা মেনে নিবি না আর। সরকার যদি এরাজ্যে সত্যিই উন্নয়ন ঘটাতে ইচ্ছুক হয় তাহলে নিজে থেকেই এগিয়ে আসতে বাধ্য হবে মধ্যস্থতা করার জন্য। এতদিন যাদের লাই দিয়ে দিয়ে মাথায় তুলেছে এখন তাদের মাথা থেকে না নামিয়ে উপায় নেই গভর্নমেন্টের। পানিহাটির ইউনিট লক আউট করে

রাখলে আমাদের বিশেষ ক্ষতি নেই। সোনারপুরের ইউনিটটাকে বেশি জোর দিতে থাক। সেটাই পুষিয়ে দেবে।'

ইন্দ্রাণী বলেন —'আগে কখনও আমাদের কল-কারখানায় কথায় কথায় ধর্মঘট হত না। সত্তরের দশকে যখন অন্যান্য বহু নামি-অনামি কারখানায় ক্রমাগত শ্রমিক ধর্মঘট হয়েছে তখনও কিন্তু আমাদের শ্রমিক ইউনিয়ন এসব ধান্দাবাজি করেনি কারণ ওরা নিজেদেরকে মুখার্জিদের ছাতার তলায় যথেষ্ট সিকিওর্ড বলে মনে করত। শ্রমিক—মালিক সম্পর্ক অনেক স্বচ্ছ ছিল। পানিহাটির কারখানায়ই এই নিয়ে দুবার হল। আর দুবারই একই ইউনিয়ন একই জেনারেল সেক্রেটারির অধীনে ধর্মঘট করেছে। এটা জেনারেল সেক্রেটারি স্বরূপ পাল আর ওর বিশেষ চ্যালাদের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির প্রচেষ্টা নয় তো? প্রথমবারে টাকা খাইয়ে ওদের লোভ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। ওদের বিরোধীপক্ষও এখন যথেষ্ট শক্তিশালী। দু-তরফে টিকে থাকার একটা লড়াইও চলছে। আচ্ছা, আমরা বিরোধীপক্ষকে হাত করে নিচ্ছি না কেন? টাকা যদি খাওয়াতেই হয় তাহলে বিরোধীপক্ষকে খাইয়ে এদের গদি উলটে দেবার চেষ্টা করলে আমার মনে হয় প্রবলেমটা এখনকার মতো সলভ হতে পারে।'

নন্দু এতক্ষণ ধরে শ্রোতার ভূমিকায় থেকে শুনে যাচ্ছিল। স্বরূপ পালের ঘরের ভেতরে ভাঙন ধরিয়ে দিতে পারলে বিরোধীপক্ষকে টাকা খাইয়ে হাত করার দরকার হবে না। একবার টাকার গন্ধ পেলে সব পক্ষই একই রকম ব্যবহার করবে—এটাই নিয়ম। যে যায় লংকা সেই হয় রাবণ—কথাই আছে এরকম। স্বরূপ পালের ডানহাত আর বাঁহাত হল মনোজ ব্যানার্জি আর পল্লব ব্যানার্জি — দুই জ্যাঠতুতো খুড়তুতো ভাই। ওদের কাঁধে ভর দিয়েই স্বরূপ পাল ইলেকশনে জিতে পর পর দুবার জেনারেল সেক্রেটারি হয়েছে। মনোজ আর পল্লবকে স্বরূপ পালের দুপাশ থেকে সরিয়ে আনতে পারলেই স্বরূপ খুঁটি উপড়ে মুখ থুবড়ে পড়বে। ওদের ওয়ার্কার্স ইউনিয়নে স্বরূপ শুধু একটা সিম্বল। মনোজ-পল্লবের মধ্যে যে কোনও একজন যদি ইলেকশনে দাঁড়াতো কখনও তাহলে স্বরূপ পাল কোনও দিনই নেতা হতে পারত না। কিন্তু ওরা দুভাই যে কেন নেতা হবার লোভ সম্বরন করে থেকেছে সেটাই আশ্চর্যের ব্যাপার।

সেদিন অফিসে এসে অনেকক্ষণ ধরে নন্দু কয়েকটা ফোন করল। একজনের সঙ্গেই সবচেয়ে বেশি সময় কথা হল। ফোন নামিয়ে রাখার আগে ও বলছিল—'হ্যাঁ হ্যাঁ, আজকেই। আমি আসব। না অন্য কেউ জানুক সেটা আমি চাই না। না না —বাড়িতে পাঠাবেন না। এই প্রশ্রয় আমি দিতে চাই না। অফিসেই —রাত আটটা থেকে ন'টার মধ্যে। ঠিক আছে?'

আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র রোডে মুখার্জি অ্যান্ড মুখার্জি ইন্টারন্যাশনালের হেড অফিসে অনেক দিনই অনেক রাত অব্দি কোনও কোনও ফ্লোরে আলো জ্বলতে দেখা যায়। সাধারণ

কর্মচারিরা ছুটি হলে যথাসময়ে চলে গেলেও বড়ো সাহেবরা থেকে যান। ছ'তলা দৈত্যাকার বাড়িটার একেবারে ওপরের তলায় কনফারেন্স রুমে সাহেবদের কনফারেন্স চলে। সেরাতে অন্য কোনও তলায় নয়, চারতলার একটা রুমের ভারী পরদার আস্তরণ ভেদ করেও বাইরে থেকে আলো দেখা যাচ্ছিল। ওটা সুনন্দা মেমসাহেবের চেম্বার। সেরাতে কোনও কনফারেন্স ছিল না তাই বড়োমেমসাহেব আর প্রেসিডেন্ট সাহেবও ছিলেন না। শুধু ছোটোমেমসাহেব একাই রয়েছেন। জগদীশ বেয়ারা এই বিল্ডিংয়ের ছাদের ওপরে একটা ঘরে থাকে আজ তিরিশ বছর ধরে। ওকে ট্রেন-বাস ধরে বাড়ি ফিরতে হয় না। যত রাতেই কনফারেন্স ভাঙুক না কেন, সব সাহেবরা চলে না যাওয়া অব্দি জগদীশের ছুটি নেই। বড়ো সাহেব সিদ্ধার্থ মুখার্জির খাস বেয়ারা হয়ে ঢুকেছিল জগদীশ। আর কয়েকমাস পর অবসর নেবে। হাত-পা সচল, শরীর স্বাস্থ্য অটুট। এখনও কয়েকবছর চাকরি করতে সক্ষম ও। কিন্তু সেটি হবার নয়। অবসরের বয়সে অবসর নিতেই হবে এখানে। বড়ো সাহেবের হার্টের অপারেশন না হলে ছোটোমেমসাহেব হয়ত কোনওদিন এখানে পা রাখতেন না। বড়ো বাড়ির কথা ওদের জানার কথাই নয় তবু হাওয়া কিছু কথা বয়ে আনে সেই আলিপুরের বাড়ি থেকে এই অফিস বাড়ির ভেতরেও। ছোটোমেমসাহেব নাকি অফিস কাছারি যাওয়া পছন্দ করতেন না। ঘর সংসার নিয়ে থাকতে ভালোবাসতেন। তাঁকে নাকি জোর করেই অফিসের চেয়ারে বসানো হয়েছে।—এসব জগদীশও শুনেছে। ছোটোমেমসাহেব কাজে যোগ দেবার আগেই ও জেনেছে যে ওকেই ছোটোমেমসাহেবের খাস বেয়ারা হতে হবে। চতুর্থশ্রেণির কর্মচারিদের নজরে জগদীশের মানসম্মান আরও বেড়েছিল। পরপর দুজন মালিকের বেয়ারা হওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। বিশ্বাসী না হলে হওয়া যায় না। ঘরে ঢুকতে বেরোতে কত কথাই কানে যায়। সেসব কথা অন্য কারুর কানে যাতে না পৌঁছয় সে ব্যাপারে সাবধান থাকতে হয়। এই আজই তো খালি অফিস বাড়িতে ছোটোমেমসাহেব বসে আছেন কাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য। নীচে সিকিউরিটির লোকদের জানিয়ে দিয়েছেন দুজন লোক আসবে। পাস দেখে ওদের ওপরে পাঠাতে! জগদীশকেও বলেছেন—'জগদীশ তুমি খেয়াল রেখো, দুজন লোক আসবে। তাদেব আইডেনটিটি পাস এনে আমাকে দেখাবে আগে তারপর আমি বললে এখানে নিয়ে আসবে। একটু বেশি রাতও হতে পারে, তুমি কিন্তু কাছাকাছি থেকো। চায়ের ব্যবস্থাও রেখো।' — মুখার্জি ইন্টারন্যাশনালের চাকরিতে যথেষ্ট লাভ আছে। মাইনেপত্র অত্যন্ত ভালো দেয়। বছরে বছরে ঠিকসময়ে ইনক্রিমেন্ট হয়। মেডিক্যাল বেনিফিট, প্রভিডেন্ড ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, সুপার এনুয়েশন — কিছুই বাদ নেই যা ওরা দেয় না। একটু ওপরের দিকের লোকরা তো হাউসরেন্টও পায়। ওদের যোগ্যতার সম্মান ওরা তো পাবেই—এসবের জন্য জগদীশ লালায়িত হয় না। ও নিজে ওইটুকু বিদ্যা পেটে নিয়ে মুখার্জিদের কাছ থেকে কম তো পায়নি। দুটো ছেলে দুটো মেয়েকে উচ্চশিক্ষা দিয়েছে।

দেশে টিনের চালের ঘর ভেঙে পাকা বাড়ি বানিয়েছে, —সবই এঁদের কৃপায়। তবুও কেন যে কিছু লোক সন্তুষ্ট থাকে না বোঝে না জগদীশ। পানিহাটির কারখানায় শুধু শুধু বে-ফালতু হরতাল টরতাল করে একটা গন্ডগোল পাকাচ্ছে। এরা তো যোগ্যতার দাম দেয়। যদি যোগ্যতা থাকে তবে দাম তোরা পাবি। কিন্তু কিছু অযোগ্য লোককে পুষে রাখা মানে তো নিজের মুখের গড়াস ছিটিয়ে কাকের পাল ডেকে আনা। কেন বাপু এসব ঝুট-ঝামেলা ডেকে আনিস তোরা ইউনিয়নের নাম করে? জগদীশ ইচ্ছে করলে আরও দশবছর ভালোভাবে কাজ করতে পারে—সে কর্মক্ষমতা ওর আছে। কিন্তু এমন অন্যায় আব্দার ও করবে কেন? ষাট বছরে রিটায়ার হতে হবে তো ষাটবছরেই হবে। আরও এক্সটেন্ড করার জন্য ইউনিয়নকে ধরে ধর্মঘট বাঁধাবে না। —জগদীশ পর্দা সরিয়ে মেমসাহেবের ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করে —'মেমসাহেব একটু কফি করে দেব? অনেকক্ষণ থেকে কিছু চান নি তাই আমি জিজ্ঞেস করতে এলাম।

—'খুব ভালো করেছ জগদীশ। কফি পেলে ভালো হয়। গলাটা শুকনো লাগছে। নাসরীনকেও চলে যেতে বলে ঠিক করিনি।' —একেবারে আন্তরিক ভাবে কথা বলেন ছোটোমেমসাহেব। ঠিক ওর শ্বশুরের মতো। বিগলিত জগদীশ একটু পরেই কফি এনে দেয়। টেবিলের কাগজপত্রগুলো গুছিয়ে রাখে। নন্দু কফিতে চুমুক দিয়ে বলে—'আঃ! খুব ভালো বানিয়েছ।'

—'আজ্ঞে, আমি কি আর নাসরীন ম্যাডামের মতো বানাতে পারি? ওই চেষ্টা করেছি আরকী!' —চিরকালের অনুগত ভৃত্য জগদীশকে দেখতে থাকে নন্দু। মনের ভেতরে কিছু ভাবনা খেলা করে। আজ যারা আসবে তাদের মধ্যে কি কৃতজ্ঞতা বোধ, আনুগত্য খুঁজে পাবে ও? অনেক আশায়, কাউকে না জানিয়ে, একান্ত গোপনে যে কাজটা করতে যাচ্ছে ও আজ রাতে সেটা কতটা সফল হবে কিংবা কতটা বিফল হবে জানে না নন্দু। তবু একবার পরখ করে বাজিয়ে দেখতে চেয়েছে। একমাত্র ও আর পানিহাটির ফ্যাক্টরি ম্যানেজার সঞ্জীব সরকার ছাড়া আর কেউ জানে না। আর হেডঅফিসের সিকিউরিটিরা তো চেনেই না ওদের। জগদীশও চেনে না। একেবারে গোপনে করবে বলেই ও ওর পি. এ. নাসরীনকেও সরিয়ে দিয়েছে। যদি কাজ হয়ে যায় তাহলেও ও কারও কাছে মুখ খুলবে না নিজে ক্রেডিট নেওয়ার লোভে। সঞ্জীব সরকার অত্যন্ত দায়িত্ববান মানুষ যাকে কনফিডেন্সে নেওয়া যায়। তবে উনি নিজে আসতে চাইলেও নন্দুই বারণ করেছে। মনোজ আর পল্লবকে ও একা ফেস করতে চায় ওর নিজের পদ্ধতিতে। ঘড়ির দিকে তাকালো নন্দু—এখন আটটা কুড়ি। যে কোনও সময় এসে পড়বে ওরা। সময় রাত নটা অবধি দিয়েছে এই সিক্রেট মিটিংয়ে আসবার জন্য। —একা একা বসে সময়ের ঘড়ির কাঁটা পার হতে হতে থিরথির করে উত্তেজনা ছড়াতে থাকে নন্দুর শরীরের স্নায়ুগুলোর মধ্যে। আজ থেকে কয়েকবছর আগেও এসব করার কথা কল্পনাতেও আনতে পারত না ও। বাপের বাড়ির আদরে লালিত, স্বামীর ভালোবাসার গলিত রসে ডুবে থাকা লবঙ্গলতিকা,

দুটি সুন্দর ছেলেমেয়ের মা হবার গরবে গরবিনী সুনন্দা মুখার্জি স্বপ্নেও ভাবেনি কোনওদিন যে এতবড়ো ট্রান্সফরমেশন ওর নিজের জীবনে ঘটতে পারে। অপুর মতো সাধারণ একটি মেয়ের সঙ্গে যে সুনন্দা এঁটে উঠতে পারেনি কোনো সময় সে কিনা আজ নিজের বুদ্ধির ওপর আস্থা রেখে ইউনিয়নের দুই মস্তান পান্ডার সঙ্গে গোপন একক বৈঠক করে সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজতে সচেষ্ট হয়েছে। বিফল হবার সম্ভাবনাই বেশি ভেবে পরে যাতে সকলের কাছে হাস্যাস্পদ হতে না হয় সেইজন্য তথাগতকেও আভাসটুকু দেয়নি। কারণ তথাগতই সবচেয়ে আগে বলবে —'এসব ব্যাপারে তোমার কোনও অভিজ্ঞতাই নেই তা সত্ত্বেও তুমি এসব করতে কেন গিয়েছিলে? দিলে তো পুরো মামলাটাকে আরও জটিল করে?'

—'ছোটো মেমসায়েব! ওরা এয়েছেন'।— জগদীশ যে কখন পর্দা সরিয়ে ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে নিঃশব্দে টেরও পায়নি নন্দু। ওর মুখে 'ওরা এয়েছেন' শুনে সচকিত হয়ে ওঠে ও। বলে —' কোথায় ওরা?'

—'ওয়েটিং রুমে বসিয়ে এসেচি। এই যে আইডেনটি পাস।' —পাস দুখানা টেবিলের ওপরে রাখে জগদীশ।

—'ঠিক আছে। তুমি ওদের এখানে পৌঁছে দিয়ে ধারে কাছেই থেকো। আর বেল দিলেই চলে এসো।'

জগদীশ চলে যেতে নন্দু পাসদুটো তুলে দেখতে থাকে। পাসপোর্ট সাইজ রঙীন ছবিতে যে দুটো মুখ দেখা যাচ্ছে এইমুখগুলো দুজন পোড় খাওয়া মধ্যবয়সি লোকের। মুখের চেহারাতে কোনও বিশেষত্ব নেই। হাটে-ঘাটে-পথে বাজারে এরকমই সব মুখের ভিড় দেখতে পাওয়া যায়। নন্দুর হঠাৎ মনে হয় ও এদের একেবারেই চেনে না। এরা হাজার হাজার মানুষেরই প্রতিচ্ছবি, জীবনযুদ্ধে ক্রমাগত লড়াই করে করে একই রকম রেখাঙ্কিত সবপুরুষের মুখের প্রতিভূ হয়ে গেছে।

পরের বুধবারে ম্যানেজমেন্টের সাথে ধর্মঘটি ইউনিয়নের ডিক্লেয়ার্ড মিটিংয়ের আগেই পানিহাটি কারখানায় অনেকগুলো ঘটনা ঘটে গেল। রাজ্যসরকার পন্থী ধর্মঘটি শ্রমিক নেতা স্বরূপ পালের ডাকা গেট মিটিংয়ে ধর্মঘট সমর্থনকারী শ্রমিকদের টিকির নাগালও দেখা গেল না। মাত্র হাতেগোনা গোটাকয় চামচা নিয়ে স্বরূপপাল মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে মালিকপক্ষের দুর্বিনত জেদের সামনে মাথানত না করে নিজেদের দাবিতে অটল থাকার আকুতি জানিয়ে যেতে থাকলো। অন্যদিকে দেখা গেল রাজ্যসরকার বিরোধী এবং ধর্মঘট বিরোধী ইউনিয়নটিও অন্য আর একটি গেটে মিটিং করে এই অকারণ, অনায্য, অন্যায় ধর্মঘটে সামিল না হবার জন্য শ্রমিক ভাইদের কাছে যুক্তির পর যুক্তি খাড়া করে প্রবল উত্তেজিত ভাষণ দিয়ে যাচ্ছে। আর এসবের মধ্যে সবচেয়ে চমৎকৃত দৃশ্যটি দেখা গেল কার্ড পাঞ্চ করানোর জন্য বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের সামনে গতকাল অবধি ধর্মঘটে

সামিল হওয়া, অনশন ধর্মঘটের হুমকি দেওয়া শ্রমিকদের ধর্মঘট প্রত্যাহার করে কাজে যোগ দেবার জন্য লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার দৃশ্য।

ধর্মঘটি নেতার আকুতিতে কান না দিয়ে, বিরোধীপক্ষের গেট মিটিংয়ে যোগদান না করে, ধর্মঘট ভেঙে দিয়ে প্রায় পঁচাশি শতাংশ শ্রমিক কার্ড পাঞ্চ করিয়ে ঢুকে গেল যার যার ডিপার্টমেন্ট-এ। স্বরূপ পাল বিস্মিত দৃষ্টিতে ওর অনুগামী শ্রমিকদের ওকেই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে চলে যেতে দেখল।

—'এটা কি হল?' — বিশেষ কাউকে উদ্দেশ্য না করে স্বরূপ পালের আহত বিস্ময় প্রশ্ন হয়ে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল।

গন্ডগোলের গন্ধ শুঁকে জড়ো হওয়া টি. ভি. চ্যানেল আর সংবাদপত্রের ফটোগ্রাফারদের ক্যামেরার শাটার টানার চিঁ-ই-ই শব্দ শোনা যেতে লাগল। রিপোর্টারদের আঙুল নোটপ্যাডে দ্রুত গতিতে চলতে লাগল .....'পানিহাটির কারখানায় বিনা যুদ্ধে মালিকপক্ষের যুদ্ধ জয়। সি. টু.র ইউনিয়ন ভেঙে গেল।' .... 'সি. টু. র ধর্মঘটের সমর্থক ধর্মঘটি শ্রমিকরা নিজেরাই ধর্মঘট তুলে নিলেন।' ..... 'জেনারেল সেক্রেটারি স্বরূপ পালের সমস্ত আবেদন নিবেদন অগ্রাহ্য করে পঁচাশি শতাংশ শ্রমিক নিজ ইচ্ছায় কাজে যোগ দিয়ে সি. টু.র ডাকা পানিহাটির মুখার্জি ইন্টারন্যাশনালের কারখানার একসপ্তাহ ব্যাপী ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নিলেন' .... 'পানিহাটির মুখার্জি অ্যান্ড মুখার্জি ইন্টারন্যাশনালের কারখানায় সি. টু.র ইউনিয়ন বিপদগ্রস্ত। শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে আমাদের সাংবাদিকরা জানতে পারেন যে এই ধর্মঘট ডাকার পেছনে ইউনিয়নের নেতারা যে সিক্স পয়েন্ট দাবি রেখেছিলেন সেগুলো নিতান্তই অযৌক্তিক বলে মনে হওয়াতেই তারা ধর্মঘট প্রত্যাহার করে কাজে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তারা আরও জানিয়েছেন যে মালিকপক্ষ লক আউট করে দিলে নেতারা নন, বিপদে পড়বেন শ্রমিকরাই। মালিকপক্ষ কারও ওপরে জোর করে ভি. আর. এস চাপাননি, প্রস্তাব রেখেছেন মাত্র। যে দশজন শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছেন তারা কেউই কোম্পানির নিযুক্ত পারমানেন্ট শ্রমিক নন। এদেরকে পারমানেন্ট না করে ছাঁটাই করার সিদ্ধান্তকে কর্মরত অধিকাংশ শ্রমিক অন্যায় বলে মনে করেন না।' (এরপর পাঁচের পাতায়) ... ... ইত্যাদি।

মুখার্জি ম্যানশনে মর্নিংগ্লোরিতে সকালবেলার চায়ের আসর আজ জমজমাট। খবরের কাগজের পাতা নিয়ে টানাটানি। তিনখানা ইংরেজি কাগজ ছাড়াও আজ নন্দু বিশেষ ভাবে প্রত্যেকটা বাংলা কাগজ আনিয়েছে গতকাল সন্ধেয় বাংলা টি. ভি. চ্যানেলগুলোতে পানিহাটির কারখানার ঘটনা চাক্ষুষ করার পর। বাংলা কাগজগুলো ও নিজেই জোরে জোরে পড়ে শোনাচ্ছে কারণ ইন্দ্রাণী বাংলা পড়তে পারেন না। শোনা, পড়ার মাঝে মাঝে প্রত্যেকেই যে যার কমেন্টও চালিয়ে যাচ্ছেন।

—ব্যাপারটা যে এত সহজে, এভাবে মিটবে ভাবতেই পারিনি।' ..... তথাগত।

—'অন্যায় আবদার যেভাবেই শেষ হোক হয়েছে যে এটাই ভালো কথা। ওয়ার্কার্সদেরও ফ্যামিলি আছে। ওরা বুঝতে পেরেছে যে ইউনিয়ন লিডাররা সবসময় সঠিক কাজ করে না। ওরা তো বলেছে যে ফ্যাক্টরি যদি লক আউট হয়ে যায় ইনডেফিনীট পিরিওডের জন্য তাহলে ওদের ফ্যামিলি খেতে পাবে না। ঘরে উনুন জ্বলবে না।' ...... ইন্দ্রাণী

—উহুঁ! এত সহজ নয় ব্যাপারটা। রহস্যময়! আমি ক্লুটা খুঁজে পাচ্ছি না।' ——— সিদ্ধার্থ।

—'কোনও রহস্য টহস্য নয় ড্যাড। তোমাকে ক্লু টু খুঁজতেও হবে না। মম যা বলেছে সেটাই ঠিক। দিনকাল বদলাচ্ছে ড্যাড। ওয়ার্কার্সরাও আজকাল লিডারদের কথায় আগুনে ঝাঁপ দেয় না আগেকার মতন। ওরা এখন ভাবে।' .... সুনন্দা। মনের পর্দায় দিনতিনেক আগে ওই রাত্তিরের কথা ভেসে ওঠে ওর।

সেই রাত্তিরে পুরনো বেয়ারা জগদীশ যখন আগন্তুক দুজনকে সুনন্দার চেম্বারে এনে দিয়ে বাইরে চলে গেল তখন আড়ষ্ট হয়ে থাকা দুই আগন্তুকই হাতজোড় করে নমস্কারের ভঙ্গীতে বলেছিল—'নমস্কার মেমসাহেব।'

সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে মেমসায়েব সুনন্দা মুখার্জি সামনের চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করে বলেছিল—'বসো তোমরা।'

ওরা তবুও বসতে ইতস্তত করছে দেখে দ্বিতীয়বার বলতে হয়েছে — আরে বসো। নাহলে কথা বলব কি করে?'

চেয়াব টেনে বসার পরও ওরা আড়ষ্ঠ হয়েই অপেক্ষা করছিল। নিজে থেকে কোনও কথাই বলেনি।

সুনন্দাকেই কথা শুরু করতে হয়েছে—'অফিসে ডেকে এনেছি বলে এটা কিন্তু অফিসিয়েল মিটিং নয়। একদিন তোমাদের আমার সাহায্যের ভয়ানক দরকার ছিল আজ আমার তোমাদের সাহায্যের ভয়ানক দরকার তাই ডেকেছি। যেহেতু, মিটিংটা ব্যক্তিগত কারণে সেজন্যই তোমরা আমাকে মেমসাহেব না বলে নন্দুপিসি বললেই আমি বেশি সহজ বোধ করব। এবার বল তোমাদের মধ্যে কে মনা আর কে পটু? আমি তো তোমাদের আগেকার মুখ, চেহারার সঙ্গে বর্তমান মুখ মেলাতেই পারছি না। কচি মুখগুলো বদলে গেছে একেবারে। অবশ্য একবারই মাত্র দেখেছিলাম তোমাদের।'

ব্যাস্। শুধু একটু স্বীকৃতিরই প্রয়োজন হয়েছিল ওদের। এরপর দু-দফা চা বিস্কুট-সন্দেশ সহযোগে রাত এগারোটা অবধি একেবারে কর্ডিয়েল পিসি-ভাইপোর সম্পর্ক। সমস্ত প্ল্যান ওদেরই রাজনীতিতে পাকা দাদা সুলভ মস্তিষ্ক থেকে বেরিয়েছিল। ওরাই বলেছিল —'সি. টু. আমাদেরই ইউনিয়ন। স্বরূপ পালের বিরুদ্ধে আমাদের

হউনিয়নের সমর্থক কর্মচারীদেরই অনেক অভিযোগ আছে। ইউনিয়নটাকে ভেঙে দুটুকরো করে দিলেই ধর্মঘট ব্যর্থ হয়ে যাবে নন্দুপিসি। আপনি চিন্তা করবেন না। বুধবারের আগেই সব হয়ে যাবে।' —দারুণ কনফিডেন্টলি বলেছিল ওরা।

এরপর নন্দু পারিবারিক প্রশ্নগুলো করেছিল। যুথীপিসি, সজলকাকু, কাজলকাকুদের খবর নিয়েছিল। অপুর স্বামী শশধরবাবুর কোনও খোঁজ পাওয়া গেল কিনা জিজ্ঞেস করেছে। পুঁটু বলল—'না, নন্দুপিসি, ছোটোপিসেমশাই যেন কপ্পুরের মতো উবে গেলেন। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনও দিয়েছিল ওর বোন। কোনও খবর পাওয়া যায়নি।'

—'ছোটো পিসি যে মারা গেছে সে খবরটাও পিসেমশাই আমাদের বাড়িতে জানান নি। মারা যাওয়ার তিনদিন পর আমিই এসেছিলাম হাসপাতালে ছোটোপিসিকে দেখব বলে। তুমি যে কেবিনে রেখেছিলে ছোটোপিসিকে সেখানে গিয়ে দেখি অন্য আর একজন শুয়ে আছে। খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলাম জানো? পরে খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারি তিনদিন আগেই ছোটোপিসি মারা গেছে। পিসেমশাই কেন যে এরকম করলেন আজও আমরা কেউ বুঝতে পারলাম না। আশ্চর্য মানুষ উনি।' —মনার গলায় রাগ আর দুঃখ দুইই একসঙ্গে প্রকাশ পায়।

নন্দু বুঝতে পারে এরাও মানুষ খারাপ নয়। জগদীশ বেয়ারা একা নয়, এরাও যথেষ্ট লয়েল। উপকারীর উপকার ভুলে যায় নি। এবার ইলেকশন হলে এই মনা বা পুঁটুর মধ্যে কেউ একজনই ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারি হবে—এ ব্যাপারে ও নিশ্চিন্ত। বাড়িতে ডেকে আত্মীয়তা না পাতিয়েও ও ইচ্ছে করলেই এদের হাতের মুঠোয় পুরে রাখতে পারে। এদের দুজনেরই এখনও বহুদিন চাকরি আছে। ইউনিয়নে এদের যথেষ্ট কদর আছে তাই ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে ও পিসিসুলভ আন্তরিকতায় জিজ্ঞেস করে— তোরা বিয়েটিয়ে করেছিস? বুলার নিশ্চয়ই বিয়ে হয়ে গেছে? কেমন আছে ও? ছেলে-মেয়ে হয়েছে? বুলার আর যুথীপিসির কথা আমার খুব মনে পড়ে জানিস?

পল্লব ওরফে পুঁটু লজ্জা লজ্জা মুখ করে বলে —'আমাদের সকলেরই বিয়ে হয়ে গেছে। আমার একছেলে। এবার এইচ. এস. দেবে। মনার মেয়ে বড়ো। ছেলেটা ছোটো। ওর মেয়ে ক্লাস নাইনে আর ছেলে সেভেনে পড়ে। বুলা ভালো আছে নন্দুপিসি। ওর দুটো ছেলে। তুমি আমাদের সকলের নাম পর্যন্ত মনে রেখেছ নন্দুপিসি?'

নন্দু একথার উত্তর না দিয়ে বলে---'পুঁটু তোর ছেলেকে এইচ. এস. টা ভালো করে পাস করতে বল। কি নিয়ে পড়ছে? সাইন্স না কমার্স?'

—'সাইন্স নিয়েই পড়ছে। ইঞ্জিনিয়ার হবার স্বপ্ন দেখে। আমাদের তো লেখাপড়া হল না তেমন।

আমাদের বাবাদের ক্ষমতাও ছিল না ভালোভাবে লেখাপড়া শেখানোর। আমাকে আর মনাকে তুমি চাকরি না দিলে আমাদের ছেলেমেয়েরাও আমাদের মতোই হত নন্দুপিসি।

আমার ছেলের প্রাইভেট টিউশনির পেছনে আমি মাসে বারোশো টাকা খরচ করতে পারছি যা বাবারা পারেনি করতে।'

নন্দু হাতঘড়িতে দেখে এগারোটা। বলে—'রাত এগারোটা বেজে গেল। তোরা এবার ওঠ। অনেকদূরে যেতে হবে তোদের, বাস পাবি তো?'

মনা বলে ওঠে—' ও নিয়ে তুমি ভেবো না, আমরা ঠিক চলে যাব।'

—'পুটু তোর ছেলে ইঞ্জিনিয়ার হবে। ওর স্বপ্ন সার্থক করতে আমি সাহায্য করব। নে এখন ওঠ।'

আশ্চর্য! সেরাতে প্রথমে কাজের কথা বলার পর নন্দু যখন ' ছোটোমেম সাহেবের ' খোলশ ছেড়ে সত্যিই নন্দুপিসির মতো আন্তরিক কথা বলেছিল, যখন ওরাও আড়ষ্টতা কাটিয়ে উঠে ফ্রি হয়ে নিজেদের কথা বলেছিল, পরিবারের সকলের সংবাদ পরিবেশন করেছিল নন্দু পিসির কাছে তখনও একবারের জন্যও মনা-পুটু বলেনি—'নন্দু পিসি তুমি একদিন এসো না মনসাতলার বাড়িতে। বড়পিসি, বাবা-কাকারা সবাই তোমাকে দেখতে চায়।' — অপু হলে মুহূর্তে দূরত্ব ভেঙে কাছে আসার চেষ্টা করত কিন্তু অপুর ভাইপোরা করেনি। চলে আসার সময় ওরাও উঠে দাঁড়িয়ে ছিল নন্দুও উঠে পড়েছিল, দু ভাই নীচু হয়ে নন্দুর পায়ে প্রণাম করে শুধু বলেছিল— 'কিছু চিন্তা করো না নন্দুপিসি, শুধু দেখে যাও আমরা কি করতে পারি।'

শ্বশুর-শাশুড়ি এবং তথাগত কখন ব্রেকফার্স্ট টেবিল ছেড়ে চলে গেছে খেয়ালও করেনি ও। মুখের সামনে আনন্দবাজার পত্রিকাটা খুলে রেখে সেইরাতে ফিরে গিয়েছিল। অপু মরেও ওর জীবনের সঙ্গে এখনও জড়িয়ে আছে। আজ বারবার অপুর কথা ভীষণ মনে পড়ছে ওর। যেদিন অপুর সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিল, সেই যেদিন যুথীপিসি আর কাজলকাকু অপুকে দেখতে এসেছিল, যেদিন প্রথম ওর বিবেক জেগে উঠেছিল এই পরিবারটার জন্য উপায় থাকতেও কিছুই না করার লজ্জায়, সেদিন কাজলকাকু যখন কেবিনের ভেতরে গিয়ে অপুকে বলেছিল — 'নন্দু মনা-পুটুকে চাকরি দেবে রে। এই দ্যাখ কার্ড দিয়েছে ; ওর সঙ্গে গিয়ে দেখা করতে বলল। দেরিতে হলেও নন্দু তোর কথা রেখেছে অপু।'

গর্তের ভেতর থেকে তাকানো অপুর চোখের দৃষ্টিতে নন্দু সেদিন কৃতজ্ঞতা দেখেনি। ওর চোখে যেন এক অজেয় যুদ্ধ জয় করার ভাষা ফুটে উঠেছিল। জীবনের প্রতি পদে পদে হেরে যাওয়া অপুর চোখে মরবার আগে প্রথম জিতে যাওয়ার অহংকার ফুটে উঠেছিল। অপু এমন কতগুলো কথা বলেছিল যে কথাগুলো আক্ষরিক অর্থে এই মুহূর্তে মনে না পড়লেও ভাবার্থ মনে আছে নন্দুর। অপুর মুখে ওরকম কথা আশাই করা যায় না বলে নন্দুর মনে হয়েছিল মৃত্যুর আলো অপুকে বদলে দিচ্ছে। একেবারে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, মৃত্যুর চোখে চোখ রেখে চিরকালের উগ্র ছন্নছাড়া অপু হঠাৎ বোঝনদার, মার্জিত হয়ে উঠেছে। কি যেন বলেছিল ও কাজলকাকুকে? বোধহয়

এরকমকিছু বলেছিল—'দ্যাখ নন্দু তোদের আপন বলে ভাবে রে! তোদের কষ্ট দেখে ওর কষ্ট হয়েছে তাই মনা -পুঁটুকে চাকরি দিচ্ছে। বেঁচে গেলি তোরা। তাই বলে বারবার ওর কাছে চলে যাস না যেন। বিরক্ত করিস না ওকে। ওর উপকার মনে রাখিস ..... এরকমই কিছু কথা বলেছিল। -- তাই কি অপুর কথা রাখতে এতবছরে একদিনও কাজল কাকু সজলকাকুরা বা ওদের ছেলেরা কোনওদিন আর নন্দুর সামনে এসে দাঁড়ায়নি?

কৃতজ্ঞতার বাঁধনে বাঁধা পড়ে আছে বলেই মনা-পুঁটুরা নন্দুপিসিকে সাহায্য করতে এতটুকুও দ্বিধাগ্রস্থ হয়নি? কোনও রকম ঘনিষ্ঠতা করার প্রয়াসটুকুও প্রকাশ পায়নি ওদের ব্যবহারে? ধ্বংসের মুখ থেকে এতবড়ো একটা পরিবারকে একদিন বাঁচিয়েছিল বলে এখন ঋণ শোধ করার সুযোগ পেয়েই ঋণ শোধ করেছে? নবীনদাদুর পরিবারকে ওরা যে চিরকাল নীচু নজরে দেখেছে সেসব ভুল, ভ্রান্ত ধারণা ছিল। অপুর কথা বাদ দিলে পরিবারের অন্যরা লেখাপড়া না শিখলেও অন্তরে মনুষ্যত্ববোধের অভাব ছিল না একথা আজ বুঝতে পারল নন্দু। এখনও ভাবতেই লজ্জা করছে যে মনা-পুঁটুকে চাকরি দেবার পর থেকে ও কনস্ট্যান্ট সারভেইলেন্সে রাখত গোপনে। ওদের রাজনীতি করা মস্তান দাদা ছাড়া আর কিছুই কখনও ভাবেনি। যদিও ওদের বিরুদ্ধে কোনও ক্রিমিন্যাল রিপোর্ট ওর কাছে কখনও জমা পড়েনি তবুও ওদেরকে কোনদিনো 'ভদ্রলোক' বলেও ভাবেনি ও। আর সেজন্যই ওদের ডেকে এনে নিজের কাজ উদ্ধার করার জন্য ব্যবহার করার আগে মনে করিয়ে দিয়েছিল—'একদিন তোমাদের ভয়ানক প্রয়োজনে আমি তোমাদের সাহায্য করেছিলাম, আজ আমার ভয়ানক প্রয়োজনে তোমাদের সাহায্য চাই'। —একা একা বসে এসব ভাবতে এখন খুব লজ্জা করছে ওর। এই কথা কটা না বলে সোজাসুজি সাহায্য চাইলেও নন্দুপিসির কারখানায় ঝামেলা মেটানোর জন্য ওরা যে সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত এব্যাপারে এখন আর কোনও সন্দেহ নেই ওর মনে। নন্দুপিসি ওদের আপনজন বলে মনে করেছে এটুকু পাওয়াতেই ওরা সন্তুষ্ট থাকতে জানে।

মানুষ চিনতে আমার যে কত ভুল হয়েছে! কখনও বংশকৌলীন্য দিয়ে, কখনও অর্থ কৌলিন্য দিয়ে, কখনও সামাজিক স্ট্যাটাস দিয়ে বিচার করতে চেয়েছি, শুধু মানুষ বলে বিচার করিনি।

॥ এগারো ॥

অম্বিকাচরণের চেম্বারের বারান্দায় রোগা যে বুড়িটা দিনের বেশিরভাগ সময় বসে সামনের রাস্তার দিকে তাকিয়ে চলমান গাড়িগুলোর ধুলোওড়া দেখে, যার মাথার পাতলা হয়ে যাওয়া সাদা শনের মতো চুলগুলো বিউলির ডালের বড়ির আকারে মাথার পেছনে একটা খোপা হয়ে আটকে থাকে, যার পাশে একটা লাঠি রাখা থাকে সে যে যুথী একথা কেউ না বলেদিলে নতুন মানুষরা বুঝতেই পারবে না। ধন্বন্তরী অম্বিকাচরণের চেম্বারটা

এখন আর ডাক্তারদের চেম্বার নয়। ওটাই যুথীর থাকার ঘর। ভেতরের দিকে অন্য একটা ঘরে যুথীর বিধবা মেয়ে ওর দুই মেয়েকে নিয়ে থাকে। বাড়ির অর্দ্ধেকটা ভাড়া দিয়ে দেওয়া হয়েছে। যুথীর নিজের পেনশন আর মেয়ে ওর স্বামীর পেনশনের যে টাকাটা পায় তাই দিয়ে ভালোভাবে চলে না। তাই বাড়ি ভাড়া দিতে হয়েছে, জামাই ক্যান্সার নিয়েও বেশ কয়েক বছর বেঁচে ছিল। এমনকি পেটের দুদিকে ঝোলানো দু-দুটো প্লাষ্টিক ব্যাগ নিয়ে রিক্সায় চড়ে অফিসেও গেছে। সহকর্মীদের সহমর্মিতায় যতটা সম্ভব কম কাজের ভার সামলাতে বিশেষ বেগ পেতেও হয়নি ওকে। পেচ্ছাপ পায়খানা প্লাষ্টিক ব্যাগগুলোতে জমা হত টিউবের মাধ্যমে। বছরে একবার করে ভেলোরে গিয়ে দেখিয়ে আসত। দিব্যি চলছিল সবকিছু। যুথীর মনে আশার পাখিরা ডানা মেলে ওড়াউড়ি করত। ভাবত কত উন্নত হয়ে গেছে ডাক্তারি শাস্ত্র, ক্যান্সার রুগিকেও এতগুলো বছর বাঁচিয়ে যখন রেখেছে এমনকি চলাফেরা করার ক্ষমতাও তৈরি করে দিয়েছে তখন আরও অনেক বছর টিকে থাকবে ওর জামাই। মাত্র সাতাশ বছর বয়সের মেয়েটার জীবনে এই অভিশাপ নেমে এসেছিল। মেয়ের দিকে তখন তাকাতে ভয় করত যুথীর। এই বয়সে স্বামীসুখ বঞ্চিত দুটো মেয়ের মা হয়ে ওর মেয়েটার মুখ থেকে সব হাসি মুছে গিয়েছিল। রুক্ষ, শুকনো মুখে আগের লাবণ্যতার চিহ্নটুকুও ছিল না। স্বামীর কাছ থেকে সাংসারিক কাজে কোনও সাহায্য পাওয়া তো দূরের কথা উলটে স্বামী নিজেই আরও একটা বাচ্চা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাকে সবকিছু করে দিতে হয়। আর যুথীর তো শুধু পাহারাদার হয়ে বাড়িতে থাকাটুকুই সার। কোমর ঝুঁকিয়ে যে একটু কাজ করে মেয়েটাকে সাহায্য করবে সে উপায়ও নেই। তবুও জামাইটা বেঁচেছিল এটাই তখন মনে হত অনেক। সেটাও সইলো না কপালে! আজই হোক আর কালই হোক -এ রোগে মরতেই হবে। মরে গেল যুথীর জামাই। জামালপুরের কোয়ার্টার ছেড়ে মেয়েকে নিয়ে মনসাতলায় ফিরে আসতে হল যুথীকে।

নাতনি দুটো বড়ো হয়েছে, ওরা স্কুলে চলে যায়। মেয়েটাও শিশুনিকেতন নামে বাচ্চাদের একটা স্কুলে পড়াতে যায়। মনসাতলারই একজন মহিলা স্কুলটা খুলেছেন। প্রাইভেট স্কুল, মাইনে তেমন নয়। বড়োজোর হাতখরচ টুকুই চলে তবুও মেয়েটা একটা অবলম্বন ধরে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে। স্থানীয় এম. এল. এ. নাকি স্কুলটাকে বড়ো করার, মাধ্যমিক পর্যন্ত ক্লাস খোলার জন্য ব্যবস্থা করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। যুথীর মেয়ে ওই আশ্বাসের দিকে তাকিয়ে আছে। সাধারণ গ্র্যাজুয়েট, এ জমানায় এদের জন্য চাকরী কোথায়? যুথীর কোনও কাজ থাকে না ওরা সবাই বেরিয়ে গেলে তাই রোজই ও এই চেম্বার ঘরের সিঁড়িতে বসে থাকে আর পুরনো স্মৃতির মজা পুকুরটাতে সাঁতার কাটতে থাকে। রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়া অচেনা দুষ্টু ছেলের অচেনা মা যুথীর দিকে দেখিয়ে চঞ্চল ছেলেকে ভয় দেখিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করে কখনও কখনও —'ওই দ্যাখ। জটাই বুড়ি বসে আছে লাঠি নিয়ে। দুষ্টুমি করলেই ধরে নিয়ে যায়।' যুথী নিজের কানে শুনেছে

বলতে। যুথীর তখন নিজের ছেলের কথা মনে পড়ে। কত বছর পার হয়ে গেল, সেই যে গেল আর এল না ফিরে। সবাই বলে ও নেই, মারা গেছে। কিন্তু মারা গেলে সমুদ্র তো ওর দেহটা ফেরত দিত। যুথী মানতে পারেনি ওর ছেলে নেই। লোকে বলতো দেহটা মাছে টাছে খেয়ে ফেলেছে । এসব শুনলে ওর যে কি কষ্ট হত সেটা কেউ বুঝতো না। ওর কল্‌জের টুকরো ছেলেকে বড়ো বড়ো ধারালো দাঁতে মাছ বা অন্য কোনও সামুদ্রিক জীব খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে — এ দৃশ্যটা কল্পনা করতে পারত না ও। কোন্‌ মা পারে? — এখন যুথীর মনে হয় ওর ছেলে নেই। যে কোনও কারণেই হোক ছেলের দেহটা পাওয়া যায়নি। এই বারান্দায় বসে রাস্তার চলা স্কুটার, অটোরিক্সা, গাড়ি, সাইকেল ভ্যান, রিক্সার জটপাকানো জ্যাম আর ধুলোওড়া দেখতে দেখতে যুথীর নিজের শাশুড়ির কথা মনে পড়ে। বংশ রক্ষা বংশ রক্ষা করে করে পাগল মানুষটার আত্মা কি ব্রহ্মাণ্ডের সাথে মিশে গিয়েও কষ্ট পাচ্ছে বংশটা শেষ পর্যন্ত রক্ষা করা গেল না বলে? বাতি দেবার কেউ থাকল না বলে? কার অভিশাপ ছিল যুথীর ওপর? জেনেশুনে কারও ক্ষতি ও কোনওদিন করেনি তবু কে এমন অভিশাপ দিল যে যুথী সর্বস্ব হারিয়ে একা হয়ে গেল? মৃত্যু নানারূপে অসময়ে এসে বার বার ওর প্রিয়জনদের এক এক থাবায় তুলে নিয়ে গেল? আর ওকে গাড়ীর চাকায় পিষ্ট হওয়া ধূলোর মত বার বার পিষ্ট হতে হলো। অপুও অসময়ে গেছে। যতদিন বেঁচেছিল সুযোগ পেলেই বড়দিকে দোষ দিয়েছে ওর জীবন নষ্ট করার জন্য। বউভাতের রাত্রে শ্বশুরবাড়ি থেকে পালানো অপু যুথীর নাকের সামনে আঙুল তুলে চিৎকার করে বলেছিল—তুই কোনওদিন সুখী হবি না বড়দি। আমাকে বিদেয় করার জন্য তোর চোখে ওই বুড়োটা ছাড়া আর কেউ পড়ল না? তুই 'আমার এতবড়ো সর্বনাশ করে পার পাবি নাকি? ছোটোবেলা থেকেই তুই আমাকে সহ্য করতে পারতিস না। আমি অসভ্য, বাঁদর, জানোয়ার ছিলাম তোর কাছে। তুই তো নিঃসন্তান ছিলিস, আমাকে শোধরাবার জন্য কেন নিজের কাছে এনে রাখিস নি? — এর ফল তুই ভুগবি। ভগবান তোকে শাস্তি দেবে দেখে নিস।'

যুথী ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নাড়ে। না, ও কক্ষনো অপুর ক্ষতি করতে চায়নি। বহুমেয়ের স্বামীর সঙ্গে বয়সের ব্যবধান থাকত সেই যুগে। তারা মানিয়ে নিত। বয়সে অনেক ছোটো হওয়ার জন্য স্বামী স্ত্রীকে স্নেহ -মমতার বাঁধনে বেঁধে রাখত। ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দিত সহজে। যুথী দেখেছে এসব। একটা সময়ে স্ত্রী ভুলেই যেত যে সে তার স্বামীর চেয়ে অনেক ছোটো। অপু সুখে থাকবে, আর্থিক কষ্ট পাবে না, বয়স্ক স্বামী অপুর পুরনো কথা কখনও জানতে পারলে ক্ষমা করে দেবে ছেলেমানুষী ভেবে—এটাই চেয়েছিল যুথী। না-না। অপুর কোনও ব্যাপারে কেউ যুথীকে দায়ী করলে ভুল করবে। অপু ওর নিজের খোড়া গর্তে পড়ে কষ্ট পেয়েছে। শেষ সময়ে সেই তো শশধরই ওকে দেখল। যে শশধরকে স্বামী বলে মানেনি অপু, যে শশধরের ভাগ্নের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক তৈরি করে

একটা জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে ফেলল, সেই বয়স্ক নির্যাতিত শশধরই অসভ্য, জানোয়ার, একটা ব্যাভিচারিণী স্ত্রীকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সঙ্গ দিয়েছে। অপু যেসব কাণ্ড করেছে তারপরে অন্য কোনও স্বামী কি ক্ষমা করত ওকে? বয়স্ক ছিল বলে, অপুর চেয়ে কুড়ি বছর আগেকার মানসিকতা ছিল বলে শশধর সহ্য করেছে মুখ বুজে। অপুর কাছাকাছি বয়সের পুরুষ হলে একলাথি মেরে পথে বের করে দিত। অমিত কি করেছে? এসেছে মৃত্যু শয্যায় পড়ে থাকা অপুকে দেখতে? আসবে না কেউ, যারা অপুর বিশ্রী স্বভাবের পরিচয় একবার পেয়েছে তারা বর্জ্য পদার্থের মতোই অপুকে বর্জন করবে। অপুর অভিশাপ কেন লাগবে যুথীর গায়ে? না-না! অপু নয়। অপুর কোনও সর্বনাশ ও করেনি। বরং সর্বনাশের ষোলোকলা পূর্ণ করার আগেই বিয়ে দিয়ে বাঁচাতে চেয়েছিল। কিন্তু কাকে বাঁচাবে? যে মরবে বলে আগুনে ঝাঁপ দেয় স্বেচ্ছায় তাকে আর বাঁচানো যায় না। মাঝখান থেকে শশধর নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। যুথী শুধু মহাকালের মতো সাক্ষী হয়ে পড়ে রইল।

রোদ এখন যুথীর পায়ের পাতায় এসে পড়েছে। তবুও ওঠে না ও। উঠে কোথায় যাবে? ওই দুখানা ঘরের ভেতরে বন্ধ হয়ে থাকতে আর মন চায় না। আজকাল আর বাপের বাড়ির দিকেও যেতে পারে না। এত গাড়ি ঘোড়ার রাস্তায় ওইটুকু পথ যাবারও ক্ষমতা নেই আর। ভাই-ভাইপোরাই আসে। কী জোনাকি জ্বলত ওই মেঠো সরু পায়েচলা পথটাতে! সন্ধে হলেই অন্ধকার। কোনও প্রয়োজনে যদি বাড়ির বাইরে যেতে হত তাহলে হ্যারিকেন নিয়ে যেতে হত সাপ-খোপের ভয়ে। টর্চয়ের চলন খুব কমই ছিল এই মনসাতলা গ্রামে। কোথায় গেল ওইসব হাজার হাজার জোনাকি, ঝিঁঝিপোকা শেয়ালরা? ডিব্রুগড়ে থাকতে বর্ষার সময় জোনাকি দুশো চারশো দেখেছে, ঝিঁঝির ডাকও শুনেছে তবে শেয়ালের সমবেত হুক্কাহুয়া ওদের রিভারসাইড রোডে শোনেনি। নিঝুম মনসাতলা, মহেশতলা, বাঁড়ুজ্জের হাট এখন চব্বিশ ঘণ্টা সরব। নাহঃ! এখন আর ওরা বলতে পারবে না—আমাদের দেশের বাড়ি মনসাতলা গ্রামে। ওই যে বাঁড়ুজ্জের হাট মহেশতলা! তারপরই আমাদের সেই সুজলা সুফলা, পুকুর, বাঁশবন, মেঠোপথের সুন্দর মনসাতলা! ওদের বাড়ির সামনের এই রাস্তাটা যখন চওড়া করে পিচ ঢেলে চকচকে হল সবাই কত খুশি হয়েছিল—যুথীও। তখনও তো গ্রামই ছিল এ জায়গাটা। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে কোথা থেকে যে পঙ্গপালের মতো মানুষ চলে এল ভাবতেও অবাক লাগে এখন। যত পুকুর-ডোবা সব বুজে গেল আস্তে আস্তে। দোতলা-তিনতলা বাড়িতে আকাশ ঢেকে দিল। মনসাতলা গ্রামের নরম মাটি মানুষের পায়ের চাপে, যানবাহনের চাকার চাপে শক্তপোক্ত কঠিন হয়ে গেল।— যুথী মহাকালের মতো সাক্ষী হয়ে আছে সব পরিবর্তনের। ওদের গেটের পরে সরু পায়ে চলা রাস্তাটার গা ঘেঁষে ছিল জলা। গরমের দুপুরে জলঢোঁড়া সাপ নির্ভয়ে রাস্তা পেরিয়ে ওদের বাড়িতেও এসে ঢুকত। জাত সাপও ছিল,

তবে ওদের যখন তখন দেখা যেতো না জলটোঁড়ার মতো। সেই জলা বুজিয়ে গড়ে উঠেছে মিউনিসিপ্যালিটির মাতৃমঙ্গল হাসপাতাল। রাস্তার চকচকে পিচ তো কবেই উঠে দাঁত বের করা খোয়ার রাস্তা হয়ে গেছে, এখন ধুলো ছাড়া আর কিছু নেই। মাতৃমঙ্গলে ভর্তি হতে আসা প্রসূতীদের আর আত্মীয়দের ভিড়ে ওদের ছোটোগেটটার বাইরে সবসময়ই যানজট লেগে থাকে। সাইকেলে-স্কুটারে ধাক্কা লাগা অ্যাকসিডেন্টে প্রবল ঝগড়া চেঁচামেচিতে সরগরম হয়ে থাকে স্থানটা। ওর অলস সময় এসব দেখে দেখেই কাটে। স্থলিত মন্থর গতিতে ওর বেলা বাড়ে ঠিক যেমন করে ওর জীবনের বেলা আশীর দিকে এগোচ্ছে অতি ধীরে ধীরে। এই তো কয়েকদিন আগে কাজল এসে সাইকেল থেকে নামল গেটের সামনে। গেট খুলে সাইকেলটা টেনে এনে দেওয়ালের পাশে রেখে যুথীকে বলল—'কি রে বড়দি গরম লাগছে না তোর? এখানে বসে আছিস কেন এখনও?' যুথী বলে— 'ঘরে বসে থেকে কি করব? দমবন্ধ হয়ে আসে। কথা বলারও তো কেউ নেই। এখানটায় বসে রাস্তা দেখি, লোকজন দেখি তাই সময় কেটে যায়। বোস না সিঁড়িতেই, ভালো লাগবে।'

কাজলের কাছেই সেদিন শুনেছিল আদিত্যের মেয়ে নন্দুদের কোন কারখানায় গন্ডগোল হয়েছে, হরতাল হয়েছে এসব কথা। মনা আর পুঁটুর সাহায্য নিয়ে ধর্মঘট ভেঙে দেওয়ার কথা। নন্দু এখন নিজে অফিসে বসে বরের সঙ্গে। মনা-পুঁটুকে অফিসে ডেকে নিয়ে এসে কি কি বলেছে—সব কিছু সবিস্তারে বর্ণনা করেছে কাজল। যুথীর মনের ধারে কাছেও এখন আর কোনও আবেগের দেখা পাওয়া যায় না। আগে একটা সময়ে আদিত্যের মেয়ের হয়ে এতবড়ো একটা কাজ করেছে শুনলে মনা-পুঁটুর ওপর খুশি হত ও। আবেগে গলে যাওয়া গলায় নিজেই বলতো—'ওরা চিরকাল আমাদের জন্য করেছে রে, আজ তবু মনা-পুঁটু একটু ঋণ শোধ করলো।' যুথীর এখন অনেক ভাবান্তর হয়ে গেছে। ও যেন সংসারে থেকেও অন্য কোথাও বিরাজ করে। কোনও মন্তব্য না করেই শুনে গেল সব। কাজলই বলেছিল—'জীবনে নন্দুর কাছে ঋণ তো কম নয় রে বড়দি। মনা আর পুঁটু সামান্য একটু ঋণ শোধ করল তবু। আমরা তো পারিনি।' —যুথী মনে মনে বলেছে —'ঠিক।'

কাজলের ওপর মনে মনে বিরক্ত হয় যুথী। ও তো কতকাল ধরে কারও কথা জিজ্ঞেস করে না। কারও খবর জানতে চায় না তবুও গায়েপড়া হয়ে এসে শুধুশুধু ওর কাছে নন্দুর কথা বলার দরকার কি? অনেক পেছনে ফেলে আসা ঘুমন্ত বিষাদ স্মৃতিগুলোকে অকারণ নাড়িয়ে তুলে দিয়ে চলে গেল কাজল। নন্দু, অপু, আদিত্য, অতুল্য —সবাইকেই ভুলে থাকতে চায় যুথী। ওদের কার কাছ থেকে কি পেয়েছে ও যে ঘটা করে মনে রাখবে? সবাই ঠকিয়েছে, সবাই মিথ্যে কথা বলেছে ওকে। ওদের কারও প্রতি ওর আর কোনও মমতা নেই। মৃত্যুর অপেক্ষায় বসে থাকা মানুষটার মনে রায়চৌধুরি বাড়ির, ডিব্রুগড়ের অতীতকে খোঁচা মেরে বর্তমানে ফিরিয়ে না আনলে কি ক্ষতিটা হত?

নন্দুর কথা বললেই অপু এসে যায় অভেদ্যভাবে আর অপু এসে গেলেই আদিত্য, অতুল্য, অম্বিকাচরণ, কালীকাবাবা সবাই এসে পড়ে মনে। বিউলির ডালের বড়ির মতো খোপাটা শুদ্ধ মাথা নাড়ে বৃদ্ধা যুথী—না, মনের ধারে কাছেও আসতে দেব না ওসব কথা। অপু মিথ্যেবাদী ছিল। যতসব মিথ্যেকথা বলে গেছে মরবার আগে।

মনে করতে না চেয়েও মনে পড়ে। কাজল যে সাইকেল নিয়ে—'চলিরে বড়দি'—বলে কখন চলে গেল সেটাও আর খেয়াল করেনি ও। খবর পেয়ে জামালপুর থেকে কোনওরকমে ছুটে এসেছিল অপুকে শেষ দেখা দেখতে। ভাইদের মুখে শুনেছিল এসেই আদিত্যের মেয়ে নন্দু অপুর শেষদিকের চিকিৎসার সব দায় নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। রোজ হাসপাতালে দেখতে আসে অপুকে। শুনে খুব ভালো লেগেছিল তখন। মনে হয়েছিল—বাহঃ! আদিত্যের মেয়েটা ছোটোবেলায় যেমন ভালো ছিল বড়ো বেলাতেও একইরকম চালিয়ে গেল। আর এই মেয়ের জীবনে বিষ ঢালতে অপু কিনা লক্ষীন্দরের বাসরে ঢোকার মতো ছিদ্রপথ খুঁজছিল? অমিত নেহাৎ সময়মতো সবকথা বলে দিয়েছিল এসে? তাই তো যুথীর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল নন্দুর সুখের জীবন থেকে অপুকে সূর্যর ভয় দেখিয়ে বের করে আনা। সেই অপুকেই গু-মুত থেকে তুলে এনে সুস্থ পরিবেশে রেখেছে নন্দু। দুই বিপরীত চরিত্রের আবাল্যের বন্ধুত্ব।

সেদিন কাজলের সঙ্গে হাসপাতালে এসে অপুর অবস্থা দেখে হাহাকার করে উঠেছিল ওর বুকের ভেতরটা। খারাপ হোক ভালো হোক অপু তো ওরই ছোটোবোন। দেখেই বুঝতে পেরেছিল আর বেশিদিন নেই। অপু নিজেও সে কথাই বলছিল। এরই মধ্যে আদিত্যের ঝলমলে সুন্দর মেয়েটা এল। অপুর হাল দেখে মুষড়ে পড়া যুথী নন্দুর সঙ্গে দুটো কথাও ভালো করে বলার মতো অবস্থায় ছিল না। বার বার কান্না উথলে আসছিল, গলা থেকে ডুকরে বের হচ্ছিল শব্দ। একটু পরেই নন্দু কাজলকে নিয়ে বাইরে চলে যেতেই অপু বলে উঠেছিল—'থামা বড়দি। তোর নাকিকান্না থামা এবার। তোর যে আমার জন্য কত কষ্ট হচ্ছে সে আমি জানি। তুই হাজার কাঁদলেও আমাকে বিশ্বাস করাতে পারবি না যে তুই আমাকে ছোটোবোন বলে কখনও ভালোবেসেছিলি। যা না বাইরে। তোর পেয়ারের আদিত্যনারায়ণের মেয়ে তো কেবিনের বাইরে চলে গেল তোর ঢংয়ের কান্না দেখে। ওর কাছে যা।

যুথীর কান্না থেমে গিয়েছিল অপুর বিযাক্ত স্বরে বলা কথা শুনে। তবুও ধৈর্য্য ধরে সামলাবার চেষ্টা করেছিল। বলেছিল—'অপু, তোর শরীরটা এখন কোনও উত্তেজনা নিতে পারবে না রে! এত রাগ করিস না লক্ষ্মীটি। একটু শান্ত হ।'

—'কেন?' —ফোঁস করে উঠেছিল অপুর কংকাল—'শান্ত কেন হব? তোরা আমার সর্বনাশ করে সুখে থাকবি আর আমি গলে পচে মরব এরপরও শান্ত থাকব? তুই কম শত্রুতা করেছিস আমার সঙ্গে? এই নন্দুর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভেঙে দেবার জন্য

মনসাতলার বাড়িতে তুই আমাকে ব্ল্যাকমেল করেছিলি সূর্যর কথা সবাইকে বলে দিবি বলে। বাপের বাড়ির রাস্তা চিরতরে বন্ধ করে দিয়েছিলি। ওই শয়তান অমিত নিজের সংসার নিজের পিঠ বাঁচানোর জন্য তোর কাছে গিয়ে সব বলে এসেছিল । সূর্যের জন্মের জন্য ওর কোনও ভূমিকা ছিল না? এ্যাঁ? আকাশ থেকে ধপ করে পড়েছিল সূর্য? তুই যদি নন্দুর সঙ্গে আমার বন্ধুত্বটা ভেঙে না দিতিস তাহলে নন্দু আমার জন্য আজ যা করছে সেটা একেবারে প্রথম থেকেই করত। হয়তো আমি আরও কিছুদিন বাঁচতে পারতাম। আমার জীবনের সব সুখের অন্তরায় তুই বড়দি তুই। আমি দুঃশ্চরিত্র! আমি খারাপ! তুই তাহলে কি রে?'

যুথীর মাথা গরম হচ্ছিল আস্তে আস্তে। ঠান্ডা গলায় বলেছিল—'আমি কি? দুঃশ্চরিত্র? কি বলতে চাস তুই?'

ভাঙাচোরা মুখটাকে আরও বিকৃত করে অপু বলেছিল—'মনের দিক থেকে আমি তোর থেকে অনেক ভালো রে বড়দি। সেদিন আমিও তোকে ব্ল্যাকমেইল করতে পারতাম। তোর অনেক কথা একমাত্র আমি জানি। ছোটোবেলায় বাবার পাশে ঘুমোতাম আমি ছোটো ঘরটাতে। মা রাত্রে রান্নাঘরের কাজ শেষ করে পানের বাটা নিয়ে এসে বাবার সঙ্গে সংসারের কথা বলত। এরকমই একদিন তোর কথা বলছিল। ওরা হয়তো ভেবেছিল আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। মা বলছিল বাবাকে — যুথীটা জীবনে কি পেলো? এতদিন ধরে বিয়ে হয়ে বাচ্চা না হওয়ার জন্য শাশুড়ির গঞ্জনায় আত্মহত্যা করতে গেল মেয়েটা। ছোটোবেলা থেকে ভালোবাসলো আদিত্যকে আর বিয়ে হল অতুল্যর সঙ্গে।'—বাবা চমকে উঠে জিজ্ঞেস করেছিল —'এ তুমি কি বলছ গিন্নি? যুথী আদিত্যকে ভালোবাসতো একথা তোমাকে কে বলল? যুথী? মা বলেছিল —'না, যুথী কিছুই বলেনি। কিন্তু আমি জানতাম। মায়ের চোখকে ছেলেমেয়েরা কি ফাঁকি দিতে পারে গো? যুথীর কষ্ট তো আমি দেখেছি।'

বাবা বলেছিল—'তখন আমাকে বলোনি কেন তুমি? তাহলে আমি যুথীকে আরও পড়াতাম। অত তাড়াতাড়ি বিয়ে দিতাম না। এখন আর এসব বলে লাভ কি?'

মা বলেছিল —'তখন বললেও লাভ হত না কিছুই। যুথী একাই আদিত্যকে ভালবেসে মরেছিল। ছেলেটা ওকে ভালোবাসেইনি। একতরফা ভালোবাসা। আদিত্য যেদিন শিলংয়ের কলেজে পড়তে চলে গেল তার আগের দিন থেকে মেয়েটার কি ছটফটানী। চলে যাবার দিন জানালায় বসে আদিত্যকে যেতে দেখেছে। সামনে যায়নি বিদায় জানাতে। আদিত্য যদি ওকে ভালোবাসতো তাহলে ও তো যাবার আগে দেখা করতে আসতো। একবারও আসেনি। দেখাই করেনি। বড়োলোকের ছেলেরা আমাদের মতো ঘরের মেয়েদের ভালোবাসেনা গো। আর রায়চৌধুরি গিন্নি নিজের ছোটোছেলের সঙ্গে যুথীর বিয়ে দিতে রাজি হত ভেবেছ তুমি? কক্ষনও না। আদিত্যর শিলং চলে যাওয়ার দিনটা আমি ভুলিনি তোমরা যতই বোকা আর গবেট বলে ভাবো না আমাকে। কেঁদে

কেঁদে মেয়েটার দুচোখ-নাক লাল। কাউকে বলতেও পারেনি সইতেও পারেনি। অতুল্যর সঙ্গে বিয়ের কথায় কোনও বাধা দিল না। এমনকি কলেজে পড়া হবে না জেনেও কিচ্ছুটি বলেনি। এক কথায় রাজি হয়ে গিয়েছিল। কেন? আসলে ও এখান থেকে দূরে চলে গিয়ে ভুলে থাকতে চেয়েছিল। বুঝলে?' —আমি ঘুমের ভান করে সব শুনছিলাম। তখন তো তোর জমজ ছেলেমেয়ে হয়ে গেছে। তোর শাশুড়ি আর তোকে কষ্টও দেয় না। কিন্তু তুই আমাকে কষ্ট দেওয়া বন্ধ করিস নি বড়দি। আদিত্যকে না পেলে কি হবে ওর মেয়েকে আদিখ্যেতা দেখিয়ে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে চাইতিস। যতবার ডিব্রুগড়ে আসতিস ততবার নন্দুর সঙ্গে আমার তুলনা করতিস। নন্দু ভালোমেয়ে আর আমি খারাপ মেয়ে। আমি নন্দুকেও খারাপ করে দেবো। নন্দুর বাবা-মার চেয়েও তোর ওর জন্য বেশি চিন্তা ছিল। —বল মিথ্যে বলছি কি না?—হাঁফাতে হাঁফাতে বলেছিল অপু।

যুথীর মুখে কথা জোগাচ্ছিল না। ও নিরুপায় হয়ে শুধু বলতে পেরেছিল —' তোর খবরটা ওরা আমাকে না দিলেই ভালো করত। সেই জামালপুর থেকে ল্যাংড়া পায়ে ছুটে আসতে হত না তোকে দেখার জন্য। আমার জন্য তোর মনে কি শুধু বিদ্বেষ ছাড়া আর কিছুই নেই রে অপু?

অপু তির্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেছিল—' কে বলল বিদ্বেষ ছাড়া আর কিছু ছিল না? না থাকলে কি তোর অপারেশনে এত দৌড়াদৌড়ি করেছি? তোকে নিজের কাছে এনে রেখে সেবা করেছি? তোর জামাইকে চিকিৎসা করাতে ভেলোরে নিয়ে গেছি? আজ অবধি তোর কি করে বাচ্চা হয়েছে কাউকে বলেছি বল?'

যুথী বিস্ময়ে হতবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল— মানে? আমার আবার কি করে বাচ্চা হবে? সবাইর যেমন হয় তেমনিই তো হবে। এ আবার নতুন কি কথা দিয়ে আক্রমণ করতে চাইছিস তুই?' অপু বিশ্রী হেসে বলেছিল —' সেটা অবশ্য তুইও জানিস না আর মুখুজ্জেমশাই ও না জেনেই মরে গেল। আমি শুধু ওই মহাভারতের অভিমন্যুর মতো ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে জেনে ফেলেছিলাম। ঠামা আমাকে আর নন্দুকে মহাভারতের গল্প শোনাতো খালি। পালাতে চাইলেও বুড়িটা পালাতে দিত না। বকাবকি করে বসিয়ে দিত। তখনই অভিমন্যুর গল্পটা শুনেছিলাম।'

—'তোর কথার মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না আমি। আমাকে মরার আগে জব্দ করে যদি তোর মনের শান্তি হয় তাহলে বলতে থাক তুই। আমি শুনছি।'

—'জব্দ তো তোকে হতেই হবে বড়দি। তুই আমাকে ছোটোবেলা থেকে কতরকম ভাবে জব্দ করেছিস মনে করে দ্যাখ একবার। মরার আগে তোকে শুধু গোপন কথাগুলো বলে যেতে চাই যাতে বাকি জীবনটা তুই মরতে মরতে বেঁচে থাকিস ঠিক যেমন শশধর মুখুজ্জের সঙ্গে বিয়ে হয়ে আমাকে বেঁচে থাকতে হয়েছিল।'

—'সেই শশধরই তো তোর জন্য জান লড়িয়ে দিচ্ছে আজ? তুই ওকে কি দিয়েছিস অপু? তোর কি কারও প্রতি কৃতজ্ঞতা নেই? তুই কি ধাতুতে তৈরি রে?'

—'শশধর মুখুজ্জের প্রতি কৃতজ্ঞতা আছে। নন্দুর প্রতি কৃতজ্ঞতা আছে। তোর প্রতিও কৃতজ্ঞতা ছিল কারণ মা যখন নিঃস্ব অবস্থায় আমাদের নিয়ে মনসাতলায় এলো তখন তুই খাইয়েছিলি বলে। সেই কৃতজ্ঞতার ঋণ আমি নানা ভাবে শোধ করে দিয়েছি বড়দি। এখন শোন সেই রাতে বাবা কি শুনিয়েছিল মাকে। আমার তখন দশ-এগারো বছর বয়স। কিচ্ছু ভুলে যাইনি আমি। বাবা আদিত্যনারায়ণের প্রতি তোর ভালোবাসার কথা শুনে কেঁদেই ফেলেছিল। বড্ড বেশি ভালোবাসতো বাবা তোকে। তারপর মাকে বলল—'জানো গিন্নি, যুথীর বিয়েটা বোধহয় আরও একটু দেখেশুনে দিলেই ভালো হত। মেয়েটা কোনও দিনই পুরোপুরি সুখী হতে পারেনি। অতুল্যর স্বাস্থ্য যে এত খারাপ সেটা তো তখন কেউই জানতো না। ওর যে টি.বি. রোগ আছে তখন তো ওর বাবাও বুঝতে পারেনি । অম্বিকাদাদা খুবই সজ্জন মানুষ। ছেলের ভেতরে ভেতরে টি. বি. হয়েছে জানলে যুথীর সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব দিতই না। এ বিশ্বাস আমার আছে। আজ তোমাকে যে কথা বলব সেকথা আগেই বলা উচিত ছিল। কিন্তু কোনমুখে বলব ভেবে বলাই হয়নি। তুমি তো যুথীর মা! তুমি সহ্য করতে পারবে? অম্বিকাদাদা নিজের মুখে আমাকে বলেছিলেন। বলেছিলেন—নবীন তুমি যুথীর বাবা। তোমার কাছে গোপন করলে নরকেও আমার ঠাঁই হবে না তাই বলছি। অপরাধ করে থাকলে নিজগুণে ক্ষমা করে দিও ভাই।'

মা ভয় পেয়ে গিয়েছিল বাবার কথা শুনে। বাবা আবার কাঁদছিলও তো। এরই মধ্যে বাবা বলল—দাঁড়াও দেখি অপুটা ঘুমোচ্ছে কি না।

মার তর সইছিল না শোনার জন্য। বলল — ওকে নিয়ে ভাবতে হবে না। সারাদিন ডানপিটেগিরি করে রাতে বিছানায় শুলেই ঘুমিয়ে কুম্ভকর্ণ। কানের সামনে ঢাক বাজালেও উঠবে না। তুমি আমাকে বল বেয়াইমশাই এমন কি কথা বলেছেন যে তোমার চোখে জল আসে?

বাবা বলল—'যুথীর ছেলে-মেয়ে অতুল্যর সন্তান নয় গিন্নি।'

—'এ্যাঁ! সে আবার কি অলুক্ষুণে কথা? আমার যুথীর বদনাম করার আর কোনও উপায় পেল না ওরা। ছি: ছি:! কি পাষণ্ড ওরা!'

বাবা মাকে থামিয়ে বলল —'তা নয়। তুমি কথাটা পুরো না শুনেই ওদের ওপরে রাগ করছ। আসলে অম্বিকাদাদা যা বলেছিলেন সেটা হল অতুল্যর বাপ হবার ক্ষমতা ছিল না। আমাদের যুথীই বরং মা হবার ক্ষমতা নিয়ে জন্মেছিল। ও মোটেই বন্ধ্যা ছিল না। অম্বিকাদাদার বড়োভাই কালিকাচরণ তান্ত্রিক সাধু সে সব তো তুমি শুনেছ। যুথী আর অতুল্যকে তারাপিঠে নিয়ে গিয়ে তন্ত্রসাধনার মাধ্যমে সন্তান সম্ভাবনা ঘটিয়েছিলেন সে সবও জানো। আসল ব্যাপারটা তা নয়। কোনও তন্ত্রমন্ত্র কোনও ওষুধ বিষুধই অতুল্যর মতো সম্পূর্ণ নিবীর্য পুরুষকে বাপ বানাতে পারবে না। তাই নিজেদের বংশরক্ষার জন্য ওরা 'আরোপ' পদ্ধতির সাহায্য নিয়েছিলেন। একুশদিন ধরে হোমযজ্ঞের সামনে যুথী আর অতুল্যকে বসিয়ে ওদের দুজনকে ইএমন একটা শরবৎ খেতে দেওয়া হত যা খাবার পর

ওদের বাহ্যজ্ঞান প্রায় থাকতই না। ওদের নিয়ে কি করা হচ্ছে সেসব ওরা বুঝতেও পারত না। অতুল্যকে ওর নিজের ঘরে তুলে এনে শুইয়ে দেওয়া হত আর কালিকা বাবার নির্দেশে তাঁর একজন বীর্যবান ব্রাহ্মণ শিষ্য যুথীকে-----

—'ওমা! এসব তুমি কি যা তা বলছ গো? অম্বিকাচরণ আমার শুদ্ধ মেয়েটার এমন সর্বনাশ জেনেশুনে করতে দিয়েছে? ওদের ভালো হবে না। তুমি দেখে নিও। —বলে মা কাঁদতে শুরু করেছিল। বাবা তখন রেগে গিয়ে মাকে বলেছিল—এজন্যই তোমাকে গবেট বলি। না বুঝে শুনেই কাঁদতে শুরু করো তুমি।

যুথীর অপলক দৃষ্টিতে দৃষ্টি মিলিয়ে অপু বলে—'কি রে বড়দি! তুই শুনছিস তো? বানিয়ে বানিয়ে বাবা নিশ্চয়ই মাকে মিথ্যে গল্প শোনায়নি? বাবা তো আমার মতো দুঃশ্চরিত্র খারাপ মানুষ ছিল না। তুই গল্পটা শুনে মিলিয়ে নিচ্ছিস তো? তুই-ই ভালো জানিস ওই তারাপীঠে একুশদিন ধরে কি হয়েছিল। বাবা অবশ্য মাকে বুঝিয়ে বলেছিল যে তোর শ্বশুর নাকি বলেছে এভাবে ছাড়া ওদের বংশটা রক্ষা করার আর উপায় ছিল না। তাই তোর শ্বশুরকে কালিকাসাধুর কথা মেনেই চলতে হয়েছে। তোর দজ্জাল শাশুড়িও খুশি আর না জেনেশুনে তুই আর মুখুজ্জেমশাইও খুশি।

শোন বড়দি, এইসব কথা ওই কালিকাবাবা আর তোর শ্বশুর শুধু জানত। তোর জমজবাচ্চার অন্নপ্রাশনের সময় তোর শ্বশুর আমাদের বাবাকে চুপিচুপি বলেছিল। বাবা-মারা তো আর এসব কথা ফাঁস করে না, না? ভগবানের কি লীলা দ্যাখ বাবা মাকে বলল তো আমি অভিমন্যুর মতো সব শুনে ফেললাম আর সারাজীবন ধরে ভেতরে পুষে রাখলাম কাউকে না বলে। এটা তো তোর প্রতি সবচেয়ে বড়ো কৃতজ্ঞতা স্বীকার। —এবার বল বড়দি, জ্ঞানে হোক অজ্ঞানে হোক তুইও তো তোর চরিত্র হারিয়েছিলি। একটা অচেনা অজানা লোকের জমজসন্তান পেটে ধরে বড়াই করার চেয়ে জেনেশুনে আমি যদি অমিতের সন্তানকে পেটে ধরি তাহলেই আমি তোর চেয়ে বেশি খারাপ হয়ে গেলাম? তুই যখন আমাকে হেনস্থা করেছিলি তখন আমার মতো খারাপ মেয়েরা যা করে আমিও সেরকম করতে পারতাম রে। সারা মনসাতলা গ্রামে তোর কথা রটিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু আমি সেসব কিচ্ছু করিনি। নিজের দুঃখ কষ্ট সব এই বুকটাতে চেপে রেখে তোর আদেশ পালন করে নিজের বাপের বাড়ি, নন্দুর বাড়ি সব কিছু ছেড়ে একা হয়ে বেঁচে থেকেছি চার-পাঁচটা বছর। কষ্ট চেপে চেপে এই রোগটা হল আমার। কষ্ট তুইও পেয়েছিস। যারই হোক ছেলেটাকে জন্ম তো তুই ই দিয়েছিলি। সে অসময়ে চলে গেল। যে বংশরক্ষার জন্য এত আয়োজন সে বংশে বাতি দেবার কেউ থাকল না। আমি তো এজীবনের সব পাপের শাস্তি ভোগ করেই যাচ্ছি তুইও আর একটু ভোগ কর। হয়ত আগামী জন্মে আমরা খুব ভালো দুবোন হতে পারব।

ঠিক এই সময়ই কাজল আর নন্দু এসে আবার কেবিনে ঢুকে ছিল। কাজল উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিল মনা আর পুটুকে নন্দু চাকরি দেবে বলেছে। আর যুথী এতক্ষণ ধরে অপুব

দেওয়া গরল ফোঁটায় ফোঁটায় পান করে অসহ্য যন্ত্রণার কারণ প্রকাশ করতে না পেরে হঠাৎ হাউমাউ করে কেঁদে উঠেছিল। —সেই দিনের পর থেকেই যুথী যেন সবকিছুর প্রতি কেমন নির্লিপ্ত হয়ে উঠেছিল। মৃত্যুর কামনা ছাড়া অন্য আর কোনও কামনা ছিল না।

॥ বারো ॥

ঠামা বলত—'নদীর একপাড় ভাঙে অন্যপাড় গড়ে। দিন কি আর চিরকাল একরকম থাকে রে? লক্ষ্মী হলেন চঞ্চলা দেবী। একজায়গায় স্থির থাকতে পারেন না। কখন যে ওনার মনে কি উদয় হয় কেউ বলতে পারে না। রাজার ঘরের রাজকীয়পুজো, ভোগ ফেলে রেখে চলে যান ফকিরের ঘরে। ফকির রাজা হয় আর রাজা হয় ফকির।' —নন্দুর জ্ঞান হবার পর থেকে ছোটোবেলা— বড়োবেলা সবসময়ই ঠামা এরকম নানা কথা বলতো। বলতো —'সব মেয়েরেই লক্ষ্মীর অংশে জন্ম তাই মেয়েরাই লক্ষ্মী।' —নন্দু বুঝত না। জিজ্ঞেস করত—'লক্ষ্মীর অংশে জন্ম কি ঠামা'। ঠামা বলত—'লক্ষ্মী অংশে জন্ম মানে হলো মেয়েদের মধ্যে মালক্ষ্মীর অনেকগুণ থাকে বুঝলি? মেয়েদের সব অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেবার সহজাত ক্ষমতা থাকে। যখন রাজার ঘরে থাকে মহারানি হয়ে তখন যেমন মহারানি সুলভ আচার আচরণ করতে পারে তেমনি যখন গরিব ফকির হয়ে যায় তখনও কিন্তু খুদকুঁড়ো, হিঞ্চে-কলমি দিয়েও সংসারের উনুনটা জ্বালিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। পুরুষরা অনেক দুর্বল, বুঝলি? ওরা এত কষ্ট সহ্য করতে পারে না। কিন্তু মেয়েরা পারে। মেয়েরা পাশে না থাকলে এই পুরুষ জাতটা না এক্কেবারে ফুঃ। একেবারে ন্যাতা ক্যেতা বাচ্চাদের মতো হয়ে যায় দুর্দিনে। মেয়েরা সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করেও পুরুষের মনে সাহস জোগায়। উৎসাহ দেয়। এগিয়ে যাবার জন্য তাড়া দেয়। তখন পুরুষরা আবার নতুন করে এগিয়ে যাবার শক্তি খুঁজে পায়। তাই তো মেয়েদের শক্তি বলে। —তোরা তো পাঁচালি টাচালি পড়িসই না। তাহলে এসব আর জানবি কি করে? তোদের মা-রাই কি আর পড়তে চায়? নেহাত আমার ভয়ে পড়ে। পড়লে কি হবে? মর্মার্থ গ্রহণ না করে অবিশ্বাস নিয়ে পড়তে হচ্ছে বলে পড়লে কিচ্ছু শেখা যায় না। হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসা এগুলো যদি শিক্ষামূলক না হত তাহলে এখনও কি টিঁকে থাকত বল? —কিন্তু তোরা তো সব মেমসায়েবদের স্কুলে পড়ে এসব নিয়ে হাসাহাসি করিস। বিশ্বাসই করিস না কিছু।' — দুঃখী দুঃখী মুখ বানাতো ঠামা।

ছোটোবেলায় নন্দু হাঁ করে এসব শুনত, বিশ্বাসও করত। বড়োবেলায়ও শুনত আর ঠামার অবিচল বিশ্বাস দেখে মনে মনে হাসত। কখনও তর্ক করে, সন্দেহ প্রকাশ করে ঠামার বিশ্বাসের বুনিয়াদে আঘাত করার চেষ্টা করেনি ও। নিজের সংস্কারে ঠামার বিশ্বাস যেমন অটুট ছিল তেমনি আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা, ইংরেজি শিক্ষা, এগুলোর প্রতিও যথেষ্ট

বিশ্বাস ছিল। ঠামা শুধু এটুকুই আশা করত যে ওঁর ছেলেরা, নাতি-নাতনীরা সাহেবি স্কুলে পড়ে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে বলে নিজেদের সংস্কার গুলো যেন ভুলে না যায়। —নন্দু সব মনে রেখেছে। আর মনে রেখেছে বলেই ঠামাব বলা কথাগুলো যখন জীবনে প্রতিফলিত হতে দেখছে তখন ও মুষড়ে পড়ে না। ওর মনে হয় এটাই জগতের নিয়ম। এরকমই ঘটে এসেছে যুগ যুগান্ত ধরে। দিন চিরকাল একরকম থাকে না। ডিব্রুগড়ে রায়চৌধুরি বাড়ি একরকম নেই। কোলকাতায় মুখার্জি অ্যান্ড মুখার্জি ইন্টারন্যাশনালও এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। দুটো পরিবারেরই গৌরবময় অধ্যায় ঘুণে কাটছে। ঝকঝকে দেওয়ালগুলোতে অজস্র সূক্ষ্ম চেরা চেরা ফাটলে শ্যাওলা ধরেছে। ঘাটতিতে চলার জন্য ওর জ্যাঠতুতো দাদারা নিজেদের শেয়ারের চারখানা চা-বাগান বিক্রি করে দিয়েছে। শুধু ওর বাবা পারেনি নিজের বাগানটা বিক্রি করতে। ডিব্রুগড়ের একদা বিখ্যাত ধনী রায়চৌধুরি বাড়ির এখন পড়ন্ত দশা। রায়চৌধুরি ভিলা ঠামার নামে ছিল। ঠামা এটা নন্দুকে দিয়ে গেছে উইল করে। হয়তো ভেবেছে নন্দুর নামে থাকলে বিক্রি হবে না এটা।

এদিকে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম সারীর শিল্পপতিদের আসন অলংকৃত করে থাকা মুখার্জি অ্যান্ড মুখার্জি ইন্টারন্যাশন্যালও শিল্প জগতে পিছিয়ে পড়েছে। সিদ্ধার্থ মুখার্জির মৃত্যু, গৌতম মুখার্জির (জোজো) দেশে ফিরে না আসা, ডোনার জীবনে চোরাস্রোতের মতো ভঙ্গুর ঘটনা প্রবাহ, সর্বোপরি নিত্য নবীন নব নব উদ্যোগের সঙ্গে মুকাবিলা করতে আর পারছে না তথাগত মুখার্জি। জোজো-ডোনারা ভুলের পর ভুল করেছে। বারবার বার প্রতিজ্ঞা করেছে ওরা আর ভুল করবে না বলে, তারপরও আবার ভুল করেছে। আপ্রাণ চেষ্টাতেও নন্দু পারেনি নিজের ছেলেমেয়েকে সুরক্ষিত করতে। চঞ্চলা লক্ষ্মী কখন যে নন্দুর সদাজাগ্রত চোখে ধুলো দিয়ে নিঃশব্দ পায়ে মুখার্জি ম্যানশন ছাড়ার চেষ্টা করছিলেন টের পায়নি ও। নিজের মনের অবস্থা ও তথাগতকে বুঝতে দেয় না। ঠামার কথা মনে রেখে ও নিজের সর্বশক্তি দিয়ে তথাগতকে ভেঙে পড়ার হাত থেকে রক্ষা করে চলে সর্বদা। তারপরও এমন প্রতিকূল সময় এসে পড়ে জীবনে যখন ওকেই ভেঙে পড়তে বাধ্য হতে হয়।

ক্যারলের পরেও জোজোর জীবনে অন্য মেয়েরা এসেছে ক্ষণস্থায়ী হয়ে। ওর ফিরে আসার বছরে যে মেয়েটি এল ওর জীবনে সে অন্যদের মতো নয়। সান্ড্রা আমেরিকান হয়েও অনেকটাই ওরিয়েন্টাল নেচারের। ঘর বেঁধে থাকার পক্ষপাতী। —ওর বাবা-মাও আজ অবধি একসাথেই আছে আর ও নিজেও তাই চেয়েছে। জোজো যখন সান্ড্রার কথা, সান্ড্রাকে বিয়ে করে ওদেশেই থেকে যাবার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছিল তথাগত তখন সহ্য করতে পারেনি। পারার কথাও নয়। যে ছেলের ফিরে এসে নিজেদের ব্যবসার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেবার কথা সে যদি জানায় যে তার হবু স্ত্রী নিজের প্রফেশন ছেড়ে ইন্ডিয়াতে এসে সেটল করতে রাজি নয় তাহলে পথ চেয়ে বসে থাকা বাপের রাগ হবারই কথা।

দিনের পর দিন লং ডিসট্যান্স কল হয়েছে দুতরফে, দিনের পর দিন বোঝানো, তর্কাতর্কি, রাগারাগী সবই হয়েছে। এমনকি সান্ড্রার সঙ্গেও কথা বলেছে ওরা, কিন্তু কোনও ফল হয়নি। সান্ড্রা অনুনয় করে বিনীত ভাবে জানিয়েছে ওর পক্ষে গৌতমকে ছেড়ে থাকাও যেমন অসম্ভব ঠিক ততখানিই অসম্ভব ওর নিজের রিসার্চ প্রোজেক্ট ছাড়া। ও জানে গৌতম যে ইন্ডিয়াতে কোনও এক ইণ্ড্রাস্টিয়েলস্টের একমাত্র ছেলে। কোলকাতায় থাকতে এলে ওর জীবনে প্রাচুর্যের অভাব হবে না বরং আমেরিকায় ও যে অবস্থায় আছে তার চেয়েও অনেক বেশি অর্থ সুখে থাকতে পারবে। কিন্তু ওর রিসার্চ বন্ধ করে ইন্ডিয়ায় চলে আসা সম্ভব নয়।

সেই রাগারাগী, ভুল বোঝাবুঝির সময়টাতেও অসীম ধৈর্যে নন্দু নিজেকে স্থির রেখেছে। জোজো এবাড়িতে আর আসবে না, এলেও কদিনের অতিথির মতো এসে চলে যাবে একথা ভাবতে বুক ভেঙে গেছে ওর । নন্দু কোনওদিন ঠামার মতো বা ওর নিজের শ্বশুর-শাশুড়ির মতো ছেলে বউ, নাতি-নাতনি নিয়ে থাকতে পারবে না একসাথে একথা মনে এলেই কেঁদেছে গোপনে। কিন্তু তথাগতর সামনে নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করে ওকে আরও দুর্বল করে দেয়নি। বিয়ের পর বউকে নিয়ে জোজো এবাড়িতে এসে দুমাস থেকে গেছে। সান্ড্রা এবাড়িতেই প্রেগন্যান্ট হয়েছে। এই ওঁচা কোলকাতার বাঙালি লেডি ডাক্তারই সান্ড্রাকে পরীক্ষা করেছে এবং প্রেগন্যান্সি কনফার্ম করেছে। শুধু জোজোর জন্মের আগে ওর শাশুড়ি ইন্দ্রাণী যেমন পুত্রবধূর ক্রমবর্ধমান পেটে মাঝে মাঝে কান পেতে আত্মজ শিশুটির অস্তিত্বের উপলব্ধি করে সুখানুভব করতেন নন্দু তা পারেনি। মাত্র দেড়মাসের ভ্রূণ নিজের অস্তিত্বের জানান দিতে পারে না। সান্ড্রাকে ওদের ভালো লেগেছিল। তথাগতকে বশে আনতে মেয়েটার বেশি সময় লাগেনি। না, জোজো দেশে ফিরে না আসার জন্য হয়তো অনেক অসুবিধাই পোয়াতে হয়েছে ওদের তবুও নন্দুর মনে আজ আর দুঃখ নেই। তাই নন্দু পরম প্রশান্তিতে কচি কচি কাঁচা হাতের লেখা দুই নাতির পাঠানো কার্ডের অপেক্ষায় থাকে এখন। দুটো দামাল একবারই এসেছিল। আবার আসবে। সেই দিন গোনে নন্দু। জোজো বিবাহিত জীবনে সান্ড্রাকে নিয়ে, দুই ছেলেকে নিয়ে সুখী। থাকুক না ওরা দূরে, তাতে কি? মা তো এটুকুই শুধু চায়—'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে?'

তথাগত—সুনন্দা মুখার্জির জীবনের অর্ধেক আকাশ নীল নীলিমায় ভরা। সেখানে গৌতম মুখার্জি, সান্ড্রা, বোধিসত্ত্ব আর শুদ্ধশীলরা তারার মতো জ্বলজ্বল করে ফুটে থাকে। নিজের পরিবার থেকে দূরে থেকেও পারিবারিক মমত্ব থেকে বঞ্চিত নয় জোজো। নন্দু ছেলে বউ বা দুই নাতিকে কাছে রেখে পারিবারিক আদর দিতে না পারলেও সান্ড্রার বাবা-মা, ঠাকুরদা আর ভাই প্রায়ই এসে পারিবারিক স্পর্শ বুলিয়ে দিয়ে যায় ওদের মনে প্রাণে। সান্ড্রার বাবা এন্ড্রুর সঙ্গে, দুই নাতি বুধ আর শুধের সঙ্গে মোবাইলে গল্প করে তথাগত। নন্দু মাঝখানে মোবাইল কেড়ে নিয়ে নিজের কানে লাগায়। সান্ড্রা-জোজোর

গাঁটছড়া খুলবে না কখনও। ওদের পরিবারে কেউ গাঁটছড়া খোলেনি। ঠাকুরদা-ঠাকুরমা একসাথেই থেকেছে। ঠাকুরমার মৃত্যুর পর ঠাকুরদা ইলিনয়েসে ছেলে এন্ড্রুর কাছে এসেই আছে। জোজো বলে —'ওরা একেবারে ভারতীয়দের মতো মাম্মা। তুমি আমার বিয়ে কোলকাতার কোনও বাঙালি মেয়ের সঙ্গে দিলে যেমন হত এরা সেরকমই মা। তোমরা একবার এসে নিজের চোখে দেখে যাও তাহলে বুঝবে তোমার ছেলে অসুখী নয়।' —নন্দু জানে সব আমেরিকানরাই পরিবার ছেড়ে ছিটকে চলে যায় না চিরকালের জন্য। পৃথিবীর সবদেশেই কিছু ছিটকে যাওয়া কিছু আটকে থাকা পরিবার থাকে। জোজোর ভাগ্য ভালো যে ও সান্ড্রাকে পেয়েছিল। কোলকাতার বাঙালি মেয়ে বিয়ে করলেও জোজো এত সুখী নাও হতে পারত। পরিবার ভেঙে চলে যাওয়ার চলটা এখন বাঙালিদের মধ্যেই বেশি দেখা যায়। —ডোনার জীবনটাও যদি এরকমই হত তাহলে ওদের বাকি অর্দ্ধেক আকাশটা ঘন কালো মেঘে ঢেকে থাকত না।

নদীর এপাড় ভাঙে ওপার গড়ে। নবীন ব্যানার্জির পরিবারের এই প্রজন্মে ভাঙা পাড়ের নীচে প্রথম চর ভেসে উঠেছে। পুঁটুর ছেলেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বার জন্য নন্দুপিসির কোনও সাহায্যই দরকার হয়নি। পুঁটুর ছেলে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাস করে নিজের যোগ্যতায় ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে। পুঁটু মুখার্জি ইন্টারন্যাশনালের হেড অফিসে এসে খবরটা জানিয়ে গিয়েছিল নন্দুকে। ওর চোখ মুখে খুশি ছিল কিন্তু অহংকার ছিল না সেদিন। বলেছিল — 'ছেলেটা উচ্চমাধ্যমিকেও ভালো রেজাল্ট করেছে আর ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে চান্স পেয়ে গেছে জয়েন্টে। তুমি বলেছিলে উচ্চমাধ্যমিকের রেজাল্ট বের হলেই এসে জানাতে। তো আমি ভাবলাম জয়েন্টের রেজাল্টটা দেখে নিই তারপরই আসব। তাই আজ এসেছি নন্দুপিসি। আমাদের বংশে এতখানি লেখাপড়া আগে তো কেউ করেনি তাই আনন্দে -----।'

পুঁটুর চোখে জল এসে গিয়েছিল আনন্দে। তারপর তো কতবছর বেরিয়ে গেল জীবন থেকে। মনা-পুঁটুরাও রিটায়ার করে চলে গেল। সেদিনের পর আর দেখা হয়নি। দেখা তো এমনিতেই হত না। ধর্মঘটের সময় নিতান্ত ঠেকায় পড়ে ও ডেকে পাঠিয়েছিল। ওরাও কাজটা করেছে বলে কোনওরকম সুবিধা আদায় করতে আর আসেনি। নন্দুর বিশ্বাস নবীনদাদুর এই জেনারেশন জীবনে দাঁড়িয়ে যাবে ভালোভাবে কারণ এদের আত্মবিশ্বাস আর আত্মমর্যাদাবোধ দুটোই আছে। অপুদের জমানা শেষ। নদীর নতুন চরের পলিমাটিতে মনা-পুঁটুদের ছেলেমেয়েরা সজীবগাছের মতো আকাশে মাথা ছুঁইয়ে দাঁড়াবে। চোখে না দেখতে পেলেও, জানতে না পারলেও ওর মন একথাই বলছে। ওর নিজের মননদীর মজবুত বাঁধ দেওয়া পাড়টা কবে প্রথম ফেটে চৌচির হয়ে ভেঙে পড়েছিল? ডোনা যখন ওর বেডসাইড টেবিলে দু-তিনবার ছেলেবন্ধুর ছবি পালটে রেখেছে তখন থেকে? ডোনা কাছাকাছি না থাকলে ওর মোবাইল বাজলে ফোন তুললে ওপার থেকে যখন পুরুষ কণ্ঠ

ভেসে আসতো —'ইজ ইট গার্গী স্পিকিং? ' তখন থেকে? না-না। তখন ওর এসব নিয়ে এমন কিছু মাথাব্যথা হয়নি । তথাগত, ইন্দ্রাণী, সিদ্ধার্থ সকলেই বলতো এগুলো সিরিয়াস কিছু নয়। বয়সের ধর্ম, যুগের প্রভাব। ওসব চলে যাবে। নন্দুও ভেবেছে—হ্যাঁ, এসব চলে যাবে। ও নিজে একদিন মেয়েকে নিয়ে বসবে। ওকে বলবে, বোঝাবে লক্ষ্মণরেখা কাকে বলে। ও ওর মায়ের দায়িত্ব পালন করেছিল বইকি! খুব ভালো করেই বুঝিয়ে ছিল —ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা করছ। ফট করে প্রেমে পড়ে গেছ মনে করছ, ওগুলো কিন্তু প্রেম নয়। শুধু ভাল লাগা। এগুলোকে যত কম প্রশ্রয় দেবে ততোই তোমারও মঙ্গল আমাদেরও শান্তি। সীমানা ছাড়িয়ে যেও না যেন। একবার সীমানার চৌকাঠ পার করে ফেললে আর সেই ভুল শোধরানো যায় না। মেয়েদের এই কথাটা মনে রেখে চলতে হয় ডোনা। দ্যাখ, তোকে দেখতে এত সুন্দর, ছেলেরা তো আকৃষ্ট হবেই। আমাকে দেখেও হত রে। কিন্তু আমি নিজের ব্যালেন্স হারাইনি কখনও। কোনও ভুল কাজ করিনি আর তাই সারাজীবন তোর ড্যাডের কাছে সম্মান পেয়েছি। একটু আধটু বন্ধুত্ব ঠিক আছে কিন্তু তার বেশি ঘনিষ্ঠতা করিস না যাতে ক্ষতি হতে পারে। বুঝলি? মনে রাখিস মার কথাগুলো।

ওর উনিশ-কুড়ি বছরের মেয়ের ইজ্জতে খুব লেগেছিল সেদিন। তর্ক জুড়ে দিয়েছিল-তুমি কি আমাকে এরকম মনে করো মাম্মা? তোমার মনে হয় আমি কোনও খারাপ কাজ করতে পারি? ছি: ! আমি ভাবতেও পারছি না যে তুমি আমাকে নিয়ে এমন চিন্তা করো!

নন্দু বলেছিল—সব মায়েরাই মেয়ে বড়ো হলে উৎকণ্ঠায় থাকে। সব মায়েরাই মেয়েদের বুঝিয়ে বলে রে। তবুও কত দুর্ঘটনা অনিচ্ছাকৃতভাবে ঘটে যায় তাই না? তুই খারাপ বলে আমি ভাববো কেন? কিন্তু সঙ্গীসাথীরা সবাই যে ভালো হবে এমন তো না হতেও পারে। তাই সাবধান থাকতে বলছি। এতে এত রেগে যাওয়ার কি হল? আমাদের দেশে এখনও ছেলেদের সাতখুন মাফ কিন্তু মেয়েদের বেলায় পান থেকে চুন খসলে এই গেল এই গেল আওয়াজ ওঠে সমাজে। — ডোনা সেদিন আরও তর্ক করেছিল অনেকক্ষণ ধরে। যেমনটা আজকাল, উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত সব মেয়েরাই করে থাকে বড়োদের সঙ্গে। নন্দু ধৈর্য্য ধরে শান্ত করে রেখেছিল নিজেকে। এক একটা সময় মেয়ের অযথা তর্ক থামাবার জন্য টেনে একটা থাপ্পড় মারার জন্য হাত নিসপিস করেছে, তবুও সংযত রেখেছিল নিজেকে।

সেকেন্ড ইয়ার শেষে ডোনা এক অন্য ডোনা হয়ে বাড়ি এল। শান্ত, নিস্তব্ধ, আত্মমগ্ন। আগের মতো বেডসাইড টেবিলে কোনও হাসি মুখ স্মার্ট যুবকের ছবি রাখা নেই। দাদু-ঠাম্মির সঙ্গে চায়ের আসরে বসে নতুন বয়ফ্রেন্ডের নানা গুণ কীর্তনের চেষ্টায় বাচালতা নেই। একটা ফেনিল সমুদ্র যেন হঠাৎ মন্ত্রবলে নিস্তরঙ্গ ঝিল হয়ে গেছে যার চারপাশে পাড় আছে, সীমানা আছে। পুরো ছুটিটা বেশির ভাগ সময়ই বাড়িতে বসে

পড়াশুনো করে কাটিয়ে দিল। ডোনা যে বাড়ির ভেতরে আছে সেটা বোঝাই মুশকিল হত ওর উচ্ছ্বাসহীন নিঃশব্দ অবস্থানে। নন্দু মনে মনে খুশি হয়ে ভাবে — গতবারে দেওয়া দাওয়াই কাজে লেগেছে। মেয়ে বুঝতে পেরেছে মায়ের দেওয়া উপদেশগুলো মেনে চলা উচিত। যাক্, ডোনাকে সামলে নেওয়া গেছে সময়মতো। আর ভুলপথে চলে যেতে পারে ভেবে ভয়ে ভয়ে থাকতে হবে না নন্দুকে।

এই আনন্দ নিয়েই ডোনার ফাইনাল পরীক্ষা পর্যন্ত মানসিক শান্তি বজায় থেকেছে ওর। এবার ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরে নিজেদের ফ্যাক্টরিতেই কাজে লেগে পড়বে, নতুন নতুন সফিস্টিকেটেড মেশিনপত্র কিনতে বিদেশে যাবে অন্য ইঞ্জিনিয়ারদের টিম সঙ্গে নিয়ে। ওর বাবার পাশে শক্তপায়ে দাঁড়িয়ে মুখার্জি ইন্টারন্যাশনালকে কম্পিটিশনের বাজারে লড়াই করে প্রথমসারিতে রাখার জন্য সহায়তা করবে। তথাগতও জোজোর ফিরে না আসার দুঃখ ভুলে মেয়েকে পাশে পেয়েই নতুন উদ্যম খুঁজে পাবে। —নন্দুর স্বপ্নরা ওর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে বসল। নন্দুর আশায় জলাঞ্জলী দিয়ে ডোনা জানাল ও এখনই ফিরতে পারবে না। মাস্টার্স করার জন্য এখন মনিপালে থেকেই ওকে চেষ্টা চালাতে হবে।

যুক্তিসঙ্গত কথা। মনে মনে তথাগতর ইচ্ছে ছিল ডোনাকেও বিদেশে পাঠাবে কিন্তু জোজোর কেসটা দেখার পর গার্গি মুখার্জির বেলায় সেটা আর প্রকাশ করার সাহস পেল না। দেশেই মাটার্স করুক না! নিজেদের কাছেই থাকবে তো তবুও। খুশি মনেই বলেছিল তথাগত — 'খুব ভালো কথা। দ্যাখ চেষ্টা করে। তোর রেজাল্ট তো বরাবরই ভালো হয়েছে, পেয়েও যেতে পারিস। আর না পেলেও আমি তো আছি ডোনা! টাকা ঢেলে তোকে মাস্টার্স করিয়ে নিয়ে আসব। কিচ্ছু ভাবিস না তুই।'

ডোনা প্রতিবাদ করে বলেছিল--'না ড্যাড, টাকা ঢালার প্রশ্ন নেই এখনই। দেখি না চেষ্টা করে। মা কে শুধু সামলে রেখো। বাড়ি আসছি না বলে ঘ্যান ঘ্যান যেন না করে। এখন বেশ কিছুমাস আমার এখানে থাকা খুব জরুরি। তোমরা একেবারে দুশ্চিন্তা করো না।' সত্যি, নন্দুও ঘ্যান ঘ্যান করেনি। মেয়ে যথেষ্ট বড়ো হয়েছে। একজন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার। নিজের বিদ্যা-বুদ্ধি, জ্ঞান সবই আছে। আচার আচরণে অসংগতি চোখে পড়ে না। বরং বয়স বাড়ার সাথে সাথে অনেক বেশি সংযত হয়েছে ডোনা। ওকে নিয়ে ভাবনা করা বাতুলতা। হ্যাঁ, ডোনা মা-বাবার সম্মতি নিয়েই ওখানে থেকে গিয়েছিল। রেজাল্টও ভালো করেছিল। আর পোস্ট গ্রাজুয়েশনেও নিজের চেষ্টাতেই স্থান করে নিয়েছিল। বাড়ির সঙ্গে টেলিফোনিক যোগাযোগ ছাড়া আসার সম্ভাবনা ছিল না ওর। নন্দুরাও ওর কেরিয়ারের কথা ভেবে চাপ দেয়নি কখনও । একই দেশের মধ্যে, ওইটুকু দূরত্বের ব্যবধানে যে এতবড়ো কিছু ঘটে যেতে পারে একথা কল্পনায়ও আসেনি ওদের। ছাব্বিশ বছর ধরে একটু একটু করে জমিয়ে গড়ে তোলা পরম বিশ্বাসের পাহাড়টা মুহূর্তের অ্যাভেলেঞ্চে ধ্বসে নিঃশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। মোবাইল ফোনে কয়েকবার বিভিন্ন

জনের কাছ থেকে কল, এস. এম. এস. এসেছিল —'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে আসুন। গার্গি মুখার্জি হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে।

বনবন করে ঘুরতে থাকা মাথায় দিশেহারা নন্দুর পক্ষে সেদিন কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়াই সম্ভব হয়নি। রুনা না থাকলে ও বোধহয় রওয়ানা হতেও পারত না একা একা। তথাগত তখন কোলকাতার বাইরে। রুনাই দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় নিস্কম্প প্রদীপের মতো স্থির থেকে ভাইজাগে তথাগতকে জানিয়েছে, বলেছে—' যে ফ্লাইট পাবেন সেটাতেই চেপে আপনি চলে যান। আমি ম্যাডামকেও ফার্স্ট অ্যাভেইলেবল ফ্লাইটে পাঠাবার বন্দোবস্ত করছি স্যার। ভগবানে বিশ্বাস রাখুন স্যার। ডোনার কিচ্ছু হবে না। ও ভালো হয়ে যাবে।' —মিসেস গোমস মারা যাওয়ার পর রুনাই ওঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছিল। এতকালের সহাবস্থানের ফলে রুনাই এবাড়ির গৃহিনী হয়ে উঠেছিল প্রায়। নন্দুকে অফিস যেতে হত, সংসারের দায় একটু একটু করে রুনার কাঁধে না চাপিয়ে ওর উপায় ছিল না। গত কয়েক বছর ধরে রুনা আর ডিউটির শেষে সেই বেলগাছিয়াতে নিজের বাড়িতে ফিরে যায় না। ওর স্বামী মারা যাবার পরই ইন্দ্রাণী প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবাড়িতেই ওকে থেকে যাবার জন্য। রুনা সবিনয়ে বলেছিল—এখনই নয় বড়ো মেমসায়েব। ছেলেটা সবে ইউ. কো. ব্যাংকে চাকরি পেয়েছে। ওর বিয়ে দিয়ে ঘরে বউ এনে আমি এবাড়িতে চলে আসব নিশ্চিন্ত হয়ে। এখনও কিছুদিন আর একটু কষ্ট সহ্য করতে হবে আসা-যাওয়া করার।' —যা বলেছিল ঠিক তাই করেছিল। ছেলের বউ-এর হাতে বেলগাছিয়ার সংসার তুলে দিয়ে মুখার্জি ম্যানশনের একজন মেম্বার হয়ে চলে এসেছিল রুনা। নন্দুর একান্ত কাছের মানুষ, সাহায্যকারী, সখী, সচিব—সবকিছু!

অতি পুরাতন ভৃত্য সামসুদ্দীন বাবুর্চি, মালি হরিহর আর আরও দুজন মহিলা কর্মি অনুপমাদি আর নন্দুর বর্তমান অ্যাসিটেন্ট পায়েলের হাতে মুখার্জি ম্যানশনের সব ভার বুঝিয়ে দিয়ে রুনা নিজে নন্দুকে নিয়ে রওয়ানা হয়েছিল সন্ধের ফ্লাইটে। ইন্দ্রাণী শরীর খারাপ নিয়েও এয়ারপোর্ট পর্যন্ত এসেছিলেন। সারাটা পথ নন্দুকে নিজের বুকের কাছে ধরে বসে এসেছিলেন ইন্দ্রাণী। মুখে একটি কথাও নয়; শুধু হাতের স্পর্শে এক কঠিন সময়কে মোকাবিলা করার শক্তি সঞ্চারিত করে চলেছিলেন উনি। আর নন্দুর হৃদপিন্ডের ভেতরে টিকটিক করে চলতে থাকা প্রাণটা শুধু একটা কথাই বলে যাচ্ছিল —ডক্টররা সেভেন্টি টু আওয়ার্স সময় দিয়েছেন। তার আগে কিছু বলা যাবে না বলছেন। —বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে কতঘন্টা পেরিয়ে গেল তার হিসাব করার চেষ্টা বার বার গুলিয়ে যাচ্ছে। ওর ভঙ্গুর মন নিজের অস্থিরতায় সব ওলট-পালট করে দিচ্ছে। কিছুই সঠিক ভাবে চিন্তা করতে পারছে না ও। ডোনার যে কি হয়েছে সেই কথাটা ওর বন্ধুরা যারা ফোন করেছিল তারা কেউ বলল না। কেন বলল না? কেন এড়িয়ে গেল কি অসুখ করেছে গার্গির? তথাগত কি এতক্ষণে পৌঁছে গেছে? ও কি গিয়ে ডোনাকে বাঁচাবার চেষ্টা শুরু করে দিয়েছে? নন্দু কি গিয়ে দেখতে পাবে ডোনা সব বিপদ মুক্ত? না কি ---- ।

—সিটবেল্টটা বাঁধার ক্ষমতাটুকুও হারিয়ে ফেলেছে ও। মাথাটা সিটের ব্যাকে রেখে চোখ বন্ধ করে বিভীষিকা দেখতে থাকে নন্দু। রুনাই হাত বাড়িয়ে সিটবেল্ট বেঁধে দেয়। ক্লীনেক্স দিয়ে চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বলে —'এসব কি হচ্ছে? এভাবে ভেঙে পড়লে মেয়েটার অমঙ্গল হবে না?'

* * * * *

—'হ্যাঁ মা, আমি বলছি। কেমন আছে এখন? তোমরা কেমন আছ? ' —ডিব্রুগড়ে মাকে ফোন করে ও।

—'একই রকম আছে। কথাটথা বলেই না প্রায়। জোর করে খাওয়াই ছোটো বাচ্চার মতো।'

—'তোমাদেরই কষ্ট মা।'

—'কষ্ট আমাদের জন্য তো নয় নন্দু। কষ্ট ওর কষ্ট দেখে। ছটফটানি তো এখনও যাচ্ছে না। সেই সময় ওকে দেখলে কষ্ট হয় আমার। ডা. হাজারিকা বলছেন অবশ্য এটা আর বেশিদিন থাকবে না। ছেড়ে দেবার পরেও কিছুদিন এই সিনড্রোমটা থাকে। সেই আশাতেই আছি এখন।'

—'আর সে কেমন আছে মা? ওর দিকে নজর টজর দেয়?'

—'সে খুব ভালো আছে রে। সে ই তো সব দুঃখ ভুলিয়ে রেখেছে আমাদের। তোর বাপি তো তাকে নিয়েই মজে আছে। তবে ওর দিকেও নজর দেয় না। ও যে আছে সেটাও ভুলে গেছে মনে হয়।

—'সারাদিন ঘরেই থাকে? বাইরে যেতে চায় না?'

—'না। বাইরে যেতে চায় না। একদিক থেকে ভালোই রে নন্দু। বাইরে বেরোলে আবার যদি ওসব জোগাড় করে ফেলে? তুই কি ভাবছিস এখানে ওসব নেই? কোলকাতার থেকে বেশিই আছে হয়তো। আমরাই জানি না। কিন্তু যারা এসব নেয় তারা ঠিক জোগাড় করে ফেলতে পারে।' —শ্রীলা দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

এদিক থেকে নন্দুও দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—'কেন এরকম হল মা? আমি বা তথাগত তো কখনও কারও ক্ষতি করিনি!'

—'তুই কি একা নন্দু? লক্ষ লক্ষ বাবা-মায়েরা এই অভিশাপের যন্ত্রণা ভুগছে। তারা কি সকলেই কারও ক্ষতি করেছে? এটা যে যুগের অভিশাপ রে! কিচ্ছু করার নেই। আমরা তো তবু ব্যয়সাধ্য চিকিৎসাটা করিয়ে পথে আনতে পারছি। কতজনে সেটা প্যাবে বল তো?'

—'ঠিকই বলেছ মা। আচ্ছা মা, তোমার বা বাপির সঙ্গে কথা বলে না?'

—'বলে এখন একটু। নিজে থেকে বলে না। জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেয়। ডা. হাজারিকা বলেন এটাও অত্যন্ত পজিটিভ সাইন। —নন্দু তুই এত মুষড়ে পড়িস না। ওকে আমরা ভালো করে তুলবোই। চিন্তা করিস না এত —বুঝলি?'

নন্দু কেঁদে ফেলে —'মা এই বয়সে তোমাদের ওপর এতবড়ো বোঝা ---

—'ভুল করছিস নন্দু। এই বয়সে এই এতবড়ো শূন্য বাড়িটাতে ওরা এসে আমাদের মরাগাছের গোড়ায় জল ঢেলেছে রে। কোথা থেকে অলস জীবনে ব্যস্ততা এসে পড়ে শরীর-মনে নতুন করে শক্তি এনে দিয়েছে। হাঁটুর ব্যথা, কোমরের ব্যথা সব পালিয়েছে ওই দামালটাকে সামলাতে সামলাতে। আমরা ওদের কাছে পেয়ে আয়ু ফিরে পেয়েছি মনে হচ্ছে। তুই ওসব নিয়ে ভাবিস না। কান্না বন্ধ কর।'

—'বেশ। আর কাঁদব না। কিন্তু মা, স্থান বদল করে ঠিকানা পালটে কি আমরা ওর অতীতটা মুছে দিতে পারব বল? কী করে এতবড়ো জীবনটা কাটাবে ও?'

—'তুই তো আগে এমন করে নেগেটিভ চিন্তাভাবনা করতিস না নন্দু! সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। এটা তোর ঠামার বা আমার যুগ নয়! এটা একুশ শতকের যুগ। এযুগে এসব নিয়ে কেউ ভাবে না, শুচিবাইও করে না। সব ঠিক হয়ে যাবে। ও আবার নতুন করে বাঁচতে শিখবে। অতীত অতীতের ঠিকানায় পড়ে পড়ে পচে যাবে। কেউ ফিরেও তাকাবে না ওর অতীতের দিকে। ভবিষ্যতে আমার বলা কথাগুলো মিলিয়ে দেখে নিস তুই। ও জীবনে ভালো একজন জীবনসঙ্গী পাবে। সুখেই থাকবে রে!'

—'জানি না মা। বড়ো ভয় পাই। আর কোনও স্বপ্ন দেখতে চাই না আমি। তোমার কথাতেও আস্থা রাখতে পারি না। যদি কোনওদিন তোমার কথা সত্য হয় তবে সেদিন আবার স্বপ্ন দেখব।'

শ্রীলা বিরক্ত গলায় বলে—'আমার মনে হচ্ছে তুই বেশি চিন্তা করে করে নিজেই ডিপ্রেশনের পেশেন্ট হয়ে যাচ্ছিস। ওর ভাবনা-চিন্তা এখন আমাদের ওপর ছেড়ে দিয়ে তুই নিজে ঠিক থাক। ও তো আর জলে পড়ে নেই! ওর দাদু-দিদার রক্ষণাবেক্ষনে আছে। আমরা তোর মতো এত ভেঙে পড়িনি। ভুল করেছে তার খেসারত দিচ্ছে সাময়িক ভাবে। সারাজীবন তো আর দেবে না। ভালো হয়ে গেলেই নতুন করে জীবন শুরু করার কথাও ভাববে। —নে রাখ এখন। আমার কাজ আছে।' ফোন রেখে দিয়ে আঁচল তুলে চোখ চাপা দেয় শ্রীলা নামের একদা স্মার্ট, সুন্দরী, বর্তমানে একমাথা পাকা চুল ভারী শরীরের এক বৃদ্ধা রমণী। যার এই সময় নিজের দুঃখ প্রকাশ করারও অধিকার নেই প্রকাশ্যে। বিষ হজম করেও যাকে স্তোক বাক্য শোনাতে হবে নিজের একমাত্র মেয়েকে। মেয়ে এবং মেয়ের খ্যাতিমান শ্বশুরবাড়ির মান-সম্মান, ইজ্জৎ বাঁচাতে শ্রীলা আর আদিত্যকে এখন শেষ বয়সে এসে আবার শিশু পালনের হাতেখড়ি করতে হয়েছে। কোলকাতা থেকে সুদূরে আসামের এই প্রত্যন্ত ডিব্রুগড় শহরে রায়চৌধুরি ভিলার অন্দরমহলে গোপন করে রাখতে হয়েছে মুখার্জির ম্যানশনের কলংককে। এছাড়া আর কোনও উপায় যে ছিল না অসহায় মুখার্জি ম্যানশনের মানুষগুলোর!

ডোনা হাতের কবজি কেটেছিল নতুন ব্লেড দিয়ে! কবজি নয়। কবজির চামড়া, তারপর পরতে পরতে মাংস, তার নীচে নীল রংয়ের যে শিরাটা টিপে ধরে ডাক্তাররা

নাড়ী দেখে ডোনা সেটাকে কেটেছিল। অনেক রক্ত বয়ে বিছানা ভিজে মাটিতে গড়িয়েছিল। ও আত্মহত্যা করে মরতে চেয়েছিল। পারেনি। ব্যাঙ্গালোরের মতো জায়গায় মরা কি অত সোজা? দুনিয়ার তাবড়ো ডাক্তাররা মরা মানুষ বাঁচানোর ব্রত নিয়ে বসে আছে ওখানে। ডোনারও মরা হল না।

তথাগতই আগে পৌঁছেছিল। নন্দু আর রুনা হাসপাতালে পৌঁছে জানতে পেরেছিল গার্গি মুখার্জির ব্যর্থ আত্মহত্যার প্রয়াসের কথা। তখনও ব্যর্থ বলা ঠিক নয় যদিও, কারণ ডাক্তাররা বাহাত্তর ঘণ্টার আগে কিছু বলতে নারাজ। প্রচুর রক্ত দিতে হয়েছে। কলেজের ছেলে-মেয়েরা, অধ্যাপকরাই ব্লাড ডোনেট করেছে। আত্মহত্যার ব্যর্থ প্রয়াস এজন্য বলা যায় যে ওর গ্রুপের রক্ত সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া গেছে বলে ওর সহপাঠীরাই আশা করছে গার্গি এ যাত্রা বেঁচে যাবে। যে মেয়েটি প্রথম ফোনটা করেছিল ও যে ডোনার বিশেষ বন্ধু সেটা বোঝা গিয়েছিল যখন নন্দু পৌঁছোনোর পর ও এসে নন্দুর দিকে আট মাসের একটা ফুটফুটে বাচ্চা এগিয়ে দিয়ে বলেছিল —'একে ধরুন আন্টি। গতরাত থেকে আমরা কজনে পালা করে কোনোরকমে একে রেখেছি। এখন আপনি এসে গেছেন তাই আমরা নিশ্চিন্ত হলাম। ও গার্গির ছেলে। বয়স আট মাস।'

আঘাতের পর আঘাতে বিধ্বস্ত নন্দু বাকরহিত। এ কি ধরনের অসভ্য রসিকতা করছে মেয়েটা? গার্গি আই. সি. ইউ তে মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করছে, ওদের এই বিপদের সময়, এই মানসিক অবস্থাতে এরকম রসিকতা করা কি একটা শিক্ষিত মেয়ের পরিচয়? বিরক্ত নন্দু মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলে —'হোয়াট নোনসেন্স ইজ দিস?'

মেয়েটাও অসহায়ের মতো এবার তথাগত আর রুনার দিকে তাকিয়ে বলে —'দিস ইজ নো নোনসেন্স স্যার। এ ধ্রুব। গার্গির ছেলে।' —কি যেন ভাবে মেয়েটা। তারপর আবার বলে—'গার্গি তারমানে আপনাদের কিছুই জানায় নি। ও এত বেশি ডিপ্রেসড্ ছিল সমস্ত ব্যাপারটা নিয়ে----এত আঘাত পেয়েছিল প্রফেসর শুক্লার চলে যাওয়াতে ---এবার বুঝতে পারছি।' বলে মেয়েটা বাচ্চাটাকে নিয়ে চলে যাবার উদ্যোগ করতেই তথাগত ওকে আটকায় —'চলে যেও না বসো এখানে। আমাদের সব কথা খুলে বল। আমি সব শুনতে চাই। কেন গার্গি স্যুইসাইড করতে চেয়েছে? কি ঘটেছে ওর জীবনে যা আমরা জানি না? প্লিজ কোনও দ্বিধা না করেই বল। আমাদের তো সব জানা দরকার।'

সবই জানতে পেরেছিল ওরা। ওদের মেয়ের পোস্টগ্র্যাজুয়েশনের সিলেকশন একজামিনেশনে ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট করে চান্স পাওয়ার কথা। প্রফেসার শুক্লার কাছে সেই থার্ড ইয়ার থেকে স্পেশিয়েল কোচিং নেওয়ার কথা। ওদের দুজনের মধ্যে গভীর প্রেম হওয়ার কথা। বিবাহিত দুই সন্তানের পিতা প্রফেসর শুক্লার সঙ্গে রূপসী, প্রায় মেয়ের বয়সি গার্গি মুখার্জির সম্পর্ক নিয়ে ক্যাম্পাস জুড়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আলোচনার কথা। গার্গির প্রেগন্যান্ট হওয়ার কথা। ইউনিভার্সিটি পোস্টগ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্টস হোস্টেলের এক

কামরার নিজস্ব ফ্ল্যাট থেকে বহিষ্কার হওয়ার কথা। ধ্রুবর জন্মের কথা। পরিশেষে প্রফেসর শুক্লার রেজিগনেশন দিতে বাধ্য হওয়া এবং আগে থেকেই ইউ. এস. য়ের চাকরি জোগাড় হয়ে থাকার জন্য পরিবার নিয়ে চলে যাবার কথা জানাজানি হতেই গার্গির ভায়োলেন্ট রি-অ্যাকশন, ড্রাগ এডিকশন—সব জেনেছিল ওরা তিনজনে ওখানে বসে বসে। আত্মহত্যার চেষ্টার চারদিন আগে শুক্লারা ইউ. এস. এ.-তে ফ্লাই করেছেন। ক্যাম্পাস হোস্টেল ছেড়ে গার্গি কাছাকাছি একটা বাসা ভাড়া করে থাকত। এ. টি. এম. থেকে টাকা তুলে তুলে সব ক'টা ব্যাংকের ব্যালেন্স নিল হয়ে গিয়েছিল। বন্ধুরাও ধার দেওয়া বন্ধ করেছিল ড্রাগ নেয় বলে।

এতক্ষণে রুনা আর থাকতে না পেরে মেয়েটির কোল থেকে ধ্রুবকে নিজের কোলে টেনে নেয়। মেয়েটা যেন এতক্ষণে গচ্ছিত পরের ধনের দায়মুক্ত হয়। বলে —'যত দিন প্রফেসর শুক্লা এখানে ছিলেন উনি ওকে টাকা দিতে চাইতেন কিন্তু গার্গি কিছুতেই ওঁর কাছ থেকে কোনও সাহায্য নেবে না। আপনারা হয়ত এইসব শুনে কষ্ট পাচ্ছেন কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি তো সাক্ষী, আমি জানি ওদের দুজনের মধ্যে কতটা গভীর সম্পর্ক ছিল, কত ভালোবাসা ছিল। আসলে, প্রফেসর শুক্লারও কোনো উপায় ছিল না। গার্গি প্রফেসর শুক্লাকে কখনও দোষ দেয়নি, দায়ী করে নি। নিজের দুর্ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে এসব কাণ্ড করে ফেলেছে। ও ভালো হয়ে যাবে আন্টি। এটাই আমাদের বিশ্বাস।'

আর কিছু শোনার ছিল না। মেয়েটা তখনকার মতো চলে গিয়েছিল। আই. সি. ইউ য়ের বাইরে 'নো নয়েজ' জোনে ডোনার ছেলের গলার গার্গলিং-এর শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ ছিল না ওদের তিনজনের মুখে। তথাগত আর নন্দুর রক্তশূন্য হয়ে যাওয়া মুখ দুটোর দিকে তাকিয়ে রুনার বুকের ভেতরে হৃদপিন্ডটা শুধু জোরে জোরে ধক ধক করছিল ভয়ে। এরা দুজন হার্ট ফেইল করবে না তো? সারাটা জীবন ও এদের সঙ্গে কাটিয়ে দিয়েছে। ও জানে দুঃখের সঙ্গে কিংবা অসম্মানের সঙ্গে এদের কোনও পরিচয় নেই। ওদের জীবনে হঠাৎ ঘনিয়ে আসা এই ভয়ানক ঝড়, এমন ঘনঘোর অন্ধকার কাটিয়ে উঠতে পারবে তো এই চিরকালের সুখী দম্পতি? এই সময় ওর এখন কি বলা উচিত? ম্যাডাম একা থাকলে ও তবু সামলে নেওয়ার চেষ্টা করতে পারত কিন্তু ছোটোসাহেব রয়েছেন। ওর সামনে রুনা এখন কি বলবে? একে তো ওর মতো একজন সামান্য কর্মচারির সামনে ওদের পরিবারের এতবড়ো কলঙ্কটা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। উনি কি ওকে বিশ্বাস করতে পারবেন যে রুনা প্রাণ থাকতে কোনোদিনই একথা কারোও কাছে প্রকাশ করবে না? ম্যাডাম ওকে জানেন। বিশ্বাসও করেন। কিন্তু সাহেব কি আস্থা রাখতে পারবেন ওর ওপরে? এই ধ্রুবর বয়সের ডোনাকেও কোলে নিয়েছে, খাইয়ে দিয়েছে রুনা। ডোনার জন্য ওদের যতটা কষ্ট হচ্ছে ওর ও তো হচ্ছে। ম্যাডাম একা তো জোজো

আর ডোনাকে মানুষ করেনি, রুনারও সহযোগিতা ছিল দুটো বাচ্চাকে বড়ো করে তোলার পেছনে। ওদের কি সে কথা মনে আছে? — কোনও কথা বলার সাহস জোগাড় করতে না পেরে রুনা নামের একান্ত অনুগত মহিলা বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে এক পা থেকে অন্যপায়ে নিজের শরীরের ওজন শিফট করতে থাকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। আর ঠিক তখনই তথাগত নন্দুর পিঠে হাত রেখে বলে ওঠেছিল। —'ধ্রুবকে তুমি তোমার কোলে নেবে না নন্দু? নাও ওকে কোলে নাও।' নন্দু নীচু মাথাটা উঠিয়ে এমন একটা দৃষ্টিতে তথাগতর দিকে তাকিয়েছিল যে দৃষ্টিতে কোনও কথা নেই, কোনও প্রশ্ন নেই—কিছুই নেই। একেবারে শূন্য ভাবলেশহীন সে দৃষ্টি। দেখে রুনার গা টা ছমছম করে উঠেছিল। ম্যাডাম যেন অনেক গভীর ঘুম থেকে সবে জেগে উঠে কিছু না বুঝতে পেরে ফ্যাল ফ্যাল করে নির্বোধের মতো তাকিয়ে রয়েছে। কোনও কিছু না ভেবেই ও ধ্রুবকে স্রেফ ম্যাডামের কোলে নামিয়ে দিতেই বাচ্চাটা হঠাৎ হেসে উঠে ম্যাডামের বুকের কাছে লটকে থাকা লকেট শুদ্ধ চেইনটা ধরে খুশিতে নানা রকম আওয়াজ করতে লাগল আর ম্যাডাম যেন ঘুমের ঘোরেই নিজের দুহাতের বেড়ে বাচ্চাটাকে কোলের গভীরে টেনে নিল। রুনার দু চোখে জল এসে গিয়েছিল। কোলে যখন নিয়ে নিয়েছে তখন আর ভয় নেই। ম্যাডাম এবং ধ্রুব দুজনের বিপদই কেটে গেল।

ব্যাঙ্গালোরের হোটেলে বসে রুনার পরামর্শই ওদের দুজনের পছন্দ হয়েছিল। সমস্যা সমাধানের জন্য এত সুন্দর ভাবে এত দরদ দিয়ে রুনা ওদের বুঝিয়েছিল যে ডোনা সুস্থ হলে ব্যাঙ্গালোর থেকে ম্যাডাম যেন ডোনা আর ধ্রুবকে নিয়ে একেবারে সোজা ডিব্রুগড়ে চলে যান। তাতে আলিপুরের বাড়ির কেউ জানতে পারবে না ঘটনাটা। আর কাজের লোকরা না জানলে বিষয়টা ছড়াবার কোনো সম্ভাবনা নেই। তাছাড়া ডিব্রুগড় ডোনার কাছে খুব একটা পরিচিত পরিবেশ নয় দাদু-দিদার বাড়িটা ছাড়া। ড্রাগ-টাগ জোগাড় করা সহজ হবে না সেখানে। ওখানকার লোকেরাও আবার ডোনাকে বিশেষ চেনে না কোলকাতার লোকদের মতো। তাই ধ্রুবকে নিয়ে কারও মনে জিজ্ঞাসা চিহ্ন আসবে না। সবদিক বজায় থাকবে এতে। শুধু একটা বিষয়ে খোঁজ নিতে হবে। হেরোয়িনের নেশা ছাড়াবার জন্য যে বিশেষ চিকিৎসা দরকার সেটা করার মতো বিশেষজ্ঞ ডাক্তার পাওয়া যাবে কি না! রুনার মনে হয় এখন কিছুকাল পরিচিত পরিবেশ থেকে দূরে থাকলেই ওর ভালো হবে।

বাহাত্তর ঘন্টা কাটার আগে তথাগত ডিব্রুগড়ে ফোন করে অযথা শ্বশুর শাশুড়িকে দুশ্চিন্তায় ফেলতে চায়নি। একমাত্র ইন্দ্রাণীকেই ঘন ঘন ফোন করে সমস্ত রিপোর্ট দিয়েছে। রুনার পরামর্শের কথাও মাকে জানিয়েছে। ইন্দ্রাণী এক কথায় রুনার পরামর্শ মেনে নিয়েছেন। বুদ্ধিমতী ইন্দ্রাণী বুঝতে পেরেছিলেন রুনা এবাড়ির শুভাকাঙ্ক্ষী শুধু নয়, দুর্দিনের সাথীও বটে। তার পরিচয় সিদ্ধার্থর রোগশয্যায় এবং মৃত্যুর সময়ই পেয়েছিলেন ইন্দ্রাণী।

জীবনের শুরুতেই ভালোবাসার কাছে, জীবনের কাছে হেরে গিয়ে জীবনটাকেই শেষ করে দেবার চেষ্টা অসফল হবার পর থেকে ডোনা ডিব্রুগড়ে আছে। কোলকাতার সমাজে কেউ জানতে পারেনি মুখার্জি ম্যানশনের দুর্ভাগ্যের কথা। ডা. হাজারিকার চিকিৎসায় নেশার কবল থেকেও ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসছে মেয়েটা। শুধু মনের ভেতরের আঘাতগুলোকে নির্মূল করে দিতে পারলেই আবার সুস্থ বলে, নর্মাল বলে বলা যাবে ওকে। বিগত দেড় বছরে সেটাই সম্ভব হয়নি। ধ্রুব যে ওরই ছেলে, ধ্রুবর প্রতি যে ওর কিছু কর্তব্য আছে সেই কথাটাই ইচ্ছাকৃতই হক বা অনিচ্ছাকৃত ভাবেই হক ওর মনে নেই কিংবা মনে করতে চায় না। হয়তো ধ্রুবর দিকে তাকালে নিজের ভুল, বাবা-মা পরিবারের ওপর চাপানো অমর্য্যাদা, ব্রিলিয়ান্ট কেরিয়ারের মাঝপথেই পরিসমাপ্তি —এইসব কথা মনে পড়ে গিয়ে হীনম্মন্যতা আসে তাই চোখ সরিয়ে রাখে —এটাও হতে পারে।

আর সুনন্দা মুখার্জি নামের আদর্শবাদী মহিলা? তার অবস্থা তো সবচেয়ে খারাপ। মেয়ের ভুলের মাশুল সে যতটা গুনছে মনে মনে ততটা বোধহয় আর কেউ গুনছে না। তার মেয়ে আর অপুর মধ্যে যে আর কোনও পার্থক্য নেই সেই যন্ত্রণার কথাটা সুনন্দা মুখার্জি ভুলতে পারে না। সারাজীবন ধরে শুদ্ধ সংস্কারের যে অহংকার নিয়ে ও বেঁচে থেকেছে সেই দর্পচূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়েছে ওর নিজের মেয়ে। অপুর জীবনের পঙ্কিল ঘটনার পুনরাবৃত্তি যে ওর ইঞ্জিনিয়ার মেয়ে ঘটিয়ে ফেলতে পারে একথা ওর স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। মেয়েকে ও ক্ষমা করতে পারে না। আবার ক্ষমা করার অক্ষমতা বাইরে প্রকাশও করতে পারে না। এই দ্বিমুখী যন্ত্রণার দ্বিমুখী ধারে ছিন্নভিন্ন হতে থাকে সুনন্দা মুখার্জীর অন্তরাত্মা। ডোনার সামনা সামনি হতে ইচ্ছেই করে না ওর। ডোনাও মার চোখে চোখ রেখে তাকাতে পারে না। সেই যে ব্যাঙ্গালোর থেকে ওদের নিয়ে ডিব্রুগড়ে রেখে আসতে গিয়েছিল তারপর বিগত দেড়বছরে একবার মাত্র গেছে এক সপ্তাহের জন্য। ডোনাকে যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলা শ্রীলার নজর এড়ায়নি। বিরক্ত হয়ে বলেছিল—'তুই বরং ডিব্রুগড়ে এখন আসিস না। তুই কি মনে করিস ডোনা বুঝতে পারে না যে তুই ওকে এড়িয়ে যাস? এতে তো মেয়েটার মানসিক চাপ বাড়বে বই কমবে না।' —নন্দু মার ভর্ৎসনা নীরবে মেনে নিয়েছে। চেষ্টা করেছে মেয়ের সঙ্গে স্বাভাবিক ব্যবহার করতে সেই আগের মতো, —পারেনি। মা-মেয়ের মাঝখানে একটা অদৃশ্য দেওয়াল গড়ে উঠেছে যে দেওয়াল পার হয়ে দুজনেই কেমন যেন কাছাকাছি আসতে অক্ষম হয়ে পড়ছে। পারছে না একে অন্যের গলা জড়িয়ে কেঁদে হালকা হতে।

নন্দু মাকে বলেছিল—'তুমি ঠিকই বলেছ। আমরা দুজনেই কেউ কারও কাছে ফ্রি হতে পারছি না। তাই আমারও মনে হয় আমি বারবার এলে ওর স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে দেরি হবে।' —সেই থেকে নন্দু আর ডিব্রুগড়ে যায় নি। ওর বাপি আর মা যখন ডোনার দায়িত্ব নিয়েছে তখন ওর চেয়েও বেশিই করবে। তথাগতর যেমন প্রথমে প্রফেসার শুক্লাব

ওপরে রাগ হয়েছিল ক্রোধে ফেটে পড়ে বলেছিল — 'আমি কেস করব। আমার মেয়ের জীবন নষ্ট করে ওকে শান্তিতে থাকতে দেব না।'

নন্দুর প্রফেসর শুক্লার ওপর কোনও রাগ ছিল না। কে ওই শুক্লা? তাকে তো নন্দু চেনেই না। কি রকম পরিবারে সে মানুষ হয়েছে কিছুই জানে না। ওর সমস্ত রাগই নিজের মেয়ের ওপরে হয়েছে। ডোনা ওদের মেয়ে। ডোনার শরীরের প্রত্যেকটা লোমকূপ ওর চেনা। মনিপালে যাবার আগে অব্দি ওরই চোখের সামনে ওরই শিক্ষায় বড়ো হয়েছে। সেই মেয়ে মাত্র দু-চার বছরের স্বাধীনতায় এতবড়ো বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারল? নন্দু বারবার ওকে বোঝায় নি? শেখায় নি কি করে নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে হয়? ছেলেমেয়ের ওপরে পরিবারের সম্মান বহন করার দায়িত্ব বর্তায় সেই দায় ছেলেমেয়েদের মেনে চলতে হয়? —সব বুঝিয়েছে তবুও ডোনা বিপথে পা রাখতে দ্বিধাই করেনি। স্বার্থপরের মতো নিজের দুদিনের ভালোবাসার কাছে সারাজীবনের সুখ বিসর্জন দিতে কসুর করেনি। ছি: ছি: !

অন্ধ রাগে ফেটে পড়ে তথাগতকে বলেছিল—'প্রফেসর শুক্লার বিরুদ্ধে কেস করে কি প্রমাণ করবে তুমি? তোমার মেয়ে নাবালিকা? ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রফেসর শুক্লার মতো বয়স্ক, বিদ্বান, বিবাহিত একজন মানুষ জোর করে তোমার মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করেছে? তোমার মেয়ে ধোওয়া তুলসীপাতা? লোক হাসাবার চেষ্টা তুমি অন্তত আর করো না তথাগত। শোনো, আমাদের ডোনা নিজে সব কিছুর জন্য দায়ী। ওই শুক্লা শুধু উপলক্ষ্য মাত্র। জাহান্নমে যাক ওই মেয়ে। আমার কোনও সহানুভূতি নেই ওর প্রতি। যতটুকু করার করে দিয়েছি আমরা। আর কিছু করব না। সুস্থ হলেই বাপিকে বলে দেব ওকে যেন বলে দেয় এবার ওর ছেলেকে নিয়ে নিজেদের ভবিষ্যতের ব্যবস্থা নিজেই করে নিতে। শুক্লার সঙ্গে একবাড়িতে, একই ঘরে থাকার আগে কি আমাদের জিজ্ঞেস করে লিভ-টুগেদার করেছিল? বদমাশ মেয়ে!'

নন্দুর গনগনে লাল মুখের দিকে তাকিয়ে তথাগত থমকে গিয়েছিল। আমতা আমতা করে বলেছিল—'এসব কি বলছ তুমি? ও আমাদের মেয়ে নন্দু! এত কঠিন ব্যবহার করলে তো আবার স্যুইসাইড করার চেষ্টা করবে?'

হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে নন্দু বলেছিল—'করুক। মরে যাক। তবু তো এতবড়ো লম্বা একটা জীবন উচ্ছিষ্টের মতো কাটাতে হবে না ওকে ওই বাচ্চাটাকে নিয়ে। কোন পুরুষটা আর ওকে সম্মানের নজরে দেখবে বলতো? সকলেই ওকে সস্তা, একজনের ব্যবহার করা এঁটো পাতার মতো মনে করবে। ওর কি সত্যিই আর কোনও ভবিষ্যৎ আছে? ও যে আবার ড্রাগ নেবে না, আবার অন্য কোনও শুক্লার সঙ্গে ---- না, আমি আর কিছু ভাবতে পারছি না। আমার মাথাটা খারাপ হয়ে যাবে তথাগত।'

তথাগতও রেগে গিয়েছিল। বলেছিল—'তোমার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে অলরেডি। তানাহলে মা হয়ে কেউ নিজের মেয়েকে এভাবে কথা বলে না। তুমি চিরকালহ

যুগের থেকে পিছিয়ে থেকেছ আর এখন তো সাতকাল গিয়ে এককালে ঠেকা বুড়ির মতো কথা বলছ। এযুগে এসব নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না তুমি ছাড়া। যুগটা এখন সিঙ্গল মাদারের। আর কেউ আজকাল পিতৃপরিচয়ের খোঁজে হাঁফিয়ে মরে না তোমার মতো। মায়ের পরিচয়েও বাচ্চারা বড়ো হয় এখন। ডোনা ওর ছেলেকে ওর পরিচয়েই বড়ো করবে। তুমি আর ওদের নিয়ে বেশি ভেবো না। আমার মেয়ে আমি বুঝে নেব সবকিছু।'

কাউকে কিচ্ছু বুঝে নিতে হয়নি। ডোনা ধীরে ধীরে সুস্থ হয়েছে। নর্মাল লাইফে ফিরেছে। ধ্রুবর ভার দিদা-দাদুর কাছ থেকে নিয়েছে। চারিদিকে চাকরির জন্য অ্যাপ্লাই করতে শুরু করেছে। ইন্টারভিউ দিতে গেছে। দাদু-দিদার কথা মেনে ইন্টারভিউ দিতে দূরে কোথাও যাবার সময় দাদুকে সঙ্গে নিতে আপত্তি করেনি। শুধু একটাই আপত্তি করেছে ও। তথাগত, নন্দু এমনকি ঠাম্মীর হাজার অনুরোধেও কোলকাতায় মুখার্জি ম্যানশনে ফিরে আসতে রাজি হয়নি। আর এরজন্যও তথাগত নন্দুকেই দোষ দিয়েছে। বলেছে—'তুমি ওর বিপদের সময় মা হয়ে ওকে এত বেশি নেগলেক্ট করেছ, ওকে এমন অপরাধী ভেবেছ যে নিজের বাড়িতে ফিরে আসার পথটাই ওর বন্ধ হয়ে গেছে।' —ডোনার ঘটনা তথাগত আর নন্দুর দাম্পত্য জীবনে এই মাঝবয়সে একধরনের দূরত্ব এনে দিয়েছে বোঝে নন্দু। শুধু বোঝে না তথাগত যে কেন ওর মানসিক অবস্থাটার গুরুত্ব দিতে চায় না। ও তো একটা যন্ত্র নয় যে একই মডেলের অন্য যন্ত্রগুলোর মত একই ভাবে চলতে পারবে? ডোনার ঘটনার সঙ্গে যে ওর নিজেরই হার-জিতের প্রশ্নটা জড়িয়ে আছে! সুনন্দা মুখার্জির মেয়ে সুনন্দার মতো আচরণ না করে অপুমাসীর মতো করে ফেলেছে। অবশ্য অপুমাসি বলে কেউ ছিল সেটা ডোনা জানত না। সেই ছোটোবেলায় একঝলক দেখেছিল অপুকে। তবুও নিজের অজান্তেই ডোনা নিজেকে অপু নাম্নী এক নিকৃষ্ট মেয়ের সমগোত্রীয় করে ফেলেছে। মা হয়েও নন্দু সেটা আটকাতে পারেনি। এটাই ওর হেরে যাওয়া। শুধু তথাগত কেন, ওর নিজের বাবা-মা, শাশুড়ি কেউ কোনওদিন বুঝবে না ওর মনের গোপন ক্ষতটা কতটা কষ্ট ওকে দিচ্ছে। তথাগতর সিঙ্গল মাদার কনসেপ্ট ওকে কোনও স্বান্তনা দিতে পারে না। ডোনা তো ওরই সন্তান! কষ্ট করে ওকেই জন্ম দিতে হয়েছে বড়ো করতে হয়েছে! নিজের মেয়েকে ও ভালবাসে না নাকি? ভালোবাসে বলেই মেয়ের অন্ধকার ভবিষ্যতের চিন্তায় অস্থির হয়ে থাকে। —এসব কেউ বোঝে না। আজকাল তাই নন্দু আর আগের মতো তথাগতর সঙ্গে তর্ক করে না। সব অভিযোগ চুপ করে সহ্য করে।

অফিস থেকে ফিরে শাশুড়ির সঙ্গে কিছু সময় কাটিয়ে এসে নিজের রুমে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছিল ও। ডোনা কানপুরে একটা চাকরি পেয়েছে। কোম্পানিই ফ্ল্যাটের ব্যবস্থ করে দেবে। আজ ফোন করেছিল ডোনা। নন্দু বলেছিল—'তুই নিজেদের ফ্যাক্টরি ছেড়ে বাইরে চাকরি করবি এটা তো ড্যাড মেনে নিতে পারছে না ডোনা। ওরও বয়স বাড়ছে, এখন তোরাই ভরসা। তুইও যদি জোজোর মতো বাইরে থাকিস তাহলে এখানে কে দেখবে বল?'

ডোনা চট করে উত্তর দেয়নি। তারপর স্থির গলায় বলেছিল —'সেটা কি সম্ভব মম? ধ্রুবকে কি বলে সমাজে পরিচয় দেবে? যে কারণে আমাকে প্রায় দু-বছর দাদুর কাছে ডিব্রুগড়ে থাকতে হল সেই কারণটা তো আমার সঙ্গেই রয়েছে। কোলকাতায় তোমাদের এতবড়ো সমাজ এত আত্মীয়-স্বজন, তারা তো প্রশ্ন করবে! কি উত্তর দেবে তোমরা?'

এবার নন্দুর কাছে উত্তর নেই। একটু পরে অতি সাবধানে ও বলেছিল —'ডোনা, ধ্রুবর তো স্কুলে যাবার বয়স হয়েছে। ওকে কি আমরা কোনও ভালো বোর্ডিং স্কুলে রাখতে পারি না? আমি, আমার বাবা, দাদারা, সবাই তো দার্জিলিং-এ বোর্ডিং স্কুলেই থেকেছে। জোজোও থেকেছে। তুইও গিয়েছিলি। কান্নাকাটি করতিস বলে তোকে নিয়ে এসেছিলাম। তেমনি যদি ধ্রুবকে-----

ডোনা বাধা দিয়ে বলেছিল—'সকলের পরিচয় ছিল মাম্মা। ধ্রুবর সেটা থাকলেও প্রকাশ করা যায় না। ও ছুটিতে বাড়ি আসতে পারবে না কারণ ওর কোনও বাড়ি নেই। মাম্মা, ধ্রুবকে আমি নিজের ইচ্ছেয় জন্ম দিয়েছি। ও অনাথ নয় যে বোর্ডিংয়েই থাকবে ছুটির সময়ও। আমি আছি তো! ও আমার সঙ্গে কানপুরেই থাকবে। মাম্মা, আমি যেমন তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারিনি বোর্ডিংয়ে ধ্রুবও পারবে না।'

বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করতে থাকে নন্দু। মাথার দুপাশের রগ যেন ফেটে যাচ্ছে ব্যথায়। দুহাতের আঙুলে কানের দুপাশ টিপে ধরে থেকে হাত ব্যথা হয়ে যায় কিন্তু মাথার যন্ত্রণা কমে না। এই আর এক নতুন উপসর্গ শুরু হয়েছে ওর। বাধ্য হয়ে উঠে দুটো ডিসপিরিন গ্লাসের জলে গুলে খেয়ে এসে শুয়ে পড়ে আবার। ডোনার কথা, ধ্রুবর কথা, অপুর কথা—সব কথা মাথা থেকে সরিয়ে দিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করে অসময়েই । বৃথা চেষ্টা । ঠিক যেন চিটেগুড়ে মাছি আটকে থাকার মতো চিন্তাগুলো ওর মাথার মজ্জার মধ্যে আটকে আছে। অপুর কেসটার সঙ্গে ডোনার কেসটার তফাত কতটুকু? অপুর ছেলেটার নাম সূর্য। ডোনার ছেলের নাম ধ্রুব। এদের নাম দুটোর মধ্যেও মিল আছে। ধ্রুব-সূর্য! অনস্বীকার্য দুটো নাম সত্যের প্রতীক। যতদিন এই ব্রহ্মাণ্ড আছে ওরাও থাকবে ততদিন। জ্বলজ্বল করে জ্বলবে আকাশে। অপু নিজেকে রায়চৌধুরি বাড়ির মেয়ে বলে মনে করতে চাইত। বলেছিল হাসপাতালের বেডে শুয়ে —'তোর সবকিছু আমি পেতে চাইতাম। জামা. জুতো, ক্লিপ, স্কুলব্যাগ সবকিছু। তোদের বাড়ি, গাড়ি, ফুলের বাগান, মার্বেলের মেঝের ঠান্ডা, তোদের খাট-বিছানা, সোফা, খাবার টেবিল—সবকিছু। কি বোকা ছিলাম রে! চাইলেই কি ওসব পাওয়া যায় বল? হেদোয় আমাদের ওই এক কামরার ঘরে অমিতের কাছ থেকে একটা ছোটো ফ্রিজ আর সাদাকালো টি. ভি. পেয়ে মনে করলাম আর আমাকে পায় কে? দুটো হাল্কা গয়না আর ক'টা শাড়ি কিনেই মনে হল আমি তো প্রায় নন্দুই হয়ে গেছি। একেবারে সর্বনাশের নেশায় ডুবে গেলাম। - রাগ করিস না নন্দু, আমার সর্বনাশের নেশাটার জন্য অজান্তে পরোক্ষভাবে তুই দায়ী। তুই-ই আমার লোভ বাড়াতিস গাড়ি চড়ে ইস্কুলে যাওয়া আসা করে। তোর মত ইস্তিরী করা

স্কুলড্রেস আমার ছিল না। ওইরকম চকচকে জুতো-মোজা ছিল না তাই স্কুলে যেতে চাইতাম না। দ্যাখ না, বড়দি তো তোর বাপির দেখাদেখি এত পড়াশুনো করেছিল। কি লাভ হল? তোর বাপি তো আরও কতবেশি পড়ল আর বড়দির সেই মনসাতলাগ্রামে বিয়ে হয়ে গেল। দূর দূর! আমরা শুধু অন্যকে দেখে জ্বলে পুড়ে মরতেই জানি অন্যদের মতো হতে চাইলেও হতে পারি না।'

নন্দু তখন মৃত্যুশয্যায় শোওয়া অপুর কোনো কথারই প্রতিবাদ করত না। অপুর মনস্তাপ, পশ্চাতাপ সবকিছুই সামঞ্জস্যহীন লাগত ওর। কোন কথাটা যে বিশ্বাস করবে আর কোনটা করবে না বুঝতেও পারত না। অপু কখনও বলতো অমিতের বউ ঝুম্পাকে ও হিংসে করে নি কোনদিন। আবার একথাও বলেছে —'অমিত যখন সিঁথির ফ্ল্যাটটা কিনলো আমার ভেতরটা জ্বলে গিয়েছিল। কত স্বপ্ন ছিল আমার একটা সুন্দর সাজানো বাড়ীতে সেজেগুজে পরীর মতো থাকব আমি। আমার ভাগ্যে শিকেটা ছিঁড়ল না। ঝুম্পা মনের মতো করে ফ্ল্যাট সাজালো পরির মতো সেজে সেই ফ্ল্যাটে অমিতের সঙ্গে থাকতে লাগল।'

ডিসপিরিনে কাজ হয়েছে। মাথাব্যথাটা কমেছে। হাত বাড়িয়ে এ.সি.টাকে কম করে দিয়ে চিত হয়ে শুয়ে ভাবতে থাকে নন্দু। না-না। ডোনা অপুর মতো নয়। ডোনা কখনও কাউকে হিংসে করেনি। নিজের ভুলের বোঝা, কর্মফলের দায় কারও ওপরে চাপিয়ে দেয়নি। হতে পারে অপুর ছেলে সূর্য আর ডোনার ছেলে ধ্রুবর জন্মানোর ব্যাপারটাতে মিল আছে কিন্তু ডোনা অপুর মতো নীচ, স্বার্থপর জটীল চরিত্রের মোটেই নয়। অধ্যাপক শুক্লাকেও কখনও দায়ী করেনি ও। শিক্ষকের সঙ্গে ছাত্রীর প্রেমের ঘটনার বহু নজির আছে। পড়াশুনায় সাহায্য পেতে পেতে শিক্ষকের প্রতি নির্ভরতা এসে যায়। বার বার ভালো রেজাল্ট করতে করতে শ্রদ্ধা আর বিশ্বাসের মাত্রা অপরিসীম বেড়ে যায়। নিজের মেধাও যে ভালো রেজাল্টের অন্যতম কারণ সে কথাটাও মনে রাখে না কেউ কেউ। মনে করে—উনি না থাকলে এরকম রেজাল্ট করতেই পারতাম না। আর তার থেকেই ভালোবাসা জাগে। কখনও একতরফা কখনও আবার বয়সের বেড়া ভেঙে দু-তরফা। ডোনার ক্ষেত্রে এটাই ঘটেছিল। ও যে ভুল করে ফেলে নিজের এবং ধ্রুবর জীবনটাতে বিপদ ডেকে এনেছে, নিজের পরিবারের মানসম্মানকেও জটিল পরিস্থিতিতে ফেলে দিয়েছে এসব কথা ভেবেই নেশার পথ ধরেছিল ভুলে থাকার জন্য। ডোনা অপুর মতো জালিম মেয়ে নয় ও দুর্বল চরিত্রের। তাই ড্রাগের আড়ালে মানসিক যন্ত্রণাকে লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছে। বাবা মা যাতে না জানতে পারে ওর কেলেঙ্কারীর কথা সে জন্য মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে। বাড়ি আসা ছেড়েছে। শত অভাবের মধ্যেও প্রফেসার শুক্লার অর্থসাহায্য রিফিউজ করেছে। বাবার কাছেও টাকা চাইতে কুণ্ঠিত হয়েছে। শেষে নিরুপায় হয়ে আত্মহত্যা করতে চেয়েছে। মুখার্জি অ্যান্ড মুখার্জি ইন্টারন্যাশনালের একমাত্র আদরের

মেয়ে টাকার অভাবে কষ্টসহ্য করেছে তবুও ভালোবাসার মানুষটির কাছে আত্মসম্মান বিসর্জন দেয়নি তো! অত প্রিয় মাম্মা -ড্যাডের কাছেও নয়!

শোওয়া অবস্থা থেকে নন্দু ঝট করে উঠে বসে। এতদিন কেন এসব কথা মনে আসেনি? তিনটে বছর ধরে ও কেন ডোনাকে অপুর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে নিজে কষ্ট পেয়েছে মেয়েটাকেও কষ্ট দিয়েছে? অপুর অবসেশন ওর মনের কাচের জানালাটাকে ময়লায় অস্বচ্ছ করে রেখে দিয়েছিল যেন, তাই আজকের আগে কোনও দিন দুজনকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে বিচার করতে পারেনি ও। আজ, এই এক্ষুনি কেউ যেন হোস পাইপের প্রবল জলের তোড়ে মনের জানালার কাচটাকে ধুয়ে পরিষ্কার করে দিল। ডোনাকে স্পষ্ট বুঝতে পারছে, চিনতে পারছে ও। আজ মনে হচ্ছে ও সবসময় শুধু নিজেকে দিয়ে বিচার করতে চেয়েছে। ওর আত্মঅহংকার, নারী পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে ওর রিজিডিটি ওকে এত অন্ধ করে রেখেছিল যে অন্য কারও মনের খবর রাখার প্রয়োজনও মনে করেনি ও। তথাগত হয়তো ঠিক কথাই বলে যে ও বহুযুগ পেছনে পড়ে থাকা মানুষ। অপু আর অমিতের সম্পর্ককেও ও ঘৃণার নজরে দেখেছিল। শাশুড়ি ইন্দ্রাণী ওকে সেদিন বুঝিয়েছিলেন। বলেছিলেন অপু যা করেছে ওর বয়সের একটা মেয়ের ওইসময় ওরকম করাটাই স্বাভাবিক ছিল। অপুর অন্যান্য শতেক দোষ থাকলেও ষোলো বছরের মেয়েকে ছত্রিশ বছরের অস্বাস্থ্যবান পাত্রের সাথে জোর করে বিয়ে দেওয়াটা অন্যায়। অপুর নোংরামী সবটা মেনে নিতে না পারলেও ইন্দ্রাণীর যুক্তি মেনে নিয়েছিল ও। ডোনার বুদ্ধি কম তাই প্রবল আবেগের স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দেবার আগে পরিণামের চিন্তাটাও মাথায় রাখেনি। পরিণামের মুখোমুখি যখন হয়েছে তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। বিভ্রান্ত, দিশেহারা মেয়েটা তখন নিজেই নিজেকে শাস্তি দিয়েছে। আর সেই দুর্যোগের সময়টাতেই ওর মা ওর কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছে রাগ, ঘৃণা, দুঃখ আর জেদের বশীভূত হয়ে। —এক্ষুনি, এক্ষুনি ও ডোনাকে ফোন করবে। ওর মন পৌঁছে গেছে ডিব্রুগড়ে মেয়ের কাছে। —বিছানা ছেড়ে উঠে টেবিলের ওপরে রাখা মোবাইলটা তুলে নেয়।

—'হ্যালো! ডোনা? মাম্মা বলছি। তোর প্রথম চাকরি, প্রথম অফিস কোয়ার্টারে থাকা। একা সামলাতে পারবি না প্রথম প্রথম । তাই আমি যাব কানপুরে ধ্রুবকে রাখার জন্য।'

* * * * *

সেই প্রথম দিন থেকে বিগত দুবছর ধরে একই গাড়িতে পেছনের সিটে বসে যাওয়া আসা। প্রথম দিকের সংকোচ কয়েকদিন পর কেটে গিয়েছিল যদিও তবু সহজে বন্ধুত্ব হয়নি। দু-তরফেই যথেষ্ট আড়ষ্টতা ছিল। সৌজন্য বিনিময় আর অফিস সংক্রান্ত দু-চারটে কথার বেশি এগোতো না কেউ। কোম্পানি এক হলেও দুজনের ডিপার্টমেন্ট একেবারে আলাদা। একজন কম্পিউটার টেকনোলজি অন্যজন মেকানিক্যাল। একজন গ্র্যাজুয়েট

ইঞ্জিনিয়ার অন্যজন ডিপ্লোমা হোল্ডার। একজন প্রথম পোস্টিংয়েই বেশ বড়োসড়ো পদাধিকারী, অন্যজন অনেক বছরের সার্ভিসের অভিজ্ঞতায় মাঝামাঝি পজিশনে। কোনও মিল নেই একমাত্র একই গাড়ি শেয়ার করে অফিস যাওয়া ছাড়া। কোম্পানির গাড়ি দুজনকে নিতে আসতো কারণ একই বিল্ডিংয়ে একজন অনেকদিন ধরেই 'এ' ব্লকের একটা ফ্ল্যাট পেয়ে আছে, অন্যজন 'বি' ব্লকে ফ্ল্যাট পেয়ে সদ্য এসেছে। এতদিন 'এ' ব্লকের মানুষটি একাই যেত। কোম্পানির নির্দেশে এখন 'বি' ব্লকের নতুন আসা মানুষটিকে তুলে নিতে হয়। দুজনের কেউ গায়ে পড়ে আলাপ জমাতে বেশি ইচ্ছুক নয় বোঝা যেত। ক্ষেত্র এবং বিষয় আলাদা হওয়াটাও কথাবার্তা এগোনোর পক্ষে সুবিধাজনক ছিল না। পুরনো যাত্রী 'এ' ব্লকের মানুষটি 'বি' ব্লকের নতুন যাত্রীর সঙ্গে হাসি হাসি মুখে কয়েকটা একই ধরনের কথা বলেই আবার খবরের কাগজে ডুবে যেত। নতুন যাত্রীও উত্তরগুলো দিয়েই জানালা দিয়ে বাইরের রোজ দেখা দোকানপাট, পথচলতী মানুষজন দেখতে ব্যস্ত থাকত। ঠিক কবে কখন মাঝখানের ব্যবধানটা একটু একটু করে সরে গিয়ে একজনের কাছে আর একজনের জায়গা করে দিয়েছিল বোঝাই যায়নি। জীবনের কাছে প্রচণ্ড মার খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়া দুটো মানুষ যেন কাকতালীয় ভাবেই একে অন্যের সংস্পর্শে এসে পড়েছিল। ডিপ্লোমা হোল্ডার মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারটি একজন অবিবাহিত পুরুষ। পৃথিবীতে সম্পূর্ণ একা একা তার জীবন নির্বাহ। তিনকুলে কেউ নেই। অন্যজন এক নারী। ওর পরিবার পরিজন আছে দূরে তবুও সেও একা। ছোট্ট একটা ছেলে আছে ওর। ছেলেকে নিয়ে স্বনির্বাসিত, স্বনির্বাচিত জীবনে সেও নিঃসঙ্গ। দুজন কাজের মহিলা অবশ্য ওর আছে। একজন ঠিকে আর একজন সবসময়ের। ওর ছেলে স্কুল থেকে ফিরে আয়া মাসির কাছে থাকে আর বিকেলে ঘুম ভেঙে উঠেই মাম্মা কখন আসবে বলে জ্বালাতন করতে থাকে। ওর মাম্মা অফিস থেকে কখনও এদিক ওদিক যায় না। সোজা বাড়ি আসে।

পুরুষটির বাড়িতে একজন বয়স্ক মহিলা সকালে আর বিকেলে এসে রান্না-বান্না, সংসার সামলে দিয়ে চলে যান। কোনও কারণে একদিন না আসতে পারলেও ক্ষতি নেই। এই পুরুষটি সব কাজ নিজে করতে পারে। অনেক কম বয়স থেকে সংসারের নানা কাজ করে করে অভ্যস্থ। কাউকে না হলেও ওর চলে যায়। কিছুটা অমিশুক স্বভাবের জন্য ওর বন্ধু-বান্ধব বিশেষ নেই বাড়ি বয়ে এসে আড্ডা মারার মতো। নিজেও কারও বাড়ি যায় না স্বভাব চুপচাপ মানুষটা। এমনকি একই বিল্ডিংয়ের 'এ'- 'বি' ব্লকে থেকেও, সহযাত্রী মেয়েটির সঙ্গে বন্ধুত্ব হওয়া সত্ত্বেও ওর ফ্ল্যাটেএকদিনও আসেনি। সখ্যতা বাড়ার পরও কখনও কোনও ছুটির দিনেও প্রতিবেশীরা মেয়েটাকে আর ওই পুরুষটিকে বাইরে ঘুরতে, রেস্টুরেন্টে খেতে, কোনও ভালো সংগীতের অনুষ্ঠানে , শপিং মলে, সিনেমা হলে কোনও মুভি দেখতে যেতে দেখেনি কখনও। এরা দুজনেই যেন মানুষের কাছ থেকে যতদূর সম্ভব নিজেদের আড়াল করে রাখতে চায়। প্রফেশন্যাল ক্ষেত্রের বাইরে কারও সঙ্গে মেলামেশা করে না। যতদিন পর্যন্ত ওদের দুজনের সম্পর্ক আন্তরিক হয়নি ততদিন

গাড়িতে যেতে যেতে দুজনেই ভাবতো —ও ঠিক আমারই মতো। ওর জীবনেও কি আমার মতোই কোনো অন্ধকার আছে? তা না হলে ওরই বা কোনও সামাজিক জীবন নেই কেন?

পরে, যখন ওদের সখ্যতা হল, যখন একে অন্যকে ধীরে ধীরে চিনল, মনে মনে একের প্রতি অন্যের বিশ্বাস জাগল তখন ওরা দুজনে দুজনের জীবনের বন্ধ ঘরটার দরজা খুলে বলল—এই দেখ। এখানে শুধুই অন্ধকার।

মেয়েটা বলল—আমার অন্ধকার আমি নিজেই তৈরি করেছি। এর জন্য অন্য কেউ দায়ী নয়। পুরুষ বলল—আমার অন্ধকার তোমার থেকেও বেশি গাঢ়। তবে এই অন্ধকার আমার তৈরি নয়। শুনলে অবাক হবে আমাকে জোর করে জন্ম দিয়ে এই অন্ধকারে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আর সেটা করেছে আমার জন্মদাত্রী মা।

মেয়েটা শুনল সব তারপর বলল—আমিও তো ধ্রুবকে জোর করে জন্ম দিয়েছি। ধ্রুবর চারপাশে অন্ধকারের বলয় এঁকে দিয়েছি।

পুরুষ বলল —আমি অনাথ আশ্রমে বড়ো হয়েছি। সতেরো বছর বয়স পর্যন্ত শুধু মাকেই দেখেছি। বাবাকে দেখিনি। তাঁর নামও জানতাম না।

—ধ্রুবও জানে না। ও শুধু আমাকেই জানে। বড়ো হলে জিজ্ঞেস করবে কিন্তু বলতে পারব না।

—'আমিও জিজ্ঞেস করতাম। মা মিথ্যে কথা বলতো। মার মৃত্যুশয্যায় মার স্বামী নিজেকে আমার বাবা বলে পরিচয় দিয়ে অনাথ আশ্রম থেকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমি তখন তাঁকেই আমার বাবা বলে বিশ্বাস করেছিলাম। উনিই আমাকে পড়িয়েছেন। মারা যাবার আগে বলেছিলেন আমি ওর ছেলে নই। আমার আসল বাবার নামটাই শুধু বলেছিলেন আর কিছু নয়। বলেছিলেন —ওই নামের লোক ধরে ধরে খুঁজতে যাস না। আমি তোকে নতুন নাম, আমার পরিচয় দিয়েছি।

মেয়েটা বলল—ধ্রুবও আমাকে একদিন জিজ্ঞেস করবে। আমিও বলতে পারব না ওকে। কারণ ও যার ছেলে তাঁর সম্মান নষ্ট করতে পারব না আমি। আমি তো ওঁকে ভালোবেসেছিলাম। উনি বিবাহিত। দুটো ছেলে আছে। আমার অধ্যাপক ছিলেন। ওঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা কখনও মলিন হবে না। ধ্রুবকে আমার একার পরিচয়েই বেঁচে থাকতে হবে। ও কি পারবে?

—'কেন? যদি কোনও সৎ, সজ্জন ব্যক্তি ধ্রুবকে নিজের পরিচয় দিতে চায়? আমার মায়ের স্বামী যেমন আমাকে দিয়েছিলেন? আমার আসল বাবা তো চ্যাটার্জি। আমি মুখার্জি। জীবনে যা কিছু হয়েছি সবটাই আমার পালিত পিতা শশধর মুখার্জির জন্য। উনি আমাকে নাম-পরিচয় দিয়ে ভদ্রভাবে বাঁচার সুযোগ করে গেছেন। আমার কাছে উনিই ভগবান।

—সকলের কি ও রকম সৌভাগ্য হয়? আজ মনে হয় ধ্রুবকে এই পৃথিবীতে আনাটাই আমার অন্যায় হয়েছে। আমার জন্য ওকে হয়তো সারা জীবন সাফার করতে হবে।

—আমাকে কি খুব কাপুরু বলে মনে হয়? কিংবা আমি মানুষটা ভালো নই, আমার কোনো খারাপ অভিসন্ধি আছে এরকম মনে হয় কি?

—হঠাৎ এ আবার কি কথা? এরকম মনে হতে যাবে কেন? একজন সৎ মানুষ বলেই তো বিশ্বাস করতে পেরেছি। সব গোপন ব্যথা প্রকাশ করতে পেরে নিজেকে হালকা করেছি।

—আরও একটু হালকা হওয়া যায় যদি আমি ধ্রুবকে দত্তক নিয়ে ওকে বাবা-মা দুইই দিতে পারা যায় তাহলে।

—মানে?

—খুব সোজা। আমাদের খুব তাড়াতাড়ি বিয়ে করে ফেলা আর আইনত ধ্রুবকে আমার দত্তক নেওয়া। মেয়েটা অনেকক্ষণ কথা বলতে পারে না। মাথা নীচু করে নিজের হাতের আঙুল দেখতে ব্যস্ত। আসলে গভীর ভাবে কিছু ভাবে। পুরুষটি পরম ধৈর্য্যশীল বোঝা যায় কারণ সেও চুপ করে থেকে মেয়েটাকে চিন্তা করার সময় দেয়। ও জানে মেয়েটার একবার আগুন লেগে ঘর পুড়েছে এখন ও সামনে অগ্নিরংয়ের আভাস দেখলেও পালাতে চাইবে। ও মেয়েটার রিঅ্যাকশনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

মেয়েটা এবার মুখ তুলে ওর চোখে চোখ রেখে বলে —প্রফেসর অবিনাশ শুক্লার স্মৃতি ভুলতে যদি না পারি?

পুরুষটি এই প্রথম প্রাণ খুলে হাসল। হাসি থামলে বলল—ভোলা যাবে না। যার ছেলে সঙ্গে থাকবে তার স্মৃতিও সঙ্গেই থাকবে। সেই ব্যক্তি যতদূরেই থাকুক তার স্মৃতি ভোলা যায় না। সময়ের সাথে সাথে ঝাপসা হবে তবু মনে পড়বে। এটাই স্বাভাবিক। শুধু ধ্রুবকে কখনও জানতে দেওয়া চলবে না। এতেই ওর মঙ্গল।

—ধ্রুবর পাঁচ বছর হল। ও তো আমার সঙ্গে কাউকে কখনও দেখেনি। ও মেনে নিতে পারবে কিনা জানিনা।

—এখনই মেনে নিতে সুবিধা হবে। আরও বড়ো হলে আর পারবে না। তাছাড়া ও তো আমাকে দেখেনি। চেনেও না। ওর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়ই যদি বাপ-ছেলের মতো হয় তবে ওর মেনে নিতে অসুবিধে হবার কথা নয়। আর সে জন্যই আগে ওকে দত্তক নেওয়া তারপর ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের কাছে যাওয়া উচিত।

—এই ইচ্ছেটা কি এই প্রথম হল?

—না। আগেও সঙ্গী পাবার ইচ্ছে হত নিশ্চয়ই। আমার জীবনসঙ্গীকে তো আমার মতো জ্বলন্ত কয়লার ওপর দিয়ে হেঁটে আসতে হবে। তানাহলে অনাথ আশ্রমে বড়ো হওয়া আমাকে সে বুঝবে কেমন করে? শুধু শুধু জীবনসঙ্গী নিয়ে এসে জীবনযন্ত্রণা বাড়িয়ে তো লাভ নেই। জ্ঞান হবার পর থেকে যন্ত্রণার বোঝা কিছু কম তো জড়ো হয়নি! আঠারো বছর হয়ে গেলে অনাথ আশ্রম আর রাখে না। মাধ্যমিকের আগেই শশধর মুখার্জি

আমার জীবনে এসে পড়েছিলেন। তাই আজ এই শিক্ষিত, ভদ্র, সভ্য একজন মানুষের পরিচয়ে এখানে বসে আছি। উনি না এলে মা মরে যাওয়ার পর হয়ত অন্ধকারের জীব হয়ে যেতাম। —গার্গি, আমাকে আর একজন শশধর মুখার্জি হবার সুযোগ দেবে না তুমি?

ডোনা নিজের হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলে—হ্যাঁ, সূর্য। দেবো। হাতটা ধরো। তোমার হাতটা ধরে না থাকলে মম-ড্যাডকে খবরটা দেবার সাহসই জোটাতে পারব না। প্রথমবার ওঁদের কাছে সবকথা গোপন করে, মিথ্যে কথা বলে যে ভুল করেছি সে ভুল আর কখনও করতে চাই না আমি। এখন আমি শুধু ওদের আসতে বলব। বাকি কথা তুমি আমি একসাথে বসে বলব ওদের সামনে।

স্মিত হাসিতে সূর্য চট্টোপাধ্যায় ওরফে ৺শশধর মুখোপাধ্যায়ের দেওয়া নাম -পদবিধারী ভাস্কর মুখার্জির মুখটাতে শতশত নক্ষত্রের জ্যোতির্ময় রূপ ফুটে ওঠে। ডোনার বাড়ানো হাতটা নিজের দুহার্তের মধ্যে ধরে ও বলে—এ জীবনে আর কোনও দিন এই হাত আমার হাত থেকে খসে যাবে না গার্গি। কোনও কষ্ট আসতে দেব না যা ভোলার জন্য তোমাকে ড্রাগের আশ্রয় নিতে হবে। হাতের শিরা কেটে আত্মহত্যা করার প্ল্যান তোমার মাথায় আর আসবে না কখনও। ধ্রুবকে সঙ্গে নিয়ে আমরা এবার নতুন করে বাঁচব যেমন করে অন্যরা বাঁচে। তোমার—আমার দুজনেরই অন্ধকারের ভয় কেটে গেছে। আলোয় ফিরে আসতে পেরেছি আমরা। আর কোনো ভয় নেই গার্গি!

* * * * *

তথাগত কখন চায়ের টেবিল ছেড়ে উঠে চলে গেছে। মর্নিংগ্লোরিতে নন্দু একাই বসে থাকে। তথাগত অফিসে যাবে। রোজই ঠিক সময়ে চলে যায় ও। প্রায় সত্তোর ছুর বয়সেও যুবকোচিত চালচলন। চেহারা ছবি। স্বাস্থ্যটাকেও ঠিক রেখেছে। নন্দুর মতো ক্লান্তি নেই ওর। মনের মধ্যে বিষাদের মেঘ জমতে দেয় না, তাই এত ভালো থাকতে পেরেছে। মর্নিং গ্লোরির গ্লোরি তো ক্ষয়ে ক্ষয়ে কৃষ্ণা চতুর্দশীর চাঁদের মতো একটা রেখায় এসে দাঁড়িয়েছে। গ্লোরি নেই শুধু কোন আমলের দেওয়া নামটা আছে। এত বড়ো বিশাল বাড়িটাতে এখন যেন কোথাও সূচ পড়লেও শব্দ হয়। সেই সব শব্দে নন্দু চমকে ওঠে। টুপ টুপ করে শুকনোপাতা ঝরার মতো বছরগুলো জীবনের গাছ থেকে অলখ্যেই ঝরে ঝরে পড়ে গেছে। এবাড়ির গ্লোরিরা কেউ কেউ চিরতরে চলে গেছে আর কেউ কেউ দূরে দূবে থেকে বাড়ির কথা ভুলে গেছে। তথাগত নিয়মিত অফিসে যায়। নন্দু কখনও ইচ্ছে হলে সময় কাটানোর উপায় খুঁজে না পেলে যায়। ও সবকিছু থেকে ছুটি চায় এখন। মুখার্জি ম্যানশন থেকে, মুখার্জি ইন্টারন্যাশনাল থেকে, কোলকাতার হাই-ফাই সোসাইটি থেকে, ওর ঘাড়ে বর্তানো সেইসব জনহিতকর কর্মকাণ্ড থেকে সমস্ত কোলাহল থেকে দূরে কোনও এক শান্তির জায়গায় চুপচাপ শান্তিতে থাকতে চায়। তথাগত হাসে এসব কথা শুনে। বলে—'তুমি কি করে ধরে নিচ্ছ যে দূরে কোথাও চলে গেলেই মানুষ শান্তিতে

থাকে? শান্তি তো মানুষের মনের মধ্যেই থাকে নন্দু বাইরে কোথাও নয়। আচ্ছা, এখন তোমার আর অশান্তি কোথায় আছে? ডোনাকে নিয়ে একটা সময় কষ্ট পেয়েছ জানি। কিন্তু তোমার ডোনার মতো সুখী কত জন মেয়ে হয় বলতো এতসব ঘটে যাবার পরেও? এমন চমৎকার জামাই এমন সুন্দর দুটো নাতি-নাতনি পেয়েছ। তারপর তোমার ছেলে বউ দেশে ফিরে আসবে পাকাপাকি ভাবে, এরপরও তোমার এত ডিপ্রেশন কেন হয় নন্দু? ইনফ্যাক্ট, আমার তো নিজেকে পরম ভাগ্যবান বলে মনে হয়। আমার ছেলেমেয়ে সুখে আছে শান্তিতে আছে একথা ভাবলেই আমার নিজেকে সুস্থ বলে মনে হয়। তুমি একবার আমার মতো করে ভেবে দেখ তুমিও শান্তি পাবে। এখানেই শান্তিতে থাকতে পারবে। দূরে যাবার দরকার হবে না।'

নন্দু এসব কথা গুলো জানে। তথাগতকে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে না। নন্দু কচিখুকি নয় যে বোঝে না। কিন্তু ওর মনটা তো ওরই মন। সেই মনের ভেতরের ভাবনা চিন্তাগুলোও একান্ত ওর নিজস্ব। সেসব ভাবনা চিন্তায় একমাত্র ওরই অধিকার ওরই বিচরণ। অন্যরা ওর মনের বিচরণ ক্ষেত্রে কি করে প্রবেশ করবে? ওর চিন্তা ভাবনার মধ্যে কি করে অঙ্কুশ লাগাবে? ওরা কি বুঝবে যে অতীতের মধ্যে বাস করতে ভালোবাসে? ওরা ওকে পাগল ভাববে। ওর প্রতিদিনের বর্তমান যখন যে ভাবে যে দাবি নিয়ে সামনে এসেছে ও সব দাবি পূরণ করেছে। বর্তমানকে ও কখনও অস্বীকার করেনি। কিন্তু অন্য বহু মানুষের মতো বর্তমানকে স্বাগত জানিয়ে স্বীকার করতে গিয়ে অতীতকে একেবারে মুছে ফেলতে পারেনি ও। ওর ছোটোবেলা, রায়চৌধুরি ভিলা, ডিব্রুগড়, ঠামা, জেঠু-জেঠিমা, বাপি-মা, অপু এরা সবাই ওর মনের সঙ্গে চিরকাল মাখামাখি হয়ে লেপটে থেকেছে। আজও একই ভাবে আছে। ও রায়চৌধুরি ভিলায় ফিরে যেতে চায়। পরিত্যক্ত বন্ধ রায়চৌধুরি ভিলার সমস্ত জানালা-দরজা খুলে আলো-বাতাসে ভরিয়ে দিতে চায় ঘরগুলো। সংস্কার করে, রং করে আবার আগের মতো করে তুলতে চায়। জোজোর দুইছেলে বড়ো হয়ে গেছে। ওরা এবার বাপের সঙ্গে এদেশে এসে মুখার্জি ইন্টারন্যাশনালের হাল ধরবে। ধ্রুব আর নেহাও বড়ো হয়েই গেল। ওর তিনটি নাতিকে নন্দু ওর ভাবনার সঙ্গে মেলাতে পারে না। একটাই মাত্র চারাগাছ আছে সে সূর্য আর ডোনার মেয়ে নীহারিকা। ডাক নাম নেহা। নন্দুর মন নেহাকে পাশে চায়। ও নিজে ঠামার রোলে প্লে করতেচায়। ঠামার বলা সমস্ত কথা, রামায়ণ-মহাভারতের গল্প, হিতোপদেশের গল্প শোনাতে চায়। ও নেহাকে ওর মতো করে বড়ো করতে চায়। নেহার মধ্যে পুরনো দিনের সংস্কার, আদর্শ, ন্যায়নীতি সব গেঁথে দিয়ে এ যুগের আধুনিকতার ক্রমবর্ধমান অবক্ষয় থেকে বাঁচাতে চায়। গুরুজনদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করা শেখাতে চায়। শিক্ষককে সম্মান করা শেখাতে চায়। কেউ বুঝবে না কেন নন্দুর ভাবনারা অতীতে আটকে আছে। ওরা ওকে নিয়ে হাসাহাসি করবে। আর এই প্রজন্মের নতুন নতুন সমস্যা, নতুন

নতুন সর্বনাশের দুশ্চিন্তায় নন্দু ভেতরে ভেতরে ক্ষয় হয়ে বৃদ্ধ হতে থাকবে। একমাত্র একটি মানুষ আছে যে মর্যাদা দেবে ওকে। সে সূর্য। হ্যাঁ, অপুর পঙ্কিল জীবন থেকে জন্ম নেওয়া এক মহাপবিত্র পদ্মফুল।

সে-ই কবে কানপুরে পৌঁছে যখন ওকে ডোনার ফ্ল্যাটে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছিল তথাগত তখন সবিনয়ে সেই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে ওই ছেলে বলতে পেরেছিল হবু শ্বশুরকে —'গার্গি ধ্রুবকে নিয়ে আমার জীবনে আসার আগে আমি ও বাড়িতে যেতে চাই না। এ ব্যাপারে আমার কিছু রিজার্ভেশন আছে।'

ওদের রেজিস্ট্রেশন হওয়ার আগে ওই ছেলে প্রমাণ করে দিয়েছিল যে ওর জন্ম কলঙ্কিত হলেও ও নিজে কতখানি পবিত্র চরিত্রের। আরও একবার ওদের চমকে দিয়ে বলেছিল—'একটা বিশেষ অনুরোধ আছে। ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশনের আগেই আমি কথাটা বলতে চাই। দেখুন, আমি আর গার্গি দুজনেই চাকরি করি। আমাদের দুজনের রোজগারে ছোটো একটা সংসার খুব ভালোভাবেই চলবে। আমাদের যা প্রয়োজন হবে সেগুলো আমরা দুজনে মিলে আস্তে আস্তে করে নেব। প্রচুর ঐশ্বর্য আর বৈভব না থাকলেও সুখে থাকা যায় বলে আমার বিশ্বাস। দয়া করে আপনাদের রায়চৌধুরি আর মুখার্জি পরিবারের ঐশ্বর্যের কোনও চাপে আমাদের দম বন্ধ করবেন না। যে সুখশান্তির স্বপ্ন দেখে ঘর বাঁধতে যাচ্ছি আমরা ঐশ্বর্যর চাপে সে ঘর যেন ভেঙে না যায়—প্লিজ!

ডায়মন্ড স্টাডেড ঘড়ি, আংটি. বোতাম, চেইন পর্যন্ত ফেরত দিয়ে বলেছিল —'ড্যাডি, আমি এসব পরতে অভ্যস্ত নই। ঘড়ি তো আছে হাতে। হিরে জহরৎ আমার কাছে বোঝা বলে মনে হবে।' — সূর্য ওর কথা রেখে সবই করেছে। কানপুরে দুহাজার স্কোয়ারফুটের ফ্ল্যাট কিনেছে, ইনোভা গাড়ি কিনেছে, ধ্রুবকে নামকরা মিশনারি স্কুলে রেখে পড়িয়েছে। নেহাকেও নামকরা একটা স্কুলেই পড়াচ্ছিল । ওদের সংসারে শুধুই সুখ, শুধুই শান্তি। তথাগতও কখনও মুখার্জি ইন্টারন্যাশনালের কোনও বড়োমাপের চেয়ারে বসার আবদার নিয়ে ডোনা বা সূর্যর জীবনের শান্তি ভঙ্গ করতে যায়নি। আর বাবা-মার মৃত্যুর পর নন্দুও কখনও বলেনি বাপির এত প্রিয় চা-বাগানটা তোরা এসে দেখভাল কর। আমি তো বুড়ো হয়ে গেছি আর এদিক-ওদিক দুদিক সামলাতে পারি না। ওটা বিক্রি করার কথা ভাবলেও কান্না পায়। মনে হয় বাপিকেই বিক্রি করতে চাইছি। তোমরা এর ভার নাও সূর্য! —না। কখনও বলেনি একথা।

সূর্যকে প্রথম দেখে নন্দু চিনতে পারেনি। সমস্ত কথা শোনার পর সূর্যর মুখে ও বরং অমিতের আদল খুঁজে অমিতের মুখটা মনে করার চেষ্টা করছিল। আর সব চেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার ঘটেছিল ওর মনে। ওর মন যেন খোঁচা মেরে মেরে ওকে সাবধান করে বলে যাচ্ছিল—কোনও বাধা কোনও আপত্তি করো না তুমি। ও অপুর গর্ভজাত হতে পারে কিন্তু অপুর মতো নয়। তোমাদের সকলের অনেক পুণ্যফলে এই সূর্য তোমার

মেয়ের জীবনসাথী হবার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এই সূর্য আকাশের সূর্যর মতোই আলোয় ভরিয়ে দেবে তোমার মেয়ের জীবন। ওর জীবনে অপু-অমিত কারও অস্তিত্ব নেই। ও শশধর মুখোপাধ্যায়ের আদর্শে পালিত নিখাদ, একক এক শক্তিশালি ব্যক্তিত্ব। —সেদিন নন্দুর ইনার ভয়েস খাঁটি কথাই বলেছিল। অপুর রায়চৌধুরী বাড়ীর মেয়ে হতে চাওয়ার অপরিসীম আকাঙ্ক্ষাই হয়তো নিয়তির খেয়ালে ওর ছেলেকে রায়চৌধুরি বাড়ির নাতজামাই করে দিয়েছে অনেক দুর্গম পথ পার করে এনে। কিন্তু নির্লোভ সূর্যর মধ্য দিয়ে অপুর লোভী মনের বাসনা পূর্ণ হতে দেয়নি। তথাগত আর নন্দুর জীবনের অর্ধেক আকাশের মেঘ সরিয়ে দিয়ে সূর্য জ্বলজ্বল করছে পুরো আকাশটা জুড়ে। ডোনা আর সূর্য দুজনেই চায় ওদের মেয়ে নীহারিকা দিদুন নন্দুর কাছে থেকে বড়ো হোক। নন্দুও তাই চায়। সনাতন আর আধুনিক — দুটোর মিশ্রণে যেমন করে ঠামা ওকে বড়ো করেছিল ও নেহাকে সেরকম শিক্ষাতেই বড়ো করে তুলবে। কিন্তু এখানে নয়। ওকে রায়চৌধুরি ভিলায় ফেরত যেতে হবে।

—'এবার তো তোমার মুখার্জি ম্যানশন সামলাবার লোক এসে গেছে। ছুটি দেবে আমাকে? বড়ো ক্লান্ত! এবার নিজের মতো করে বাকি জীবনটা বাঁচতে চাই। নেহাকে গড়ে তুলতে চাই পবিত্র করে। দাও না ছুটি।'

—'শুধু নিজের জন্য ছুটি চাইছ? আমার কথা ভাবলে না?'

—'তুমি তো ছুটি চাওনি কখনও। মুখার্জি ইন্টারন্যাশনাল তোমাকে ছুটি দেবে ভাবছ?'

—' কেন? ছেলে-বউ এসে গেছে ঘরে। জোজো তো ভার নিয়ে নিয়েছে। সান্ড্রাকেও স্টেট গভর্মেন্ট জমি দিয়েছে আগ্রহী হয়ে ওর রি-প্রোডাকটিভ স্টেম সেল রিসার্চ সেন্টার খোলার জন্য। আমিও তো এখন মুক্ত। ওদের দরকার পড়লে ফ্লাইট ধরে এসে দেখে যাব।'

—'তাহলে চলো। থাকতে পারবে তো কোলকাতা ছেড়ে? টেনিস কোর্ট সুইমিং পুল নেই যে!'

—' তোমাকে ছাড়া কোথাও থাকতে পারব না। তুমি পাশে থাকলে সুন্দরবনও কোলকাতা।'

রায়চৌধুরি ভিলায় মিস্ত্রি লেগেছে। হাফপ্যান্টের ওপর একটা টি. শার্ট পড়ে তথাগত কাজের তদারকে ব্যস্ত । এখানে এই পরিবেশে কেউ চেনে না, কেউ জানে না ও কে? শীতের রোদ্দুরে অতবড়ো রায়চৌধুরি ভিলার চারপাশে ছুটোছুটি করতে ভালো লাগে ওর। এক ঘেয়ে পোশাকে এ. সি. চেম্বারে বসে বসে হাঁফিয়ে পড়েছিল সেটা এখন বুঝতে

পারছে। এসব কাজও যে মানুষকে কতখানি আনন্দ দিতে পারে আগে কোনও ধারণাই ছিল না। শ্বশুর-শাশুড়ি মারা যাবার পর আর সংস্কার হয়নি বাড়িটার। কেয়ারটেকারের হাতে রাখা ছিল। নন্দুর প্রাণের টান। তথাগত বুঝত নন্দু এখানেই শেষ জীবনটা কাটাতে বদ্ধপরিকর। এই টান নন্দুর একার নয়। পৃথিবীর বহুমানুষ এই মাধ্যাকর্ষণের টানে ফেরৎ আসে জন্মভূমিতে, জন্মভিটেতে। ওর পরিবারে, ওর নিজের জীবনে অনেক অনেক অবদান এই সুনন্দা নামের মহিলার। সে সব ঋণ তথাগত কোনও দিন বোধহয় শোধ করতে পারবে না। ওর নিজের জীবনেও একটু পরিবর্তন দরকার ছিল। নন্দু ওর পুরোনো ভূমিতে, ওর পুরোনো ধ্যান ধারণা, বিশ্বাস ইত্যাদি অবলম্বন করে নাতনিকে নিয়ে এক নতুন অধ্যায় রচনা করতে চাইছে। তথাগত আর কোনও বাধা দেবে না। কারণ নন্দু প্রমাণ করেছে যে ওই ঠিক ছিল। আজ তথাগতও চায় নাতনি নেহা সুনন্দার মতোই যেন হয়। নেহাকে নিয়ে আবার প্রথম থেকে শুরু হোক না! যতদিন বেঁচে থাকা ততদিনই তো আশা-আকাঙ্ক্ষা! ডিব্রুগড়ে এসে এই যে শান্ত জীবন এ যেন এক রূপকথা থেকে হঠাৎ টুকুস করে এসে পড়েছে ওর সত্তর ছুঁই বয়সের জীবনে। একেবারে অন্যরকম জীবন অন্যরকম অভিজ্ঞতা। ভালো লাগছে, খুব ভালো লাগছে ওর। আরও অনেকদিন বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করছে। গাড়ি বের না করে সাইকেল রিক্সায় চেপে বাজার থেকে ব্রহ্মপুত্রর তাজা চিতলমাছের তিন কিলো ওজনের পেটের কাছটা কিনে এনে বিশ্বজয় করার সুখ অনুভব করছে তখন নন্দু একগাল হেসে বলছে —'তুমি এ মাছ কী করে চিনে নিয়ে এলে গো? জীবনে একটি দিনও বাজারে যাওনি!' – ওর মনে হয় এরা এখনই আসল সংসার করছে, সংসার ধর্মের স্বাদ অনুভব করছে। এতকাল যে সংসার করেছে তার স্বাদ, গন্ধ মাদার ডেয়ারির দুধের মতো ছিল। না, তথাগতর কোনও পশ্চাতাপ নেই রায়চৌধুরি ভিলায় অবসর জীবন কাটাতে এসে। তাছাড়া, সূর্য খুশি মনে নেহাকে দাদু-দিদার হাতে সঁপে দিয়ে বলেছে—'নন্দুমা, তুমি নেহাকে ঠিক তোমার মতো করে গড়ে তুলো। আমিও যে তোমার মতোই পশ্চিমী থেকে দেশি রীতি রেওয়াজেই বেশি বিশ্বাস করি।' —ওকে গাড়ি করে স্কুলে ছেড়ে আসা আর নিয়ে আসাতেও কত সুখ। বকর-বকর করে কত কথা বলতে থাকে নাতনিটা। প্রাণে সুখের পরশ বুলিয়ে দেয় ওর হাজার হাজার জিজ্ঞাসা। ওর প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিয়েও ক্লান্তিবোধ হয়না তথাগতর। নন্দু ঠিকই বলত— ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনি কাছে না থাকলে বয়স্ক মানুষের জীবন মরুভূমির মতো। তবে এ সুখ ক্ষণস্থায়ী। নন্দু ওকে কোনও লাক্সারি করতে দেবে না। নেহা এখন স্কুলবাসে করে স্কুলে যাবে অন্যদের মতো।

নীচু পাঁচিলের ওপারে একরকমের দেখতে চারটে বাড়িই ভাড়া হয়ে গিয়েছিল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখে নন্দু। ওই মাঝের বাড়িটাতে নবীনদাদুরা থাকতেন। নবীনদাদু এই আমগাছটা লাগিয়েছিলেন যেদিন সেদিন ও আর অপু মগে করে জল ঢেলেছিল গাছের

গোড়ায়। কতবড়ো ঝাঁকড়া বৃক্ষ হয়ে কতখানি জায়গায় ছায়া দিয়ে রেখেছে গাছটা। গরমকালে নিশ্চয় হিমসাগর আম ফলাবে। অপুরা খেতে পারেনি। তখন ফলত না। ঠামা বলতো—'নারকেল গাছ একপুরুষ লাগায় অন্যপুরুষ ফল খায়। তবে সে আসল নারকেল গাছ বুঝলি? ওই বেঁটে বেঁটে বামুন গাছ নয়, যেগুলো তিন-চার বছরেই এইটুকুটুকু হাজারটার ভেতর খোকলা ফল ঝুলিয়ে বাহবা কুড়োয়। মাগো! ওগুলো আবার নারকেল নাকি?' —নন্দু ভাবে এই আমগাছটাওতো যিনি পুঁতেছিলেন তিনি খেতে পারেননি। এর ফল তাঁর পরবর্তী পুরুষরা খেতে পায়নি। অন্য লোকে খাচ্ছে।

চারটে বাড়িতে যারা যারা থাকেন প্রত্যেককেই চেনে নন্দু। কথাবার্তা বলে, আসা-যাওয়া আছে। নবীনদাদুদের বাড়িটাতে আছেন শ্রীপ্রমথ গগৈ। সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন আসাম সরকারে। এখন রিটায়ার্ড। ওরই ছোটোছেলে ডিব্রুগড় মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তার-প্রফেসর। ছেলের বউ গার্লস হাই স্কুলে জিওগ্রাফির টিচার। ওদের ছোটোমেয়েটা নীহারিকার স্কুলে একই ক্লাশে পড়ে। নেহার বন্ধুও। নাম মীনাক্ষী। মিনু বলে ডাকে সবাই। মিনু নেহার থেকেও পড়াশুনোয় বেশি ভালো। ওদের দুজনকে একসাথে দেখলেই অপুর কথা মনে পড়ে। মিনু যখন গেট খুলে ও বাড়ি থেকে এবাড়িতে আসে তখন নন্দু প্রায়ই চমকে ওঠে, মনে হয় অপু আসছে। মিনুকে নিয়ে ওকে ভয় পেতে হয় না। মিনু সভ্য, ভদ্র। উচ্চশিক্ষিত পরিবারের শাসনের বাঁধনে বাধা মেয়ে। একটু বেশি দেরি করলেই ওর দাদু প্রমথ গগৈ নাতনিকে ডাকাডাকি করে নিয়ে যান। নেহাকে খুশি মনেই মিনুর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে দিতে পারে নন্দু। সারা পাড়া জুড়ে অপুর মতো ঘুরে বেড়ানোর মেয়ে ও নয়। বাকি তিনটে বাড়িতে ছোটো ছেলেমেয়ে নেই তাই নেহা এখানে আসার পর মিনু আর নেহা পরস্পর খেলার সাথী হয়ে খুব খুশিতে আছে। নন্দুও নিশ্চিন্ত। নেহাকে ওর মনের মতো করে তৈরি করার স্বপ্ন সার্থক করে তোলার ব্রত পালন করে চলেছে। সকালবেলা স্নান করে আগে ঠাকুর প্রণাম করে সরস্বতী স্তোত্র পাঠ করে এসে পড়তে বসা। তারপর হাতে মেখে ডাল-ভাত-মাছ-তরকারি খেয়ে স্কুলে যাওয়া। সন্ধের সময় আবার ঠাকুরঘরে গায়ত্রী স্তোত্র পাঠ করে হোমওয়ার্ক করা, পরের দিনের পড়া শেখা। বিকেলে আর ছুটির দিনে মিনুর সঙ্গে যত ইচ্ছে খেলা করা। ফাঁকে ফাঁকে দিদুনের পাশে শুয়ে রূপকথার গল্প, রামায়ণ-মহাভারতের গল্প শোনা। এক ফাঁকে বাংলা লিখতে পড়তে শেখা। বাংলা ভালো করে শেখানোর জন্য সেই পুরাতন ঠাকুরমার ঝুলি. শুকতারা, সন্দেশ পত্রিকারা আবার আসতে শুরু করেছে রায়চৌধুরি ভিলাতে ডাকেযোগে। নাতনির প্রোগ্রেস দেখে নন্দুও স্যাটিসফাইড। পরম্পরাগতভাবে ও নেহাকে তৈরি করে যাবে। নেহা আবার পরে পরম্বরা বজায় রেখে ওর কোনও উত্তরসূরিকে তৈরি করে রেখে যাবে। এভাবেই টেনে নিয়ে যেতে হবে নিজেদের অমূল্য সব পুরাতন ধ্যানধারণা, বিশ্বাস, শিক্ষা আর সংস্কৃতিকে। আধুনিক শিক্ষার প্যারালাল চালাতে হবে পুরোনো শিক্ষাগুলোও। ওগুলোকে

বর্জন করে হারিয়ে যেতে দেওয়া চলবে না। তাহলেই বিপর্যয় সহজে গ্রাস করতে সক্ষম হবে না। নন্দু সেটা আর হতে দেবে না দ্বিতীয়বার।

—'কি হল? উঠে পড়লে কেন? বসো না।' — তথাগত অনুনয় করে বলে।

—'দাঁড়াও। সুতোর বাক্সটা নিয়ে আসছি। পাঞ্জাবির বোতামটা নেই বলনি কেন?'

—'ও থাক। পরে হবে এখন। তুমি বসো।'

—'না। পরে বলে ফেলে রাখলে আর হয় না। এক্ষুনি তো আসছি রে বাবা।'

নন্দু উঠে গিয়ে সুতোর বাক্স নিয়ে এসে বসে। সূচে সুতো পরাতে গিয়ে জেরবার অবস্থা। সুতো আর ঢোকে না কিছুতেই। একবার ঢুকে গেছে মনে করে টান মারতেই সূচটাই গেল পড়ে।

—'এই যাহ! সূচটাই পড়ে গেল।'

—'আমাকে দিলেই পারতে আমি সুতো পরিয়ে দিতাম। দাঁড়াও খুঁজে দেখি কোথায় পড়ল।— তথাগত মাটিতে হামা দিয়ে সূচ খোঁজে। নন্দুও সোফার ওপাশে হামা দেয়। সুতো ছাড়া সূচ! কারও পায়ে বিঁধে গেলেই বিপদ।

—'এ মা! এই দাদু! এই দিদুন! তোমরা লুকোচুরি খেলছ? আমি আর মিনু তো এমনি করে লুকোচুরি খেলি। যাহঃ! বড়োরা আবার লুকোচুরি খেলে নাকি? ' —নীহারিকা এসে কখন ঢুকেছে ঘরে —তোমরা কি ছোটো হয়ে গেছ?'

তথাগত হামা দিয়ে এদিক ওদিক এগোতে এগোতে বলে—' খেলে খেলে। হাত থেকে সূচ পড়ে গেলে বড়োদেরও লুকোচুরি খেলতে হয়। তুই দ্যাখ না খুঁজে পাস কিনা?

—'এই তো সূচ! সামনেই তো পড়েছিল।' —নিচু হয়ে সূচ তুলে নেহা বলে —'আমাকে দাও আমি সুতো পরিয়ে দিই।'

সুতো পরিয়ে দিয়েই বলে —'দিদুন কালকের রবিবারে মিনুর ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে। মনে আছে তো তোমার? লুচি, আলুর দম, রসগোল্লা আর দরবেশ হবে। এনে দেবে তো?

নন্দুর মুখ দিয়ে কোনও কথা বের হয় না। এ কথাগুলো নেহা কি করে বলল? জানল কি করে? এগুলো তো ঠিক এই বয়সে নন্দু বলতো ওর ঠামাকে । ওর মা শ্রীলা লুচি আর আলুরদম বানিয়ে দিত অনিচ্ছাসত্ত্বেও আর ঠামা দরবেশ-রসগোল্লা আনিয়ে দিত বাজার থেকে। অপু সন্ধেবেলা সেজেগুজে ওর ছেলে পুতুলটাকে রাংতার টোপর পরিয়ে নিয়ে আসত । নন্দুও ওর মেয়ে পুতুলের হাতে, গলায়, মাথায় সোনালী রাংতার গয়না পরিয়ে, মার মেশিনের ড্রয়ার থেকে পড়ে থাকা লাল সিল্কের কাপড়ের টুকরো দিয়ে শাড়ি পরিয়ে ঠাকুরঘরের বারান্দায় অপেক্ষা করত। ঠামা জিজ্ঞেস করত—'হ্যাঁরে, বরযাত্রী কতজন?' —নন্দু অম্লান বদনে বলত— 'কেন? অপুই তো বরযাত্রী। ওরই তো ছেলে না?'

নন্দু নেহাকে পরীক্ষা করার জন্য জিজ্ঞেস করে—'সে সব তো হবে কিন্তু বরযাত্রী কতজন আসবে?' নেহা সরল মনে অম্লান বদনে উত্তর দেয়—'মিনুই তো বরযাত্রী আসবে গো। ওর ছেলের সঙ্গেই যে আমার মেয়ের বিয়ে!'

নীহারিকা চলে গেছে রুম থেকে। ওর পেছনে খুনশুঁটি করতে করতে তথাগতও চলে গেছে। দুই দাঁতের মাঝখানে সুতোশুদ্ধ সূঁচটা ঝুলে আছে নন্দুর। হাতে তথাগতর ছেড়ে যাওয়া পাঞ্জাবি। কিন্তু বোতাম লাগাচ্ছে না। ওর মুখের রেখায় পরিতৃপ্তির হাসি। এযুগেও নেহা ওর পুতুলমেয়ের বিয়ে দেবে মিনুর ছেলের সঙ্গে! ওর জানাশোনা কোনও বাচ্চারা এখন আর ঘাস-লতা-পাতা, ফেলে দেওয়ার সবজির অবশিষ্ট রান্নাঘর থেকে কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে রান্না-বাটি খেলা করে না। প্লাস্টিকের পুতুলকে রাংতার মুকুট পরিয়ে পুতুলের বিয়ে দেয় না। বিদেশি টকিং ডল, বার্বি ডল, কিচেন সেট, রোবট, ব্যাটম্যান, স্পাইডারম্যানে ভরে আছে বাজার। টি. ভি. তে শক্তিমান, ব্যাটম্যান, স্পাইডারম্যানে ক্যারিস্মা দেখে নিজেরা ওইরকম হতে গিয়ে কত দুর্ঘটনাই না ঘটেছে তবু মা-বাবারা সাবধান হয় না। স্মার্টনেসের মারাত্মক দৌড়ে জানবাজী রেখে নিজেরাই এগিয়ে দেয় শিশুগুলোকে। ও নেহাকে এসব খেলনা কিনে দেবে না কখনও। নেহা সনাতন খেলা খেলবে। 'ফুল বলে ধন্য আমি।'— গানের সঙ্গে রবীন্দ্র নৃত্যের লয়ে নাচবে। পাছা দুলিয়ে, কাঁধ শেক করে হিন্দি সিনেমার চটুল গানের সঙ্গে ওইসব ব্রেকডান্সের মতো কুৎসিত নাচ নাচবে না। নেহা একটা নরম-সরম সাধারণ মেয়ের মতো বড়ো হবে। মুখার্জি বা রায়চৌধুরিদের বড়োলোকির আঁচ ওর শরীরে লাগতে দেবেই না নন্দু। নেহা যে সূর্যর মেয়ে! নেহা যে সুনন্দার নাতনি। নেহাকে যে কিছুতেই ওর ঠাকুর্মা অপুর মতো কিংবা মা ডোনার মতো ভুল করতে দিতে পারে না ওর দিদিমা সুনন্দা। ওর বাবা যে ভাস্কর ওরফে সূর্য! আগামীদিনের সমাজ আরও অবক্ষয়ের অন্ধকারে ডুববে—জানে নন্দু। এখন সেই তথাকথিত প্রগতিশীলতার ধ্বজাধারী শ্রী তথাগত মুখার্জিও ঠেক খেয়ে শিখেছে। এখন ও মানতে বাধ্য হয়েছে যে ওর বউ চিরকাল ঠিক কথা বলেছে। তাই নীহারিকার ব্যাপারে নন্দুর কঠোর নিয়মানুবর্তিতা বা শাসনের মধ্যে একেবারেই নাক গলাতে আসে না। ডোনা চোখে আঙুলপুরে দিয়ে শিখিয়ে দিয়েছে ব্যক্তি স্বাধীনতাকে কত সহজে স্বেচ্ছাচারিতায় পালটাতে পারে আজকের ছেলেমেয়েরা।

নন্দু হাতে পাঞ্জাবিটা তুলে নিয়ে বোতাম বসাতে বসাতে এক যুগ আগে মরে যাওয়া অপুকে মনে মনে বলে —এই রায়চৌধুরি বাড়ির চারপাশে তাকালেই তোর নানারকম অপকীর্তির ইতিহাস চোখের সামনে ভেসে ওঠে অপু। কিন্তু তোর অপকীর্তির ধ্বংসস্তুপের ওপরেই আমি তোর নাতনির সুকীর্তির সৌধ বানাব। পশ্চিমি উচ্ছৃঙ্খলতার আঁধি আমাদের আকাশটাকে অন্ধকারে ঢেকে দিচ্ছে সেই অন্ধকার আরও গাঢ় হবার আগেই আমি নীহারিকার মাধ্যমে অন্তত একটা দীপ জ্বালিয়ে রাখতে চেষ্টা করব অপু। যে দীপে সলতে

মজবুৎ হবে, সুশিক্ষা আর রক্ষণশীলতার তেলে অনির্বাণ হয়ে জ্বলবে সেই দীপশিখা। তোর ছেলে সূর্যর কাছ থেকে আগুন নিয়ে তোর নাতনির দীপটা জ্বালিয়েছি আমি। তুই কোথায় আছিস আমি জানি না। যেখানেই থাকিস না কেন লক্ষ রাখিস ভাই কোনও দমকা হাওয়া বা হঠাৎ খবর না দিয়ে এসে পড়া ঝড় যেন নীহারিকা নামের শিখাটা কে না নেভাতে পারে। দু'হাত দিয়ে আড়াল করে শিখাটাকে জ্বলতে দিস অপু। তোর প্রাণের চেয়েও প্রিয় সূর্যকে ফেলে রেখে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলি তুই। আর আমারও প্রাণের চেয়েও প্রিয় মেয়েটা নিজের দোষে পথ হারিয়ে ফেলেছিল। ওরা দুজনে অন্ধকারে একা একা অনেক কষ্ট পেয়েছেরে। ভগবানের অশেষ করুণায় ওদের দেখা হয়েছিল। একে অন্যের হাত ধরে ওরা আলোয় ফিরেছে। তুই যেখানেই থাকিস সেখান থেকেই আশীর্বাদ করিস আর কোনও অন্ধকার যেন কখনও না আসে ওদের জীবনে। আর আমি যেন নীহারিকাকে সত্যিকারের মানুষ করে তুলতে পারি। আমার ওপরে তো তোর অগাধ বিশ্বাস ছিল। সূর্যরও অগাধ বিশ্বাস রে আমার ওপরে। তাই তো নীহারিকাকে আমার হাতে দিয়েছে। আমি যেন তোদের বিশ্বাসের মূল্য রাখতে পারি অপু। —কাল যে তোর নাতনির পুতুলমেয়ের বিয়ে। আমি জানি কাল তুই না এসে থাকতে পারবি না। কেউ না দেখুক, কেউ না বুঝুক, —আমি শুধু বুঝব বাতাসের সঙ্গে মিশে তুই আছিস ওখানে। পুতুলের বিয়ে আর তুই থাকবি না? সে তো অসম্ভব ব্যাপার! জানিস অপু আমি জোজোকে নিয়ে কখনও এত দুশ্চিন্তা করিনি। ও যে ছেলে! হাজারটা কেলেঙ্কারিতেও দোষ হয়না ওদের। আমি ডোনাকে নিয়ে চিন্তা করতাম। কত বুঝিয়েছি তবু খোঁটা উপরে ফেলল। আমাদের সমাজ উচ্ছৃঙ্খলাতাকে আজও মেনে নেয় নারে।

ভাবতে ভাবতে নন্দুর মুখে আবার হাসিফুটে ওঠে। এই শতকে, ২০০০ সাল পার হয়ে আসা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানের জগতে বাস করেও ও ইহলোক, পরলোক, জন্মান্তরবাদ, আত্মা, ঈশ্বর —সব মানে পূর্ণমাত্রায়। একথা শুনলে শিক্ষিত মানুষেরা খুব মজা পাবে। ওকে নিয়ে হাসাহাসি করার, সমালোচনা করার সুযোগটা কেউ ছাড়বে না। হাসুক গে। নন্দু তো নন্দুর মতন; অন্য কারও মতো হতে চায় না ও। অবিশ্বাস করে কিছু না পাওয়ার চেয়ে বিশ্বাস করে কিছু পাবার আশা করলে ক্ষতি কি? নন্দুও তো ঠামার থেকে অনেক পরের প্রজন্মে জন্মিয়েছিল! ঠামার দেওয়া শিক্ষাগুলোকে বিশ্বাস করে গ্রহণ করেছিল। তাতে তো ওর কোনও ক্ষতি হয়নি! দার্জিলিং-এর পড়াশুনোর পাঠ শেষ করে বাড়িতে এসেছে ও। দাদাদের সঙ্গে লনে ব্যাডমিন্টন খেলছিল। কোর্টফোর্ট ছিল না। এমনি ঘাসের ওপরে এদিকে-ওদিকে দাঁড়িয়ে খেলছিল ওরা। ঠামা ওকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল ভেতরে। বলেছিল—'এখন থেকে এই ছোট্ট প্যান্ট (ডেনিমের টাইট শর্টস্ ছিল ওটা) আর এই বুক দেখানো জামাগুলো (কোমর লেংথের স্লিভলেস টপ ছিল পরনে) আর পরবি না। লজ্জা করে না তোর? নিজের দাদাদের সামনে লাফিয়ে লাফিয়ে এইসব পোষাক পরে

খেলছিস? —যা। তোর মার কাছ থেকে শাড়ি পরা শেখ গিয়ে। শাড়ি পরবি এখন থেকে।' —সেদিন প্রথম নন্দু লজ্জা পেয়েছিল। নিজের শরীর সম্পর্কে সচেতন হয়েছিল।

নন্দু ঠামার কথা শুনেছিল। সেই আঠারো বছর বয়সের পর থেকে বাড়ির বাইরে শাড়ি ছাড়া অন্য কোনও পোশাক পরেনি ও আজ অবধি। সেই সময়েও প্রেসিডেন্সি কলেজে বা ইউনিভার্সিটিতে এক-দুজন মেয়ে মাঝে-সাঝে অন্যরকম পোশাক পরত বইকি! কিন্তু ও পরেনি আর। এমনকি এতবার যে বিদেশে গেছে শাড়িই পরেছে আর ওর এই বৈপরীত্যই বিদেশে মানুষের চোখকে আকর্ষণ করেছে। শাড়িপরা সুন্দরীকে লোকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে দেখেছে।

নন্দু ভাবে—কিন্তু আমি ডোনাকে পারিনি। ঠামার ভাষায় না বলতে পারলেও আমি বলেছি। শাড়ি পরেই থাকতে হবে তাও বলিনি। বলেছি এই সব প্রভোকেটিভ ড্রেসগুলো পরিস কেন? তোরা এসব পরিস বলেই তো আজকাল এত ইভটিজিং, এত রেপ কেস শোনা যায়। — বলেছি—মেয়েদের শরীরটা তো ঢেকে রাখার জিনিষ। তোরা এখনকার মেয়েরা যেসব পোশাক পরিস তার চেয়ে খালি গায়ে থাকলে বরং পুরুষেরা উত্তেজিত হবে না । তোদের আক্রমণ করবে না। এ যেন ইচ্ছে করে আক্রান্ত হবার জন্যই চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো —এই দ্যাখো, আমার শরীরে কত শত ইউটার্ন আছে!

না। ডোনা শোনেনি। কেউ শোনে না আজকাল । জানে নন্দু। কোলকাতার রাস্তায় চলমান মেয়েদের দিকে তাকিয়ে ওর লজ্জা হত, লজ্জা হত নিজের মেয়ের দিকে তাকিয়েও। ডোনারা নিজেদের বাঙালি বলে তো নয়ই বোধহয় ভারতীয় বলে মানতেও লজ্জা পেত। অথচ এইসব ডোনারা হয়তো অনেকেই ইংল্যান্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স কিংবা অন্য কোনও বিদেশে কখনও পা রাখেনি। তবুও নিজেকে বিদেশী বানাবার কি লজ্জাকর প্রচেষ্টা এদের। নিজের দেশটাতে যা আছে সব খারাপ। শালীনতা, সহিষ্ণুতা, সংযম —এসব শব্দগুলোতে ভয়ানক অ্যালার্জি! শুনতেই চায় না। যেন মা খারাপ কথা শোনাচ্ছে! আশ্চর্য ব্যাপার—যে বিদেশীদের এরা অনুকরণ করতে চায় তাদের মধ্যে নন্দু কিন্তু কখনও বেলেল্লাপনা লক্ষ করেনি ওসব দেশে থাকার সময়। আমাদের এরা অনুকরণের নামে যে সব করে ফেলছে সেগুলোর কোনও ব্যাখ্যা নেই একমাত্র উচ্ছৃঙ্খলতা ছাড়া। নীহারিকাকে বাঁচাতে হবে ওকে। যত কঠিনই হোক সে কাজ তবুও ও করবে। জোজো, ডোনা বা তথাগতরা ওকে নিয়ে যত বিদ্রুপই করুক ও সব সহ্য করবে। জোজো আর সান্দ্রার খুব আপত্তি ছিল মম্-ড্যাডের ডিব্রুগড়ের মতো একটা জায়গায় নীহারিকাকে নিয়ে নির্বাসনে যাওয়ার ব্যাপারে। জোজো তো বিদ্রুপ করে সকলের সামনেই বলেছিল —'Mom, old age is not the name of a old body but it is the name of a old mind. তুমি মনে মনে বুড়ো হয়ে যাচ্ছো মম। মেয়েরা যখন স্পেসশিপে ইউনিভার্সে ঘুরে বেড়াচ্ছে মাসের পর মাস ধরে তখন তুমি নেহাকে কলকাতা থেকে

সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছো পুরনো আচার-বিচারে বিশ্বাসী করে তুলতে? ব্যাপারটা খুবই 'ফানি' মনে হয়—তাই না? এখন তো এখানেই স্কুলে ক্লাস সিক্সে সেক্স এড চালু হচ্ছে।'

নন্দু শীতলগলায় উত্তর দিয়েছিল—'না ফানি মনে হবার কোনও কারণ নেই। স্পেসশিপে চড়ে আকাশে ঘুরে বেড়ানোর সঙ্গে নিজের নৈতিক চরিত্র হনন করার কোনও যোগ নেই। বিজ্ঞানে বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা রাখার মতো সামান্য বিদ্যা বা জ্ঞান আমারও আছে। আমার আরও একটা জ্ঞান আছে যা তোদের নেই। সেটা হল সত্যিকারের মানুষ হতে গেলে সবচেয়ে আগে নিজের চরিত্রটাকে মজবুত করে গড়তে হয়। নিজের সমাজকে না চিনলে, যে সমাজে আমার বাস, সেই সমাজ আমার কাছে কি আশা করে সেটা না জানলে চরিত্র গঠন করা অসম্ভব। আমি ওল্ড মাইন্ডেড নই জোজো। আমি অত্যন্ত শুভ ফলদায়ী কিন্তু ওল্ড বিশ্বাসে বিশ্বাসী। আমার সেইসব বিশ্বাসকেই আমি নেহার মধ্যে স্থাপন করতে চাই। ও এদেশের এক মধ্যবিত্ত বাপের মেয়ে হয়ে জন্ম নিয়েছে। এই সমাজে নিজের মান বাঁচিয়ে আত্মসম্ভ্রম বাঁচিয়ে ওকে চলতে হবে। সেটা যাতে সঠিক করতে পারে সেই চেষ্টাই করছি। পশ্চিমের দেশগুলোতে তো একটা সময় বারো বছর বয়স থেকে ছেলে-মেয়েদের স্বাধীনতা দেওয়া হত জোজো! মায়েরা বারো বছরের মেয়ের দুধের গ্লাসে পিল ছেড়ে দিয়ে গোপনে কনট্রাসেপটিভ খাইয়ে ডেট্ করতে পাঠাত। এতে না হয় বারো-চোদ্দো বছর বয়সে প্রেগন্যান্সির দুর্ঘটনা আটকানো গেছে। কিন্তু বল তো আমাকে—এর চেয়েও বড়ো দুর্ঘটনা কি ওরা ডেকে আনেনি? স্বাধীনতার নামে যে উচ্ছৃঙ্খল খেলায় ওরা মেতেছিল তার ফলেই কি আজ পৃথিবী জুড়ে এইচ.আই.ভি.র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েনি? —এখন পশ্চিমি দেশগুলো ঠেক খেয়ে শিখে পথে আসার চেষ্টা করছে রে! আমাদের ফেলে আসা সেই পুরনো নাকসিঁটকোনো পথটাতেই আসতে চেষ্টা করছে ওরা! আর আমরা? আমরা ওদের ইউজ করা কনডোমগুলো নিজেদের সন্তানের হাতে তুলে দিয়ে বিদেশীআনার ট্রেনিং দিচ্ছি। —না। নেহাকে আমি কখনও বিদেশের স্বপ্ন দেখাব না। ও একেবারে দেশী হয়ে সুস্থ শরীর-মন নিয়ে বেঁচে থাকুক জোজো। বেশি আধুনিক নাই বা হলো, —আমার মতো সাধারণ মেয়ে হয়েই থাকুক।' —উত্তেজিত হয়ে একনাগাড়ে জোজোকে ঝেড়ে ঘেমে, মুখ-গাল-কান লাল করে ফেলেছিল সেদিন নন্দু।

নন্দু জানে না ওরা সেদিন ওকে বুঝতে পেরেছিল কিনা! তবে কেউ আর তর্ক করে কথা বাড়ায়নি। ক্লাস সিক্সে সেক্স এড চালু করে বাচ্চাদের মনে কৌতুহলের মাত্রা বাড়িয়ে পরীক্ষা করে দেখার উৎসাহই বাড়িয়ে দেওয়া হবে। লাভ কিছুই হবে না বরং সর্বনাশটাকে আগাম ডেকে আনা হবে। শৈশবকে গলাটিপে মেরে এক একটা পাকাপোক্ত ছেলেমেয়ে তৈরি করার পথ খোলা হবে। —ভুল, ভুল। সব ভুল সিদ্ধান্ত। এভাবেই বার বার ভুল সিদ্ধান্তের বলির বকরা হচ্ছে আমাদের সন্তানরা। নেহাকে কী করে চারিদিকের ভুলের

দূষিত হাওয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখব আমি? —যত ভাবে তত বুকে ব্যথা হয় চিনচিন করে। তত মাথা ধরে থাকে সারাদিন ধরে। কাউকে কিচ্ছু বলে না ওর টেনশন ওর শরীর-বুক ধড়ফড় করার কথা। একা সহ্য করে নিজের যন্ত্রণা। যত কষ্টই হোক, ওকে কেউ না বুঝুক তবু সামনের লক্ষ স্থির হয়ে আছে সুনন্দা মুখার্জির। মাছের চোখটা ওকে একটি বাণেই বিদ্ধ করতে হবে। চ্যারিটি বিগিনস অ্যাট হোমের মতো নেহাকে তৈরি করেই পারিবারিক পিউরিফিকেশন শুরু করাতে হবে প্রথমে। তারপর একদিন হয়তো নীহারিকা ওর আপন আলোয় আরও বহুজনের মধ্যে ছড়িয়ে দেবে এই সত্ত্বা। বহু পথ হারানোকে ফেরাবে ঘরে। ও পারবে। ও যে নীহারিকা!